

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নতুন চাঁদ দেখা	3
ওজরগ্রন্থদের রোজা পালন	15
মুসাফিরের রোজা	33
অসুস্থ ব্যক্তির রোজা	47
রোজাদারের জন্য যা করা মুস্তাহাব	66
রোজাদারের জন্য যা করা বৈধ	83
রোজা ভঙ্গের কারণসমূহ	95
রোজার কাযা পালন	147
নফল রোজা	178
যে দিনগুলোতে রোজা রাখা নিষিদ্ধ	211
ইতিকাফ	216
কাফফারা	233
তারাবী নামায ও লাইলাতুল কদর	248
রমজানের মাসয়ালাসমূহ	286
রোজা অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী	326
রোজা ফরজ হওয়া ও এর ফজিলত	330
রমজানে নারী	362

নতুন চাঁদ দেখা

ধর্তব্য হল চাঁদ দেখা; জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব নয়

প্রশ্ন

কোন মুসলিমের জন্য রোযা শুরু করা ও শেষ করার ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিদ্যার উপর নির্ভর করা কি জায়েয? নাকি অবশ্যই চাঁদ দেখতে হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলামী শরিয়া (আইন) সহজ। এর বিধিবিধান সাধারণ ও সর্বস্তরের মানুষ ও জ্বিনকে অন্তর্ভুক্তকারী; তারা শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক, শহরবাসী হোক কিংবা গ্রামবাসী হোক। এ কারণে আল্লাহ তাদের জন্য ইবাদতসমূহের সময় জানার পদ্ধতি সহজ করেছেন। তিনি ইবাদতসমূহের শুরু ও শেষের সময় জানার জন্য এমন কিছু আলামত নির্ধারণ করেছেন যে আলামতগুলো জানা সবার নাগালে। উদাহরণস্বরূপঃ সূর্যাস্তকে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু ও আসরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আলামত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। লালিমা অস্ত যাওয়াকে এশার ওয়াক্ত প্রবেশের আলামত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। মাসের শেষদিকে চন্দ্র অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর নতুন চাঁদ দেখা যাওয়াকে নতুন চন্দ্র মাস শুরু হওয়া ও আগের মাসের সমাপ্তির আলামত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি মাসের শুরু জানার জন্য আমাদেরকে এমন কিছু জানার দায়িত্ব দেননি যেটা গুটি কয়েক মানুষ ছাড়া অন্যেরা জানে না; আর তা হচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যা কিংবা নক্ষত্র গণনাশাস্ত্র। নতুন চাঁদ দেখাকে মুসলমানদের রোযা শুরু করা ও রোযা ভঙ্গ করার আলামত হিসেবে নির্ধারণ করে কুরআন ও সুন্নাহতে অনেক দলিল উদ্ধৃত হয়েছে। ঈদুল আযহা ও আরাফার দিন নির্ধারণের বিষয়টিও অনুরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পাবে সে যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে।” [সূরা বাক্বারা; ২:১৮৫]। তিনি আরও বলেন: “তারা আপনাকে নতুন চন্দ্রসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; বলুন: সেগুলো মানুষের (কাজকর্ম) ও হজ্জের সময় নির্ধারক।” [সূরা বাক্বারা, ২:১৮৯] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যখন তোমরা সেটা (চাঁদ) দেখবে তখন রোযা রাখবে এবং যখন তোমরা সেটা (চাঁদ) দেখবে তখন রোযা ভঙ্গ করবে। আর যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে তোমরা ত্রিশদিন পূর্ণ করবে।” অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রাখাকে রমযান মাসের নব চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং রোযা ভাঙ্গাকে শাওয়াল মাসের নব চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন; তিনি নক্ষত্র গণনা কিংবা গ্রহসমূহের পরিভ্রমণের সাথে সম্পৃক্ত করেননি। এভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায়, খুলাফায় রাশেদীনের যামানায়, চার ইমামের যামানায় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তিন প্রজন্মের উত্তমতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন সে যামানায় আমল হয়েছে। তাই চন্দ্রমাস সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে চাঁদ দেখা বাদ দিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার শরণাপন্ন হওয়া বিদাতের অন্তর্ভুক্ত; যাতে কোন কল্যাণ নাই এবং এর সপক্ষে শরিয়াতে কোন দলিল নাই...। কল্যাণ হচ্ছে যার গত হয়েছেন দ্বীনি বিষয়ে তাদের অনুসরণ করা। অকল্যাণ হচ্ছে দ্বীনি বিষয়ে নব প্রচলিত বিদাতের অনুসরণ; আল্লাহ আমাদেরকে, আপনাদেরকে ও সকল মুসলমানকে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত যাবতীয় ফিতনা থেকে রক্ষা করুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রত্যেক ব্যক্তি যে দেশে অবস্থান করছেন সে দেশের স্থানীয়দের সাথে রোযা রাখা ও ঈদ করা তার উপর আবশ্যিক

প্রশ্ন

আমরা হারামাইন শরিফাইনের দেশের নাগরিক। বর্তমানে এশিয়ার একটি মুসলিম দেশ (পাকিস্তান)-এ দূতাবাসে চাকুরী করছি। আমরা কি সৌদি আরবের সাথে রোযা রাখব ও ঈদ করব; নাকি যে দেশে আমরা অবস্থান করছি সে দেশের সাথে করব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

শরিয়তের দলিল-প্রমাণের প্রত্যক্ষ নির্দেশনা হচ্ছে— প্রত্যেক ব্যক্তি যে দেশে অবস্থান করছেন সে দেশের স্থানীয়দের সাথে রোযা রাখা তার উপর আবশ্যিক। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “রোযা হচ্ছে যে দিন তোমরা রোযা রাখ; ঈদুল ফিতর হচ্ছে যে দিন তোমরা রোযা ভঙ্গ কর এবং ঈদুল আযহা হচ্ছে যে দিন তোমরা কোরবানী কর।” এবং যেহেতু শরিয়ত থেকে একতাবদ্ধ থাকার নির্দেশ এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া ও মতভেদ করা থেকে সাবধানকরণ জানা যায়। এবং যেহেতু সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিঞ্জদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে স্থানভেদে চন্দ্রের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন; যেমনটি বলেছেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া।

পূর্বেক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানে অবস্থিত দূতাবাসের যে কর্মকর্তারা পাকিস্তানের সাথে রোযা রাখে তাদের আমল অন্য যারা সৌদি আরবের সাথে রোযা রাখে তাদের আমলের চেয়ে সত্যের অধিক নিকটবর্তী— দুই দেশের মাঝে দূরত্বের কারণে এবং উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে। নিঃসন্দেহে পৃথিবীর যে কোন মুসলিম দেশে চাঁদ দেখা কিংবা ত্রিশদিন পূর্ণ করার মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানের রোযা রাখা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। শরিয়তের দলিলের বাহ্যিক মর্মের সাথে এটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে, তা যদি সম্ভবপর না হয়; তাহলে আগে আমরা যা উল্লেখ করেছি সেটাই অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী অভিমত। আল্লাহই তাওফিকদাতা।” [সমাণ্ড]

ফাযিলাতুশ শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহঃ) এর মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাওয়িয়া (১৫/৯৮, ৯৯)

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে আরও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: “পাকিস্তানে রমযান ও শাওয়ালের চাঁদ কখনও সৌদি আরবের দুইদিন পরে দেখা যায়; সেক্ষেত্রে তারা কি সৌদি আরবের সাথে রোযা রাখবে; নাকি পাকিস্তানের সাথে?”

জবাবে তিনি বলেন:

আমাদের কাছে পবিত্র শরিয়তের যে বিধান অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হয় তা হল: আপনাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সেখানকার মুসলমানদের সাথে রোযা রাখা; দুটো কারণে:

এক. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস: “রোযা হচ্ছে যে দিন তোমরা রোযা রাখ; ঈদুল ফিতর হচ্ছে যে দিন তোমরা রোযা ভঙ্গ কর এবং ঈদুল আযহা হচ্ছে যে দিন তোমরা কোরবানী কর।” হাদিসটি আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থাকারগণ ‘হাসান’ সনদে সংকলন করেছেন। তাই আপনি এবং আপনার ভাইগণ পাকিস্তানে থাকলে আপনাদের উচিত হবে তাদের সাথে রোযা রাখা এবং তারা যখন ঈদ করে তখন তাদের সাথে ঈদ করা। কেননা এ হাদিসের নির্দেশনার মধ্যে আপনারাও অন্তর্ভুক্ত। এবং যেহেতু উদয়স্থল আলাদা আলাদা হওয়ার প্রেক্ষিতে চাঁদ দেখাও আলাদা আলাদা সময়ে ঘটে। একদল আলেমের অভিমত হল তাদের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও আছেন: প্রত্যেক দেশের লোকদেরকে আলাদা আলাদাভাবে চাঁদ দেখতে হবে।

দুই. সেখানকার মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রোযা রাখা ও ঈদ করলে বিশৃঙ্খলা হবে; জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে, সমালোচনা করা হবে, ঝগড়াবিবাদের উদ্রেক ঘটবে। পরিপূর্ণ ইসলামী শরিয়ত ঐক্যবদ্ধ থাকা, নেকী ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করা এবং মতভেদ ও বিবাদ বর্জন করার প্রতি আহ্বান করে। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। [সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুয়ায (রাঃ) ও আবু মুসা (রাঃ) কে ইয়ামেনে পাঠান তখন তিনি বলেন: “তোমরা দুইজন সুসংবাদ দিবে; বীতশ্রদ্ধ করবে না, একে অপরকে মেনে চলবে, মতভেদ করবে না।” [সমাণ্ড]

[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাওয়িয়া (১৫/১০৩, ১০৪)

চাঁদ দেখাই ধর্তব্য; জ্যোতিবিদদের হিসাব-নিকাশ নয়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: এখানে মুসলিম আলেমদের মধ্যে রমযানের রোযার শুরু ও ঈদুল ফিতর নির্ধারণ নিয়ে চরম মতভেদ। তাদের মধ্যে কেউ “চাঁদ দেখে রোযা রাখ ও চাঁদ দেখে রোযা ভাঙ্গ” এ হাদিসের উপর নির্ভর করে চাঁদ দেখাকে ধর্তব্য মনে করেন। আর কেউ আছেন তারা জ্যোতিবিদদের মতামতের উপর নির্ভর করেন। তারা বলেন: বর্তমানে জ্যোতিবিজ্ঞানীরা মহাকাশ গবেষণার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছেন; তাদের পক্ষে চন্দ্র মাসের শুরু জানা সম্ভব। এ মাসয়ালায় সঠিক রায় কোনটি?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

সঠিক অভিমত হচ্ছে, যে অভিমতের ভিত্তিতে আমল করা কর্তব্য তা হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ভাঙ্গ” যা প্রমাণ করছে তার ভিত্তিতে আমল করা। অর্থাৎ চর্মচোখে চাঁদ দেখে রমযান মাস শুরু করা ও রমযান মাস শেষ করা। কেননা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যে শরিয়ত বা অনুশাসন দিয়ে পাঠানো হয়েছে সেটা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও অব্যাহত থাকবে। ইসলামী শরিয়ত সর্বকাল ও সর্বযুগের জন্য উপযোগী। হোকনা, জাগতিক জ্ঞান অগ্রসর হোক; কিংবা অনগ্রসর থাকুক। হোকনা যন্ত্রপাতি পাওয়া যাক; কিংবা না পাওয়া যাক। হোকনা কোন দেশে জ্যোতিবিদ্যায় পারদর্শী বিজ্ঞানী থাকুক কিংবা না থাকুক। পৃথিবীর সর্বকালের, সর্বস্থানের মানুষ চাঁদ দেখে আমল করার সাধ্য রাখে। কিন্তু, জ্যোতিবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি কোথাও পাওয়া যেতে পারে; আবার কোথাও পাওয়া যাবে না। যন্ত্রপাতি হয়তো কোথাও পাওয়া যাবে; আবার হয়তো কোথাও পাওয়া যাবে না।

দুই:

জ্যোতিবিজ্ঞান কিংবা অন্যান্য বিজ্ঞানের যে বিকাশ ঘটেছে কিংবা ভবিষ্যতে ঘটবে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সে ব্যাপারে জ্ঞাত আছেন। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা বলেন: সূতরাং তোমাদের মাঝে যেকোনো ব্যক্তি এই মাসপাবেসে যেনরোজাপালন করে।”[২ সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৫] এ বিধানকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন যে, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ; চাঁদ দেখে রোযা ভাঙ্গ”[আল-হাদিস]। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের রোযা শুরু করা ও রোযা ভাঙ্গ করাকে চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। নক্ষত্রের হিসাবের সাথে মাস গণনাকে সম্পৃক্ত করেননি। অথচ আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে যে, জ্যোতিবিজ্ঞানীরা অচিরেই নক্ষত্রের হিসাব ও বিচরণের জ্ঞানে এগিয়ে যাবেন। তাই মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর রাসুলের মুখনিসূত যে বিধান আল্লাহ দিয়েছেন সেটাকে গ্রহণ করা। তা হচ্ছে- চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোযা রাখা ও রোযা ভাঙ্গা। এটি আলেমদের ইজমার পর্যায়ে। যে ব্যক্তি এ অভিমতের বিপক্ষে গিয়ে নক্ষত্র গণনার উপর নির্ভর করবে তার অভিমতটি অসমর্থিত; এর উপর নির্ভর করা যাবে না।

আল্লাহুই ভাল জানেন।

তাঁরা দিনের বেলায় রমজান মাস শুরু হওয়ার খবর পেয়ে রোজা পালন করেছেন

প্রশ্ন

আমাদের কিছু মুসলিম ভাই সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত রমজান মাসের আগমন সম্পর্কে জানতে পারেননি। জানার পর থেকে তারা রোজা থেকেছেন। এই রোজা কি তাদের জন্য যথেষ্ট হবে, নাকি তাদেরকে এর বদলে কাযা রোজা রাখতে হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

সংবাদপ্রাপ্তির পর থেকে দিনের বাকি অংশরোজা-ভঙ্গকারীবিষয়সমূহ থেকে বিরত থেকে তাঁরা সঠিক কাজটি করেছেন। তবে সেই দিনের বদলে তাদেরকে আরেকটিরোযাকাযা করতে হবে। [গবেষণা ও ফাৎওয়াবিষয়কস্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৪৫)]

সেই দিনের পরিবর্তে আরেকটি রোজা কাযাকরা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল, তারা রাত থেকে রোজার নিয়ত করেননি।
রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

" من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "

“যে ব্যক্তি ফজরের পূর্ব হতে রোজার (ফরজ রোজা) নিয়ত বাঁধেনি তার রোজা হবে না।” [মুসনাদে আহমাদ (৬/২৮৭), সুনানে আবু দাউদ (২৪৫৪), জামে তিরমিযি (৭৩০), সুনানে নাসাঈ (২৩৩১), আল-আলবানী ‘সহীহ আবু দাউদ’ (২১৪৩) গ্রন্থেহাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন]

যে কারাবন্দীর সময় জানার সুযোগ নেই তার নামায ও রোজা

প্রশ্ন

যে কারাবন্দী মাটির নীচে অন্ধকার সেলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে, নামাযের সময় জানার তার কোন সুযোগ নেই, রমজান মাস কখন শুরু হবে সে সম্পর্কে তার কাছে কোন তথ্য নেই সে কিভাবে নামায ও রোজা আদায় করবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

এক:

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন সকল মুসলিম বন্দীর আশু মুক্তির ব্যবস্থা করেদেন, নিজ করুণায় তাদেরকে ধৈর্য্য-শক্তি ও সাহুনা দান করেন, তাদের অন্তরগুলোআত্মপ্রশান্তি ও একীনদিয়েভরপুর করে দেন এবং মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথের দিশাদেন যে পথে তাঁর প্রিয়ভাজনগণ (আউলিয়াগণ) সম্মানিত হবেন এবং তাঁর শত্রুরা লাঞ্ছিত হবে ।

দুই:

আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আটক ও কারাবন্দী ব্যক্তি সালাত ও সিয়াম এর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে না। বরং তাদের উপর ফরজ হল সময় নির্ধারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। যদি নামাযেরসময় শুরু হয়েছে মর্মেপ্রবল ধারণা হয়, তবে তিনিসালাত আদায় করে নিবেন। অনুরূপভাবে রমজান মাস শুরু হয়েছে মর্মে তার প্রবল ধারণা হলে তিনিরোজা পালন করবেন। খাবারের সময়গুলো খেয়াল করে অথবা কারাগারের লোকদের জিজ্ঞেস করে তিনি সময় নির্ধারণ করতে পারেন। তিনি যদি সালাত ও সিয়ামেরসঠিক সময় জানার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তবে তার ইবাদত সহিহ হবে ও এর মাধ্যমে তিনি দায়িত্বমুক্ত হবেন; যদিও পরবর্তীতে তার কাছেপ্রকাশ পায় যে, তার ইবাদত যথাসময়ে আদায় হয়েছে অথবা যথাসময়ের পরে আদায় হয়েছে অথবা কোন কিছু প্রকাশ না হোক। এর দলিল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة : ২৮৬]

“আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।” [২ আল-বাক্বারাহ : ২৮৬]

এবং আল্লাহ তাআলার বাণী:

(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاتَّهَا) [الطلاق]

“আল্লাহ যাকে যে পরিমাণ সামর্থ্য দান করেছেন এর অতিরিক্ত কোনো ভার তিনি তার উপর আরোপ করেন না।” [৬৫ সূরা আত্ব-ত্বালারু : ৭]

তবে পরে যদি জানতে পারেন যে, তিনি ঈদের দিনগুলোতে রোজা ছিলেন তবে সে রোজাগুলো কাযা করা তার উপর ওয়াজিব। কারণ ঈদের দিনের রোজা সহিহ নয়। যদি পরবর্তীতে তিনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে, তিনি সঠিক সময়ের পূর্বে সালাত বা সিয়াম পালন করেছেন তাহলে সে নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।

আল- মূসূআ আল-ফিক্বহিয়াহ (২৮/৮৪-৮৫) গ্রন্থে রয়েছে:

“অধিকাংশ ফিক্বাহ-গবেষকের মতে, যার কাছে মাসের হিসাব সুস্পষ্ট নয় তিনি রমজানের রোজা পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন না। বরং রোজা পালন তার দায়িত্বে ফরজ হিসেবে থাকবে। যেহেতু তার উপর শরয়ি দায়িত্বন্যস্ত এবং তিনি শরয়ি নির্দেশের আওতাভুক্ত। তিনি যদি নিজের বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে রমজান মাস নির্ধারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করে রোজা রাখা শুরু করেন এক্ষেত্রে তার পাঁচটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা:

অস্পষ্টতা অব্যাহত থাকা এবং সঠিক সময় তার নিকট পরিষ্কৃত না হওয়া। তার রোজা কি রমজান মাসে পালিত হয়েছে, নাকি রমজানের আগে পালিত হয়েছে, নাকি পরে পালিত হয়েছে এর কিছুই জানতে না পারা – এ ক্ষেত্রে তার পালিত রোজার মাধ্যমে তার দায়িত্ব খালাস হবে, তাকে পুনরায় রোজা রাখতে হবে না। যেহেতু তিনি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছেন। অতএব, এর চেয়ে বেশি কিছু তার দায়িত্বে বর্তাবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা :

বন্দি ব্যক্তির রোজা রমজান মাসে পালিত হওয়া-এই রোজার মাধ্যমে তার দায়িত্ব খালাস হবে।

তৃতীয় অবস্থা :

বন্দি ব্যক্তির রোজা পালন রমজানের পরে পালিত হওয়া- অধিকাংশ ফিক্বাহ বিশেষজ্ঞগণের মতে এই রোজা পালনের মাধ্যমে তার দায়িত্ব খালাস হবে।

চতুর্থ অবস্থা:

এর দু’টি দিক হতে পারে:

প্রথম দিক: তার রোজা রমজানের পূর্বে পালিত হওয়া এবং রমজান শুরু হওয়ার আগে তিনি তা জানতে পারা। এক্ষেত্রে রমজান মাস শুরু হলে তাকে রমজানের রোজা পালন করতে হবে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কারণ নির্ধারিত সময়ে তা পালন করার সামর্থ্য তার রয়েছে।

দ্বিতীয় দিক: তার রোজা রমজানের পূর্বে পালিত হওয়া এবং রমজান শেষ হওয়ার আগে তিনি তা জানতে না পারা। এই রোজা পালন তার দায়িত্ব খালাসের জন্য যথেষ্ট হবে কিনা এই ব্যাপারে দু’টি মত রয়েছে-

প্রথম মত: এই রোজা পালন তার দায়িত্ব খালাসের জন্য যথেষ্ট হবে না। বরং এর কাযা পালন করা তার উপর ওয়াজিব। এটি মালেকী, হাম্বলী মাযহাবের অভিমত এবং শাফেয়ী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মতও এটি।

দ্বিতীয় মত: এই রোজা পালন রমজানের রোজা হিসেবে তার দায়িত্ব খালাসের জন্য যথেষ্ট হবে। যেমনিভাবে আরাফাতের দিন নির্ধারণের ব্যাপারে যদি সন্দেহ দেখা দেয় এবং হজ্জযাত্রীগণ আরাফার দিনের পূর্বেই আরাফাতে অবস্থান নেন তবে তাদের হজ্জ শুদ্ধ হবে— এটি শাফেয়িমায়হাবের কিছু কিছু আলেমের অভিমত।

পঞ্চম অবস্থা:

“তারকিছু রোযা রমজান মাসে এবং কিছু রোজা রমজানের পরে পালিত হওয়া। যে রোজাগুলো রমজান মাসে অথবা রমজানের পরে পালিত হয়েছে সেগুলো তার দায়িত্ব খালাসের জন্য যথেষ্ট হবে। আর যে রোজাগুলো রমজান মাসের আগে পালিত হয়েছে সেগুলো তার দায়িত্ব খালাসের জন্য যথেষ্ট জন্য হবে না।” সমাপ্ত

দেখুন- আল-মাজমু (৩/৭২-৭৩), আল-মুগনী (৩/৯৬)

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

সিয়াম পালন ও ঈদ উদযাপনের ক্ষেত্রে স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধাচরণ করা নাজায়েয

প্রশ্ন

আমাদের দেশে একদল দ্বীনদার ভাই আছেন তারা কিছু কিছু ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। যেমন রমজান মাসের সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে তারা খালি চোখে নতুন চাঁদ না-দেখা পর্যন্ত সিয়াম পালন করেন না। কখনও কখনও আমরা তাদের একদিন বা দুইদিন আগে রমজানের সিয়াম পালন শুরু করি। তারাও ঈদুল ফিতরের একদিন বা দুইদিন পরে ঈদ উদযাপন করে থাকেন। আমরা যদি তাদেরকে ঈদের দিনে রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি তারা এই বলে জবাব দেন যে, আমরা খালি চোখে নতুন চাঁদ না-দেখা পর্যন্ত ঈদ করব না এবং রোজা রাখা শুরু করব না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে সিয়াম পালন কর এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ছাড়।” তারা যন্ত্রের সাহায্যে নতুন চাঁদ দেখার পদ্ধতি মানেন না। উল্লেখ্য দুই ঈদের নামাযের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তারা তাদের নতুন চাঁদ দেখার ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে ঈদ উদযাপনের পরে ঈদ উদযাপন করেন। অনুরূপভাবে তারা ঈদুল আযহার সময় পশু কোরবানী ও আরাফার সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও আমাদের বি করেন। তারা ঈদুল আযহার দুইদিন পরে ঈদ উদযাপন করেন। অর্থাৎ সমস্ত মুসলিম কোরবানী করার পরে তারা পশু কোরবানী করেন। তারা যা করছেন তা কি সঠিক? আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাদের উপর ওয়াজিব হল সাধারণ মানুষের সাথে সিয়াম পালন করা, তাদের সাথে ঈদ উদযাপন করা এবং তাদের সাথে দুই ঈদের নামায আদায় করা। এর দলীল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة) متفق عليه

“তোমরাতা (নতুনচাঁদ) দেখেসিয়াম পালনকর, তা (নতুনচাঁদ) দেখেরোজা ছাড় (ঈদ উদযাপন কর)। আরযদিআকাশমেঘাচ্ছনথাকে তবে(রোজার) সংখ্যা (৩০দিন) পূর্ণকর।”[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম] এই হাদিসের উদ্দেশ্য হলো- চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হলে সিয়াম পালন ও ঈদ উদযাপনের আদেশ দেয়া। সেটা খালি চোখেও হতে পারে অথবা দৃষ্টিশক্তিকে সাহায্যকারী কোন যন্ত্রপাতির মাধ্যমেও হতে পারে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

" الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون "

أخرجه أبوداود (٢٧٢٨) والترمذي (٦٩٩) ،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٥٦٥)

“রোজা হল সেদিন যেদিন তোমরা সকলে রোজা পালন কর। ঈদ হল সেদিন যেদিন তোমরা সকলে ঈদ উদযাপন কর। ঈদুল আযহা হলো সেদিন যেদিন তোমরা সকলে পশু কোরবানী কর।”[হাদিসটি আবু দাউদ (২৩২৪) ও তিরমিযী (৬৯৭) বর্ণনা করেছেন; আলবানী সহীহত তিরমিযী’ (৫৬১) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

আল্লাহই তাওফিক দাতা। আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক

নতুন চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে যার কথা গ্রহণযোগ্য কে সেই আদল ব্যক্তি

প্রশ্ন

আমি (১৫৮৪) নং প্রশ্নের উত্তরে পড়েছি যে, রমজান মাসের শুরু প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে একজন আদল ও ছিকা ব্যক্তির চাঁদ দেখা যথেষ্ট। সে আদল ব্যক্তির পরিচয় কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আদল((عَدْلٌ) এর শাব্দিক অর্থ মুস্তাক্বীম(সরল, সোজা)। এটি বক্রতার বিপরীত।

শরিয়তের পরিভাষায়: আদল হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সমস্ত ফরজ পালন করেন, কোন কবিরাত গুনাতে লিপ্ত নন এবং উপর্যুপরি সগিরা গুনাতেও লিপ্ত নন।

ফরজ পালন করার অর্থ হল- ফরজ ইবাদতসমূহ আদায় করা। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায। কবিরাতগুনাহনাকরার অর্থ-নামিমাহ (চোগলখুরী), গিবত (অপরের অগোচরে পরনিন্দা) ইত্যাদি কবিরাত গুনাহ না করা। সেই ব্যক্তির মধ্যে আদল হওয়ার সাথে সাথে আরো যে শর্ত থাকতে হবে তা হলো:

সেই ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি প্রখর হতে হবে। যাতে করে তার দাবীর সত্যতার পক্ষে সম্ভাবনা বেশি থাকে। দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হলে আদল হওয়া সত্ত্বেও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হওয়ায়তার সাক্ষ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। এই শর্তটির পক্ষে দলীল হলো-আল্লাহ তাআলা কোন কাজের দায়িত্ব দেয়ার জন্য শক্তি ও আমনতদারিতাকে উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। মুসা আলাইহিস সালামের সাথে মাদইয়ানের (এক বৃদ্ধ) অধিবাসীর কাহিনীতে তার দুইমেয়ের একজন বলেছিলেন:

يَأْتِيَتْ اسْتَأْجَرَهُ إِنْ خَيْرٍ مِنْ اسْتَأْجَرْتِ الْقَوِيَّ الْأَمِينِ [٢٦ : القصص : ٢٦]

“আবু, ইনাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করুন। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কারও থেকে কাজ নিতে চাইলে এমন ব্যক্তিই উত্তম যে শক্তিশালী ও আমানতদার।”[২৮ সূরা আল-ক্বাসাস: ২৬] ইফরিত নামী যে জ্বিনসাবা রাজ্যেররানীর সিংহাসন উঠিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে বলেছিল:

وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ [٣٩ : النمل : ٣٩]

“এবং নিশ্চয়ই আমি এ ব্যাপারে শক্তিবান ও আমানতদার।”[২৭ সূরা আন নাম্বল : ৩৯]

তাই (শক্তি ও আমানতদারিতা) এ দুইটি গুণ থাকা যেকোন দায়িত্ব প্রাপ্তির প্রধান দুটি শর্ত। সাক্ষ্যপ্রদানও এমনি একটি গুরু দায়িত্ব। [আশ-শারহ আল-মুমতি’ (৬/৩২৩)] আরও জানতে দেখুন আল-মূসূ’আহ আল-ফিকহিয়্যাহ (ফিকহী এনসাইক্লোপিডিয়া) (৫/৩০),

প্রকাশনায়: কুয়েত।

চাঁদ উঠার বিভিন্ন উদয়স্থল সংক্রান্ত মতভেদ কি বিবেচনাযোগ্য? এ ব্যাপারে অমুসলিম দেশে অবস্থানরত মুসলিম কমিউনিটির করণীয়

প্রশ্ন

আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে বসবাসরত কিছু মুসলিম ছাত্র। প্রতি বছর রমজান মাসের শুরুতে আমরা একটি সমস্যার মুখোমুখি হই। এ সময় স্থানীয় মুসলিম কমিউনিটি তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১. প্রথম দল: তারা যে দেশের স্থায়ী বাসিন্দা সে দেশে চাঁদ দেখার খবরের ভিত্তিতে রোজা শুরু করে। ২. দ্বিতীয় দল: যারা সৌদি আরবে রোজা রাখা শুরু হলে সিয়াম পালন শুরু করে। ৩. তৃতীয় দল: যারা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মুসলিম ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নতুন চাঁদ দেখার খবর পৌঁছলে রোজা রাখে। এ ছাত্র ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে চাঁদ দেখার দায়িত্ব পালন করে থাকে। তারা দেশের কোন এক স্থানে চাঁদ দেখলে সে খবর বিভিন্ন ইসলামিক সেন্টারে পৌঁছে দেয়। তাদের খবরের ভিত্তিতে গোটা যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমান একই দিন রোজা পালন শুরু করে; যদিও শহরগুলোর মাঝে দূরত্ব অনেক। এক্ষেত্রে সিয়াম পালন, চাঁদ দেখা ও এ সংক্রান্ত খবরের ব্যাপারে কারা বেশি অনুসরণযোগ্য? দয়া করে এ ব্যাপারে আমাদেরকে ফতোয়া দিন; আল্লাহ আপনাদেরকে সওয়াব দিবেন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এক: স্থানভেদে নতুন চাঁদের ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল থাকার বিষয়টি ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা অবধারিতভাবে জ্ঞাত। এ ব্যাপারে কোন আলেম দ্বিমত করেন নি। সে ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল কি বিবেচনাযোগ্য; নাকি বিবেচনাযোগ্য নয়- তা নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। দুই: ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল ও তা বিবেচনাযোগ্য না হওয়ার বিষয়টি তাত্ত্বিক মাসালা। এতে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে। ইলম ও দ্বীনদারির বিবেচনায়যোগ্য আলেমদের এ ব্যাপারে মতভেদ করার অবকাশ আছে। এটি এমন একটি গ্রহণযোগ্য মতভেদ যে ব্যাপারে সঠিক মতপ্রদানকারী (মুজতাহিদ) দুইবার সওয়াব পাবেন- ইজতিহাদ করার সওয়াব ও সঠিক মত প্রদান করার সওয়াব এবং ভুল মত প্রদানকারী (মুজতাহিদ)ও ইজতিহাদ করার জন্য একটি সওয়াব পাবেন। এই মাসালাতে আলেমগণ দুটি মত ব্যক্ত করেছেন:

-তাদের কেউ কেউ ভিন্নভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনা করেছেন

-আর কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনা করেননি

তাদের উভয়পক্ষ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল দিয়েছেন। এমনকি একই দলিলউভয় পক্ষ তার মতের পক্ষেব্যবহার করেছেন। কারণ সে দলিলটি উভয় মতের পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করা যায়। যেমনআল্লাহর তাআলার বাণী:

(يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) (البقرة: ১৮৯)

“লোকেরা আপনাকে নতুন মাসের চাঁদসম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদেরকে বলে দিনএটা মানুষের (বিভিন্ন কাজ-কর্মের)এবং হজ্জের সময় নির্ধারণ করার জন্য।” [২ সূরা আল-বাক্বারা:১৮৯]এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এরবাণী:

(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) الحديث

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা শুরু কর এবং সেটা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ছেড়ে দাও।”[সহিহ বুখারী(১৯০৯)ও সহিহ মুসলিম (১০৮১)]উভয় পক্ষের এ মতভেদের কারণ হল প্রত্যেক পক্ষদলিলটিকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বুঝেছেন এবং মাসালা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাপথ অনুসরণ করেছেন।

তিন: জ্যোতির্বিদ্যার গণনার মাধ্যমে নতুনচাঁদ সাব্যস্তকরণ ও এ ব্যাপারে বর্ণিত কুরআন-হাদিসের দলিলগুলো আলেমগণের পরিষদ পর্যালোচনা করেছেন এবংতঁরাএব্যাপারেপূর্ববর্তী আলেমগণেরসকল বক্তব্য অবগত হয়েছেন। পরিশেষে তঁরা সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, শরিয়ি বিধিবিধান পালনের জন্য নতুন চাঁদ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবগ্রহণযোগ্য নয়। তঁদের দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এর বাণী:

(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) الحديث

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা রাখ এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ছাড়।”[সহিহ বুখারী (১৯০৯)ও সহিহ মুসলিম (১০৮১)]তিনি আরো বলেছেন:

(لاتصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه) الحديث

“তোমরাতা (নতুন চাঁদ) না-দেখা পর্যন্ত রোজা রেখো না এবং তা (নতুন চাঁদ) না-দেখা পর্যন্ত রোজা ছেড়ে দিও না।”[মালিক (৬৩৫)]এবং এই অর্থেরআরো অন্যান্য দলীল।

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিরঅভিমত হচ্ছে- অমুসলিম সরকার কর্তৃক শাসিত দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য নতুন চাঁদ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এ ধরনের মুসলিম ছাত্র ইউনিয়ন (অথবা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান যারা মুসলিমকমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব করে) মুসলিম সরকারের স্থলাভিষিক্ত হবে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এই ছাত্র ইউনিয়নের ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনা করা অথবা না-করাএ দুটো অভিমতের যে কোন একটি বেছে নেয়ার অধিকার রয়েছে। এরপর তারা বাছাইকৃত সে অভিমতকে সে দেশের সকল মুসলিমের উপর প্রয়োগ করবেন। ছাত্র ইউনিয়নের এই সাধারণ প্রজ্ঞাপন মেনে নেয়া সেখানকার মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক- ঐক্যের স্বার্থে, যথাসময়ে সিয়াম শুরু করার স্বার্থে এবং মতভেদ ও বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলার নিমিত্তে। এ ধরনের দেশে যারা বাসকরে তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হলো- নিজ নিজ এলাকায় নতুন চাঁদ দেখা যদি তাদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক ছিকা(নির্ভরযোগ্য) ব্যক্তি নতুন চাঁদ দেখে তবে তারা রোজা পালন শুরু করবে এবং ছাত্র ইউনিয়নকেও সে সংবাদ দিবে যাতে তারা সবার জন্য প্রজ্ঞাপন জারী করতে পারে। এই পদ্ধতিটি মাস শুরু সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর মাস শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখেছে এই মর্মে দুইজন আদেল(দ্বীনদার) ব্যক্তিরসাক্ষ্য আবশ্যিক হবে। অন্যথায় রমজান মাস ত্রিশদিন পূর্ণ করতে হবে। এর দলীল হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণী:

(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً)

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা পালন কর এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ছাড়। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে তা (নতুন চাঁদ) দেখা না যায় তবে ত্রিশদিন পূর্ণ কর।”

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

যে ব্যক্তি একাকী রমজান মাসের নতুন চাঁদ দেখেছে তার জন্য কি সিয়াম পালন করা অনিবার্য?

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি একাকী রমজান মাসের নতুন চাঁদ দেখেছে তার জন্য কি সিয়াম পালন করা অনিবার্য? যদি তা অনিবার্য হয় এর সপক্ষে দলীল কী?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যে ব্যক্তি রমজান মাসের নতুন চাঁদ অথবা শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ একাই দেখেছে এবং এব্যাপারে বিচারককে অথবা স্থানীয় লোকজনকে অবহিত করেছে কিন্তু তারা তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেনি তবে কি সে একাই রোজা পালন করবে?নাকি সবার সাথে রোজা পালন করবে-এব্যাপারে আলেমগণের মাঝে তিনটি অভিমত রয়েছে: প্রথমত:

সে ব্যক্তি মাসের শুরু ও সমাপ্তি উভয় ক্ষেত্রে তার নিজের দেখা অনুসারে একাকী আমল করবে। মাসের শুরুতে তিনি একাকী রোজা শুরু করবেন এবং মাসের শেষে নিজের দেখা অনুযায়ী রোজা ছাড়বেন। এটি ইমাম শাফেয়ীর অভিমত।

তবে তিনি তা গোপনে করবেন। প্রকাশ্যে মানুষের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হবেননা। যাতে মানুষ তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা না করে। কারণ এক্ষেত্রে রোজাদারগণ তাকে বে-রোজদার মনে করবে।

দ্বিতীয় মত :

সে ব্যক্তি নিজের দেখা অনুসারে মাসের শুরুতে আমল করবেন এবং একাকী রোজা রাখা শুরু করবেন। তবে মাসের শেষে নিজের দেখা অনুসারে আমল করবেন না। বরং অন্য সবার সাথে রোজা ছাড়বেন। এটি অধিকাংশ আলেমের মত। এদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ।

আর এ মতটি গ্রহণ করেছেন শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেছেন: “এটি সাবধানতা মূলক অভিমত। এ মত গ্রহণের মাধ্যমে আমরা রোজা থাকা ও ছাড়া উভয় ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করেছি। রোজা পালনের ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলব: আপনি রোজা রাখুন। কিন্তু রোজা ছাড়ার ব্যাপারে আমরা তাকে বলব: আপনি রোজা ছাড়বেননা; বরং রোজা রাখতে থাকুন।” সমাপ্ত আশ-শারহুলমুমতি (৬/৩৩০)

তৃতীয় মত :

সেব্যক্তি মাসের শুরু অথবা সমাপ্তি কোন ক্ষেত্রে তার নিজের দেখা অনুসারে আমল করবে না। বরং সবার সাথে রোজা রাখবে এবং সবার সাথে রোজা ছাড়বে।

এক বর্ণনামতে এঅভিমতের পক্ষে রয়েছেন ইমাম আহমাদ। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ এ মতটিকে সমর্থন করেছেন এবং এর সপক্ষে অনেক দলীল পেশ করেছেন। তিনি বলেন: “আর তৃতীয় মত হচ্ছে- সে ব্যক্তি অন্য সব মানুষের সাথে রোজা রাখবেন এবং সবার সাথে রোজা ছাড়বেন। উল্লেখিত মতগুলোর মধ্যে এ মতটি বেশি শক্তিশালী। এরপক্ষে দলীল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: “আপনাদের রোজা হবে সেদিন, যেদিন আপনারা সকলে রোজা রাখেন এবং আপনাদের ঈদ হবে সেদিন যেদিন আপনারা সকলে ঈদ উদযাপন করেন। আর আপনাদের ঈদুলআযহা হবে সেদিন যেদিন আপনারা সকলে পশু কোরবানী করেন।” [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন: হাদিসটি হাসান-গরীব, এটি আরও বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ। তিনি শুধু ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। এবং ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের সূত্রে উসমান ইবনে মুহাম্মদ হতে, তিনি আলমাকবুরি হতে, তিনি আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “রোজা হল সেদিন যেদিন আপনারা সকলে রোজা পালন করেন। ঈদুল ফিতর (রোজা ভঙ্গের ঈদ) হল সেদিন যেদিন আপনারা সকলে রোজা ভঙ্গ করেন। আর ঈদুলআযহা হল সেদিন যেদিন আপনারা সকলে পশু কোরবানী করেন।” তিরমিযী বলেন: এই হাদিসটি হাসান-গরীব। তিনি আরো বলেন: ‘আলেমগণের মধ্যে অনেকে এই হাদিসটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: এর অর্থ হল- রোজা শুরু করতে হবে ও ঈদুল ফিতর উদযাপন করতে হবে সম্মিলিতভাবে, সকল মানুষের সাথে।’ সমাপ্ত [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৫/১১৪)]

তিনি আরও দলীল হিসেবে পেশ করেন যে, কেউ যদি জিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ একাকী দেখে তবে আলেমগণের কেউ একথা বলেননি যে, (হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে) সে একাকী আরাফাতে অবস্থান করবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এই মাসয়ালার মূলভিত্তি হচ্ছে- আল্লাহ তাআলা এই হুকুমকে নতুন চাঁদ ও মাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি বলেন: *يسألونك عن الأهلة قل هي موافيت* (لোকেরা আপনাকে নতুন মাসের চাঁদসম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদেরকে বলে দিন এটা মানুষের (বিভিন্ন কাজ-কর্মের) এবং হজ্জের সময় নির্ধারণ করার জন্য।) [২ সূরা আল-বাক্বার: ১৮৯] আয়াতে কারীমাতে আহিল্লাহ (শব্দটি হিলাল (শব্দটির বহুবচন) হিলাল বলতে বুঝায়- যা দিয়ে কোন ঘোষণা দেয়া হয় বা কোন কিছু প্রচার করা হয়। তাই আকাশে যদি চাঁদ উদিত হয় আর মানুষ সে সম্পর্কে না জানে এবং তা দিয়ে মাস গণনা শুরু না করে তবে তো তা ‘হিলাল’ হলো না। অনুরূপভাবে (শব্দটি شهر) শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সুতরাং মানুষের মাঝে যদি প্রসিদ্ধি নাপায় তবে তো নতুন মাস শুরু হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না। অনেক মানুষ এই মাসয়ালেতে ভুল করেন এই ধারণার কারণে যে, তারা মনে করেন আকাশে নতুন চাঁদ উদিত হলেই তো তামাসের প্রথম রাত্রি হিসেবে ধরা হবে- চাই সেটা মানুষের মাঝে প্রচার লাভ করুন অথবা না করুক, তারা এর দ্বারা নতুন মাস গণনা আরম্ভ করুক বা না করুক। কিন্তু ব্যাপারটি এমন নয়; বরং মানুষের কাছে নতুন চাঁদ প্রকাশিত হওয়া এবং এর দ্বারা তাদের নতুন মাস শুরু করা আবশ্যিক। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: (*صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفترون، وأضحاكم يوم تضحون*) “আপনাদের রোজা হবে সেদিন যেদিন আপনারা সকলে রোজা পালন শুরু করেন। আপনাদের ঈদ হবে সেদিন যেদিন আপনারা সকলে রোজা ভঙ্গ করেন। আর আপনাদের ঈদুল আযহা হবে সেদিন যেদিন আপনারা সকলে পশু কোরবানী করেন।” অর্থাৎ যেদিনটিকে আপনারা রোজা পালন, ঈদুল ফিতর উদযাপন এবং ঈদুল আযহা উদযাপনের দিন হিসেবে জানতে পেরেছেন। আর যদি আপনারা তা না-জানতে পারেন তবে একারণে

আপনাদের উপর কোন হুকুম বর্তাবে না।” সমাপ্ত [মাজমুলফাতাওয়া (২৫/২০২)] এই মতানুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায[মাজমূ ফাতাওয়া আশ-শাইখ(১৫/৭২) صحيحه الألباني رحمه الله في صحيح (الصوميومتصومون...) وحديث : (سنن الترمذي برقم () تيرمذيগ্রছে সহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন (৫৬১)। আরও দেখুন ফিকাহবিদগণের মতামত- আল মূগনী (৩/৪৭, ৪৯), আল মাজমূ(৬/২৯০), আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়াহ (১৮/২৮) আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

নতুন চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে টেলিস্কোপ জাতীয় যন্ত্রপাতির সাহায্য নেয়া জায়েয; জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনার সাহায্য নয়

প্রশ্ন

নতুন চাঁদের বয়স ৩০ ঘণ্টা হওয়ার আগে খালি চোখে তা দেখা সম্ভব নয়। এছাড়া কখনো আবহাওয়াজনিত কারণে তা দেখা সম্ভব হয় না। এর উপর ভিত্তি করে কি অ্যাসট্রোনমিক্যাল তথ্যাদির সাহায্যে নতুন চাঁদ দেখার সম্ভাব্য সময় ও রমজান মাস শুরু হওয়ার সময় হিসাব করা জায়েয? নাকি পবিত্র রমজান মাস শুরু করার আগে নতুন চাঁদ দেখা আমাদের উপর ওয়াজিব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। নতুন চাঁদ দেখার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নেয়া জায়েয। কিন্তু পবিত্র রমজান মাসের শুরু সাব্যস্ত করা কিংবা ঈদের দিন নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করা জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ তাঁর কিতাবে কিংবা তার নবীর হাদিসে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করা আমাদের জন্য শরিয়তসিদ্ধ করেন নি। বরং আমাদের জন্য চাঁদ দেখাকে শরিয়তসিদ্ধ করেছেন। রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেলে রোজা শুরু করা এবং শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে রোজা ছাড়া এবং ঈদুল ফিত্বরের নামাযের জন্য মিলিত হওয়াকে শরিয়তসিদ্ধ করেছেন। মানুষের কাজ কর্মের হিসাব নির্ণয় ও হজ্জের সময় নির্ণয়ক বানিয়েছেন চন্দ্রকে। তাই কোনো মুসলিমের জন্য এ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে ইবাদতের সময়সীমা নির্ধারণ করা জায়েয নয়। যেমন-রমজান মাসের রোজা, ঈদ উদযাপন, বায়তুল্লাহর হজ্জ আদায়, ভুলক্রমে হত্যার কাফফারার রোজা, যিহারের কাফফারার রোজা ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

قال تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة : ১৮৫]

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পেলো সে যাতে সিয়াম পালন করে।” [২ আল-বাক্বারাহ: ১৮৫] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

(يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) [البقرة : ১৮৯]

“তারা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলুন তা মানুষের (কাজ-কর্ম) ও হজ্জ এর জন্য সময় নির্ধারক।”[২ আল-বাক্বারাহ :১৮৯]এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)

“তোমরাতা (নতুনচাঁদ) দেখেসিয়াম পালনকর এবং তা (নতুনচাঁদ) দেখে ঈদ কর। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তবে ৩০ দিন পূর্ণ কর।”

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, যারা চন্দ্রের উদয়স্থলে পরিষ্কার আকাশে অথবা মেঘাচ্ছন্ন আকাশে নতুন চাঁদ দেখতে পেলোনা তাদের জন্য শাবান মাস ত্রিশদিন পূর্ণ করা ওয়াজিব।”[ফাতাওয়াল্ লাজনাহ আদদায়িমা (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র)(১০/১০০] যদিপার্শ্ববর্তী অন্যকোন অঞ্চলে নতুন চাঁদ দেখা প্রমাণিত নাহয় তাহলে এই হুকুম প্রযোজ্য। আর যদি অন্য অঞ্চলে শরিয়ত সম্মত ভাবে নতুন চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতানুযায়ী তাদের উপর সিয়াম পালন করা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা কাদের সাথে রোজা রাখবে

প্রশ্ন

আমি হল্যাণ্ডে থাকি। এখানে লোকেরা প্রথম রমজানের দিন মতভেদে জড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ মিশরের সাথে রোজা রাখে। আবার কেউ কেউ সৌদি আরবের ঘোষণার জন্য অপেক্ষায় থাকে। এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থানটি সঠিক?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নতুন চাঁদ দেখার মাধ্যমে আইনত নতুন মাস শুরু হওয়া সাব্যস্ত হয়। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোজা ভাঙ্গ।”[সহিহ বুখারি (১৯০৯) ও সহিহ মুসলিম (১০৮১)] জোর্তিবিদদের হিসাবের ভিত্তিতে মাসের শুরু সাব্যস্ত করা যাবে না। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, চন্দ্রের উদয়স্থল এক দেশ থেকে আরেক দেশে ভিন্ন ভিন্ন। বিশেষতঃ হল্যাণ্ডের মত এমন দূরবর্তী দেশের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই। চন্দ্রের উদয়স্থল যে, ভিন্ন ভিন্ন এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু মতভেদ হচ্ছে- এক দেশ থেকে আরেক দেশে মাস সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এ উদয়স্থলের ভিন্নতার কোন প্রভাব আছে কিনা, সেটা নিয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। দুই:

অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের যদি কোন শরিয়্যা কমিটি অথবা বোর্ড থাকে তাহলে তারা সে কমিটির সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করবে এবং চন্দ্র মাসের শুরু ও সমাপ্তি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে উক্ত কমিটির চাঁদ-দেখার উপর নির্ভর করবে। ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলেমগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, এ ধরনের ফতোয়া বোর্ড সংশ্লিষ্ট দেশের মুসলমানদের জন্য ইসলামি সরকারের ভূমিকা পালন করবে এবং চন্দ্রমাসের শুরু ও শেষ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বোর্ডের অনুসরণ করা তাদের জন্য অবধারিত হবে। এ বিষয়ের আরো বিস্তারিত বিবরণ (১২৪৮) নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর যদি সে দেশের মুসলমানদের এ রকম কোন শরিয়া বোর্ড না থাকে তাহলে তারা অন্য কোন মুসলিম দেশের অনুসরণ করে রোজা রাখবেন এবং রোজা ভাঙ্গবেন। যে দেশের উপর তারা আস্থা রাখতে পারেন, যে দেশে চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করা হয়; জোর্তিবদ্যার উপর নির্ভরে নয়। স্পেনের অধিবাসীদের মধ্যে যারা সৌদি আরবের সাথে রোজা রাখে ও রোজা ভাঙ্গে তাদের সম্পর্কে শাইখ বিন বায় (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন:

আপনারা উল্লেখ করেছেন যে, স্পেনে বসবাস করেন বিধায় আমাদের সাথে রোজা রাখেন ও আমাদের সাথে রোজা ভাঙ্গেন এতে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোজা ভাঙ্গ। আর যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে তবে মাসের দিন সংখ্যা ত্রিশ পূর্ণ কর।” এ হাদিসটির বিধান সমস্ত উম্মতের জন্য সাধারণ। আর হারামাইনের দেশকে অনুসরণ করা অপেক্ষাকৃত শ্রেয়। যেহেতু তারা ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এই দেশকে আরো বেশি তাওফিক দান করুন। যেহেতু আপনারা এমন একটি দেশে বসবাস করছেন যে দেশে ইসলাম অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা হয় না এবং সে দেশের অধিবাসীরা ইসলামের প্রতি ঋক্ষিপ করে না। বিন বায়ের ফতোয়া সংকলন, ১৫/১০৫]

আরো বেশি জানতে পড়ুন (১২২৬) নং (১২৬৬০) নং ও (১৬০২) নং প্রশ্নোত্তর। আল্লাহই ভাল জানেন।

ওজরগ্রন্থদের রোজা পালন

প্রশ্নঃ জনৈক নিফাসগ্রন্থ নারী এক সপ্তাহের মধ্যে নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে গেছেন। তিনি রযমানের কিছুদিন সাধারণ মুসলিমদের সাথে রোযাও রেখেছেন। এরপর পুনরায় তার রক্তপাত শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় সেই নারী কি রোযা রাখবেন না? তিনি যেদিনগুলোর রোযা রেখেছেন এবং যে দিনগুলোর রোযা ভঙ্গ করেছেন সবগুলোর কাযা পালন কি তার উপর আবশ্যিক হবে?

উত্তরঃ যদি কোন নারী চল্লিশদিনের ভেতরে নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে যান; এরপর কিছুদিন রোযা রাখেন, এরপর চল্লিশ দিনের ভেতরেই আবার রক্তপাত শুরু হয়; তাহলে তার রোযা রাখা সহিহ। যেদিনগুলোতে রক্তপাত আবার ফিরে এসেছে সে দিনগুলোতে তিনি নামায ও রোযা বর্জন করবেন। কেননা এটি নিফাসের রক্ত। যতদিন পর্যন্ত না তিনি পবিত্র হন কিংবা চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়। যখনই তিনি চল্লিশ দিন পূর্ণ করবেন তখন গোসল করা তার উপর ওয়াজিব; এমনকি যদি তিনি পবিত্রতার কোন আলামত না দেখেন তবুও। কেননা আলোমদের দুটো অভিমতের মধ্যে সর্বাধিক শুদ্ধ অভিমত হলো: চল্লিশ দিন হচ্ছে নিফাসের সর্বশেষ সীমা। এরপর রক্তপাত অব্যাহত থাকলে প্রতি ওয়াক্তের জন্য ওয়ুকরা তার উপর আবশ্যিক; যতদিন না রক্তপাত বন্ধ হয়। ইস্তিহাযাগ্রন্থ নারী কেনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম এভাবে করার নির্দেশ দিয়েছেন। চল্লিশদিনের পর তার স্বামী তাকে উপভোগ করতে পারবে; এমনকি পবিত্রতার আলামত না দেখাসত্ত্বেও। কেননা উল্লেখিত অবস্থার রক্তপাতটি দূষিত রক্ত। যা নামায পড়া ওরোযা রাখার জন্য প্রতিবন্ধক নয় এবং স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীকে উপভোগ করার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক নয়।

কিন্তু যদি চল্লিশদিনের পরের রক্তপাতটি তার অভ্যাসগত হাযেয়ের সময়ে পড়ে তাহলে তিনি নামায ওরোযা বর্জন করবেন এবং এটাকে হাযেয হিসেবে বিবেচনা করবেন। আল্লাহই তাওফিকদাতা। [সমাণ্ড]

ফাযিলাতুশ শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায় (রহঃ)

ফাতাওয়াত ইসলামিয়া (২/১৪৬)

প্রশ্ন

আমার মা মারা গেছেন। তিনি জীবিত থাকতে আমাকে বলেগেছেন যে, তার উপর দুই বছরের রমজান মাসের রোযা কাযা করা বাকি আছে। যখন রমজানমাস এসেছিল তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি কাযা পালনকরে যেতে পারেননি। আমি কি তার পক্ষে রোযা আদায় করব, নাকি মিসকীন খাওয়াব? এই মিসকীন খাওয়ানোর পদ্ধতিটা কি? আমি কি একটি ছাগল জবাই করে সেই গোস্ত ৬০টি বাড়িতে বণ্টন করে দিব, নাকি সেই খাবারের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ দানকরে দিব?

উত্তর

বেশি ভাল হয় যদি আপনি আপনার মায়ের পক্ষ থেকে রোযা পালন করতে পারেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَوَلِيُّهُ) متفق على صحته

“ যে ব্যক্তি তার জিম্মায় রোযা পালন বাকি রেখে মারা গেছেন, তার পক্ষ থেকে তার ওলি (আত্মীয়-পরিজন) রোযা পালন করবে।” [বুখারী ও মুসলিম]

ওলি হচ্ছে- আত্মীয় স্বজন। যদি আপনার পক্ষে অথবা আপনি ছাড়া আপনার মায়ের অন্য কোন আত্মীয়ের পক্ষে রোযা পালন সম্ভবপর না হয়, তবে আপনি আপনার মায়ের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে অথবা আপনার সম্পদ থেকে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবেন। এর পরিমাণ হল- অর্ধ 'স্বা' পরিমাণ স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য। আর যদি আপনি হিসেব করে সব খাবার জমা করে একজন ফকিরকে দিয়ে দেন তাহলেও জায়েয হবে।

আর আল্লাহই তাওফিকদাতা। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর সালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন। “সমাপ্ত

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, শাইখ আব্দুর রায্যাকু আফিফি, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন গুদাইয়ান।

প্রশ্ন

বর্তমানে আমি লিভার ক্যান্সারের কারণে কেমো থেরাপিনিচ্ছি। এ চিকিৎসাটা হচ্ছে দৈনিক কিছু ট্যাবলেট সেবন, রগের মধ্যে ইনজেকশনদেয়া। কেমো থেরাপির প্রেক্ষিতে আমার স্বাস্থ্যের সার্বিক যে দুর্বলতা সেকারণে এবং লাগাতরভাবে তরল জিনিস খাওয়ার প্রয়োজন থেকে তত্ত্বাবধায়ক চিকিৎসক আমাকে রোযা না রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। এ চিকিৎসাটি ছয়মাস চলবে। এরপর স্বাস্থ্যের অবস্থা মূল্যায়ন করা হবে। চিকিৎসাটা কতটুকু কার্যকরী হচ্ছে সেটা জানা হবে। হতে পারে চিকিৎসার মেয়াদ আরও দুইমাস বাড়তে পারে। কোন উন্নতিদেখা না গেলে অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হতে পারে। যেমন- রেডিয়েশন থেরাপি বা সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন। দয়া করে, যে মাসে আমি রোযা রাখতে পারিনি এর জন্য আমার উপর কী ওয়াজিব সেটা জানাবেন? মসজিদে যেতে না পারায় আমি যদি বাসায় তারাবীর নামায পড়ি তাহলে কি কিয়ামুল লাইল এর সওয়াব পাব? শারীরিক দুর্বলতার কারণে কিয়ামুল লাইল পালন করতে না পারলে আমি কী করব? পরবর্তী দিনকি আমি এ নামাযের কাযা পালন করব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনাকে নিরাময় করে দেন, সুস্থ করে দেন।

দুই:

রোগের কারণে রমযান মাসের রোযা না রাখতে কোন অসুবিধা নেই। এরপর আপনি যদি রোযা রাখতে সক্ষম হন তাহলে এ মাসের রোযা কাযা পালন করবেন। আর সক্ষম না হলে আপনি প্রতিদিনের বদলে একজন করে মিসকীনকে খাওয়াবেন।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"অক্ষম ব্যক্তির উপর রোযা ফরয নয়। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে সে অন্য দিনগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে" [সূরাবাক্বারা, ২:১৮৫]

তবে গবেষণার মাধ্যমে এটা পরিষ্কার যে, অক্ষমতা দুই প্রকার: সাময়িক অক্ষমতা ও স্থায়ী অক্ষমতা। সাময়িক অক্ষমতা হল: যা দূর হওয়ার আশা রয়েছে। আয়াতে সে অক্ষমতার কথায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, অক্ষম ব্যক্তির অক্ষমতা দূরহলে সে রোযাগুলো কাযা করবে। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন: "সে অন্য দিনগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে"। আর স্থায়ী অক্ষমতা হল যা দূর হওয়ার আশা নেই। এমন ব্যক্তির ওপর প্রতিদিনের বদলে একজন করে মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজিব।" [আল-শারহুলমুমতি (৬/৩২৪-৩২৫) সমাপ্ত]

তিন:

কোন মুসলিম কিয়ামুল লাইল (তারাবীর নামায) মসজিদে আদায় করুক কিংবা বাসায় আদায় করুক তার জন্য সওয়াব লেখা হবে। যদিও মসজিদে আদায় করা উত্তম।

আর যে ব্যক্তি প্রতিবছর মসজিদে গিয়ে তারাবীর নামায পড়তেন পরবর্তী তেরোগের কারণে তিনি যদি বাসায় পড়েন তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য পরিপূর্ণ সওয়াব লিখে দিবেন; যেন তিনি মসজিদেই তারাবী পড়েছেন।

আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যদি কোন বান্দা অসুস্থ হয় কিংবা সফরে বের হয় তাহলে সে মুকীম বা সুস্থ থাকার স্থায়ী যে আমলগুলো করত অনুরূপ আমল তার জন্য লেখা হয়।" [সহিহ বুখারী (২৯৯৬)]

চার:

রোগ বা ঘুমুইত্যাতির মত কোন ওজরের কারণে যে ব্যক্তির রাতের কোন নামায ছুটে গেছে সে ব্যক্তির জন্য এ নামায দিনের বেলায় কাযা পালন করা শরিয়তসম্মত। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যথার কারণে বা অন্য কোন কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের কোন নামায যদি ছুটে যেত তাহলে দিনের বেলায় তিনি বার রাকাত নামায পড়তেন।" [সহিহ মুসলিম (৭৪৬)]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

"এ হাদিসে নৈমিত্তিক আমলগুলো নিয়মিত পালন মুস্তাহাব হওয়া এবং এগুলো ছুটে গেলে কাযা পালন করার পক্ষে দলিল রয়েছে।" [শারহু সহিহ মুসলিম (৬/২৭) থেকে সমাপ্ত]

তাই আপনি রাতের বেলায় যে পরিমাণ নামায পড়তেন সেটার কাযা করবেন এবং একরাকাত বেশি পড়বেন; যাতে করে বিতির (বেজোড়) না হয়। যেহেতু রাতে ছাড়া বিতির নামায নেই।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

জনৈক নারী রমযান মাসে সন্তান প্রসব করেছেন। রমযানের পরেদুগ্ধপোষ্য সন্তানের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থেকে রোযাগুলোর কাযা পালন করেননি। এরমধ্যে সে নারী আবার গর্ভবতী হয়েছেন এবং আগামী রমযানে প্রসব করেছেন। তারজন্যে কি রোযা রাখার পরিবর্তে অর্থ বিলি করা জায়েয হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এ নারীর উপর ওয়াজিব হলতিনি যে দিনগুলোর রোযা রাখেননি সে দিনগুলোর বদলে রোযা রাখা। এমনকি সেটাদ্বিতীয় রমযানের পরে হলেও। কেননা তিনি প্রথম রমযান ও দ্বিতীয় রমযানেরমধ্যবর্তী সময়ে ওজরের কারণে কাযা পালন থেকে বিরত থেকেছেন। আমি জানি নাশীতের দিনে একদিন বাদ দিয়ে একদিন রোযা রাখা কি তার জন্যে কষ্টকর হবে; এমনকিতিনি যদি দুধ পান করান তবুও? আশা করি আল্লাহ্ তাকে সে শক্তি দিবেন এবংএভাবে রোযা রাখলে তার স্বাস্থ্যের উপর কিংবা তার দুধের উপর নেতিবাচক কোনপ্রভাব পড়বে না। তাই তার উচিত যে রমযান পার হয়ে গেছে দ্বিতীয় রমযান আসারআগে সে রমযানের রোযা কাযা পালন করতে সচেষ্ট হওয়া। আর যদি সেটা সম্ভবপর নাহয় তাহলে দ্বিতীয় রমযানের পরে রাখতেও কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন

আমি মাগরিবের নামাযের আগে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর ইফতারকরিনি। ফজরের নামাযের সময় আমি জেগে উঠেছি। গত দিন থেকে আমি কিছুই খাইনি। তাই আমি রোযা ভেঙ্গে ফেলেছি। এটা কি জায়েয?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সবার জানা যে, রোযা ইসলামের একটি রুকন (স্তম্ভ)।

কোন মুসলিমের জন্য নিছক পিপাসা ও ক্ষুধার কারণে কিংবা সে রোযা রাখতেপারবে না এ আশংকা থেকে এই ইবাদত পালনে অবহেলা করা জায়েয নয়। বরং সে ধৈর্যরাখবে, আল্লাহ্র সাহায্য চাইবে। ঠাণ্ডা নেয়ার জন্য মাথায় পানি ঢালতে ওগড়গড়া কুলি করতে কোন অসুবিধা নেই।

মুসলিমের উপর ওয়াজিব রোযা অবস্থায় তার দিন শুরু করা। যদি এমনটি ঘটে যে, তিনি রোযাটি পূর্ণ করতে পারছেন না; নিজের উপর মৃত্যু বা রোগাক্রান্ত হওয়ারআশংকা করছেন সেক্ষেত্রে তার জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়েয। নিছক ধারণা থেকে রোযাভাঙ্গবেন না। বরং তিনি কষ্টের শিকার হওয়ার পরে রোযা ভাঙ্গবেন।

ইবনুল কুদামা বলেন:

"সঠিক মতানুযায়ী: কেউ যদি তীব্র পিপাসা ও তীব্র ক্ষুধায় মৃত্যুর আশংকা করেন তাহলে সে ব্যক্তি রোযা ভেঙ্গে ফেলতে পারেন।"

শাইখ বিন উছাইমীন (রহঃ) আল-কাফী গ্রন্থের উপর টীকা সংযোগ করতে গিয়ে বলেন:

"যদি কেউ পিপাসার ভয় করে।" কিন্তু এখানে নিছক পিপাসাটা উদ্দেশ্য নয়। বরংযে পিপাসার কারণে মৃত্যুর আশংকা হয় কিংবা শারীরিক ক্ষতির আশংকাহয়। [তালীকাত ইবনু উছাইমীন আললাল কাফী (৩/১২৪)]

ইমাম নববী (রহঃ) "আল-মাজমু" গ্রন্থে (৬/২৫৮) বলেন: "আমাদের মাযহাবেরআলেমগণ ও অন্যান্য আলেমগণ বলেন: যে ব্যক্তি ক্ষুধা ও পিপাসার শিকার হয়েমৃত্যুর আশংকা করছে তার উপর রোযা ভেঙ্গে ফেলা অনিবার্য; এমনকি সে যদিসুস্থ-সবল ও গৃহবাসী

(মুকীম) মানুষ হয়ত তদুপরি। যেহেতু আল্লাহ তাআলারবাণী হচ্ছে- "আর নিজেরা খুনোখুনি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতিদয়্যাবান"। [সূরা নিসা, ৪:২৯] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "নিজেদেরকে ধ্বংসেরদিকে ঠেলে দিও না।" [সূরা বাক্বারা, ২:১৯৫] তবে, অসুস্থ ব্যক্তির মত এব্যক্তির উপরও কাযা পালন করা আবশ্যিক হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ [সমাণ্ড]

অতএব, আপনার উপর ওযাজিব হল: এই দিনের রোযাটি কাযা পালন করা। আর আপনি যদি রোযা ভাঙ্গার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে থাকেন এবং কষ্ট হওয়ার আগে রোযা ভেঙ্গেফেলেন; যে কষ্ট রোযা ভাঙ্গাকে বৈধতা দেয়; সেক্ষেত্রে আপনার উপর আবশ্যিক হল: কৃত কর্মের জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং এমন কর্ম দ্বিতীয়বার আর না করা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

আমার হাযেয চলছিল। ফজরের আযানের আগে আমি পবিত্র হয়েছি। কিন্তু ক্লাস্তির কারণে আমি গোসল করতে পারিনি; এর মধ্যে ফজরের আযান হয়েগেছে। এমতাবস্থায় আমি কি সেই দিনের রোযাটি পূর্ণ করব? উল্লেখ্য, আমি আযানেরআগেই সেই দিনের রোযা রাখার নিয়ত করেছি।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।।

যদি হাযেযগ্রন্থ নারীফজরের আগে পবিত্র হন তাহলে তিনি রোযা রাখার নিয়ত করবেন। নিয়ত করলে তার রোযাসহিহ হবে; এমনকি তিনি যদি ফজর হওয়ার পর গোসল না করেন সেক্ষেত্রেও।

অনুরূপ হুকুম জুনুবী (সহবাস বা বীযপাতের কারণে যার উপর গোসল ফরয) ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যে ব্যক্তি ফজরের আগে গোসল করেনি।

সুলাইমান বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত তিনি উম্মে সালামা (রাঃ) কে এমনব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে ব্যক্তি জানাবাত (সহবাস বা বীযপাতেরকারণে গোসল ফরয) অবস্থায় ভোরে উপনীত হয়েছে সে কি রোযা রাখবে? তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুনুবী অবস্থায় ভোরে উপনীতহতেন; স্বপ্নদোষের কারণে নয়। এরপর তিনি রোযা রাখতেন। [সহিহ বুখারী (১৯৬২) ও সহিহ মুসলিম (১১০৯)]

ইমাম নববী বলেন:

শহর-বন্দরের আলেমগণ ইজমা করেছেন যে, জুনুবী ব্যক্তির রোযা রাখা সহিহ; হোক সেটা স্বপ্নদোষের কারণ থেকে কিংবা স্ত্রী সহবাসের কারণ থেকে...। জুনুবীব্যক্তির ন্যায় যদি কোন হাযেযগ্রন্থ নারী কিংবা নিফাসগ্রন্থ নারীররক্তস্রাব রাতের বেলায় বন্ধ হয়ে যায় অতঃপর তারা গোসল করার আগেই ফজর হয়ে যায়তাদের রোযা রাখাও সহিহ। রোযা পূর্ণ করা তাদের উপর ওযাজিব। হোক তারা ইচ্ছাকরে গোসল না করুক কিংবা ভুলে গিয়ে গোসল না করুক; কোন ওজরের কারণে গোসল না করুক কিংবা কোন ওজর ছাড়া গোসল না করুক। এটি আমাদের মাযহাব ও সকল আলেমেরমাযহাব। তবে, জনৈক সালাফ থেকে যা বর্ণিত রয়েছে তাঁর থেকে সেই বর্ণনাটিসহিহ; নাকি সহিহ নয়ড তা আমরা জানি না। [সমাণ্ড]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

আমার মাসিক সাতদিন থেকে আটদিন হয়ে থাকে। কখনও কখনওসপ্তম দিনে আমি আর রক্ত দেখি না; পবিত্রতাও দেখি না। এমতাবস্থায় নামায পড়া, রোযা রাখা ও সহবাসে লিপ্ত হওয়ার বিধান কী?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

আপনি তাড়াহুড়া করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সাদাস্রাব দেখতে পান; যে স্রাবটি নারীরা চিনে থাকেন । এসাদাস্রাব হচ্ছে পবিত্র হওয়ার আলামত । কেবল রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়াই পবিত্রতা নয় । বরং পবিত্রতা অর্জিত হয় পবিত্রতার আলামত দেখা যাওয়া ওনির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার মাধ্যমে ।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ ।

প্রশ্ন

আমার জমজ বাচ্চা আছে । তাদের বয়স পাঁচ মাস । আমার বুকের দুধকম হওয়ায় শুধু বুকের দুধে তাদের খাদ্য হয় না । পাশাপাশি তারা কৃত্রিম দুধও খায় । কিন্তু আমি আশংকা করছি, রোযা রাখলে আমার দুধ আরও কমে যাবে । এতে করে আমি তাদেরকে দুধ খাওয়াতে পারব না । ফলে এ অল্প বয়সেই তারা বুকের দুধ খাওয়াছেড়ে দিবে । এমতাবস্থায়, আমার জন্যে রোযা ভাঙ্গা কি জায়েয হবে?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ ।

এক:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের উপর থেকে অর্ধেক নামায শিথিলকরেছেন । এবং মুসাফির, গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর উপর থেকে সাওম (রোযা) বা সিয়াম শিথিল করেছেন ।” [সুনানে আবু দাউদ (২৪০৮), সুনানে তিরমিযি (৭১৫), সুনানে নাসাই (২২৭৫), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৬৭), আলবানি ‘সহিহ আবুদাউদ’ গ্রন্থে ‘হাসান সহিহ’ বলেছেন]

যদিও বাহ্যতঃ এই হাদিসটিতে ‘গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী’-র ক্ষেত্রে কোন শর্তারোপ করা হয়নি, কিন্তু হাদিসটির অর্থ শর্তযুক্ত । শর্তটি হচ্ছে-যদি তারা নিজেদের জীবন কিংবা সন্তানের জীবনের ব্যাপারে আশংকাবেোধ করে ।

সিন্দি কর্তৃক রচিত সুনানে ইবনে মাজাহ-এর হাশিয়াতে (১/৫১২) এসেছে: গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী: অর্থাৎ তারা উভয়ে যদি গর্ভস্থিত সন্তান কিংবা দুগ্ধপোষ্য সন্তানের ব্যাপারে আশংকা করেন কিংবা তাদের নিজেদের জীবনের ব্যাপারে আশংকা করেন [সমাণ্ড]

আল-জাসাস তায় ‘আহকামুল কুরআন’ গ্রন্থে (১/২৪৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের উপর থেকে অর্ধেক নামায শিথিল করেছেন । এবং মুসাফির, গর্ভবতী নারী, স্তন্যদায়ী নারীর উপর থেকে সাওম (রোযা) বা সিয়াম শিথিল করেছেন’ উল্লেখ করার পর বলেন: “ এটা জ্ঞাত যে, তাদের জন্য (অর্থাৎ গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী) এ শিথিলায়ন তাদের জীবনের উপর আশংকা কিংবা তাদের সন্তানের জীবনের উপর আশংকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।” । তিনি অন্যত্র (১/২৫২) বলেন: “ গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর ক্ষেত্রে; হয়তো রোযা তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যহানি করবে কিংবা তাদের সন্তানের স্বাস্থ্যহানি করবে । যেটাই হোক না কেন তাদের উভয়ের জন্য রোযানা-থাকা উত্তম । রোযা রাখা তাদের জন্য নিষিদ্ধ । আর যদি তাদের স্বাস্থ্যহানি না করে কিংবা তাদের সন্তানের স্বাস্থ্যহানি না করে তাহলে তাদের উপর রোযা রাখা ফরয । রোযা না-রাখা নাজায়েয ।” [সমাণ্ড]

আলেমগণ তাদের ভাষ্যগুলোতে এ শর্তটি উল্লেখ করেছেন । বরং এ শর্তের উপর আলেমগণের ঐক্যমত্য বর্ণিত হয়েছে: যেমনটি ইতিপূর্বে [66438](#)নং প্রশ্নোত্তরে আমরা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি ।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলব:

যদি রোযা রাখার কারণে আপনি আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকা করেন, যেমন- দুধ শুকিয়ে যাওয়া কিংবা দুধ এমন কমে যাওয়া যাতে তাদের ক্ষতি হবসেসেক্ষেত্রে আপনি রোযা না-রাখতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে, আপনি যদি নিজের ব্যাপারে আশংকাবোধ করেন যে, আপনি যদি রোযা রেখে দুধ খাওয়ানসেক্ষেত্রে আপনার এমন কষ্ট হবে যা এমন ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কষ্টের অধিক কিংবা আপনার স্বাস্থ্যহানির আশংকা করেন তাহলেও আপনার রোযা না-রাখতে কোন অসুবিধা নেই।

আর যদি আপনার প্রবল ধারণা হয় যে, রোযা রাখার কারণে দুধে যে ঘাটতি হবসেসেটা বাচ্চাদ্বয়ের প্রয়োজনীয় পরিমাণ দুধ পানের উপর কোন নেতিবাচক প্রভাবফেলবে না সেক্ষেত্রে রোযা না-রাখা বৈধ হবে না। বিশেষতঃ এ সামান্য ঘাটতি যদি কৃত্রিম দুধের মাধ্যমে পূরণ করা যায়।

ইমাম শাফেয়ি-র 'আল-উম্ম' কিতাবে (২/১১৩) এসেছে: " গর্ভবতী নারী যদি নিজসন্তানের জীবনের উপর আশংকা করেন তাহলে রোযা থাকবেন না। অনুরূপ বিধানস্বত্বদায়ী নারীর ক্ষেত্রেও; যদি রোযা তার দুধের উপর ব্যাপক ক্ষতি করে। আর যদি ক্ষতিটা সীমিত হয় তাহলে রোযা ছাড়বেন না। রোযা সাধারণত রোগ বৃদ্ধি করে; কিন্তু এটা সীমিত বৃদ্ধি। রোযা দুধে ঘাটতি করে; কিন্তু সীমিত ঘাটতি। আর যদি রোগবৃদ্ধি ও দুধ-ঘাটতি ব্যাপকভাবে ঘটে থাকে তাহলে তারা উভয়ে রোযা রাখবেন না।" [সমাণ্ড]

দুই:

যদি কোন স্তন্যদায়ী নারী নিজ সন্তানের উপর আশংকা করে রোযা ভেঙ্গে থাকে তার উপর কী বর্তাবে এ নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন:

'আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়া আল-কুওয়াইতিয়া' গ্রন্থে (৩২/৬৯) এসেছে:

" যদি তারা উভয়ে তাদের সন্তানের উপর আশংকা করে রোযা না রাখেন সে ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। শাফেয়ি মাযহাবের প্রকাশ্য বক্তব্য, হাম্বলি মাযহাব ওমুজাহিদের মতে, তাদের উভয়কে কাযা পালন করতে হবে এবং প্রত্যেক দিন একজনমিসকীন খাওয়াতে হবে। যেহেতু তারা উভয়ে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর সাধারণহুকুমের অধীনে পড়ে: " আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এরপরিবর্তে ফিদিয়া দেয়া তথা একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা।" [সূরা বাকারা ২:১৮৪] ইতিপূর্বে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এ আয়াতের তাফসির উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে কুদামা বলেন: এ ধরণের তাফসির ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীদের মাঝে তাঁদের দুইজনের সাথে ইখতিলাফকারী কেউ নেই। তাছাড়া যেহেতু শারীরিক অক্ষমতার কারণে এ রোযা না-রাখার বিষয়টি ঘটেছে। তাই বয়োবৃদ্ধব্যক্তির হুকুমের ন্যায় কাফফারা আদায় করা ফরয হবে।

হানাফি মাযহাবের আলেমগণ, আতা বিন আবি রাবাহ, হাসান, দাহহাক, নাখায়ি, সাঈদ বিন জুবাইর, যুহরি, রাবিআ, আওয়ামি, ছাওরি, আবু উবাইদ, আবু ছাওর এবং শাফেয়ি আলেমগণের অপর এক মতে: উভয়ের উপর ফিদিয়া ফরয হবে না; বরং তাদের ফিদিয়া দেয়া মুস্তাহাব হবে। দলিল হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: " নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের উপর থেকে অর্ধেকনামায শিথিল করেছেন। এবং মুসাফির, গর্ভবতী নারী, স্তন্যদায়ী নারীর উপর থেকে সাওম (রোযা) বা সিয়াম শিথিল করেছেন।"

আর মালেকি মাযহাব ও লাইছ এর মতানুযায়ী (এটি শাফেয়ি মাযহাবেরও তৃতীয় একটি মত): গর্ভবতী নারী রোযা ভাঙ্গবেন; পরবর্তীতে কাযা পালন করবেন; তবে তাকে কোন ফিদিয়া দিতে হবে না। আর স্তন্যদায়ী নারীও রোযা ভাঙ্গবেন; পরবর্তীতে কাযা পালন করবেন এবং ফিদিয়া দিবেন। কেননা স্তন্যদায়ী নারী অন্য কারো মাধ্যমে তার সন্তানকে দুধ পান করাতে পারেন; যেটা গর্ভবতী নারী পারেন না। তাছাড়া গর্ভস্থিত সন্তান গর্ভবতী নারীর সাথে একীভূত। তাই গর্ভের সন্তানের জন্য আশংকা তার কোন একটি অঙ্গের জন্য আশংকার ন্যায়। তাই গর্ভবতী নারী তার নিজের মধ্যস্থিত একটি কারণের প্রেক্ষিতে রোযা ভেঙ্গেছেন; এ ক্ষেত্রে তিনি অসুস্থ ব্যক্তির মত। আর স্তন্যদায়ী নারী তার থেকে বিচ্ছিন্ন একটি কারণের প্রেক্ষিতে রোযা ভেঙ্গেছেন; এজন্য তার উপর ফিদিয়া ফরয হবে।

সলফে সালেহিনদের কেউ কেউ যেমন- ইবনে উমর (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ বিন জুবাইর (রাঃ) এর অভিমত হচ্ছে- তারা উভয়ে রোযা ভাঙ্গবেন এবং মিসকীন খাওয়াবেন। তাদেরকে কাযা রোযা পালন করতে হবে না। [সমাণ্ড]

অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে- সঠিক জ্ঞান আল্লাহর কাছে- তাদেরকে শুধু কাযা রোযা পালন করতে হবে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়: যদি গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ীনারী শক্তিশালী ও কর্মঠ হওয়া সত্ত্বেও কোন ওজর ছাড়া রোযা না রাখেন; যদিওরোযা রাখলে তাদের উপর শারীরিক কোন প্রভাব পড়বে না? জবাবে তিনি বলেন: কোনগর্ভবতী বা স্তন্যদায়ী নারীর জন্য ওজর ছাড়া রমযানের দিনের বেলা রোযানা-রাখা জায়েয হবে না। যদি তারা ওজরের কারণে রোযা না-রাখেন তাহলে কাযা পালনকরা তাদের উপর ফরয। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।" [সূরা বাকারা: ১৮৫] এ দুই শ্রেণীর নারী অসুস্থ শ্রেণীর আওতায় পড়ে।

আর যদি তাদের ওজর হয় যে, তাদের সন্তানের উপর আশংকা; সেক্ষেত্রে কোন কোনআলেমের মতানুযায়ী তাদের উপর কাযা ফরয হওয়ার সাথে সাথে প্রতিদিনের বদলে একজনমিসকীনকে দেশীয় খাদ্য যেমন- গম, চাল বা খেজুর ইত্যাদি খাদ্য দান করা ফরযহবে। আর কোন কোন আলেমের মতে, সর্বাবস্থায় তাদের উপর রোযার কাযা পালন ছাড়াআর কিছু ফরয নয়। কেননা খাবার খাওয়ানো ফরয হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-সূন্যাহরদলিল নেই। মূল অবস্থা হচ্ছে: বান্দা দায়-দায়িত্ব মুক্ত থাকা; যতক্ষণ নাদায়-দায়িত্বের পক্ষে কোন দলিল পাওয়া যায়। এটি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এরমায়হাব এবং এটি শক্তিশালী অভিমত। [ফাতাওয়াস সিয়াম, পৃষ্ঠা-১৬১]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে আরও জিজ্ঞেস করা হয় যে: যদি কোন গর্ভবতী নারী তারনিজ জীবনের বা সন্তানের জীবনের আশংকা করে রোযা না রাখেন সেক্ষেত্রে হুকুমকী?

জবাবে তিনি বলেন: এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে-

গর্ভবতী নারীর দুইটি অবস্থা হতে পারে:

১। গর্ভবতী নারী কর্মঠ ও শক্তিশালী হওয়া। (রোযা রাখার দ্বারা) তার কোনকষ্ট না হওয়া এবং তার গর্ভস্থিত সন্তানের উপর কোন প্রভাব না পড়া। এ নারীরউপর রোযা রাখা ফরয। কেননা রোযা বর্জন করার ক্ষেত্রে তার কোন ওজর নেই।

২। গর্ভবতী নারী রোযা রাখতে সক্ষম না হওয়া। গর্ভের কাঠিন্যের কারণে কিংবা শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে। এক্ষেত্রেতিনি রোযা রাখবেন না। বিশেষত: যদি তার গর্ভস্থিত সন্তানের ক্ষতি হয়সেক্ষেত্রে রোযা না রাখা তার উপর ফরযও হতে পারে। যদি তিনি রোযা না রাখেনসেক্ষেত্রে তার বিধান অন্যসব লোকের মত যারা কোন ওজরের কারণে রোযা রাখতেপারেন না। তিনি যখন ঐ ওজর থেকে মুক্ত হবেন তখন রোযার কাযা পালন করা তার উপরফরয। অর্থাৎ প্রসব করার পর ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর কাযা পালন করাতার উপর ফরয। কিন্তু, কখনও কখনও এক ওজর শেষ হয়ে অন্য ওজর দেখা দেয়। যেমন-গর্ভধারণ এর ওজর শেষ হওয়ার পর দুগ্ধপান করানোর ওজর। হতে পারে স্তন্যদায়ীনারী পানাহারের মুখাপেক্ষী হবেন। বিশেষত: গ্রীষ্মের লম্বা দিনগুলোতে, তীব্রগরমের সময় স্তন্যদায়ী নারী তার সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানোর স্বার্থে রোযানা থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা তাকে বলব: আপনিরোযা রাখবেন না। যখন আপনার ওজর শেষ হবে; তখন আপনার যতগুলো রোযা ভাঙ্গাপড়েছে সবগুলো রোযা কাযা করবেন।" [ফাতাওয়াস সিয়াম, পৃষ্ঠা- ১৬২]

শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন:

পক্ষান্তরে, গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর ব্যাপারে আনাস বিন মালিকআল-কা'নাবি কর্তৃক বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি তাদের উভয়কে রোযা না রাখার অবকাশ দিয়েছেন। তাদেরকে তিনি মুসাফিরেরবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে করে জানা গেল যে, তারা উভয়ে মুসাফিরের মতরোযা না রেখে কাযা পালন করবেন। আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, তাদের পক্ষে রোযারাখা অসুস্থ ব্যক্তির মত কষ্টকর না হলে বা তাদের সন্তানের ক্ষতির আশংকা নাথাকলে তাদের রোযা ভাঙ্গা জায়েয হবে না। আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।"

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

কোন মুসলিম সুস্থ থাকা সত্ত্বেও রমযানের যে দিনগুলোররোযা ভেঙ্গেছেন সে রোযাগুলোর কি ফিদিয়া দিতে পারবেন? যেহেতু তিনি ডায়াবেটিসও ব্লাড প্রেসারে আক্রান্ত। তিনি কি একজন মিসকীনকে একবার খাওয়াবেন; নাকিদুইবার? তিনি দেশের বাইরে থাকেন। এক মাসের ছুটিতে নিজ দেশে এসেছেন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসারের রোগীরা সবাই একই স্তরের নয়। বরং ডাক্তারেরাতাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন। তাদের মধ্যে কেউ আছেন ডাক্তারিপারামর্শ মোতাবেক চললে নিরাপদে রোযা রাখতে পারেন। আর কেউ আছেন রোযা রাখতেপারেন না।

তবে, কারো যদি ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার একত্রে থাকে সেক্ষেত্রে ঐ রোগীর জন্য রোযা রাখা অধিকতর কঠিন হয়ে যায়।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, এ রোগীর ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করাউচিত এবং ডাক্তারের উপদেশ মোতাবেক রোযা রাখা বা ভাঙ্গা উচিত। কারণ সব ধরনেররোগের জন্য রোযা ভাঙ্গার অনুমতি নেই। যেমনটি ইতিপূর্বে¹³¹⁹নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই:

যেহেতু ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার স্থায়ী রোগ (Chronic diseases) তাই এরোগদ্বয়ের কারণে যে রোগী রোযা ভাঙ্গেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সে রোযার কাযাআর কখনও পালন করতে পারবেন না। সে কারণে তার উপর ফরয হচ্ছে- প্রতিদিনেররোযা ভাঙ্গার বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়ানো; তাকে কাযা পালন করতে হবে না।

“খাওয়ানো” দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এক বেলার খাবার খাওয়ানো। অসুস্থব্যক্তির এ স্বাধীনতা রয়েছে যে, তিনি নিজে খাবার প্রস্তুত করে মিসকীনকেডেকে খাইয়ে দিতে পারেন, কিংবা রান্না করা বা কাঁচা খাবার তাকে দিয়ে দিতেপারেন। এ তিনটির কোন একটি করলে একজন মিসকীন খাওয়ানো হল এবং তিনি তার উপরআবশ্যকীয় আমলটি পালন করলেন।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

আমি রমজান মাসে সন্তান প্রসব করার কারণে যেরোজাগুলো রাখতে পারিনি সেগুলো কিভাবে কাযা করব? রোজা শুরু করার পূর্বে কোননিয়তটি উচ্চারণ করা আমার উপর আবশ্যকীয়?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

-যদি কোন মুসলিম শরিয়তস্বীকৃত কোন ওজরের কারণে রমজানের রোজা না রাখে তাহলে সে ওজর দূর হয়ে যাওয়ারপর রোজা কাযা করা আবশ্যকীয় এবং যতদূর সম্ভব অনতিবিলম্বে রোজা রাখা ফরজ।আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরেথাকবে সে অন্যদিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৪]

-রমজানের রোজার নিয়ত রাত থেকে পাকা করা ফরজ। নিয়তের স্থান হচ্ছে- অন্তর। অর্থাৎ কাজটি করার ইচ্ছা ও দৃঢ় সংকল্প করা। এর মাধ্যমে নিয়ত হয়ে যাবে; অন্য কিছু উচ্চারণ করতে হবে না। নিয়তের স্থান হচ্ছে- অন্তর। রোজাদারেরকর্তব্য হচ্ছে- তার আমলের

মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য করা; যেন আমলটি আল্লাহর জন্য খালেস হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমল নিয়ত দ্বারা মূল্যায়িত হয়”।

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী আমার ১০ মাসের শিশু সন্তানকে দুধপান করান। তাঁর জন্য কি রমজানের রোজা না-রাখা জায়েয হবে?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

দুধপানকারিনী ও গর্ভবতী মায়ের দুইটি অবস্থা হতে পারে:

১. রোজা রাখার দ্বারা তার স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব না পড়া। অর্থাৎ তার জন্য রোজা রাখাটা কষ্টকর না হওয়া এবং তার সন্তানের জন্যেও আশংকাজনক নাহওয়া। এমন নারীর উপর রোজা রাখা ফরজ; তার জন্য রোজা ভাঙ্গা নাজায়েয।

২. রোজা রাখলে তার নিজের স্বাস্থ্য অথবা সন্তানের স্বাস্থ্যের ক্ষতিহওয়ার আশংকা করা এবং তার জন্যে রোজা রাখাটা কষ্টকর হওয়া। এমন নারীর জন্যে রোজা না-রাখা জায়েয আছে; তিনি এ রোজাগুলো পরবর্তীতে কাযা পালন করবেন। বরং অবস্থায় এ নারীর জন্যে রোজা না-রাখাই উত্তম; রোজা রাখা মাকরুহ। বরং কোন কোনআলেম উল্লেখ করেছেন যদি তার সন্তানের স্বাস্থ্যের ক্ষতির আশংকা হয় তাহলেতার উপর রোজা ছেড়ে দেয়া ফরজ; রোজা রাখা হারাম।

আল-মুরদাউয়ি ‘আল-ইনসাফ’ নামক গ্রন্থে (৭/৩৮২) বলেন:

“এমতাবস্থায় এ নারীর জন্যে রোজা রাখা মাকরুহ...। ইবনে আকীল উল্লেখ করেছেনযে, গর্ভবতী ও দুধপানকারিনী নারী যদি নিজের গর্ভস্থিত ভ্রূণ ও সন্তানেরক্ষতির আশংকা করেন তাহলে রোজা রাখা জায়েয হবে না; আর যদি ক্ষতির আশংকা নাকরেন তাহলে রোজা ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে না।” সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) ফাতাওয়া আল-সিয়াম গ্রন্থে (পৃষ্ঠা- ১৬১) বলেন:

যদি গর্ভবতী ও দুধপানকারিনী নারী শারীরিকভাবে সবল ও কর্মোদ্যমী হয়, রোজা রাখার দ্বারা তার স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব না পড়ে; তদুপরি কোন ওজরছাড়া রোজা না-রাখে এর হুকুম কি?

তিনি উত্তরে বলেন:

“গর্ভবতী ও দুধপানকারিনী নারীর জন্যে কোন ওজর ছাড়া রমজান মাসের রোজানা-রাখা জায়েয নয়। যদি ওজরের কারণে রোজা না-রাখে তাহলে রোজা কাযা করতে হবে। দলিল হচ্ছে- আল্লাহর বাণী: “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবাসফরে থাকবে সে অন্যদিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫] আর এ দুই শ্রেণীর নারী অসুস্থ ব্যক্তির পর্যায়েভুক্ত। যদি এ দুই শ্রেণীরনারীর ওজর হয় ‘তাদের সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকা’ তাহলে কোন কোন আলেমেরমতে, এরা রোজাগুলোর কাযা পালনের সাথে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে গম, চাল, খেজুর বা স্থানীয় প্রধান কোন খাদ্য সদকা করবে। আর কোন কোন আলেমের মতে, কোন অবস্থাতে তাদেরকে কাযা পালন ছাড়া আর কিছু করতে হবে না। কারণ খাদ্যপ্রদানের পক্ষে কিতাব ও সুন্নাহর কোন দলিল নেই। আর দলিল সাব্যস্ত না হওয়াপর্যন্ত ব্যক্তি যে কোন প্রকার দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকা- মৌলিক বিধান। এটিইমাম আবু হানিফার মাযহাব ও মজবুত অভিমত।” সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল (ফাতাওয়াস সিয়াম পৃষ্ঠা-১৬২):

গর্ভবতী নারী যদি নিজের স্বাস্থ্যহানি বা সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকায় রোজা না রাখে এর কী হুকুম?

উত্তরে তিনি বলেন: “আমাদের জবাব হচ্ছে- গর্ভবতী নারীর দুইটি অবস্থার কোন একটি হতে পারে:

১. শারীরিকভাবে শক্তিশালী ও কর্মোদ্যমী হওয়া, রোজা রাখতে কষ্ট না হওয়া, গর্ভস্থিত সন্তানের উপর কোন প্রভাব না পড়া- এ নারীর উপর রোজা রাখা ফরজ।যেহেতু রোজা ছেড়ে দেয়ারজন্য তার কোন ওজর নেই।

২. গর্ভবতী নারী রোজা রাখতে সক্ষম না হওয়া: গর্ভ ধারণের কাঠিন্যের কারণে অথবা তার শারীরিক দুর্বলতার কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণে। এ অবস্থায় এনারী রোজা রাখবে না। বিশেষতঃ যদি তার গর্ভস্থিত সন্তানের ক্ষতির আশংকা করে সেক্ষেত্রে রোজা ছেড়ে দেয়া তার উপর ফরজ। যদি সে রোজা ছেড়ে দেয় তাহলে অন্যওজরগ্রস্ত ব্যক্তিদের যে হুকুম তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে তথা পরবর্তীতে এরোজাগুলো কাযা পালন করা তার উপর ফরজ। অর্থাৎ সন্তান প্রসব ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর এ রোজাগুলো কাযা পালন করা তার উপর ফরজ। তবে কখনো হতে পারে গর্ভধারণের ওজর থেকে সে মুক্ত হয়েছে ঠিক; কিন্তু নতুন একটি ওজরগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ দুধপান করানোর ওজর। দুধপানকারিনী নারী পানাহার করার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে পারে; বিশেষতঃ গ্রীষ্মের দীর্ঘতর ও উত্তপ্ত দিনগুলোতে। এ দিনগুলোতে এমন নারী তার সন্তানকে বুকের দুধ পান করানোর জন্য রোজা ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা সে নারীকে বলব: আপনি রোজা ছেড়ে দিন। এ ওজর দূর হওয়ার পর আপনি এ রোজাগুলো কাযা পালন করবেন।” সমাপ্ত

শাইখ বিন বায (মাজমুউল ফাতাওয়া ১৫/২২৪) বলেন:

“গর্ভবতী ও দুধপানকারিনী নারীর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ও সুনান সংকলকগণের গ্রন্থে সহিহ সনদে আনাস বিন মালিক আল-কাবী এর বর্ণিত হাদিস নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি এ দুই প্রকারের নারীকে রোজা ছেড়ে দেয়ার অবকাশ দিয়েছেন এবং এদেরকে মুসাফিরের পর্যায়ে গণ্য করেছেন। অতএব, জানা গেল যে, এরা মুসাফিরের মত রোজা না- রেখে পরবর্তীতে কাযা পালন করবে। আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, রোগীর অনুরূপ কষ্ট নাহলে অথবা সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকা না থাকলে এ দুই শ্রেণীর নারীগণ রোজা ছেড়ে দিবে না। আল্লাহই ভাল জানেন।” সমাপ্ত

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াতে (১০/২২৬) এসেছে-

“গর্ভবতী নারীর উপরও রোজা রাখা ফরজ; তবে যদি রোজা রাখলে নিজের স্বাস্থ্যহানি অথবা গর্ভস্থিত সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকা হয় তাহলে তার জন্যে রোজা না- রাখার অবকাশ থাকবে এবং প্রসব করার পর নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে এরোজাগুলো কাযা করবে।” সমাপ্ত

প্রশ্ন

যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, রমজানের রোজা রেখে পড়াশুনা করতে পারতাম না। সে জন্য দুই রমজানের কিছু রোজা আমি রাখি নি। এখন আমার উপর কি শুধু কাযা ওয়াজিব; নাকি শুধু কাফফারা ওয়াজিব? নাকি কাযাকাফফারা উভয়টা ওয়াজিব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

রমজানমাসে রোজা পালন ইসলামের অন্যতম একটি ভিত্তি।যেভিত্তিগুলোর উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।ইবনেউমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)

“ইসলাম পাঁচটি রোকনের উপর প্রতিষ্ঠিত: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, হজ্জ আদায়করা এবং রমজান মাসে রোজাপালন করা।”

সুতরাং যে ব্যক্তি রোজাত্যাগ করল সে ইসলামের একটি রোকন ত্যাগ করল এবং কবিরা গুনাতে লিপ্ত হল। বরঞ্চ সলফে সালেহিনদের কেউ কেউ এ ধরনের ব্যক্তিকে কাফির ও মুরতাদ মনে করতেন। আমরা এ ধরনের গুনাহ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইমাম যাহাবী তার ‘আল-কাবায়ের’ গ্রন্থে (পৃঃ ৬৪) বলেছেন:

“মুমিনদের মাঝে স্বীকৃত যে, যে ব্যক্তি কোন রোগ বা কারণ ছাড়া রমজান মাসে রোজাত্যাগ করে সে ব্যক্তি যিনাকারী ও মদ্যপ মাতালের চেয়ে নিকৃষ্ট। বরং তাঁরা তার ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন এবং তার মাঝে ইসলাম দ্রোহিতা ও বিমুখতার ধারণা করেন।” সমাপ্ত

দুই:

পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখার ব্যাপারে শাইখ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি বলেন: “একজন মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তির জন্য রমজান মাসে পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখা জায়েয নয়। কারণ এটি শরিয়ত অনুমোদিত ওজর নয়। বরং তার উপর রোজাপালন করা ওয়াজিব। দিনের বেলায় পড়াশোনা করা তার জন্য কষ্টকর হলে সে রাতের বেলায় পড়াশোনা করতে পারে। আর পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উচিত ছাত্রদের প্রতি সহমর্মী হওয়া এবং রমজান মাসের পরিবর্তে অন্য সময়ে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা। এর ফলে দুইটি সুবিধার মধ্যে সমন্বয় করা যায়। ছাত্রদের সিয়ামপালন ও পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য অবসর সময় পাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহিহ হাদিসে এসেছে তিনি বলেন:

(اللهم من ولي من أمرأتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمرأتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه) أخرجه مسلم في صحيحه

“হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের যে কোন পর্যায়ের কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের সাথে কোমল হয় আপনিও তার প্রতিকোমল হন। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কর্তৃত্বপেয়ে তাদের সাথে কঠোর হয় আপনিও তার সাথে কঠোর হন।” [সহিহ মুসলিম]

তাই পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার উপদেশ হল-তাঁরা যেন ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সহমর্মী হন। রমজান মাসে পরীক্ষা না দিয়ে রমজানের আগে বা পরে পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করেন। আমরা আল্লাহর কাছে সবার জন্য তাওফিক প্রার্থনা করি।” সমাপ্ত [ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনে বায (৪/২২৩)] ‘ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ীকমিটি’ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

আমি রমজান মাসে একটানা সাড়ে ৬ ঘণ্টা পরীক্ষা দিব। মাঝে ৪৫ মিনিটের বিরতি আছে। একই পরীক্ষায় আমি গত বছরও অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু সিয়াম পালনের কারণে ভালোভাবে মনোযোগ দিতে পারিনি। তাই পরীক্ষার দিনে কি আমার রোজা না-রাখা জায়েয হবে?

তাঁরা উত্তরে বলেন:

“উল্লেখিত কারণে রোজা না-রাখা জায়েয নয়; বরং তা হারাম। কারণ রমজানে রোজা না-রাখার বৈধ ওজরের মধ্যে এটি পড়েনা।” সমাপ্ত

[ফাতাওয়াল লাজনাদাযিমাহ (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ীকমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৪০)]

তিন:

না-রাখা রোজাগুলো কাযা করার ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন:

আপনি যদি এই ভেবে রোজা না-রেখে থাকেন যে পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখা জায়েয, তবে আপনার উপর শুধু কাযা করা ওয়াজিব। আপনার যেহেতু ভুল ধারণা ছিল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আপনি হারামে লিপ্ত হননি তাই আপনার ওজুহাত গ্রহণযোগ্য। আর

আপনি যদি তা হারাম জেনে রোজা না-রাখেন তবে আপনার উপর অনুতপ্ত হওয়া, তওবা করা এবং পাপ কাজে পুনরায় ফিরে না আসার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা ওয়াজিব। কাযা করার ক্ষেত্রে যদি আপনি রোজা শুরু করে দিনের বেলায় রোজা ভেঙ্গে ফেলেন তাহলে আপনাকে এর কাযা পালন করতে হবে। আর যদি আপনি শুরু থেকেই রোজা না-রেখে থাকেন তাহলে আপনার উপর কোন কাযা নেই। এর জন্য আল্লাহ চাহত 'সত্যিকার তওবা' (তওবায়ে নাসুহ)-ই যথেষ্ট। আপনার উচিত বেশিবেশি ভাল কাজ করা, নফল রোজা রাখা; যাতে করে ছুটে যাওয়া ফরজ ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করে নিতে পারেন।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহকে রমজানে দিনের বেলায় বিনা ওজরে পানাহারের হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন:

রমজানে দিনের বেলায় বিনাওজরে পানাহার করা মারাত্মক কবিরার গুনাহ। এতে করে ব্যক্তি ফাসেক হয়ে যায়। তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে – আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং রোজা না-রাখা দিনগুলোর কাযা রোজা পালনকরা। অর্থাৎ সে যদি রোজা শুরু করে বিনা ওজরে দিনের বেলায় রোজা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার গুনাহ হবে এবং তাকে সে দিনের রোজা কাযা করতে হবে। কারণ সে রোজাটি শুরু করেছে, সেটি তার উপর অনিবার্য হয়েছে এবং সে ফরজ জেনে সে আমলটি শুরু করেছে। তাই মান্নতের ন্যায় এর কাযা করা তার উপর আবশ্যিক। আর যদি শুরু থেকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বিনা ওজরে রোজাত্যাগ করে তবে অগ্রগণ্য মত হল তার উপর কাযা আবশ্যিক নয়। কারণ কাযা করলেও সেটি তার কোন কাজে আসবেনা। যেহেতু তা কবুল হবে না।

শরয়ি কামেদা হল: নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত কোন ইবাদত যখন বিনা ওজরে সে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা হয় না সেটা আর কবুল করা হয়না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)

“ যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের দ্বীনেই তা প্রত্যাখ্যাত। ” [সহিহ বুখারী (২০৩৫), সহিহ মুসলিম (১৭১৮)]

তাছাড়া এটি আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন। আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমানা লঙ্ঘন করা জুলুম বা অন্যায়। জালিমের আমল কবুল হয়না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

(وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

“ যারা আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারা জালিম (অবিচারী)। ” [আল-বাক্বারাহ: ২২৯]

এছাড়া সে ব্যক্তি যদি এই ইবাদতটি নির্দিষ্ট সময়ের আগে পালন করত তবে তা তার কাছ থেকে কবুল করা হতোনা, অনুরূপভাবে কোন ওজর ছাড়া সে যদি নির্দিষ্ট সময়ের পরে তা আদায় করে তবে সেটাও তার কাছ থেকে কবুল করা হবেনা। সমাপ্ত

[মাজমু ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ৪৫)]

চার:

কাযা পালনে এই কয়েক বছর দেবীকরার কারণে আপনার উপর তওবা করা আবশ্যিক। যে ব্যক্তির উপর রমজানের কাযা রোজা রয়েছে পরবর্তী রমজান আসার আগে তা পালন করে নেয়া ওয়াজিব। যদি সে এর চেয়ে বেশি দেবী করে তবে সে গুনাহগার হবে। এই বিলম্ব করার কারণে তার উপর কাফফারা (প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়ানো) ওয়াজিব হবে কিনা-এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। নির্বাচিত মত হল-তার উপর কাফফারা আদায় ওয়াজিব হবেনা। তবে সাবধানতা বশতঃ আপনি যদি কাফফারা আদায় করেন তবে তা ভাল। আরও জানতে দেখুন (26865) নং প্রশ্নের উত্তর।

জবাবের সারাংশ হল:

আপনি যদি পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখা জামেয় মনে করে রোজা না-রেখে থাকেন অথবা রোজা শুরু করে দিনে ভেঙ্গে ফেলেন তাহলে আপনাকে কাযা পালন করতে হবে; কাফফারা আদায় করতে হবে না। আমরা দোয়া করছি যাতে আল্লাহ আপনার তওবা কবুল করেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন:

যে সব কর্মী কষ্টকর কায়িক পরিশ্রম করেন বিশেষতঃ গ্রীষ্মের মৌসুমে, তাদের ব্যাপারে ইসলামী শরিয়তের হুকুম কি? যেমন- যারা খনিজ পদার্থ গলানোর চুল্লীর সামনে কাজ করেন তাদের জন্য রমজানের রোজানা-রাখা কি জায়েয?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এটি সবার জানা যে, ইসলামধর্মে রমজান মাসে সিয়াম পালন করা প্রত্যেক মুকাল্লাফ (শরয়ি ভারপ্রাপ্ত) ব্যক্তির উপর ফরজ। রোজা ইসলামের অন্যতম একটি স্তম্ভ। তাই প্রত্যেক মুকাল্লাফ ব্যক্তির উচিত আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব পাওয়ার আশা নিয়ে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে তিনি যা ফরজ করেছেন তা বাস্তবায়নে তথা সিয়াম পালনে সচেষ্ট হওয়া। তবে দুনিয়াকে একেবারে ভুলে গিয়ে নয়। আবার আখিরাতের উপরে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েও নয়। যদি আল্লাহর ফরজকৃত ইবাদত পালন ও দুনিয়ার কর্মের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তবে উভয়টার মধ্যে সমন্বয় করা ওয়াজিব; যাতে সে উভয়টা পালন করতে পারে। যেমনটি এই প্রশ্নে উল্লেখিত উদাহরণে রয়েছে। এক্ষেত্রে এ কর্মীরা রাতেরবেলায় তাদের দুনিয়াবিকাজ করতে পারেন। তা সম্ভব না হলে রমজান মাসে চাকুরী থেকে ছুটি নিতে পারেন; এমনকি সেটা বেতন ছাড়া হলেও। তাও সম্ভব না হলে অন্যকোন পেশা বেছে নেবেন, যাতে করে উভয় ওয়াজিব সমানভাবে পালন করতে পারেন। কিন্তু দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে নয়। পেশা অনেক এবং অর্থ উপার্জনের উপায়ও বিভিন্ন; এধরনের কষ্টকর পেশার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহর ইচ্ছায় একজন মুসলিমের এমন কোন বৈধ কাজের অভাব হবে না যার পাশাপাশি সে আল্লাহর ফরজকৃত ইবাদত পালন করতে পারে।

ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً [الطلاق]

“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য কোন উপায় করে দিবেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রিযিক দিবেন যা সে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর আদেশ বাস্তবায়িত করবেন, আল্লাহ সব কিছুর তাকদির নির্ধারণ করে রেখেছেন।” [৬৫ আত্ব-ত্বালাক : ২-৩]

আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, উনি উল্লেখিত কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ পাননি, যেকাজ করে ইবাদত পালনে তার কষ্ট হচ্ছে, তাহলে তিনি যেন তাঁর দীনদারিরক্ষার্থে সেই ভূমি ছেড়ে অন্য ভূমিতে পালিয়ে যান যেখানে তিনি তাঁর দীন ও দুনিয়ার দায়িত্ব সমভাবে পালন করতে পারবেন, মুসলমানদের সাথে নেককাজও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতা পাবেন। আল্লাহর জমিন প্রশস্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة [النساء]

“যে হিজরত করবে আল্লাহর পথে সে পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও স্বচ্ছলতা পাবে।” [৪ সূরা আন-নিসা: ১০০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

[الزمر]

“বলুন, হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছে, তোমাদের রবকে ভয় করো। যারা এ দুনিয়ায় কল্যাণের কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহর জমিন তো প্রশস্ত। ধৈর্য শীলদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে অফুরন্ত।” [৩৯ আয-যুমার : ১০]

যদি উল্লেখিত বিকল্প প্রস্তাবনার কোনটি অবলম্বন করা সে ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব না হয় এবং তিনি প্রশ্নে উল্লেখিত কঠিন কাজ করতে বাধ্য হন তাহলে তিনি রোজা রাখতে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না অসুবিধা অনুভব করেন। অসুবিধা অনুভব করলে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবেন; যতটুকুতে তার কষ্টদূর হয়। এরপর পুনরায় বাকি সময় পানাহার থেকে বিরত থাকবেন এবং সিয়াম পালনের জন্য সুবিধামত সময়ে এই রোজার কাযা করবেন। আল্লাহই তাওফিক দাতা।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ এর প্রতি ও তাঁর পরিবার বর্গ ও সাহাবীগণের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিতহোক।

প্রশ্ন:

রমজান মাসের প্রথম দিন এক বৃদ্ধা আমার সাথে দেখাকরেছেন। তাঁর বয়স ১০০ বছরের মত হবে। কখনও তাঁর হুঁশ থাকে, আবার কখনও থাকেনা। তিনি আমার কাছে কফি চাইলেন। আমি তাঁকে কফি বানিয়ে খাইয়েছি। এতে কি আমার গুনাহ হবে? অবশ্য আমি তাঁকে বলেছিলাম আমরা এখন রমজান মাসে আছি। আমাকে এর উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন।

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

“যদি বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, উনি বেহুঁশ এবং বুদ্ধি-বিকলতা ও বার্ধক্যে আক্রান্ত তবে তাঁকে কফি বানিয়ে খাওয়াতে কোন দোষ নেই। কারণ তাঁর উপর সিয়াম পালন আবশ্যিক নয়। তার কিছু হুঁশ থাকা যেমন তিনি বলতে পারেন, ‘তোমরা এটি কর বা এটি দাও’ তার বিবেক-বুদ্ধি বহাল থাকার প্রমাণ বহন করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যিনি ১০০ বছর বয়সে পৌঁছেছেন তার বিবেক বিপর্যয় ও পরিবর্তন ঘটে। আপনি যদি তাঁর অবস্থা দেখে বোঝেন যে, তিনি হুঁশ হারিয়ে ফেলেছেন এবং ভারসাম্যহীন তবে তাঁর পানাহার করায় কোন দোষ নেই। আর আপনি যদি দেখেন যে, তার হুঁশ আছে এবং তিনি রোজা পালনে অবহেলা করছেন তবে কফি বা অন্যকিছু দিবেন না - যাতে করে আপনি গুনার কাজে সাহায্যকারী না হন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

[وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] [المائدة :]

“পুণ্যকাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর, পাপ ও সীমা লঙ্ঘনে একে অন্যকে সহযোগিতা করনা।” [৫ সূরাআল-মায়দা: ২]

তাই কোন সুস্থ মুসলিম রমজান মাসে খাবার চাইলে তাকে তা দেওয়া যাবে না। খাবার, পানীয়, ধূমপান কিছুই করতে দেওয়া যাবে না। কোন গুনাহর কাজে সাহায্য করা যাবে না। আর যাদের হুঁশ নেই যেমন- উন্মাদ, অতিবুদ্ধ, পাগল ও অতিবৃদ্ধা এদের ক্ষেত্রে কোন গুনাহ হবে না। কারণ তারা রোজা পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত।” সমাপ্ত

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রাহিমাহুল্লাহ

প্রশ্ন:

অতি সম্প্রতি আমি জানতে পেরেছি যে, আমার কিডনিতে পাথর হয়েছে। একজন মুসলিম, তাক্বওয়াবান ডাক্তার (আমার কাছে সেটাই মনে হয়েছে) আমাকে রমজানের রোযানা-রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। ব্যাপারটি স্পষ্ট করার জন্য বলছি, এই পরামর্শদেয়ার কারণ হলো- সারাদিন পানি পান করতে থাকা যাতে নতুন কোন পাথর তৈরী হওয়াথেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় রমজানের রোযা না-রাখা কি আমার উপরওয়াজিব?

উত্তর

আল্‌হামদুলিল্লাহ ।

যদি বিশ্বস্ত মুসলিম ডাক্তার একথা জানান যে, রোযা পালন আপনাস্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে এবং তিনি আপনাকে রোযা না-রাখার নির্দেশ দেন তাহলেআল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত অবকাশ (রোখসত) গ্রহণ করা ইসলামী বিধিসম্মত । আল্লাহতাআলা বলেন :

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة]

“ আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে, অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে ।” [সূরা বাক্বারা, ২:১৮৪] ইবনে কাছীর (রাহিমাল্লাহ) বলেন: “ অর্থাৎ একজন অসুস্থ বা মুসাফির ব্যক্তি অসুস্থতা বা সফররত অবস্থায় রোযা পালন করবেনা । কারণ এতে তাদের কষ্ট হবে । সুতরাং তারা রোযা ভঙ্গ করবে এবং সেই সংখ্যা অন্য দিনগুলোতে রোযা রেখে পূরণ করে নিবে ।” সমাপ্ত । তাফসীর ইবনে কাছীর (১/৪৯৮)

আল্লাহ যেখানে ছাড় দিয়েছেনসেখানে নিজেকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন :

(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىٰ رُحْصُهُ كَمَايُكْرَهُ أَنْ تُؤْتَىٰ مَعْصِيَتُهُ) رواه أحمد (صححه الألباني في "صحيح الجامع" .)

“ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর দেওয়া অবকাশ (রোখসত) গ্রহণ করা পছন্দ করেন, যেমনিভাবে তাঁর অবাধ্য হয়ে পাপে লিপ্ত হওয়া অপছন্দ করেন ।” [হাদিসটি আহমাদবর্ণনা করেছেন (৫৮৩২) । আলবানী সহীহ আল-জামি(১৮৮৬) গ্রন্থে সহীহ বলে উল্লেখকরেছেন]

যদি কারো এমন রোগ হয় যা থেকে আরোগ্য লাভের আশা করা যায় না সেক্ষেত্রে রোগী রোযা ভঙ্গ করবেন এবং প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন । আর যদি এমন রোগ হয় যা থেকে সুস্থ হওয়ার আশা করা যায় তবে সুস্থতার পর সেই দিনগুলোর রোযা কাযা পূরণ করে নিবেন ।

শাইখ ইবনে 'উছাইমীন (রাহিমাল্লাহ) বলেছেন:“ আলেমগণ সিয়ামের প্রেক্ষিতে রোগকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন :

(১) যেসব রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আশা করা যায় । এ ধরনের রোগী রোযা ভঙ্গ করবেন এবং সুস্থতার পরে সে রোযাগুলোর কাযা পূরণ করবেন ।

(২) যেসব রোগ থেকে সুস্থতা লাভের আশা করা যায় না । এ ধরনের রোগী প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন । এ খাওয়ানোটা রোযার স্তলাভিষিক্ত হবে ।” সমাপ্ত । [‘ফাৎওয়া' নূরুন'আলাদ' দারুবু' ইবনে 'উছাইমীন (৪৮/২১৬)]

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলেমগণকে এমন এক মহিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল রমজান মাস শুরু হওয়ার আগে যার অপারেশন হয়েছিল । তিনি অপারেশনের পূর্বেও কখনো রোযা পালন করেনি ।তার অপারেশনটি ছিল একটি কিডনি একেবারে ফেলে দেওয়া এবং দ্বিতীয় কিডনি থেকে পাথর অপসারণ করা । ডাক্তাররা তাকে আজীবন সিয়াম পালন না করার পরামর্শ দিয়েছেন ।

তাঁরা উত্তরে বলেন :

‘যদি কাউকে কোন মুসলিম বিশ্বস্ত ডাক্তার পরামর্শ দেয় যে, সিয়াম পালন করাতার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে তবে তিনি রোযা রাখবেন না । রমজানের প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে অর্ধেক সা' (নবী (সাঃ) এর যামানায় পরিমাণের একক) গম, চাল, খেজুর বা এ পরিমাণ স্থানীয় কোন খাদ্যদ্রব্য কাফ্ফারা হিসেবে প্রদান করবেন । কিন্তু খাদ্যের পরিবর্তে অর্ধকড়ি দিয়ে কাফ্ফারা দেওয়া জায়েয হবে না ।’সমাপ্ত । [গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৮২-১৮৩)]

শাইখ ইবনে 'উছাইমীনকে (রাহিমাল্লাহ) প্রশ্ন করা হয়েছিল:

গত বছর রমজান মুবারকের শুরুর দিকে আমার বাম কিডনিতে অপারেশন হয়েছিল ।আমি সেই রমজানের রোযা পালন করতে পারিনি । কারণ আমি আধ ঘণ্টার জন্যেও পানি ছাড়াথাকতে পারতাম না । সেই রোযা আমি এখন পর্যন্ত কাযা করতে পারিনি । এখন আমার করণীয় কি?

তিনি উত্তরে বলেন :

“আপনার কোন কিছু করণীয় নেই। কারণ আপনি অপারগ। এ অপারগতা অব্যাহত থাকলেও আপনার কোন কিছু করণীয় নেই। আর ডাক্তারেরা তো বলেছেন: এই অল্প সময়ের মধ্যেও আপনাকে পানি পান করতে হবে। তাই আপনার উপর সিয়াম পালন ওয়াজিব নয়। কারণ এ অবস্থা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং আপনাকে প্রতিদিনের রোযার বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে।” সমাপ্ত। [ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দার্ব -ইবনেউছাইমীন (৪০/২১৬)]

এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়- যদি ডাক্তার আপনাকে এ কথা জানান যে, আপনি ভবিষ্যতে রোযা পালন করতে পারবেন না তাহলে আপনার জন্য রোযা ভঙ্গ করা এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়ানো শরিয়তসম্মত। আর যদি ভবিষ্যতে সিয়ামপালন করতে পারবেন মর্মে জানান, তাহলে আপনি এখন রোযা ভঙ্গ করবেন এবং আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। সুস্থ হওয়ার পর যেসব দিনের রোযাভঙ্গ হয়েছে সেদিনগুলোর রোযা কাযা করবেন। এ বিষয়ে আরো জানতে দেখুন : (12488) ও (23296) নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

প্রশ্ন

আমার ৯ বছরের একটি ছেলে আছে। তাকে কিভাবে রমজানের রোযা পালনে অভ্যস্ত করা যায়- আশা করি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবেন, ইনশা'আল্লাহ। বিগত রমজানে সে মাত্র ১৫ দিন রোযা পালন করেছে।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

এ প্রশ্নটি পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। সন্তানদের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া ও তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে গড়ে তোলার আন্তরিক চেষ্টার ইঙ্গিত বহন করে এ ধরনের প্রশ্ন। এটি অধীনস্থদের কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার উপর যাদের দায়দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

দুই:

শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ৯ বছরের ছেলে সিয়াম পালনে মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) নয়। কারণ সে এখনও সাবালক হয়নি। তবে আল্লাহ তা'আলা ইবাদতের উপর সন্তানদেরকে লালন-পালনের দায়িত্ব পিতা-মাতার ওপর অর্পণ করেছেন। ৭ বছর বয়সী সন্তানকে নামায শিক্ষা দেয়ার জন্য পিতামাতার প্রতি আদেশ জারী করেছেন। নামাযে অবহেলা করলে ১০ বছর বয়স হতে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান সাহাবীগণ তাঁদের সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকে রোযা রাখাতেন, যেন তারা এ মহান ইবাদত পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। এ আলোচনা হতে সন্তানসন্ততিকে উত্তম গুণাবলী ও ভাল কাজের উপর গড়ে তোলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সালাতের ব্যাপারে এসেছে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

“আপনারা আপনাদের সন্তানদের ৭ বছর বয়সে সালাত আদায়ের আদেশ করুন। এ ব্যাপারে অবহেলা করলে ১০ বছর বয়সে তাদেরকে প্রহার করুন এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দিন।” [হাদিসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন (নং ৪৯৫) এবং শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদ গ্রন্থে এ হাদিসকে সহীহ হাদিস বলে চিহ্নিত করেছেন]

রোযার ব্যাপারে এসেছে:

রুবাইবিনতে মুআওযেয ইবনে আফরা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার সকালে মদিনার আশেপাশে আনসারদের এলাকায় (এই ঘোষণা) পাঠালেন : 'যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় সকাল শুরু করেছে, সে যেন তার রোযা পালন সম্পন্ন করে। আর যে ব্যক্তিকে-রোযাদার হিসেবে সকাল করেছে সে যেন বাকি দিনটুকু রোযা পালন করে।' এরপর থেকে আমরা আশুরারদিনরোযা পালন করতাম এবং আমাদের ছোট শিশুদেরকেও (ইনশাআল্লাহ) রোযা রাখতাম। আমরা (তাদের নিয়ে) মসজিদে যেতাম এবং তাদেরজন্য উল দিয়ে খেলনা তৈরী করে রাখতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকেসেই খেলনা দিয়ে ইফতারের সময় পর্যন্ত সান্ত্বনা দিয়ে রাখতাম। [হাদিসটিবর্ণনাকরেছেন ইমাম বুখারী (নং ১৯৬০) ও মুসলিম (নং ১১৩৬)]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রমজান মাসে এক মদ্যপকে বলেছিলেন :

" তোমার জন্য আফসোস! আমাদের ছোট শিশুরা পর্যন্ত রোযাদার!" এরপর তাকেপ্রহার করা শুরু করলেন। [হাদিসটি ইমাম বুখারীসনদবিহীন বাণী (মুআল্লাক)হিসেবে 'শিশুদের রোযা' পরিচ্ছেদে সংকলন করেছেন]

যে বয়সে শিশু রোযা পালনে সক্ষমতা লাভ করে সে বয়স থেকে পিতামাতা তাকেপ্রশিক্ষণমূলক রোযা রাখাবেন। এটি শিশুর শারীরিক গঠনের উপর নির্ভর করে। আলেমগণের কেউ কেউ এ সময়কে ১০ বছর বয়স থেকে নির্ধারণ করেছেন। এ ব্যাপারে আরোবিস্তারিত জবাব দেখুন (65558)নং প্রশ্নের উত্তরে। সেখানে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা পাবেন। তিন : শিশুদেরকে রোযা পালনে অভ্যস্ত করে তোলার বেশকিছু পন্থা রয়েছে:

১। শিশুদের নিকট রোযার ফজিলত সম্পর্কিত হাদিসগুলো তুলে ধরতে হবে। তাদেরকে জানাতে হবে সিয়াম পালন জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। জান্নাতের একটিদরজার নাম হচ্ছে 'আর-রাইয়্যান'। এ দরজা দিয়ে শুধু রোযাদারগণ প্রবেশ করবে।

২। রমজান আসার পূর্বেই কিছু রোযা রাখানোর মাধ্যমে সিয়াম পালনে তাদেরকে অভ্যস্ত করে তোলা। যেমন- শা'বান মাসে কয়েকটি রোযা রাখানো। যাতে তারাআকস্মিকভাবে রমজানের রোযার সম্মুখীন না হয়।

৩। প্রথমদিকে দিনের কিছু অংশে রোযা পালন করানো। ক্রমান্বয়ে সেই সময়কে বাড়িয়ে দেয়া।

৪। একেবারে শেষ সময়ে সেহেরি গ্রহণ করা। এতে করে তাদের জন্য দিনের বেলায় রোযা পালন সহজ হবে।

৫। প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে রোযা পালনে উৎসাহিত করা।

৬। ইফতার ও সেহেরীর সময় পরিবারের সকল সদস্যের সামনে তাদের প্রশংসা করা। যাতে তাদের মানসিক উন্নয়ন ঘটে।

৭। যার একাধিক শিশু রয়েছে তাদের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা। তবে খুবই সতর্কতার সাথে খেলা রাখতে হবে যাতে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়াশিশুটির প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা না হয়।

৮। তাদের মধ্যে যাদের ক্ষুধা লাগবে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়েঅথবা বৈধ খেলনাদিয়ে ভুলিয়ে রাখা। এমন খেলনা যাতে পরিশ্রম করতে হয় না। যেভাবে মহানসাহাবীগণ তাঁদের সন্তানদের ক্ষেত্রে করতেন। নির্ভরযোগ্যইসলামীচ্যানেলগুলোতে শিশুদের উপযোগী কিছু অনুষ্ঠান রয়েছেএবংরক্ষণশীল কিছু কার্টুনসিরিজ রয়েছে। এগুলো দিয়ে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা যেতে পারে।

৯। ভাল হয় যদি বাবা তার ছেলেকে মসজিদে নিয়ে যান। বিশেষতঃ আসরের সময়। যাতে সে নামাযের জামাতে হাযির থাকতে পারে। বিভিন্ন দ্বীনি ক্লাসে অংশ নিতেপারে এবং মসজিদে অবস্থান করে কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহ তা'আলার যিকিরে রতথাকতে পারে।

১০। যেসব পরিবারের শিশুরা রোযা রাখে তাদের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার জন্যদিনে বা রাতের কিছু সময় নির্দিষ্ট করে নেয়া। যাতে তারা সিয়াম পালন অব্যাহতরাখার প্রেরণা পায়।

১১। ইফতারের পর শরিয়ত অনুমোদিত ঘুরাফিরার সুযোগ দেয়া। অথবা তারা পছন্দ করে এমন খাবার, চকলেট, মিষ্টি, ফল-ফলাদি ও শরবত প্রস্তুত করা।

আমরা এ ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখতে বলছি যে, শিশুর যদি খুব বেশি কষ্ট হয় তবে রোযাটি পূর্ণ করতে তার ওপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া উচিত নয়। যাতে তার মাঝেইবাদতের প্রতি অনীহা না আসে অথবা তার মাঝে মিথ্যা বলার প্রবণতা তৈরী না করে অথবা তার অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণ না ঘটায়। কেননা ইসলামী শরিয়তে সে মুকাব্বাফ (ভারাপিত) নয়। তাই এ ব্যাপারে খেয়াল রাখা উচিত এবং সিয়াম পালনে আদেশকরার ব্যাপারে কড়া কড়ি না করা উচিত।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুসাফিরের রোজা

প্রশ্ন

আমি জেদ্দাতে মুকীম। লগুনে যাচ্ছি। সেখানে আটদিন থাকব। সফরের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষা পাস করার জন্য একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণ করা। কোর্সটির সময় হচ্ছে ইফতারের চার ঘণ্টা আগে থেকে। মাগরিবের আযান পর্যন্ত কোর্স চলবে। এ কোর্স করতে কিছু রোগীদের অবস্থার উপর নিবিড় মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আমার জন্য রোযা না-রাখাকি জায়েয হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আপনার সফরের দিন ও ফিরে আসার দিন শহরের ঘরবাড়ী অতিক্রম করার পর রোযাভেঙ্গে ফেলা জায়েয। উদাহরণতঃ যদি আপনার সফর হয় জেদ্দা থেকে দুপুরে। তাহলে রাত থেকে রোযার নিয়ত করা ও পানাহার থেকে বিরত থাকা আপনার উপর ওয়াজিব; যতক্ষণ না আপনি শহরের ঘরবাড়ী অতিক্রম করেন। অতিক্রম করলে রোযা ভেঙ্গে ফেলা আপনার জন্য জায়েয হবে।

অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য আপনার ফেরত আসার দিনও। আপনি যদি দিনের বেলায় সফর করেন তাহলে শহরের ঘরবাড়ী অতিক্রম করার আগে রোযা ভাঙ্গবেন না।

যে ব্যক্তি দিনের বেলায় সফর করেন তার জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়েয। এটি ইমাম আহমাদের মায়হাব এবং শাফেয়ি, ইসহাক ও দাউদের অভিমত। এবং এটাই অগ্রগণ্য অভিমত।

আর জমহুর আলেমের মতে, যে ব্যক্তি দিনের বেলায় সফর করেন তার জন্য সেই দিনের রোযা ভাঙ্গা জায়েয নয়।

ইবনে কুদামা (রহঃ) অগ্রগণ্য অভিমতের দলিল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "যেহেতু উবাইদ বিন জুবাইর (রহঃ) বলেন: আমি আবু বাসরা আল-গিফারীর সাথে রমযান মাসে ফুসতাত থেকে জাহাজে উঠেছিলাম। জাহাজ রওয়ানা হল। এরপর দুপুরের খাবারের সময় হল। তখনও বাড়ীঘর অতিক্রম করেনি। কিন্তু তিনি দস্তরখান বিছানোর নির্দেশ দিলেন। এরপর বললেন: কাছে আস। আমি বললাম: আপনি বাড়ীঘর দেখছেন না? তিনি বললেন: তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত থেকে বিমুখ হতে চাও? এরপর তিনি খেয়েছেন। [সুনানে আবু দাউদ] এরপর তিনি বলেন: যদি এটি সাব্যস্ত হয় তাহলে বাড়ীঘরগুলোকে পেছনে ফেলার আগে রোযা ভাঙ্গা বৈধ হবেনা। অর্থাৎ বাড়ীঘরগুলোকে অতিক্রম করা এবং এগুলোর মধ্য থেকে বের হয়ে যাওয়া।

আল-হাসান বলেন: যেই দিনে সফর করতে ইচ্ছুক সেই দিন সে চাইলে নিজ বাসাতেই ইফতার করতে পারে। অনুরূপ কথা আতা থেকেও বর্ণিত আছে। ইবনে আব্দুল বার বলেন: হাসানের উক্তিটি বিরল। নিজ গৃহে থাকাবস্থায় রোযা ভাঙ্গার পক্ষে কারো

অভিমতনেই। কোন আকলি দলিলেও নেই, নকলি দলিলেও নেই। হাসান থেকে এর বিপরীত অভিমতও বর্ণিত আছে। [আল-মুগনী (৩/১১৭) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

মুসাফির ব্যক্তি যদি কোন শহরে চারদিনের বেশি থাকার নিয়ত করে তাহলেমালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের আলেমদের মতে, তথা জমহুর আলেমদের মতে, সেমুকীমের হুকুমে পড়ে। একজন মুকীমের উপর যা যা অনিবার্য; যেমন রোযা রাখা ওনামায পরিপূর্ণভাবে আদায় করা তার উপরেও সেগুলো আদায় করা অনিবার্য।

ইবনে কুদামা বলেন: যদি মুসাফির ব্যক্তি কোন শহরে ২১ ওয়াক্ত নামায পড়ারনিয়ত করে তাহলে সে নামাযগুলো পূর্ণভাবে আদায় করবে। ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিতপ্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে: যেটুকু সময়কাল অবস্থান করার নিয়ত করলে মুসাফিরব্যক্তিকে নামায পরিপূর্ণ সংখ্যায় পড়তে হবে সেটা হচ্ছে- ২১ ওয়াক্তের চেয়েবেশি নামায। আল-আসরাম, আল-মারযুকী ও অন্যান্য আলেমগণ এটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে এটিও বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ চারদিন থাকার নিয়ত করে তাহলে সেব্যক্তিও নামায পূর্ণভাবে আদায় করবেন। আর যদি এর চেয়ে কম সময় থাকার নিয়তকরে তাহলে কসর করে পড়বে। এটি ইমাম মালেক, শাফেয়ি ও আবু ছাওরেরঅভিমত। [আল-মুগনী (২/৬৫) থেকে সমাপ্ত]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (৮/৯৯) এসেছে: "যে সফরে বের হলে সফরেরছাড়গুলো গ্রহণ করা যায় সেটা হলো প্রথাগতভাবে যেটাকে সফর বলা হয়। এর দূরত্বহচ্ছে প্রায় ৮০ কিঃমিঃ। যে ব্যক্তি এ পরিমাণ দূরত্ব বা তার চেয়ে বেশিদূরত্বে সফর করবেন তিনি সফরের ছাড়গুলো ভোগ করতে পারেন; যেমন- তিনদিন তিনরাতমোজার উপর মাসেহ করা, নামাযগুলো একত্রিত করে ও কসর করে আদায় করা, রমযানেররোযা ভঙ্গ করা। এই মুসাফির যদি কোন শহরে চারদিনের বেশি সময় থাকার নিয়ত করেনতাহলে তিনি সফরের ছাড়গুলো নিতে পারবেন না। আর যদি চারদিন বা চারদিনের চেয়েকম সময় থাকার নিয়ত করেন তাহলে তিনি সফরের ছাড়গুলো নিতে পারবেন। আর যেমুসাফির এমন কোন দেশে অবস্থান করছেন কিন্তু তিনি জানেন না যে, কবে তারপ্রয়োজন শেষ হবে এবং তিনি অবস্থান করার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় ধার্যকরেননি; তাহলে তিনি সফর অবস্থার সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারবেন; এমনকি যদি সে সময়টা অনেক লম্বা হয় তবুও। এক্ষেত্রে স্থল পথে সফর বা জল পথে সফর এদুটোর মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

পূর্বেক্ত আলোচনার আলোকে আপনি যেহেতু লন্ডনে আটদিন থাকার নিয়ত করছেন তাইএ অবস্থানকালে আপনার জন্য নামায কসর করা ও রোযা ভাঙ্গা জায়েয হবে না।

আপনি যে কষ্ট ও মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো রোযা ভাঙ্গার বৈধতা দেয় না।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

আমি আমার শহর থেকে এশার পর সফর করেছি। সেই দিনই আমারফেরাটা অপরিহার্য ছিল। যেহেতু আমি প্রায় ফজরের পর পৌঁছেছি। আমি যাদের কাছেঅবস্থান করছিলাম তাদেরকে বলেছি, তারা যেন আমাকে যোহরের সময় জাগিয়ে দেয়; যাতে আমি আমার পরিবারের উদ্দেশ্যে সফর করতে পারি। আমি জেগে উঠে যোহরেরনামায পড়লাম। তারা আমাকে দুপুরের খাবার দিল, আমি খেয়ে নিলাম এবং সফর করলাম।এমতাবস্থায় হুকুম কী?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনার প্রশ্ন থেকে বুঝাযাচ্ছে যে, আপনি সেই দিন রোযা না-রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন। আপনার প্রশ্ন থেকে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, আপনার শহর ও আপনি যে শহরেরউদ্দেশ্যে সফর করেছেন এর মাঝে দীর্ঘ দূরত্ব; কেননা আপনার সফর করতে কয়েকঘণ্টা লেগে গেছে। এ পরিমাণ দূরত্ব সফরের দূরত্ব বিবেচিত হয়। মুসাফিরের জন্যরমযানের রোযা না-রাখা জায়েয আছে। আপনাকে এ

দিনটির রোযা কাযা পালন করতে হবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

মুসাফিরের জন্য কখন রোযা ভঙ্গ করা হারাম? কারণসহ।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমারদলিল প্রমাণ করছে যে, মুসাফিরের জন্য রমযানের দিনের বেলায় রোযা না-রাখাজায়েয। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আরকেউঅসুস্থথাকলেকিংবা সফরে থাকলেঅন্যসময় এইসংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

আরও জানতে দেখুন [37717](#)নং প্রশ্নোত্তর।

ফিকাহবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, ঐ মুসাফিরের জন্য রোযা না-রাখা বৈধ যিনি নামায কসর করা যায় এমন দূরত্বে সফর করেন এবং সেটা যদি বৈধ সফর হয়। আর কারোসফর যদি নামায কসর করার মত দূরত্বে না হয় কিংবা তার সফর কোন গুনাহর কাজে হয়সেক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ করা বৈধ হবে না।

অনুরূপভাবে কেউ যদি রোযা না-রাখার জন্য সফর করে সেক্ষেত্রে তার জন্য সফর ও রোযা ভঙ্গ করা উভয়টা হারাম।

নামায কসর করার দূরত্ব অধিকাংশ আলেমদের মতে, চার মনজিল তথা প্রায় ৮০কিঃমিঃ। কোন কোন আলেমের অভিমত হচ্ছে, দূরত্বটা বিবেচ্য নয়; বরং মানুষটাকে সফর হিসেবে আখ্যায়িত করে সেটাই বিবেচ্য।

গুনাহর ক্ষেত্রে সফরকারী ব্যক্তির জন্য সফরের ছাড়গুলো (যেমন- নামাযকসর করা) গ্রহণ করা বৈধ হবে না এটি মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবেরঅভিমত। [দেখুন: আল-মুগনী ২/৫২]

তারা এ অভিমতের কারণ দর্শান এভাবে যে, রোযা না-রাখাটা একটা ছাড়। গুনাহরকাজে সফরকারী ব্যক্তি এ ছাড় পাওয়ার হকদার নয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ আয়াতদিয়ে দলিল দেন: “তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন ব্যতীতএগুলো গ্রহণ করে, তার কোন গুনাহ হবে না।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৭৩] আয়াতথেকে তাদের মতের পক্ষে দলিল গ্রহণের প্রক্রিয়া হচ্ছে- নিরুপায় ব্যক্তিঅবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী হলে আল্লাহ তাআলা তার জন্যে মৃত প্রাণীর গোশতখাওয়া হালাল করেননি। যেহেতু অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী হচ্ছে পাপী। তারা বলেন:عُذْرٌ (অবাধ্য) হচ্ছে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী। আর اِلْحَادٌ (সীমালঙ্ঘনকারী) হচ্ছে- ডাকাত।

আর হানাফি আলেমদের মতে, গুনাহগার হলেও তার জন্য সফরের ছাড় যেমন, রোযানা-রাখা, নামায কসর করা ইত্যাদি গ্রহণ করা বৈধ। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনেতাইমিয়ারও অভিমত। [দেখুন: আল-বাহরর রায়েক (২/১৪৯), মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/১১০)।

এ মতাবলম্বীরা জমহুর বা অধিকাংশ আলেম যে আয়াত দিয়ে দলিল দিয়েছেন তা মেনেননি। তারা বলেন: آيَاتُ الْبَاغِي (অবাধ্য) হচ্ছে সেই ব্যক্তি যারহালাল-খাদ্য খাওয়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে হারাম খাবার অনুেষণ করে। আর الْمُعْتَدِي (সীমালঙ্ঘনকারী) হচ্ছে- যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে যতটুকু না হলেনয় এর চেয়ে বেশি পরিমাণ ভক্ষণ করে।

আর যে ব্যক্তি রোযা না-রাখার জন্য সফর করে সে তো ইসলামী শরিয়তের সাথেছল-চাতুরী করে। এজন্য তার শাস্তি হচ্ছে, তার ছল-চাতুরীর বিপক্ষে বিধানদেয়া।

হাম্বলি মাযহাবের 'কাশশাফুল ফিনা' (২/৩১২) গ্রন্থে বলা হয়েছে:

“ যদি কেউ রোযা না-রাখার জন্য সফর করে তার উপর উভয়টা হারাম হবে অর্থাৎ সফর করা ও রোযা ভঙ্গ করা। কারণ তার সফর করার আর কোন কারণ নেই; রোযা ভঙ্গ করা ছাড়া। রোযা ভঙ্গ করা হারাম হওয়ার কারণ হল যেহেতু তার রোযা ভঙ্গ করার বৈধ কোন ওজর নেই। আর সফর করা হারাম হওয়ার কারণ হল, কেননা সেটা রোযা ভঙ্গ করার একটা হারাম কৌশল।” [সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]

মুসাফিরের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করা বৈধ হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার শহরের দালান-কোঠা কিংবা নিজ গ্রামের সীমা অতিক্রম না করে। এর পূর্বে রোযা ভাঙ্গা হারাম। কেননা সে তখনও মুকীম।

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মুসাফিরের জন্য নিম্নোক্ত স্থানে রোযা ভঙ্গ করা হারাম:

১। যদি তার সফর নামায কসর করার সমান দূরত্বে না হয়।

২। অধিকাংশ আলেমের মতে, যদি তার সফর কোন বৈধ কারণের পরিপ্রেক্ষিতে না হয়।

৩। যদি সে রোযা ভঙ্গ করার জন্য সফর করে।

৪। যদি সে সফর শুরু করে, কিন্তু তার গ্রামের বাড়ী-ঘর কিংবা তার শহর অতিক্রমের আগেই রোযা ভেঙ্গে ফেলতে চায়।

৫। অধিকাংশ আলেমের মতে, পঞ্চম অবস্থা হচ্ছে যদি কেউ যে স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করেছে সে স্থানে পৌঁছে যায় এবং সেখানে চারদিনের বেশি থাকার নিয়ত করে। অন্য একদল আলেমের মতে, মুসাফির ব্যক্তি যতদিন মুসাফির অবস্থায় থাকবে ততদিন তিনি সফরের ছাড়গুলো গ্রহণ করতে পারবেন, সে অবস্থান যত লম্বাসময় হোক না কেন। আরও জানতে দেখুন 21091 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

রমযানের রোযা না-রাখাকে বৈধকারী অজুহাতগুলো কি কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নিঃসন্দেহে আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য সহজীকরণ হচ্ছে, তিনি শুধুমাত্র তাদের উপর রোযা রাখা ফরয করেছেন যাদের রোযা রাখার সক্ষমতা আছে এবং শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের ভিত্তিতে রোযা না-রাখাকেও বৈধ করেছেন। যেসব শরিয় ওজরের কারণে রোযানা-রাখা বৈধ সেগুলো হচ্ছে:

এক: রোগ:

রোগ মানে হচ্ছে, এমন সব অবস্থা যার কারণে ব্যক্তি সুস্থতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়।

ইবনে কুদামা বলেন: রোগের কারণে রোযা না-রাখা বৈধ হওয়া মর্মে আলেমগণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “আর তোমাদের মধ্যে যেকোনো অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫] সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسْكِينٍ

(অর্থ- আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়া তথা একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা।) শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে রোযা রাখতে পারে, আর কেউ রোযা রাখতে না চাইলে সে ফিদিয়া দিবে। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

(অর্থ- রমযান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হেদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।) নাযিল হল, তখন ফিদিয়া দেয়ার ইখতিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ-সক্ষম লোকদের ওপর শুধুমাত্র রোযা রাখা জরুরী সাব্যস্ত হয়ে যায়। এআয়াত পূর্বের আয়াতটিকে রহিত করে দেয়। সুতরাং রোযা রাখার কারণে যে অসুস্থব্যক্তি তার রোগ বেড়ে যাওয়া, কিংবা আরোগ্য লাভ বিলম্বিত হওয়া কিংবা কোন অঙ্গহানি ঘটানোর আশংকা করে তার জন্য রোযা না-রাখা বৈধ। বরং রোযা না-রাখাই সুন্নত; রোযা রাখা মাকরুহ। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে রোযা রাখার পরিণতিমূর্ত্যও হতে পারে। সুতরাং এর থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যিক। অতএব, জেনে রাখুন, রোগের কষ্ট ব্যক্তিকে রোযা না-রাখার বৈধতা দেয়। পক্ষান্তরে, সুস্থ ব্যক্তি যদি কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভব করেন, তদুপরি তার জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়েয নয়। অর্থাৎ যদি রোযা রাখার কারণে শুধু ক্লান্তির কষ্ট হয় সেক্ষেত্রে।

দুই: সফর:

যে সফরে রোযা না-রাখা বৈধ সে সফরের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে:

ক. এমন দীর্ঘ সফর হওয়া, যে সফরে নামায কসর করা যায়।

খ. সফরকালীন সময়ের মধ্যে মুকীম হয়ে যাওয়ার সংকল্প না করা।

গ. এ সফর কোন গুনার কাজে না হওয়া। বরং জমছুর আলেমের নিকট স্বীকৃত কোন উদ্দেশ্য সফর করা। কেননা, রোযা না-রাখার অনুমতি একটি রুখসত (ছাড়) ও সহজীকরণ। তাই পাপে লিপ্ত ব্যক্তি এ সুযোগ পেতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ: কারো ভ্রমণের ভিত্তি যদি গুনার উপর হয়; যেমন- ডাকাতি করার জন্য সফর করা।

(কোন ক্ষেত্রে সফরের অনুমোদিত রুখসত (ছাড়) প্রযোজ্য হবে না)

সর্বসম্মতিক্রমে দুইটি কারণে সফর অবস্থার ছাড় প্রযোজ্য হবে না:

১। যদি মুসাফির তার নিজ দেশে ফেরত আসে ও নিজ এলাকায় প্রবেশ করে; যে এলাকায় সে স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

২। যদি মুসাফির ব্যক্তি কোন স্থানে সাধারণভাবে স্থায়ীভাবে থাকার নিয়তকরে, কিংবা মুকীম সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার মত সময়কাল অবস্থান করার নিয়ত করেন এবং সে স্থানটি অবস্থান করার উপযুক্ত স্থান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি মুকীম হয়ে যাবেন। তখন তিনি নামাযগুলো পরিপূর্ণ সংখ্যায় আদায় করবেন, রোযা রাখবেন; রোযা ছাড়বেন না; যেহেতু তার সফরের হুকুম শেষ হয়ে গেছে।

তিন: গর্ভধারণ ও দুধ পান করানো

ফিকাহ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ একমত যে, গর্ভবতী ও দুধ-দানকারিণীনারীর জন্য রমযানের রোযা না-রাখা বৈধ; এই শর্তে যে তারা নিজেদের কিংবাসন্তানের অসুস্থতার কিংবা রোগ বৃদ্ধির, কিংবা ক্ষতির কিংবা মৃত্যুর আশংকাকরে। এই রুখসত বা ছাড়ের পক্ষে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: " আর যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে কিংবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।" এখানে রোগ দ্বারা যে কোন রোগ উদ্দেশ্য নয়; কেননা যে রোগের কারণে রোযা রাখতে অসুবিধা হয় না সে রোগের কারণে রোযা ভাঙ্গার অবকাশ নেই। এখানে রোগ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রোযা রাখলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। রোগ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। এখানে এ অর্থ পাওয়া গেছে। তাই এ বিষয়দ্বয় রোযা না-রাখার অবকাশের আওতায় পড়বে। আরেকটি

দলিল হচ্ছে আনাস বিন মালিক আল-কা'বি (রাঃ) এর হাদিস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে রোযা ও অর্ধেক নামায মওকুফ করেছেন এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী নারীর উপর থেকে রোযা মওকুফ করেছেন। হাদিসের অন্য একটি রেওয়াজে **الحمل أو الموضع** শব্দের পরিবর্তে **الحبلى و الموضع** শব্দদ্বয় এসেছে।

চার: বার্ধক্য ও জরাগ্রস্ততা:

বার্ধক্য ও জরাগ্রস্ততা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে:

জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ: যার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে কিংবা তিনি নিজে মৃত্যুর উপক্রম, প্রতিদিন ক্ষয় হতে হতে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

এমন রুগ্ন ব্যক্তি যার সুস্থতার কোন আশা নেই; তার ব্যাপারে সবাই হতাশ।

এছাড়া বয়স্ক বৃদ্ধা।

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের রোযা না-রাখার পক্ষে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী, "আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়াতথা একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা।" [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৪] ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াতে কারীমা রহিত হয়ে যায়নি। এ আয়াতে কারীমা (এর বিধান) বয়স্ক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার ক্ষেত্রে; যারা রোযা রাখতে পারেন না, তারা রোযার পরিবর্তে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাদ্য দিবেন।

পাঁচ: ক্ষুধা ও তৃষ্ণার ফলে অস্বাভাবিক দুর্বলতা:

তীব্র ক্ষুধা কিংবা প্রচণ্ড তৃষ্ণা যাকে অস্বাভাবিক দুর্বল করে ফেলেছে; সেই ব্যক্তি তার জীবন বাঁচানোর পরিমাণ খাদ্য খাবে এবং সে দিনের অবশিষ্টাংশ উপবাস কাটাবে। আর এ রোযাটি কাযা পালন করবে।

ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অস্বাভাবিক দুর্বলতার সাথে আলেমগণ শত্রুর সাথে সম্ভাব্য কিংবা সুনিশ্চিত মোকাবিলার ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়াকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন; যেমন শত্রুর দ্বারা অপরূদ্ধ হলে: যদি গাজী (যোদ্ধা) ব্যক্তি সুনিশ্চিতভাবে কিংবা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে যুদ্ধের বিষয়টি জানেন যেহেতু তিনি শত্রুর মোকাবিলাতে রত রয়েছেন এবং রোযা রাখার কারণে শারীরিক দুর্বলতার আশংকা করেন; অথচ তিনি মুসাফির নন এমতাবস্থায় তার জন্য যুদ্ধের পূর্বে রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয আছে।

ছয়: জবরদস্তির শিকার:

জবরদস্তি হচ্ছে: শাস্তির হুমকি দেওয়ার মাধ্যমে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোন কাজ করতে কিংবা না- করতে বাধ্য করা; যে ব্যাপারে সে ব্যক্তি নিজে থেকে রাজি নয়।

প্রশ্ন:

যদি কোন মুসলিম রমযান মাসে এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয়; যে দেশ দুটি ভিন্ন ভিন্ন দিনে রোযা রাখা শুরু করেছে সেক্ষেত্রে তিনি কি করবেন?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

কোন মুসলিম যদি কোন এলাকাবাসীকে রোযা অবস্থায় পান তাহলে তার উপর তাদের সাথে রোযা রাখা ফরয। কেননা এক্ষেত্রে আগন্তুক ব্যক্তির বিধান স্থানীয়দের অনুরূপ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "রোযা হচ্ছে যেদিন তোমরা সকলে রোযা রাখ। ঈদুল ফিতর হচ্ছে যেদিন তোমরা সকলে রোযা ভাঙ্গ। আর ঈদুল আযহা হচ্ছে যেদিন তোমরা সকলে কোরবানী কর।"

[সুনানে আবু দাউদ, হাদিসটির সনদ 'জায়িদ'। সুনানে আবু দাউদে ও অন্যান্য হাদিসের গ্রন্থে এহাদিসের সমর্থনকারী আরও হাদিস রয়েছে]

ধরে নিই, এক ব্যক্তি যে দেশে রোযা রাখা শুরু করেছে সে দেশ থেকে অন্যদেশে স্থানান্তরিত হয়েছে; তাই এ ব্যক্তির রোযা অব্যাহত রাখা ও ঈদ করার ক্ষেত্রে তিনি যে দেশে স্থানান্তরিত হয়েছে সে দেশবাসীর বিধান প্রযোজ্য। তিনি তাদের সাথেই ঈদ পালন করবেন; এমনকি ঐ দেশবাসী যদি তিনি যে দেশ থেকে এসেছেন সে দেশের আগে ঈদ পালন করে সেক্ষেত্রেও। তবে, এক্ষেত্রে তার রোযা যদি ২৯টি পূর্ণ না হয় তাহলে একদিনের রোযা কাযা করা তার উপর আবশ্যিক হবে। কেননাকোন মাসের দিন সংখ্যা ২৯ এর কম হয় না।

প্রশ্ন:

আমি জেনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: (ليسمنالبر الصومفياالسفر) অর্থ- " সফর অবস্থায় রোজা রাখা নেকীর কাজ নয়"। এর মানে কি মুসাফির ব্যক্তি রোজা রাখলে সে রোজা সহিহ হবে না?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সফর অবস্থায় রোজা রাখার তিনটি অবস্থা:

১. যদি রোজা রাখাটুকুই না হয় তাহলে রোজা রাখা উত্তম।

২. যদি রোজা রাখাটুকুই হয় তাহলে রোজা রাখা উত্তম।

৩. যদি রোজা রাখলে শারীরিকভাবে ক্ষতি হয় অথবা মৃত্যুর আশংকা হয় তাহলে রোজা রাখা হারাম; রোজা রাখা ফরজ। এ সংক্রান্ত হাদিসের দলিল গুলো সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই:

প্রশ্নকারী যে হাদিসটির প্রতি ইশারা করেছেন সে হাদিসটি তৃতীয় অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি হাদিসটির প্রাসঙ্গিকতা ও বর্ণনা করার প্রেক্ষাপট আমরা জানতে পারি তাহলে এবিষয়টি পরিষ্কার হবে। ইমাম বুখারি (১৯৪৬) ও মুসলিম (১১১৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে ছিলেন। তখন তিনি এক জটলার মধ্যে এক ব্যক্তিকে ছায়া দিতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন: এখানে কি? সাহাবীরা বললেন: ইনি রোজাদার। তখন তিনি বললেন: সফরের মধ্যে রোজা রাখা সওয়াবের কোন কাজ নয়।

সিন্দি বলেন:

তাঁর কথা: (ليس من البر)

অর্থাৎ আনুগত্যের ও ইবাদতের কাজ নয়। সমাপ্ত

নববী বলেন:

এর অর্থ হচ্ছে- যদি তোমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায় এবং তোমরা ক্ষতির আশংকা কর। হাদিসটির সিয়াক বা প্রাসঙ্গিকতা এ ধরনের ব্যাখ্যার দাবী করে...। সুতরাং রোজা রেখে যে ব্যক্তি ক্ষতির সম্মুখীন হবে হাদিসটি তাদের প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সমাপ্ত

ইমাম বুখারী হাদিসটির এ অর্থ বুঝেছেন। তাইতো তিনি এ হাদিসটির শিরোনাম দিয়েছেন, “ যাকে ছায়া দিতে হয়েছে এবং তিনি তীব্র গরমের শিকার হয়েছেন তার প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: ‘সফর অবস্থায় রোজারাখা নেকীরকাজ নয়’।” সমাপ্ত

হাফেয ইবনে হাজার বলেন:

এ শিরোনাম দিয়ে তিনি এদিকে ইশারা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক “ সফর অবস্থায় রোজা রাখা সওয়াবের কাজ নয়” বাণী উচ্চারণ করার কারণ হচ্ছে- যে কষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি।

ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) ‘তাহযিবুস সুনান’ গ্রন্থে বলেন: ‘সফরে রোজারাখা সওয়াবের কোন কাজ নয়’ এটি ব্যক্তি বিশেষের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ চোখে দেখেছেন যে, এব্যক্তিকে ছায়া দেয়া হচ্ছে; রোজা রাখার কারণে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন তিনি একথা বলেছেন। অর্থাৎ সফরের মধ্যে নিজেকে এ পর্যায়ের কষ্ট দিয়ে রোজা রাখাতে সওয়াবের কিছু নেই। যেহেতু আল্লাহ তাআলা রোজা না-রাখার সুযোগ রেখেছেন। সমাপ্ত।

তিন:

এ হাদিসটি কে এর সাধারণ অর্থ (যে কোন প্রকারের সফরে রোজারাখা সওয়াবের কাজ নয়) এ অর্থে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত আছে যে, তিনি সফরে রোজা রাখতেন।

এ কারণে খাতাবী বলেছেন:

এ বক্তব্যটি এসেছে বিশেষ একটি প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে। এ উক্তিটির বিধান সংশ্লিষ্ট সাহাবীর মত যাদের অবস্থা তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রোজা রাখা সওয়াবের কাজ নয়; যদি সফরে রোজারাখার কারণে রোজাদারের অবস্থা এ ব্যক্তির মত হয়। এর সপক্ষে দলিল হচ্ছে-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর নিজে সফর অবস্থায় রোজা রেখেছেন। [আউনুলমাবুদ থেকে সংকলিত]

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

যে শিশু বালেগ হওয়ার আগে থেকে রমজানের রোজা পালন করত। রমজান মাসের দিনের বেলায় সে বালেগ হল। তাকে কি সেইদিনের রোজা কাযা করতে হবে? একইভাবে রমজান মাসে দিনের বেলা যে কাফের ইসলাম গ্রহণ করল, যে নারী হায়েয থেকে পবিত্র হল, যে পাগল জ্ঞান ফিরে পেল, যে মুসাফির রোজা না-রাখা অবস্থায় স্বগৃহে ফিরে আসল, যে অসুস্থ ব্যক্তি রোজা ছিল না, কিন্তু সে সুস্থ হয়ে উঠল - এ সমস্ত ব্যক্তির জন্য সেই দিনের বাকি অংশ রোজাভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ও সেইদিনের রোজার কাযা আদায় করাকি ওয়াজিব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের সবার ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাপারে আমরা আলেমগণের মতভেদ ও তাদের বক্তব্য (49008) নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করেছি।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের দুটি গ্রুপে ভাগ করা যেতে পারে :

১) কোন শিশু যদি বালেগ হয়, কোন কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে, কোন পাগল যদি জ্ঞান ফিরে পায়- তবে তাদের সবার হুকুম এক। সেট হল- ওজর বাঅজুহাত চলে যাওয়ার সাথে সাথে দিনের বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী সমস্ত মুফাতিরাতে হতে বিরত থাকা ওয়াজিব। কিন্তু তাদের জন্য সেই দিনের রোজা কাযাকরা ওয়াজিব নয়।

২) অপরদিকে হায়েযগ্রস্ত নারী যদি পবিত্র হয়, মুসাফির ব্যক্তি যদি স্বগৃহে ফিরে আসে, অসুস্থ ব্যক্তি যদি আরোগ্য লাভ করে- এদের সবার হুকুম এক। এদের জন্য রোজা ভঙ্গকারী মুফাতিরাতে হতে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়। কারণবিরত থাকতে তাদের কোন লাভ নেই। যেহেতু সেই দিনের রোজা কাযা করা তাদের উপর ওয়াজিব।

প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য:

প্রথম গ্রুপের মধ্যে তাকলিফের তথা শরিয়ী ভার আরোপের সকল শর্তপাওয়া গেছে। শর্তগুলো হচ্ছে- বালেগ হওয়া, মুসলিম হওয়া ও আকল (বুদ্ধি)সম্পন্ন হওয়া। যখন থেকে তাদের উপর শরিয়ী ভার আরোপ সাব্যস্ত হয়েছে তখন থেকে মুফাতিরাতে তথা রোজা ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থাকা তাদের উপর ওয়াজিব; কিন্তু সেই দিনের রোজা কাযা আদায় করা তাদের উপর ওয়াজিব নয়। কারণ যখন থেকে তাদের উপর মুফাতিরাতে (রোজা ভঙ্গকারী বিষয়) হতে বিরত থাকা ওয়াজিব হয়েছে তখন থেকে তারা তা থেকে বিরত থেকেছে। এর আগে তো তারা রোজা পালনের ব্যাপারে মুকাল্লাফ (ভারপ্রাপ্ত) ছিল না।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় গ্রুপটি সিয়াম পালনের ব্যাপারে আইনতঃ মুকাল্লাফ ছিল। তাই তা পালন করা তাদের উপর ওয়াজিব ছিল। তবে তাদের শরিয়ত অনুমোদিত ওজর থাকায় তাদেরকে রোজা না-রাখার বৈধতা দেয়া হয়েছে। এ ধরনের ওজর হচ্ছে- হায়েয, সফর ও রোগ। এসব ওজরের কারণে আল্লাহ রোজার বিধান তাদের জন্য কিছুটা সহজ করেছেন এবং রোজা না-থাকা তাদের জন্য বৈধ করেছেন। উল্লেখিত ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি রমজানের দিনের বেলায় বে-রোজদার থাকতে এ মাসের পবিত্রতা বিনষ্ট করী হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। যদি রমজানের দিনের বেলায় তাদের ওজর দূর হয়ে যায় তবুও দিনের বাকী সময়টা রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে তাদের কোন লাভ নেই। কারণ রমজান মাসের পরে তাদেরকে সেই দিনের রোজা কাযাকরতে হবে।

শাইখ মুহাম্মদ বিন সালাহ উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

“যদি কোন মুসাফির রোজা না-রাখা অবস্থায় স্বগৃহে ফিরে আসে তবে তার জন্য রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়; দিনের বাকীসময়ে পানাহার করা তার জন্য বৈধ। যেহেতু তাকে এই দিনের রোজা কাযা করতে হবে। তাই এই দিনের অবশিষ্টাংশে পানাহার থেকে বিরত থেকে কোন লাভ নেই। এটাই সঠিকমত। এটি ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ীর অভিমত এবং ইমাম আহমাদ থেকে দুইটি বর্ণনার একটি। তবে সে ব্যক্তির প্রকাশ্যে পানাহার করা উচিত নয়।” সমাপ্ত [মাজমূফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৫৮ নং প্রশ্ন)]

তিনি আরও বলেন:

“কোন হায়েযগ্রস্ত নারী অথবা নিফাসগ্রস্ত নারী দিনের বেলায় পবিত্র হলে তাদের জন্য রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়। তিনি পানাহার করতে পারেন। কারণ তার বিরত থাকায় কোন লাভ নেই। যেহেতু সেই দিনের রোজা তাকে কাযা করতে হবে। এটি ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ীর অভিমত ও ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত দুইটি অভিমতের একটি। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন:

من أكل أول النهار فليأكل آخره

“দিনের প্রথম অংশে যে ব্যক্তি খেয়েছে দিনের শেষভাগেও সে খেতে পারে।” অর্থাৎ যার জন্য দিনের প্রথম অংশে রোজা ভঙ্গ করা জায়েয তাঁর জন্য দিনের শেষ অংশেও রোজা ভঙ্গ করা বৈধ।” সমাপ্ত [মাজমূফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৫৯ নং প্রশ্ন)]

শাইখ উছাইমীনকে আরও প্রশ্ন করা হয়েছিল:

যে ব্যক্তি রমজান মাসের দিনের বেলায় শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে রোজা ভেঙ্গেছে ওজর দূর হয়ে যাওয়ার পর সে দিনের বাকী সময়ে পানাহার করাকি তার জন্য জায়েয হবে?

তিনি উত্তরে বলেন:

“ তার জন্য পানাহার করা জায়েয। কারণ সে শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে রোজা ভঙ্গ করেছে। শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে রোজা ভঙ্গ করায় তার ক্ষেত্রে রমজানের দিবসের পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব থাকে না। তাই সেপানাহার করতে পারে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি রমজান মাসের দিনের বেলায় কোনশরয়ি ওজর ছাড়া রোজা ভঙ্গ করেছে তার অবস্থা ভিন্ন। তার ক্ষেত্রে আমরা বলব: দিনের বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত থাকা তার জন্য ওয়াজিব। যদিও এরোজার কাযা পালন করাও তার উপর ওয়াজিব। এই মাসযালা দুইটির পার্থক্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।” সমাপ্ত। [মাজমূ ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনেউছাইমীন (১৯/৬০) নং প্রশ্ন]]

তিনি আরও বলেন:

“ সিয়াম বিষয়ক গবেষণাপত্রে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোন নারীর যদি হায়েয হয় এবং (রমজান মাসে) দিনের বেলায় তিনি পবিত্র হন তবে সেই দিনের বাকী অংশে তাকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে কি- এ ব্যাপারে আলোমগণ মতভেদকরেছেন।

আমরা বলব: এ মাসযালায় ইমাম আহমাদ রাহিমাল্লাহু থেকে দুটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ থেকে সর্বজনবিদিত মত হল- দিনের বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী সমস্ত মুফাতিরাৎ থেকে বিরত থাকা সে নারীর উপর ওয়াজিব। সুতরাং সে পানাহার করবে না।

দ্বিতীয় মত হচ্ছে- তার জন্য মুফাতিরাৎ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়। তাই পানাহার করা তার জন্য জায়েয। আমরা বলব: এই দ্বিতীয় মতটি ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ি (রাঃ) এরও অভিমত। এটি ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণিত। তিনি বলেন:

من أكل أول النهار فليأكل آخره

“যে ব্যক্তির জন্য দিনের প্রথম অংশে খাওয়া বৈধ তার জন্য দিনের শেষ অংশেও খাওয়া বৈধ।”

আমরা আরও বলব ভিন্ন মত আছে এমন মাসযালার ক্ষেত্রে তালিবে ইলমের কর্তব্য হল দলিলগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং তার কাছে যে মতটি অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হয় সে মতটি গ্রহণ করা। আর দলিল যেহেতু তার পক্ষে রয়েছে সেহেতু ভিন্নমতাবলম্বীর ভিন্নমতের প্রতি ক্রক্ষেপ না করা। কারণ আমরা রাসূলকে অনুসরণকারার ব্যাপারে আদিষ্ট। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

“যেদিন তাদেরকে ডেকে বলবেন: তোমরা রাসূলগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে?” [২৮ সূরা আল-কাস্বাস্ব : ৬৫]

ভিন্ন মতাবলম্বীগণ একটা সহিহ হাদিস দিয়ে দলিল দেয়। সেটাহচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনের মধ্যভাগে ‘আশুরা’-র রোজাপালনের আদেশ দিয়েছিলেন। তখন সাহাবীরা দিনের বাকি অংশ রোজা-ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত থেকেছেন। আমরা বলব, এই হাদিসে তাদের পক্ষে কোন দলিল নেই। কারণ ‘আশুরা’-র রোজা পালনের ক্ষেত্রে ‘প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া’ (হায়েয, নিফাস, কুফর ইত্যাদি)-র কোন ব্যাপার ছিল না। বরং সেক্ষেত্রে ‘নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর’ ব্যাপার ছিল।

‘প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া’ ও ‘নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর’ মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ‘নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর’ অর্থ হল- যে কারণে কোন বিধান আবশ্যকীয় হয় সে কারণ উপস্থিত হওয়ার আগে সেই হুকুমটি সাব্যস্ত হয় না। পক্ষান্তরে ‘প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার’ অর্থ হল- বিধান সাব্যস্ত আছে; কিন্তু প্রতিবন্ধকতা থাকায় সেটা বাস্তবায়ন করা যায় না। বিধান ওয়াজিব হওয়ার কারণ পাওয়া গেলেও এই প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতিতে বিধানটি পালন করা শুদ্ধ হবেনা।

এই মাসযালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য একটি মাসযালা হলো- যেব্যক্তি রমজান মাসে দিনের বেলায় ইসলাম গ্রহণ করল তাঁর ক্ষেত্রে রোজার দায়িত্ব তার উপর নতুনভাবে বর্তাল।

এ রকম আরো একটি উদাহরণ হল- কোন নাবালেগ যদি রমজান মাসে দিনেরবেলায় সাবালক হয় এবং সে বে-রোজদার থাকে তবে তার ক্ষেত্রেও রোজার দায়িত্বটিনতুনভাবে বর্তায়।

তাই যে ব্যক্তি দিনের বেলায় ইসলাম গ্রহণ করেছে আমরা তাঁকেবলব: দিনের বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকা আপনার উপরওয়াজিব। তবে এ রোজাটি আর কাযা করা আপনার উপর ওয়াজিব নয়।

অনুরূপভাবে রমজান মাসের দিনের বেলায় যে নাবালেগ বালেগ হয়েছেআমরা তাকে বলল: দিনের বাকী অংশে রোজা ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকাতোমরা উপর ওয়াজিব। তবে এ রোজাটি কাযা করা তোমার উপর ওয়াজিব নয়।

কিন্তু রমজানের দিনের বেলায় যে ঋতুবতী নারী পবিত্র হয়েছে তারক্ষেত্রে বিধানটি ভিন্ন। আলেমগণের ইজমা তথা সর্বসম্মত মত হচ্ছে- তার উপররোজাটি কাযা করা ওয়াজিব। ঋতুবতী নারী যদি রমজানের দিনের বেলায় পবিত্র হয়তাহলে দিনের বাকী অংশ রোজা ভঙ্গকারী বিষয়াদি থেকে বিরত থাকায় তার কোনোউপকারে হবে না, এই বিরত থাকাটা রোজা হিসেবে গণ্য হবে না। বরং তাকে রোজাটিকাযা করতে হবে। এ ব্যাপারে আলেমগণ ইজমা করেছেন।

এই আলোচনার মাধ্যমে 'নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানো' ও 'প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া' এর মধ্যে পার্থক্য জানা গেল। সুতরাং হাযেযগ্রস্তনারী রমজানের দিনের বেলায় পবিত্র হওয়ার মাসযালাটি 'প্রতিবন্ধকতা দূরীভূতহওয়া' শ্রেণীর মাসযালা। পক্ষান্তরে কোন শিশুর বালেগ হওয়া অথবা প্রঙ্ককারীরউল্লেখিত রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে 'আশুরা' দিনের রোজা ফরজ হওয়া- এরমাসযালাটি 'নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানো' শীর্ষক মাসযালা। আল্লাহইতাওফিক দাতা। " সমাপ্ত।

[মাজমূ ফাৎওয়া আশ-শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৬০ নং প্রশ্ন)]

প্রশ্ন :

এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে রোযা না-রাখার নিয়ত করেছেন। ফজরহওয়ার পর তিনি তার সফর বাতিল করেছেন; কিন্তু রোযা ভঙ্গকারী কোন বিষয়ে লিপ্তহননি। এক্ষেত্রে তার হুকুম কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্তপ্রশংসাআল্লাহর জন্য।

কুরআন, সূন্বাহ ওইজমা এর দলীলদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজনমুসাফিররমজানে রোযাভঙ্গ করতেপারে। তবেতাকে সম সংখ্যকরোযার কাযাকরতে হবে।আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] [البقرة]

"আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।" [সূরাবাক্বারা, ২ : ১৮৫]

যে ব্যক্তি তার নিজ শহরে অবস্থান করছেন এবং সফর করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করেছেন তিনি নিজ শহরের বাড়ি ঘরের সীমানা অতিক্রম করার আগ পর্যন্ত 'মুসাফির' হিসেবে গণ্য হবেন না।তাই শুধু সফরের নিয়ত করলেই মুসাফিরের অবকাশ সমূহ (রোখসত) যেমন- রোযাভঙ্গ করা,সালাত সংক্ষিপ্ত করা ইত্যাদি গ্রহণকরা হালাল নয়।কারণ আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের জন্য রোযা ভঙ্গ করা বৈধ করেছেন। নিজ শহর অতিক্রম না করা পর্যন্ত কেউ 'মুসাফির' বলেগণ্য হবে না।

ইবনে কুদামাহ'আল-মুগনী' (৪/৩৪৭)গ্রন্থে 'যে ব্যক্তি দিনের বেলায় সফর করেন তিনি রোযা ভঙ্গ করতে পারবেন' উল্লেখ করার পর বলেছেন: "যখন এটি সাব্যস্ত হল তখন তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা ততক্ষণ পর্যন্ত জাযেয হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তার শহরের ঘরবাড়ি পিছনে ফেলে আসেন। অর্থাৎ আবাসিক এলাকা অতিক্রম করে এর ভবন সমূহ থেকে দূরে চলে আসেন।" তবে হাসান (রহঃ) বলেছেন: "যেদিন তিনি সফর করতে চান সেদিন তিনি চাইলে তার নিজ বাড়িতেই রোযা ভঙ্গ করতে পারেন।" একই রকম

অভিমন আত্ম (রহঃ) হতেও বর্ণিত আছে। এব্যাপারে ইবনে আব্দুল বারর (রহঃ) বলেছেন :হাসান (রহঃ)এর বক্তব্যটি বিরল। নিজ শহরে থাকা অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করা কারো জন্য জায়েয নয়। কিয়াস দ্বারা অথবা কুরআন-হাদিসের দলীল দ্বারা এটাকে জায়েয করা যায় না।হাসান (রহঃ) হতে বিপরীতধর্মী বক্তব্যও বর্ণিত আছে।”

এরপর ইবনে কুদামা বলেন:“ আল্লাহ তা’আলা বলেছেন :

(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة)

“ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাসে উপস্থিত আছে, সে যেন এতে রোযা পালন করে।” [সূরা বাক্বারা, ২:১৮৫] অর্থাৎ যে ব্যক্তি شَاهِدٌ এখানে شاهد মানে- (حاضر لم يسافر) যিনি উপস্থিত আছেন, সফর করেননি। নিজ শহর থেকে বের না-হওয়া পর্যন্ত তিনি মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজ শহরে অবস্থান করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত মুকিমের (স্বগৃহে অবস্থানকারীর) হুকুমসমূহ তার উপর বর্তাবে। তাই তিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করবেন না”। সমাপ্ত

শাইখ ইবনে ‘উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

এমন একব্যক্তি সম্পর্কে, যিনি সফরের নিয়ত করেছেন এবং অজ্ঞতাবশতঃ নিজগৃহে থাকতেই তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলেছেন, তারপর সফরে বের হয়েছেন – তার উপর কাফফারা দেয়াকি ওয়াজিব?

তিনি উত্তরে বলেন : “ তার জন্য নিজবাড়িতে রোযাভঙ্গ করা হারাম। কিন্তু তিনি যদি সফরে বের হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে রোযা ভেঙ্গে থাকেন তাহলে তাকে শুধু রোযা কাযা করতে হবে।” সমাপ্ত [ফাতাওয়াআস-সিয়াম (পৃঃ১৩৩)]

আশ-শারহুল-মুমত্বি (৬/২১৮) গ্রন্থে তিনি বলেছেন :

“ রাসূলেরসুন্নাহ ও সাহাবীগণ হতে বর্ণিত বাণীসমূহে রয়েছে যে, কেউ দিনের বেলা সফর করলে রোযা ভঙ্গ করতে পারে। এক্ষেত্রে তার নিজগ্রাম ছেড়ে যাওয়া শর্তকিনা? নাকি সফরের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বের হলেই রোযা ভঙ্গ করতে পারবে?

উত্তর: সলফে সালাহীন (সাহাবী, তাবি’ঈ ও তাব-ে-তাবি’ঈ) হতে এব্যাপারে দুইটি মত বর্ণিত হয়েছে।আলেম গণের মধ্যে অনেকে এমত পোষণ করেন যে, কেউ যদি সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয় শুধু বাহনে আরোহণ করা বাকি থাকে, তাহলে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। এব্যাপারে তাঁরা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে উল্লেখ করেন যে, তিনি এমনটি করতেন। আপনি যদি আয়াতে কারীমাটি পর্যালোচনা করেন তাহলে দেখবেন যে, এ মতটি শুদ্ধ নয়। কারণ সে ব্যক্তি এখন পর্যন্ত মুসাফির হয়নি, তিনি এখন পর্যন্ত মুকীম (স্বদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তি) রয়েছেন। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, তার জন্য নিজ গ্রামের বাড়ি ঘর অতিক্রম না করা পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নয়।

অতএব সঠিক মত হল, সে নিজ এলাকা ত্যাগ না করা পর্যন্ত রোযাভঙ্গ করবে না।এ কারণে নিজ শহর থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত সালাত সংক্ষিপ্ত করা বৈধ নয়।একই ভাবে নিজ এলাকা থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত রোযাভঙ্গ করা জায়েয নয়।” সমাপ্ত [সংক্ষিপ্তও কিছুটা পরিমার্জিত]

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যে ব্যক্তি রাত থাকতেই সফর করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করেছেন তার জন্য রোযা ভঙ্গকারী হিসেবে দিন শুরু করা জায়েয নয়। বরং তাকে রোযার নিয়ত করতে হবে।এরপর দিন শুরু হলে তিনি যদি সফর করেন এবং তার নিজ গ্রামের বাড়িঘর অতিক্রম করেন তখন রোযা ভঙ্গ করা তার জন্য জায়েয হবে।

মোদ্বাকথা,যে ব্যক্তি পরদিন সফর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিধায় রাতে রোযার নিয়ত করেননি তিনি ভুল করেছেন।এক্ষেত্রে তাকে সেই দিনের পরিবর্তে কাযা রোযা আদায় করতে হবে। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, পরদিন তিনি সফর করেনি। কারণ তিনি রাত থাকতে রোযার নিয়ত করেননি।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

(مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) رواه أبو داود () والترمذي () وصححه الألباني في صحيح أبي داود

“ যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পূর্বে রোযার নিয়্যত করেনি তার রোযা হবেনা।” [হাদিসটি আবু দাউদ (২৪৫৪) ও তিরমিযী (৭৩০) বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী সহীহ আবুদাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন।] এই ব্যক্তি যদি সফর করতে না পারেন তার উচিত হবে এই মাসের সম্মানার্থে দিনের অবশিষ্টাংশ রোযা ভঙ্গকারী সকল বিষয় (মুফাতিরাত) থেকে বিরত থাকা। কারণ তিনি শরিয়ত অনুমোদিত ওজর (অজুহাত) ছাড়াই রোযা ভঙ্গ করেছেন [আশ্-শারহআল-মুমত্বি(৬/২০৯)]

তাই প্রস্তুতকারীর উচিত আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে মাফ চাওয়া এবং তিনি যা করেছেন তা থেকে তওবা করা এবং সেই দিনের রোযা কাযা করা।

আল্লাহই সবচেয়েভালো জানেন।

প্রশ্ন :

আমি বিমান একজন ক্রু। রমজান মাসে পশ্চিমের দুটো দেশের মধ্যে সফরকালে কিভাবে রোযা পালন করব যে ক্ষেত্রে ভ্রমণ দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যেহেতু আপনি বিমান ক্রুসেহেতু আপনি মুসাফির। সকল আলেম এব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত্য) পোষণ করেছেন যে, মুসাফিরের জন্য রমজান মাসে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয; তার জন্য সিয়াম পালন করাকষ্টকর হোক অথবা না-হোক।

তবে মুসাফিরের জন্য সিয়াম পালন করা কষ্টকর না হলে তার জন্য রোযা পালনকরা উত্তম। আর কষ্টকর হলে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা উত্তম। এক্ষেত্রে তাকেরোযা ভঙ্গ করা দিনগুলোর রোযা কাযা করতে হবে। আরো জানতে দেখুন প্রশ্ন নং (20165)।

যদি আপনি রোযা পালন করতে চান তবে আপনি যে স্থানে আছেন সেটা ভূমি হোক বাশূন্য হোক সেখানে ফজর উদয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে রোযা ভঙ্গকারী সকল বিষয় (মুফাতিরাত) থেকেবিরত থাকতে হবে। ইফতারের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। তাই আপনি যে স্থানে আছেন, সেই স্থানে সূর্যাস্ত না-যাওয়া পর্যন্ত ইফতার করবেন না। আপনি যদি প্লেনে থাকা অবস্থায় সূর্য দেখতে পান তবে সূর্যাস্ত না-যাওয়াপর্যন্ত আপনার জন্য ইফতার করা জায়েয নয়; যদিও আপনি প্লেনে যে দেশের আকাশসীমানা দিয়ে যাচ্ছেন সেই দেশের অধিবাসীদের বিবেচনায় সূর্য ডুবে গিয়েথাকে। বিমানে সফরের কারণে দিনের দৈর্ঘ্য ছোট বা বড়হওয়া রোযা পালনের উপর কোনপ্রভাব ফেলবে না।

এটি সবার জানা যে, দিনের বেলায় আপনার সফর যদি পূর্বদিকে হয় তবে আপনারক্ষেত্রে দিনের দৈর্ঘ্য কমে যাবে। আর যদি আপনার সফর পশ্চিম দিকে হয় তবেদিনের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে। সুতরাং আপনি যে স্থানে আছেন সেই স্থানের ফজরেরশুরু ও সূর্যাস্ত আপনার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে।

প্রশ্ন :

রোযা না-রাখাকে বৈধকারী সফরের সবনিম্ন সীমা কতটুকু?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

অধিকাংশ আলেম এই মত দিয়েছেন যে ৪৮ মাইল দূরত্বে সফর করলে সালাত সংক্ষিপ্ত করা ও রোযা ভঙ্গ করা বৈধ।

ইবনে কুদামা 'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলেছেন:

“আবু আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ ইমাম আহমাদ) এর মত হল ১৬ ফারসাখ এর কম দূরত্বে রুসর (সালাত সংক্ষিপ্ত করা) জায়েযনয়। এক ফারসাখ হল তিন মাইল। সুতরাং ১৬ফারসাখ দূরত্ব হল ৪৮ মাইল। ইবনে আব্বাস এই দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন: এই দূরত্ব উসফান থেকে মক্কা পর্যন্ত, তায়েফ থেকে মক্কা পর্যন্ত, জেদ্দা থেকে মক্কা পর্যন্ত।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, রুসর (সালাত সংক্ষিপ্ত করা) বৈধকারী দূরত্ব হল সেই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে দুই দিনের ভ্রমণ। এটি হল ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমরএর মত। এই মতটি গ্রহণ করেছেন ইমাম মালেক, আল-লাইস ও শাফেয়ী (রহঃ) প্রমুখ।” সমাপ্ত

কিলোমিটারের হিসাবে এই দূরত্ব হবে প্রায় ৮০ কিলোমিটার।

শাইখ বিন বায মাজমু' উল-ফাতাওয়া' গ্রন্থে (১২/২৬৭) এ সফরের দূরত্বসম্পর্কে বলেন: “অধিকাংশ আলেম যে মতের উপর রয়েছেন তা হচ্ছে- যারা গাড়িতে, প্লেনে, জাহাজে, স্টিমারে ভ্রমণ করে তাদের ক্ষেত্রে এই দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার ধরে হিসাব করা। এই দূরত্ব বা তার কাছাকাছি দূরত্বে ভ্রমণকে (শরিয়তের দৃষ্টিতে) সফর বলা হবে এবং মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত প্রথা অনুসারেও তা সফর হিসেবে বিবেচিত। অতএব কেউ যদি উটে করে অথবা পায়ে হেঁটে অথবা গাড়িতে অথবা প্লেনে অথবা সামুদ্রিক যানে করে এই দূরত্ব বা তার বেশি অতিক্রম করে তবে সে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে।” সমাপ্ত

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি কে প্রশ্ন করা হয় (৮/৯০): রুসর (সালাত সংক্ষিপ্ত করা) বৈধকারী দূরত্ব সম্পর্কে এবং ভাড়াচালিত গাড়িচালক ৩০০ কিলোমিটারের বেশি পথ অতিক্রম করলে সে কি সালাত রুসর (সালাত সংক্ষিপ্ত) করবে?

তাঁরা উত্তরে বলেন:

“অধিকাংশ 'আলেমের রায় অনুসারে রুসর (সালাত সংক্ষিপ্ত করা) বৈধকারী দূরত্বের পরিমাণ হল প্রায় ৮০ কিলোমিটার। তাই ভাড়াচালিত গাড়িচালক অথবা অন্যদের জন্য এক্ষেত্রে সালাত সংক্ষিপ্ত করা জায়েয। যদি সে এ উত্তরের প্রথমে উল্লেখিত দূরত্ব বা তার চেয়ে বেশি পথ অতিক্রমের নিয়তে বের হয়।” সমাপ্ত

অন্যদিকে কিছু 'আলেম এই মত ব্যক্ত করেন যে, সফরের কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়নি। বরং এ ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথার উপরে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। প্রচলিত প্রথায় একজন মানুষ যতদূর গমন করলে সফর হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেটাই সফর হিসেবে বিবেচিত হবে। যার উপর ভিত্তি করে একজন মুসাফিরের জন্য দুই সালাত একত্রীকরণ, রুসর (সালাত সংক্ষিপ্ত) করা ও রোযা ভঙ্গ করা ইত্যাদি বিধিবিধান প্রযোজ্য হয়।

শাইখুল ইসলাম 'আল-ফাতাওয়া' গ্রন্থে (২৪/১০৬) বলেছেন:

“যারা যে কোন ধরনের সফরে রুসর (সালাত সংক্ষিপ্ত) করা ও রোযা ভঙ্গ করাকে শরিয়তসম্মত মত দিয়েছেন, বিশেষ কোন সফরের সাথে নির্দিষ্ট করেননি- দলীল তাঁদের পক্ষেই এবং এটাই সঠিক মত।” সমাপ্ত

'আরকানুল ইসলাম বিষয়ক ফতোয়া' গ্রন্থে (পৃঃ ৩৮১) শাইখ ইবনে 'উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: মুসাফির ব্যক্তি কতটুকু দূরত্বের ক্ষেত্রে নামায রুসর (সংক্ষিপ্ত করা) করতে পারবে এবং রুসর না করে দুই নামায একত্রিত করা জায়েয কিনা। তিনি উত্তরে বলেন:

“নামায রুসর (সংক্ষিপ্ত) করার দূরত্বকে কিছু আলেম প্রায় ৮০ কিলোমিটারে নির্দিষ্ট করেছেন। আবার কিছু আলেম প্রচলিত প্রথার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। সফরের দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার না হলেও মানুষ যদি এটাকে সফর গণ্য করে তাহলে সেটা সফর। আর মানুষ যেটাকে সফর হিসেবে গণ্য করে না সেটা ১০০ কিলোমিটার দূরত্বে হলেও সফর নয়। শেষের এই মতটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বেছে নিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা নামায রুসর করা বৈধ হওয়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব নির্ধারণ করেননি। একইভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব নির্ধারণ করেননি। আনাস ইবনে মালিক (রাহিমাহুল্লাহ আনহু) বলেছেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخٍ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ. رواه مسلم

“রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন মাইল অথবা তিনফারসাখ দূরত্বের পথে বের হলে সালাত দুই রাকাত আদায় করতেন(অর্থাৎ সালাতসংক্ষিপ্ত করতেন)।” [হাদিসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন (৬৯১)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহর এই বক্তব্যটি সঠিকতর। প্রচলিত প্রথাযদ্বিমত দেখা গেলে যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট দূরত্বের মতটি (অর্থাৎ প্রথমমতটি) গ্রহণ করেন- এতে দোষের কিছু নেই। কারণ এটি অনেক ইমাম ও মুজতাহিদ 'আলেমগণের বক্তব্য। তাই এতে কোন সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। আর যদি প্রচলিতপ্রথায় স্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় তবে তা অনুসারে আমল করাইসঠিক।” সমাপ্ত।

অসুস্থ ব্যক্তির রোজা

প্রশ্ন

একব্যক্তি তিন বছর ধরে ফুসফুসের যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত। দুইজন মুসলিম ডাক্তারসিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, এই রোগের কারণে তার পক্ষে রোযা রাখা সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় তার জন্য রযমানের রোযা না রাখা কি জায়েয হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যেহেতু দুইজন মুসলিম ডাক্তার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, রোযা রাখলে তার শারীরিক ক্ষতিহবে এমতাবস্থায় তার জন্য রোযা না-রাখার সুযোগ রয়েছে। ইনশা আল্লাহ সুস্থহওয়ার পর সে কাযা আদায় করবে [সমাপ্ত]

[শাইখ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম (রহঃ) এর ফতোয়াসমগ্র (৪/১৮১, ১৮২)]

যদি সে পরবর্তীতেও রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়ানো তার উপর ওয়াজিব।

প্রশ্ন

আমার উপর গত রযমানের অনেক রোযার কাযা পালন বাকী রয়েছে। এখনও আমি সেগুলো রাখতেপারিনি। বর্তমানে পাকস্থলির এক রোগে ভুগছি। রোযা রাখতে পারি না। আমি জানিনা যে, ভবিষ্যতে কি রোযা রাখতে পারব; নাকি পারব না (কারণ হতে পারে আমাররোগটি দূররোগ্য)। এই রযমানের ব্যাপারে এবং বিগত রোযাগুলোর ব্যাপারে আমি কীকরব

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আমরা মহান আরশের প্রভু আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনাকে সুস্থ করে দেন।

আপনার উপর আবশ্যিক হলনির্ভরযোগ্য ডাক্তারের কথার উপর নির্ভর করা। আপনি যে রোগে ভুগছেন যদি এ রোগথেকে মুক্তির আশা থাকে তাহলে আপনি সুস্থ হওয়ার পর বর্তমান রযমান ও বিগতরযমানের যে দিনগুলোর রোযা রাখতে পারেননি সেগুলোর কাযা পালন করবেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাক্বারা, ২: ১৮৫]

আর যদি রোগটি দুরারোগ্য হয়; আরোগ্য লাভের আশা না থাকে; তাহলে আপনার উপর আবশ্যিক হল: বর্তমান রমযান ওবিগত রমযানের প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো। যেহেতুআল্লাহতাআলা বলেন: “*আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়া তথা একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা*।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৪]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: “তিনি (আয়াতে উদ্ধৃত ব্যক্তি) হচ্ছেন: বয়োবৃদ্ধ নর ও নারী; যারা রোযা রাখতেপারেন না। তারা প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবেন।” [সহিহ বুখারী (৪৫০৫)]

যে রোগীর আরোগ্য লাভের আশা নেই তার হুকুম বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির হুকুমের অনুরূপ।

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে (৪/৩৯৬) বলেন:

“যে রোগীর আরোগ্য লাভের আশানেই তিনি রোযা না রেখে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন। কেননা তিনিবৃদ্ধ লোকের হেতুর অধিভুক্ত।” [সমাণ্ড]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) “মাজালিসু রামাদান” (পৃষ্ঠা-৩২) বলেন:

“রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তি যারঅক্ষমতা চলমান ও দূর হওয়ার আশা নেই, যেমন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি কিংবাক্যাসারের মত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যার সুস্থতার আশা নেই; এমন লোকের উপররোযা রাখা ওয়াজিব নয়। কেননা তিনি রোযা রাখতে সক্ষম নন। আল্লাহতাআলাবলেন: “*তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর*।” [সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] তিনি আরও বলেন: “*আল্লাহ কাউকে তার সাধের বাইরে দায়িত্বারোপ করেননা*।” [সূরা বাক্বারা, ২:২৮৬]

তবে এমন ব্যক্তির উপর প্রতিদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো ওয়াজিব। [সমাণ্ড]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন:

যে ব্যক্তির কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে এবং প্রতিদিন তার ডায়ালেসিস করতে হয় সে কিভাবে রোযা রাখবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল (১০/১৯০): কোন ব্যক্তি রোযা-রাখা অবস্থায় তার ডায়ালাইসিস করা হলে রোযার কি কোন ক্ষতি হবে?

জবাবে তাঁরা বলেন: ডায়ালাইসিস কিভাবে করা হয়, ডায়ালাইসিস এর সাথে অন্য কোন ধরনের ক্যামিকেল মেশানো হয় এবং এ ডায়ালাইসিসএর মধ্যে কি কোন খাদ্যদ্রব্য আছে, এ বিষয়গুলো জানানোর জন্য রিয়াদস্থ কিংফয়সাল স্পেশাল হাসপাতাল ও সামরিক হাসপাতালে পত্র দেয়া হয়েছে,? উত্তরে তারাজানান যে, ডায়ালাইসিস বলতে বুঝায় রোগীর শরীরের সব রক্ত বের করে একটিযন্ত্রে (কৃত্রিম কিডনী) প্রবেশ করানো এবং রক্তকে শোধন করা এরপর পুনরায়দেহে প্রবেশ করানো। কিছু কিছু ক্যামিকেল ও খাদ্য উপাদান রক্তে ঢুকানো হয়; যেমন সূগার ও লবণ জাতীয় দ্রব্য।

ফতোয়া কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেসকরার মাধ্যমে ডায়ালেসিস এর করার পদ্ধতি অবগত হওয়ার পর ফতোয়া দিয়েছেন যে, উল্লেখিত ডায়ালেসিস এর মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ হবে।

আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা। [সমাণ্ড]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

যে ব্যক্তির কিডনি ডায়ালাসিস করা হচ্ছে রক্তবের হওয়ার কারণে তার ওজু কি ভঙ্গ হবে? ডায়ালাসিস কালে সে কিভাবে রোযা রাখবে, কিংবা নামাযের সময় হলে নামায পড়বে?

উত্তরে তিনি বলেন:

ওজু ভঙ্গ হবে না। আলেমদের মতামতগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছে- শুধু দুইটি পথ ব্যতিরেকে মানুষের দেহের অন্য কোন স্থান থেকে কিছু বের হলে ওজু ভাঙে না। পায়ুপথ ও মূত্রপথ দিয়ে কিছু বের হলেই ওজুনষ্ট হবে। সেটা পেশাব হোক কিংবা মল হোক কিংবা বায়ু হোক। এ দুই পথ দিয়ে যেটাই বের হোক না কেন ওজু ভেঙে যাবে।

এ দুই পথ ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে কোন কিছুবের হলে সেটা কম হোক কিংবা বেশি হোক যেমন- নাক দিয়ে রক্ত পড়া, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বরা, এতে ওজু ভাঙবে না। এর ভিত্তিতে বলা যায় কিডনি ডায়ালাসিসএর কারণে ওজু ভাঙবে না।

নামায আদায়ের ক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তি দুইওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করতে পারেন; জোহর ও আছর একত্রে এবং মাগরিব ওএশা একত্রে। ডাক্তারের সাথে এভাবে সমন্বয় করে নিবেন যাতে করে, ডায়ালাসিসকরতে অর্ধদিনের বেশি সময় না লাগে এবং ডায়ালাসিস এর কারণে ওয়াক্তমত জোহর ওআসরের নামায পড়া না যায়। যেমন তিনি ডাক্তারকে বলতে পারেন, মধ্যদুপুরেরএতটুকু সময় পরে ডায়ালাসিস শুরু করবেন, যতটুকু সময়ের মধ্যে আমি যোহর ও আসরেরনামাযদ্বয় পড়ে নিতে পারি। কিংবা বলবেন: আগেভাগেই ডায়ালাসিস শুরু করুন; যাতে করে আসরের ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার আগে আমি যোহর ও আসর নামায পড়ে নিতেপারি। অর্থাৎ তার জন্য দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া জায়েয; তবে যথাসময়েনামায আদায় করতে হবে। তাই, তাকে সরাসরি ডাক্তারের সাথে সমন্বয় করে নিতেহবে।

আর রোযা রাখার হুকুমের ব্যাপারে আমি দ্বিধাদ্বন্দে আছি। কখনো কখনো বলি: ডায়ালাসিস শিংগা লাগানোর মত নয়। শিংগারক্ষেত্রে তো শরীর থেকে রক্ত বের করা হয়, শরীরে কোন রক্ত প্রবেশ করানো হয়না; হাদিস অনুযায়ী যা রোযা ভঙ্গকারী। পক্ষান্তরে, ডায়ালাসিস এর ক্ষেত্রে শরীর থেকে রক্ত বের করে, পরিষ্কার করে আবার শরীরে প্রবেশ করানো হয়। কিন্তু, আমার আশংকা হয় যে, ডায়ালাসিস এর মধ্যে এমন কিছু খাদ্যউপাদান থাকে যেগুলোর কারণে পাহাহারের প্রয়োজন হয় না। যদি আসলেই এমন কিছু উপাদান থেকে থাকে তাহলে ডায়ালাসিস এর কারণে রোজা ভঙ্গ হবে। যে ব্যক্তিকে জীবনভর ডায়ালাসিস করতে হয়সে ব্যক্তির হুকুম হবে ঐ রোগীর মত যার সুস্থ হওয়ার আশা নেই। এমন রোগীপ্রতিদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন। আর যদি ডায়ালাসিস কখনওলাগে কখনও লাগে না এমন হয় তাহলে এমন রোগী ডায়ালাসিস এর সময় রোযা ভাঙবেনএবং পরবর্তীতে আদায় করে নিবেন।

আর যদি ডায়ালাসিস এর মধ্যে যে উপাদানগুলো দেয়াহয় এগুলো খাদ্য উপাদান না হয়; শুধু রক্তকে পরিশোধিত করা হয় তাহলে এটি রোযাভঙ্গ করবে না। এমন হলে রোযা রেখে ডায়ালাসিস করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ডাক্তারদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে।[সমাণ্ড]

[মাজমু ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (২০/১১৩)]

সারকথা হচ্ছে:

যে ব্যক্তি কিডনি ডায়ালাসিস করাতে বাধ্যআক্রান্ত সে ব্যক্তি তার ডায়ালাসিস এর দিনগুলোতে রোযা রাখবে না। পরবর্তীতে যদি এ ব্যক্তি এ রোযাগুলোর কাযা করতে পারে কাযা করবে। আর যদি কাযা করতে নাপারে তাহলে সে ব্যক্তির হুকুম যে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি রোযা রাখতে পারে না তারহুকুমের ন্যায়- রোযা না রেখে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাওয়াবে।

প্রশ্ন

আমি ১৪ বছর যাবৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের ডায়াবেটিকস রোগেভুগছি। এটি এমন ডায়াবেটিকস যার কারণে ইনসুলিন নেয়া লাগে না। আমি কোন ঔষধখাই না। কিন্তু খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করি ও কিছু ব্যায়াম করি; যাতে করে ডায়াবেটিকস এর মাত্রা যথাযথ সীমাতে থাকে। গত রমযান মাসে আমি কিছুদিন রোযারেখেছি। তবে সব রোযা রাখতে পারিনি; সুগার মাত্রাতিরিক্ত কমে যাওয়ার কারণে। তবে, এখন আমি অনুভব করছি যে, আলহামদু লিল্লাহ আমার অবস্থা আগের চেয়ে ভাল। কিন্তু রোযা রাখলে আমার মাথায় ব্যথ্যা হয়।

আমার রোগের অবস্থা যেটাই হোক না কেন আমার উপর রোযা রাখা কি অবধারিত?
রোযা অবস্থায় আমি কি রক্তে সুগারের পরিমাণ পরীক্ষা করতে পারব (যেহেতু আঙ্গুল থেকে রক্ত নেয়া লাগে)?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ১.

রোগীর জন্য রমযানের রোযানা-রাখা শরিয়ত অনুমোদিত; যদি রোযা রাখলে রোগীর শারীরিক ক্ষতি হয় কিংবা কষ্ট হয় কিংবা রোগীর যদি দিনের বেলায় ট্যাবলেট ও পানীয় কিংবা সেবন জাতীয় অন্যকোন কোন ঔষধ গ্রহণ করতে হয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে তাহলে অন্য দিনগুলোতে সে সংখ্যা পূর্ণ করবে।" এবং যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রুখসতগুলো গ্রহণ করাকে পছন্দ করেন যেভাবে তিনি তাঁর অবাধ্যতায় লিগুহওয়াকে অপছন্দ করেন।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, "যেভাবে তিনি তাঁর ফরজকৃত আমলগুলো পালন করাকে পছন্দ করেন।" [আলাবানী "ইরওয়াউল গালিল" গ্রন্থে (৫৬৪) হাদিসটিকে সহিহ বলেন।]

পরীক্ষা করার জন্য রগ থেকে যে রক্ত নেওয়া হয় সঠিক মতানুযায়ী এতে করে রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে বেশি রক্ত নেওয়া হলে উত্তম হল রাতে নেয়া। যদি দিনের বেলায় নিতে হয় সেক্ষেত্রে সতর্কতাপূর্ণ অভিমত হল উক্ত রোযাটির কাযা পালন করা; যেহেতু রক্ত নেয়া শিংগা লাগানোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। [সমাণ্ড]

শাইখ বিন বাযের ফতোয়া ফাতাওয়া ইসলামিয়া (খণ্ড-২; পৃষ্ঠা-১৩৯):

"অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা:

১। রোযা রাখার দ্বারা স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব না পড়া। যেমন- হালকাসর্দি, হালকা মাথা ব্যাথা, দাঁতের ব্যাথা, এ ধরনের অন্যান্য রোগ। এমন রোগীর জন্য রোযা না-রাখা জায়েয হবে না। যদিও কোন কোন আলেম বলেন: "আর যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকে" [সূরা বাক্বারার, ১৮৫ নং আয়াতের ভিত্তিতে তার জন্যেও জায়েয হবে। তবে আমরা বলব: এ বিধানটির একটি হেতু উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা হল: রোযা না-রাখাটা তার জন্য সহজতর হওয়া। আর যদি রোযা রাখলে সেটা তার উপর কোন প্রভাব না ফেলে সেক্ষেত্রে তার জন্য রোযা না-রাখাটা জায়েয হবে না। বরং তখন রোযা রাখা তার উপর ওয়াজিব।

২। যদি রোযা রাখা তার উপর কষ্টকর হয়; কিন্তু তার জন্য ক্ষতিকর না হয়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে রোযা রাখা মাকরুহ; রোযা না-রাখা সুন্নত।

৩। যদি রোযা রাখা তার জন্য কষ্টকর ও ক্ষতিকর হয়; যেমন যে ব্যক্তি কিডনির রোগে আক্রান্ত কিংবা ডায়াবেটিকস রোগ আক্রান্ত কিংবা এ ধরনের অন্য কোন রোগে আক্রান্ত। এমন ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা হারাম।

"এর মাধ্যমে আমরা কিছু ইজতিহাদকারী ও অনেক রোগীদের ভুল জানতে পারি যাদের রোযা রাখতে কষ্ট হয়; হয়তোবা শারীরিক ক্ষতিও হয় কিন্তু তারা রোযা ভাঙতে অস্বীকৃতি জানান। আমরা বলব: উনারা ভুল করছেন; যেহেতু তারা আল্লাহর দেয়া বদান্যতাকে গ্রহণ করেননি এবং তাঁর দেয়া অবকাশকে গ্রহণ করেননি এবং নিজেদের ক্ষতি করেছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন: "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা।" [সূরা নিসা, আয়াত: ২৯]

[আশ-শারহুল মুমতি (খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫২-৩৫৪)]

প্রশ্ন

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোযা না-রাখা উত্তম? নাকি কষ্ট করে রোযা রাখাটা উত্তম?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ৷।

রোগীর জন্য যদি রোযা রাখা কষ্ট হয় তাহলে উত্তম হল রোযা না-রাখা এবং যে দিনগুলোর রোযা রাখেনি সেগুলোর কাযা পালন করা । কষ্ট করে রোযা রাখা মুস্তাহাব নয় । দলিল হচ্ছে—

১। ইমাম আহমাদ (৫৮৩২) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রুখসতগুলো গ্রহণ করাকে পছন্দ করেন যেভাবে তিনি তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করেন ।" [আলাবানী "ইরওয়াউল গালিল" গ্রন্থে (৫৬৪) হাদিসটিকে সহিহ বলেন]"

২। সহিহ বুখারী (৬৭৮৬) ও সহিহ মুসলিম (২৩২৭)-এ আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুটো বিষয়ের মাঝে নির্বাচন করার এখতিয়ার দেয়া হলে তিনি সহজতম বিষয়টি গ্রহণ করতেন; যতক্ষণ না সেটা পাপ হত । পাপ হলে তিনি হতেনএর থেকে সবচেয়ে দূরত্ব রক্ষাকারী ব্যক্তি ।"

ইমাম নববী বলেন: "এ হাদিসে সহজতম বিষয় ও কোমলতম বিষয় গ্রহণ করা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে দলিল রয়েছে; যতক্ষণ না সেটা হারাম হয় কিংবা মাকরুহ হয় ।" [সমাণ্ড]

বরং কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখা মাকরুহ । কখনও কখনও হারাম হতে পারে; যদি রোযার কারণে শারীরিক ক্ষতি হওয়ার আশংকা হয় ।

কুরতুবী বলেন (২/২৭৬):

"রোগীর অবস্থা দুটো: ১। মোটেই রোযা রাখার সক্ষমতা না থাকা; তার জন্য রোযা না-রাখা ওয়াজিব । ২। কিছু শারীরিক ক্ষতি ওকষ্টের সাথে রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া । এ ব্যক্তির জন্য রোযা না-রাখা মুস্তাহাব । এমতাবস্থায় কেবল অজ্ঞ লোকই রোযা রাখে ।" [সমাণ্ড]

ইবনে কুদামা (রহঃ) "আল-মুগনী" গ্রন্থে (৪/৪০৪) বলেন:

"যদি রোগী এ রোগ সত্ত্বেও কষ্ট করে রোযা রাখে তাহলে সে মাকরুহ কাজে লিপ্ত হল । যেহেতু এ রোযা রাখার মধ্যে নিজের শারীরিক ক্ষতি করা নিহিত আছে । রোযা না-রাখাটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শিখিলায়ন ও আল্লাহর দেয়া অবকাশকে গ্রহণ করা ।" [সমাণ্ড]

শাইখ বিন উছাইমীন (রহঃ) "আশ-শারহুল মুমতি" গ্রন্থে (৬/৩৫২) বলেন:

"এর মাধ্যমে আমরা কিছু কিছু ইজতিহাদকারী ওরোগীদের ভুল জানতে পারি যাদের রোযা রাখতে কষ্ট হয়; হয়তোবা শারীরিক ক্ষতিও হয় কিন্তু তারা রোযা ভাঙতে অস্বীকৃতি জানান । আমরা বলব: উনারা ভুল করছেন; যেহেতু তারা আল্লাহর দেয়া বদান্যতাকে গ্রহণ করেননি এবং তাঁর দেয়া অবকাশকে গ্রহণ করেননি এবং নিজেদের ক্ষতি করেছেন । অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন: "তোমরানিজেদেরকে হত্যা করো না ।" [সূরা নিসা, আয়াত: ২৯]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ ।

প্রশ্ন

আমার ভাইয়ের ব্যাপারে আমার একটি প্রশ্ন আছে । সেন্সোরোসিস রোগের কারণে বেটাফিরন ইনজেকশন নিচ্ছে । ইনজেকশনটি চামড়ার নীচে দেওয়া হয় । ডাক্তার তাকে বলেছে: ইনজেকশনটি নেয়ার পর রোগীকে বেশি পরিমাণে পানি পান করতে হবে; যাতে করে কিডনিতে চাপ না পড়ে এবং শরীর যাতে পর্যাপ্ত খাদ্য পায় তাই ভাল খাবার খেতে হবে । উল্লেখ্য, ডাক্তার তাকে এ কথাও বলেছে যে, তুমি রোযা রাখতে পারবে না । কিন্তু, রমযান আসার আগেই রোযা রাখার পাকাপোক্ত নিয়ত করে থাকলে ও তুমি শক্তি অনুভব করলে;

তাহলে রোযা রাখতে পার। বিঃদ্রঃ আমার ভাই শুধু যেই দিন ইনজেকশন নেয় ঐ দিন রোযা রাখে না। এ বিষয়টিরফতোয়া জানতে চাই।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে সব ইনজেকশনে খাদ্য উপাদান নেই সেগুলো রোযা ভঙ্গ করে না; যেমনটি [49706](#) নং প্রশ্নোত্তরে বর্ণিত হয়েছে।

দুই:

যদি এ ইনজেকশনগুলো গ্রহণকারীর প্রচুর পানি ও খাবার গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে দেখতে হবে যদি ইফতার করার পর ইনজেকশনটি নেয়া যায় এবং এতে করে রোগীর কোন ক্ষতি না হয় কিংবা কষ্ট না হয় তাহলে সেটাই ওয়াজিব।

আর যদি ইফতার পর্যন্ত বিলম্ব করলে রোগীর ক্ষতি হয় কিংবা কষ্ট হয় তাহলে রোযা না রাখাই মুস্তাহাব এবং রোযা রাখা মাকরুহ।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

রোগীর কয়েকটি অবস্থা হতে পারে:

১। রোযা পালনের কারণে যে রোগীর উপর শারীরিক কোন প্রভাব পড়ে না; যেমন-হালকা সর্দি, হালকা মাথাব্যথা, দাঁতে ব্যথা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রোযা ভাঙ্গাজায়েয নয়। যদিও আলেমগণের কেউ কেউ নিম্নোক্ত আয়াতের দলীলের ভিত্তিতে বলেছেন যে তার জন্যও রোযা ভাঙ্গা জায়েয।

ومن كان مريضاً...

البقرة: 2

“আর কেউ অসুস্থ থাকলে...” [সূরা বাক্বারাহ, ২ : ১৮৫]

তবে আমরা বলবো- এই হুকুমটি একটি ইল্লত (কারণ) এর সাথে সম্পৃক্ত। আর তাহলো রোযা ভঙ্গ করাটা রোগীর জন্য বেশি আরামদায়ক হওয়া। যদি রোযা রাখলে রোগীর উপর শারীরিক কোন প্রভাব না পড়ে তবে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা নাজায়েয। বরং তার উপর রোযা রাখা ওয়াজিব।

২। যদি রোগীর উপর রোযা রাখা কষ্টকর হয়; কিন্তু ক্ষতিকর না হয়। এমন রোগীর জন্য রোযা রাখা মাকরুহ। রোযানা-রাখা তার জন্য সুন্নত।

৩। যদি রোযা রাখা তার জন্য কষ্টকর ও ক্ষতিকর হয়। যেমন যে ব্যক্তি কিডনিরোগে আক্রান্ত কিংবা ডায়াবেটিকস রোগে আক্রান্ত কিংবা এ ধরনের অন্য কোনরোগ; রোযা রাখা যে রোগের জন্য ক্ষতিকর-- এমন রোগীর জন্য রোযা রাখা হারাম।

এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা রোযা রাখতে অতি উৎসাহী রোগীদের ভুল জানতে পারি রোযা রাখা যাদের জন্য কষ্টকর; হতে পারে ক্ষতিকর; কিন্তু তদুপরি তারা রোযাভাঙ্গতে রাজি নয়।

আমরা বলব: তারা ভুল করেছেন। যেহেতু তারা আল্লাহর দয়া ও আল্লাহর দেয়াছাড়কে গ্রহণ করেননি এবং নিজেদের ক্ষতি করেছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন: "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না"। [সূরা নিসা, ৪:২৯] [আশ্-শারহুলমুমতি (৬/৩৫২)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী নিম্ন রক্তচাপ (Low Blood Pressure) এ ভুগছেন। যে রোগ তাকে শারীরিকভাবে দুর্বল করে দিচ্ছে এবং রোযা রাখার ক্ষেত্রে বাধা হচ্ছে। যদি সে রোযা রাখে তাহলে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে; এমনকি বেহুঁশ হওয়ার অবস্থা হয়ে যায়। রোযাগুলো কাযা পালন করার ক্ষেত্রে তার উপর কি করা আবশ্যিক। যে কি গরীবদেরকে খাদ্য দেয়ার জন্য কিছু অর্থ পরিশোধ করবে? যদি সেটা করা যায় তাহলে কি সে ঐ অর্থ একটা ইসলামী দাতব্য সংস্থাকে দিতে পারবে; যারা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিম দেশে মুসলমানদের জন্য খাদ্য ও সহযোগিতা সরবরাহ করে থাকে। কারণ আমার স্ত্রী বিশ্বের এমন এক উন্নত দেশে থাকেন যেখানের গরীবদেরকে মুসলিম দেশগুলোতে বসবাসকারীদের সাথে তুলনা করলে তারাও ধনী লোক হিসেবে গণ্য হবেন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

এ রোগটি যদি দীর্ঘস্থায়ী রোগ না হয় এবং সুস্থ হওয়ার আশা থাকে; তাহলে তিনি সুস্থ হওয়ার অপেক্ষা করবেন এবং যে দিনগুলোর রোযা রাখতে পারেননি সেদিনগুলোর রোযা কাযা পালন করবেন।

আর যদি রোগটি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সুস্থ হওয়ার আশা না থাকে; তাহলে তার উপর থেকে কাযা পালনের আবশ্যিকতা মওকুফ হয়ে যাবে এবং রমযান মাসের প্রতিদিনের বদলে একজন করে মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজিব হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহকে এমন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে ব্যক্তিরোযা রাখতে গেলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। জবাবে তিনি বলেন: যদি রোযা রাখা তার জন্য ধরণের রোগের কারণ হয় তাহলে সে রোযা না রেখে কাযা পালন করবেন। যদি যে কোনসময় রোযা রাখলেই তার এ অবস্থা হয় তাহলে তিনি রোযা পালনে অক্ষম হিসেবে গণ্য হবেন এবং প্রতিদিনের বদলে একজন করে মিসকীন খাওয়ানো। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৫/২১৭) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"অক্ষম ব্যক্তির উপর রোযা ফরয নয়। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে সে অন্য দিনগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে"। [সূরা বাক্বার, ২:১৮৫]

তবে গবেষণার মাধ্যমে এটা পরিষ্কার যে, অক্ষমতা দুই প্রকার: সাময়িক অক্ষমতা ও স্থায়ী অক্ষমতা। সাময়িক অক্ষমতা হল: যা দূর হওয়ার আশা রয়েছে। আয়াতে সে অক্ষমতার কথায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, অক্ষম ব্যক্তির অক্ষমতা দূর হলে সে রোযাগুলো কাযা করবে। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন: "সে অন্য দিনগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে"। আর স্থায়ী অক্ষমতা হল যা দূর হওয়ার আশা নেই। এমন ব্যক্তির ওপর প্রতিদিনের বদলে একজন করে মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজিব। [আল-শারহুলমুমতি (৬/৩২৪-৩২৫) সমাপ্ত]

দুই:

রোযার কাফফারা হিসেবে যে পরিমাণ খাদ্য দেয়া ওয়াজিব: প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্য দেওয়া। এর পরিমাণ হচ্ছে-- স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রধান খাদ্যদ্রব্যের অর্ধ সা'। অর্ধ সা'-এর ওজন প্রায় দেড় কিলোগ্রাম।

ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়িমা, প্রথম খণ্ডে (১০/১৬৭) এসেছে: "আপনি যেকয়দিনের রোযা রাখেননি সে কয়দিনের প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্যফিদিয়া হিসেবে প্রদান করলে হবে। একদিনের খাদ্যের পরিমাণ হচ্ছে অর্ধ'সা'। অর্থাৎ প্রায় দেড় কিলোগ্রাম চাল, গম বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য সাধারণতস্থানীয়রা যে খাদ্য খেয়ে থাকে।"[সমাপ্ত]

তিন:

এমন মিসকীনকে খাওয়ানো ওয়াজিব যে মিসকীনের কাছে তার নিত্যদিনের প্রয়োজনীয়খাদ্য নেই। তাই আপনাদের দেশে যদি মিসকীন না থাকে তাহলে অন্য যে দেশে মিসকীন আছে সেখানে খাদ্য প্রদান করার জন্য কাউকে দায়িত্ব দেয়া জায়েয হবে। আমরা যতটুকু পারি আল্লাহ্ আমাদেরকে ততটুকু পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে আপনারা যে দেশে থাকেন সে দেশের চেয়ে যদি অন্য কোন দেশে ক্ষুধাগ্রস্ততা ও প্রয়োজন বেশি হয় তাহলে কাফফারা ও সদকা সেই দেশে স্থানান্তরিত করা জায়েয আছে।

আরও জানতে দেখুন: [4347](#)নং ও [43146](#)নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি এমন একটি পাকস্থলির রোগে আক্রান্ত যে, আমার মুখে তরল পদার্থ জমলে পাকস্থলি থেকে খাদ্য বেরিয়ে আসে। রমযান মাসে আমার এমনটি ঘটেছে। আমাকে কি রোযার কাযা পালন করতে হবে?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

যদি রোযাদারের পাকস্থলি থেকে কোন কিছু মুখে চলে আসে তাহলে রোযাদারের কর্তব্য হচ্ছে সেটা থু দিয়ে ফেলে দেয়া। যদি রোযাদার ইচ্ছাকৃতভাবে সেটা গিলে ফেলে তাহলে রোযা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলে তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। আল্লাহ্‌ই উত্তম তাওফিক দাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীবর্গের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। [সমাপ্ত]

ফতোয়া ওগবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ আব্দুল আযিয আলে শাইখ, শাইখ আব্দুল্লাহ্‌ গুদইয়ান, শাইখ বাকর আবু যাইদ

প্রশ্ন

আমি ডায়াবেটিক্‌স এর রোগী; প্রতিদিন দুইবার ইনসুলিন নিতে বাধ্য। এ কারণে আমি রোযা রাখি না। নগদ অর্থ দিয়ে ফিদিয়া পরিশোধ করি। যে পরিমাণ অর্থ দিয়ে আমি ইফতার করি সে পরিমাণ অর্থপ্রদান করি। এ পদ্ধতিতে ফিদিয়া দেয়া কি জায়েয হবে, অর্থাৎ নগদ অর্থ দিয়ে? আমি বিবাহিত নই বিধায় রেস্টুরেন্টে ইফতার করি। আমি এই ফিদিয়া কি তিনজন বাততোধিক মিসকীনের মাঝে ভাগ করে দিতে পারব? কারণ ইফতার নেওয়ার মত কোন গরীবলোক আমি খুঁজে পাই না।

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আপনি যদি রোযা রাখারসক্ষমতা রাখেন তাহলে আপনার উপর রোযা রাখা ফরয; রোযা না রেখে ফিদিয়া দেয়া আপনার জন্য জায়েয হবে না। ইনসুলিন গ্রহণ করলে রোযা ভাঙ্গে না। আপনি রোযারেখে ইনসুলিন গ্রহণ করতে পারেন। তাই আপনি যে দিনগুলোর রোযা রাখেননি সেগুলোরকাযা আদায় করা আপনার উপর ফরয। 1319নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

আর যদি রোযা রাখলে আপনার স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হয় কিংবা রোযা রাখা আপনারজন্য খুবই কষ্টকর হয় কিংবা দিনের বেলায় আপনার অন্যান্য ঔষধ খাওয়া প্রয়োজনহয়; তাহলে আপনি রোযা না-রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি যদি ভবিষ্যতে আর কখনওরোযাগুলো কাযা পালন করার সক্ষমতা না রাখেন তখন আপনি প্রতিদিনের বদলে একজনমিসকীনকে খাদ্য দিবেন।

নগদ অর্থ দিয়ে ফিদিয়া আদায় করা জায়েয নয়। বরং খাদ্য দিয়ে ফিদিয়া আদায়করা ফরয। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: অর্থ হচ্ছে- “আর যাদের জন্য সিয়ামকষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়া তথা একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করা।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৪]

আপনার কর্তব্য হচ্ছে মিসকীনদের সন্ধান করা; যাতে করে আপনার উপর আবশ্যকীয়দায়িত্ব আপনি পালন করতে পারেন; কিংবা আপনি এমন কাউকে নগদ অর্থ দিতে পারেনযিনি খাদ্য কিনে আপনার পক্ষ থেকে মিসকীনদের কাছে পৌঁছে দিবে।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

রমযানের রোযা না-রাখাকে বৈধকারী অজুহাতগুলো কি কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নিঃসন্দেহে আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য সহজীকরণ হচ্ছে, তিনি শুধুমাত্র তাদের উপররোযা রাখা ফরয করেছেন যাদের রোযা রাখার সক্ষমতা আছে এবং শরিয়ত অনুমোদিতওজরের ভিত্তিতে রোযা না-রাখাকেও বৈধ করেছেন। যেসব শরিয়ত ওজরের কারণে রোযানা-রাখা বৈধ সেগুলো হচ্ছে:

এক: রোগ:

রোগ মানে হচ্ছে, এমন সব অবস্থা যার কারণে ব্যক্তি সুস্থতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়।

ইবনে কুদামা বলেন: রোগের কারণে রোযা না-রাখা বৈধ হওয়া মর্মেআলেমগণেরইজমা সংঘটিত হয়েছে। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “আর তোমাদের মধ্যে যেব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণকরবে।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫] সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনিবলেন: যখন

وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِّنْكَ

(অর্থ- আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়াদেয়া তথা একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা।) শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হয়, তখনআমাদেরকে এ মর্মেইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে রোযা রাখতেপারে, আর কেউ রোযা রাখতে না চাইলে সে ফিদিয়া দিবে। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَمِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

(অর্থ- রমযান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হেদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়ামপালন করে। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এসংখ্যা পূরণ করবে।) নাযিল হল, তখন ফিদিয়া দেয়ার ইখতিয়ার রহিত হয়েছে-সফম লোকদের ওপর শুধুমাত্র রোযা রাখা জরুরী সাব্যস্ত হয়ে যায়। এআয়াত পূর্বের আয়াতটিকে রহিত করে দেয়। সুতরাং রোযা রাখার কারণে যে অসুস্থ ব্যক্তি তার রোগ বেড়ে যাওয়া, কিংবা আরোগ্য লাভ বিলম্বিত হওয়া কিংবা কোন অঙ্গহানি ঘটায় আশংকা করে তার জন্য রোযা না-রাখা বৈধ। বরং রোযা না-রাখাই সুন্নত; রোযা রাখা মাকরুহ। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে রোযা রাখার পরিণতি মৃত্যুও হতে পারে। সুতরাং এর থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যিক। অতএব, জেনে রাখুন, রোগের কষ্ট ব্যক্তিকে রোযা না-রাখার বৈধতা দেয়। পক্ষান্তরে, সুস্থ ব্যক্তি যদি কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভব করেন, তদুপরি তার জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়েয নয়। অর্থাৎ যদি রোযা রাখার কারণে শুধু ক্লান্তির কষ্ট হয় সেক্ষেত্রে।

দুই: সফর:

যে সফরে রোযা না-রাখা বৈধ সে সফরের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে:

ক. এমন দীর্ঘ সফর হওয়া, যে সফরে নামায কসর করা যায়।

খ. সফরকালীন সময়ের মধ্যে মুকীম হয়ে যাওয়ার সংকল্প না করা।

গ. এ সফর কোন গুনার কাজে না হওয়া। বরং জমছুর আলেমের নিকট স্বীকৃত কোন উদ্দেশ্য সফর করা। কেননা, রোযা না-রাখার অনুমতি একটি রুখসত (ছাড়) ও সহজীকরণ। তাই পাপে লিপ্ত ব্যক্তি এ সুযোগ পেতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ: কারো ভ্রমণের ভিত্তি যদি গুনার উপর হয়; যেমন- ডাকাতি করার জন্য সফর করা।

(কোন ক্ষেত্রে সফরের অনুমোদিত রুখসত (ছাড়) প্রযোজ্য হবে না)

সর্বসম্মতিক্রমে দুইটি কারণে সফর অবস্থার ছাড় প্রযোজ্য হবে না:

১। যদি মুসাফির তার নিজ দেশে ফেরত আসে ও নিজ এলাকায় প্রবেশ করে; যে এলাকায় সে স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

২। যদি মুসাফির ব্যক্তি কোন স্থানে সাধারণভাবে স্থায়ীভাবে থাকার নিয়ত করে, কিংবা মুকীম সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার মত সময়কাল অবস্থান করার নিয়ত করেন এবং সে স্থানটি অবস্থান করার উপযুক্ত স্থান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি মুকীম হয়ে যাবেন। তখন তিনি নামাযগুলো পরিপূর্ণ সংখ্যায় আদায় করবেন, রোযা রাখবেন; রোযা ছাড়বেন না; যেহেতু তার সফরের হুকুম শেষ হয়ে গেছে।

তিন: গর্ভধারণ ও দুধ পান করানো

ফিকাহ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ একমত যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধ-দানকারিণী নারীর জন্য রমযানের রোযা না-রাখা বৈধ; এই শর্তে যে তারা নিজেদের কিংবাসন্তানের অসুস্থতার কিংবা রোগ বৃদ্ধির, কিংবা ক্ষতির কিংবা মৃত্যুর আশংকাকরে। এই রুখসত বা ছাড়ের পক্ষে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “আর যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে কিংবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।” এখানে রোগ দ্বারা যে কোন রোগ উদ্দেশ্য নয়; কেননা যে রোগের কারণে রোযা রাখতে অসুবিধা হয় না সে রোগের কারণে রোযা ভাঙ্গার অবকাশ নেই। এখানে রোগ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রোযা রাখলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। রোগ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। এখানে এ অর্থ পাওয়া গেছে। তাই এ বিষয়দ্বয় রোযা না-রাখার অবকাশের আওতায় পড়বে। আরেকটি দলিল হচ্ছে আনাস বিন মালিক আল-কা'বি (রাঃ) এর হাদিস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে রোযা ও অর্ধেক নামায মওকুফ করেছেন এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী নারীর উপর থেকে রোযা মওকুফ করেছেন। হাদিসের অন্য একটি রেওয়াজে *الحامل أو المرضع* শব্দের পরিবর্তে *الحبلى و المرضع* শব্দদ্বয় এসেছে।

চার: বার্থক্য ও জরাগ্রস্ততা:

বার্থক্য ও জরাগ্রস্ততা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে:

জ্বরাগ্রস্ত বৃদ্ধ: যার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে কিংবা তিনি নিজে মৃত্যুর উপক্রম, প্রতিদিন ক্ষয় হতে হতে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

এমন রুগ্ন ব্যক্তি যার সুস্থতার কোন আশা নেই; তার ব্যাপারে সবাই হতাশ।

এছাড়া বয়স্ক বৃদ্ধা।

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের রোযা না-রাখার পক্ষে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী, “আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়াতথা একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৪] ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াতে কারীমা রহিত হয়ে যায়নি। এ আয়াতে কারীমা (এর বিধান) বয়স্ক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার ক্ষেত্রে; যারা রোযা রাখতে পারেন না, তারা রোযার পরিবর্তে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাদ্য দিবেন।

পাঁচ: ক্ষুধা ও তৃষ্ণার ফলে অস্বাভাবিক দুর্বলতা:

তীব্র ক্ষুধা কিংবা প্রচণ্ড তৃষ্ণা যাকে অস্বাভাবিক দুর্বল করে ফেলেছে; সেই ব্যক্তি তার জীবন বাঁচানোর পরিমাণ খাদ্য খাবে এবং সে দিনের অবশিষ্টাংশ উপবাস কাটাতে। আর এ রোযাটি কাযা পালন করবে।

ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অস্বাভাবিক দুর্বলতার সাথে আলেমগণ শত্রুর সাথেসম্ভাব্য কিংবা সুনিশ্চিত মোকাবিলার ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়াকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন; যেমন শত্রুর দ্বারা অপরূদ্ধ হলে: যদি গাজী (যোদ্ধা) ব্যক্তি সুনিশ্চিতভাবে কিংবা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে যুদ্ধের বিষয়টি জানেন যেহেতু তিনি শত্রুর মোকাবিলাতে রত রয়েছেন এবং রোযা রাখার কারণে শারীরিক দুর্বলতার আশংকা করেন; অথচ তিনি মুসাফির নন এমতাবস্থায় তার জন্য যুদ্ধের পূর্বে রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয আছে।

ছয়: জ্বরদস্তির শিকার:

জ্বরদস্তি হচ্ছে: শাস্তির হুমকি দেওয়ার মাধ্যমে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোন কাজ করতে কিংবা না- করতে বাধ্য করা; যে ব্যাপারে সে ব্যক্তি নিজে থেকে রাজি নয়।

প্রশ্ন

আমার একজন বান্ধবী আছে, সে মাইগ্রেন (এক ধরণের মাথাব্যথা) রোগের কারণে রোযা রাখে না। এটা কি জায়েয? সে যে দিনগুলোর রোযা ভেঙ্গেছে সে রোযাগুলো কিভাবে কাযা করবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলার বাণী “আর যেব্যক্তি অসুস্থ অথবা যে ব্যক্তি সফরে আছে সে ব্যক্তি অন্য দিনগুলোতে (রোযার) সংখ্যা পূরণ করবে।” [২ আল-বাক্বারা হ : ১৮৫] এর ভিত্তিতে রোগীর জন্য রমযানের রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে। তবে, এ অবকাশ কঠিন রোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; যে রোগের কারণে রোযা রাখা কষ্টকর। পক্ষান্তরে, যে রোগের কারণে রোযা রাখা কষ্টকর হয় না সে রোগ রোযা না রাখার ক্ষেত্রে ওজর হিসেবে ধর্তব্য হবে না।

সূতরাং মাথাব্যথার কারণে যদি তার জন্য রোযা রাখা খুব কষ্টকর হয়ে যায়; তাহলে তার জন্য রোযা ভাঙ্গা ও রমযানের পরে সে রোযাগুলোর কাযা পালন করাজায়েয হবে। আর যদি মাথাব্যথা অব্যাহত হতে এবং এ কারণে সে রোযাগুলোর কাযাপালন করতে না পারে সে ক্ষেত্রে সে প্রতিদিনের রোযার বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

গত বছর আমি কিছু শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলাম। যারফলে আমার ওজন অনেক কমে গিয়েছিল; ডাক্তারের পরামর্শের ভিত্তিতে আমি গোটা মাসরোযা রাখতে পারিনি। এ বছর আমি সে সব রোগ থেকে সুস্থ হয়েছি। কিন্তু আমার ওজন এখনও আগের মত আছে। আমার বাবা-মা এবং তাঁদের কাছের বন্ধুবান্ধব আমাকে রোযানা-রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। এ নিয়ে আমি তাঁদের দুইজনের সাথে বাকবিতণ্ডাকরেছি। কারণ আমি অনুভব করছি যে, আমি যতটুকু সুস্থ আছি তাতে আমি রোযা রাখতে পারব। আমার মা মহল্লার ইমামকে টেলিফোন করে আমার অবস্থা বলেছেন। ইমাম সাহেব বলেছেন: যেহেতু আমার ওজন এখনও আদর্শ ওজনের পর্যায়ে আসেনি তাই আমার রোযারাখা ঠিক হবে না। এমতাবস্থায় আমি কি তাদের উপদেশ শুনব এবং পরিপূর্ণ সুস্থ হলে রোযাগুলো কাযা করব? নাকি আমি যে অবস্থায় আছি সে অবস্থায় রোযা রাখব?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন, আপনাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন।

আপনার উচিত হবে, আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া; যিনি ইতিপূর্বে আপনার চিকিৎসা করেছেন। যদি ডাক্তার রোযা রাখার ক্ষেত্রে আপনার সক্ষমতা নিশ্চিত করে এবং রোযা রাখা আপনার স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক কোন প্রভাব ফেলবে না, আপনার সুস্থতা বিলম্বিত হবে না তাহলে আল্লাহ চাহতে আপনি ও আপনার পিতামাতা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবেন। এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে আপনি রোযা রাখা শুরু করতে পারবেন।

পক্ষান্তরে, ডাক্তার যদি মনে করেন, রোযা রাখা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কঠিন হবে, এতে করে আপনার স্বাস্থ্যগত কিছু সমস্যা হবে তাহলে রোযা না-রাখা আপনার জন্য উত্তম। রমযানের পরে আপনি সুস্থ হয়ে রোযা রাখতে পারবেন।

আল-দিরদিরমালিকী (রহঃ) বলেন:

যদি রোগ সম্পর্কে অবহিত কোন ডাক্তার ধারণা করেন যে, রোযা রাখলে রোগ বাড়বে কিংবা সুস্থতা বিলম্বিত হবে তাহলে রোযা না-রাখা জায়েয। অনুরূপভাবে রোযা রাখলে যদি রোগী খুব ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রেও। [আল-শারহুলকাবির (১/৫৩৫) থেকে সমাণ্ড]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: রোগ বেড়ে যাওয়া কিংবা সুস্থতা বিলম্বিত হওয়ার ভয় থাকলে রোযা না-রাখা জায়েয। সুতরাং রোগ বেড়ে যাওয়া কিংবা রোগমুক্তি বিলম্বিত হওয়ার আশংকা হলে, কিংবা রোযা রাখলে রোগী ক্লান্ত হয়ে পড়লে— একারণগুলোর কারণে রোযা না-রাখা বৈধ।

পক্ষান্তরে, রোযার উপর যে রোগের কোন প্রভাব নেই, যেমন দাঁত ব্যাথা, আঙ্গুলের ব্যাথা ইত্যাদির কারণে রোযা না-রাখা জায়েয নেই; যতক্ষণ না এগুলোর কারণে ভিন্ন কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়। শুধু দাঁত ব্যাথার কারণে যদি কেউ রোযা না-রাখে এতে তা তার কোন সুবিধা নেই। তবে, ডাক্তার যদি বলে, আপনি রোযা না-রেখে খাওয়া-দাওয়া করেন এতে করে, আপনার দাঁতব্যাথা, মাড়ির ব্যাথা হালকা হবে— তাহলে আমরা বলব: অসুবিধানেই। কারণ অনেক সময় খাদ্যের কমতি রোগের দীর্ঘ সূত্রিতা, ব্যাথা ও চোখের ব্যাথার কারণ হয়। অর্থাৎ রোযারাখাটা যদি রোগের উপর প্রভাব ফেলে তাহলে সে রোযা না-রাখতে পারে। আর যদি প্রভাব না ফেলে তাহলে রোযা ভাঙ্গবেনা। [তালিকাতআলাল কাফি (৩/১২৩) থেকে সমাণ্ড]

কেবল আদর্শ ওজনের চেয়ে ওজন কম থাকা রোযা না-রাখার কারণ নয়। বরং রোযার কারণে কি ধরণের কষ্ট ও ক্লান্তি বা ক্ষতি আরোপিত হয় সেটা দেখতে হবে। খাদ্যের যে ঘাটতি সেটা রাতের খাবারের মাধ্যমে পূরণ করা কি সম্ভব, নাকি সম্ভব নয়; সেটাও দেখতে হবে। সুতরাং একজন বিশ্বস্ত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এবং ডাক্তার যে পরামর্শ দিবেন আপনি সেটা মেনে চলতে পারেন। আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন [140246](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

যে শিশু বালেগ হওয়ার আগে থেকে রমজানের রোজা পালন করত। রমজান মাসের দিনের বেলায় সে বালেগ হল। তাকে কি সেইদিনের রোজা কাযা করতে হবে? একইভাবে রমজান মাসে দিনের বেলা যে কাফের ইসলামগ্রহণ করল, যে নারী হায়েয থেকে পবিত্র হল, যে পাগল জ্ঞান ফিরে পেল, যে মুসাফির রোজা না-রাখা অবস্থায় স্বগৃহে ফিরে আসল, যে অসুস্থ ব্যক্তি রোজা ছিল না, কিন্তু সে সুস্থ হয়ে উঠল - এ সমস্ত ব্যক্তির জন্য সেই দিনের বাকি অংশ রোজা ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ থেকে বিরত থাকা ও সেদিনের রোজার কাযা আদায় করা কি ওয়াজিব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের সবার ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাপারে আমরা আলেমগণের মতভেদ ও তাদের বক্তব্য (49008) নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করেছি।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের দুটি গ্রুপে ভাগ করা যেতে পারে :

১) কোন শিশু যদি বালেগ হয়, কোন কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে, কোন পাগল যদি জ্ঞান ফিরে পায়- তবে তাদের সবার হুকুম এক। সেট হল- ওজর বা অজুহাত চলে যাওয়ার সাথে সাথে দিনের বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী সমস্ত মুফাতিরাতে হতে বিরত থাকা ওয়াজিব। কিন্তু তাদের জন্য সেই দিনের রোজা কাযাকরা ওয়াজিব নয়।

২) অপরদিকে হায়েয গ্রস্ত নারী যদি পবিত্র হয়, মুসাফির ব্যক্তি যদি স্বগৃহে ফিরে আসে, অসুস্থ ব্যক্তি যদি আরোগ্য লাভ করে- এদের সবার হুকুম এক। এদের জন্য রোজা ভঙ্গকারী মুফাতিরাতে হতে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়। কারণ বিরত থাকতে তাদের কোন লাভ নেই। যেহেতু সেই দিনের রোজা কাযা করা তাদের উপর ওয়াজিব।

প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য:

প্রথম গ্রুপের মধ্যে তাকলিফের তথা শরয়ি ভার আরোপের সকল শর্তপাওয়া গেছে। শর্তগুলো হচ্ছে- বালেগ হওয়া, মুসলিম হওয়া ও আকল (বুদ্ধি)সম্পন্ন হওয়া। যখন থেকে তাদের উপর শরয়ি ভার আরোপ সাব্যস্ত হয়েছে তখন থেকে মুফাতিরাতে তথা রোজা ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থাকা তাদের উপর ওয়াজিব; কিন্তু সেই দিনের রোজা কাযা আদায় করা তাদের উপর ওয়াজিব নয়। কারণ যখন থেকে তাদের উপর মুফাতিরাতে (রোজা ভঙ্গকারী বিষয়) হতে বিরত থাকা ওয়াজিব হয়েছে তখন থেকে তারা তা থেকে বিরত থেকেছে। এর আগে তো তারা রোজা পালনের ব্যাপারে মুকাল্লাফ (ভারপ্রাপ্ত) ছিল না।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় গ্রুপটি সিয়াম পালনের ব্যাপারে আইনতঃ মুকাল্লাফ ছিল। তাই তা পালন করা তাদের উপর ওয়াজিব ছিল। তবে তাদের শরয়িত অনুমোদিত ওজর থাকায় তাদেরকে রোজা না-রাখার বৈধতা দেয়া হয়েছে। এ ধরনের ওজর হচ্ছে- হায়েয, সফর ও রোগ। এসব ওজরের কারণে আল্লাহ রোজার বিধান তাদের জন্য কিছুটা সহজ করেছেন এবং রোজা না-থাকা তাদের জন্য বৈধ করেছেন। উল্লেখিত ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি রমজানের দিনের বেলায় বে-রোজদার থাকতে এ মাসের পবিত্রতা বিনষ্টকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। যদি রমজানের দিনের বেলায় তাদের ওজর দূর হয়ে যায় তবুও দিনের বাকী সময়টা রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে তাদের কোন লাভ নেই। কারণ রমজান মাসের পরে তাদেরকে সেই দিনের রোযা কাযা করতে হবে।

শাইখ মুহাম্মদ বিন সালেহ উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

“ যদি কোন মুসাফির রোজা না-রাখা অবস্থায় স্বগৃহে ফিরে আসে তবেতার জন্য রোজা ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়; দিনের বাকী সময়ে পানাহার করা তার জন্য বৈধ। যেহেতু তাকে এই দিনের রোজা কাযা করতে হবে। তাই এই দিনের অবশিষ্টাংশে পানাহার থেকে বিরত থেকে কোন লাভ নেই। এটাই সঠিকমত। এটি ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ীর অভিমত এবং ইমাম আহমাদ থেকে দুইটি বর্ণনার একটি। তবে সে ব্যক্তির প্রকাশ্যে পানাহার করা উচিত নয়।” সমাপ্ত [মাজমুফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৫৮ নং প্রশ্ন)]

তিনি আরও বলেন:

"কোন হাযেযগ্রস্ত নারী অথবা নিফাসগ্রস্ত নারী দিনের বেলায় পবিত্র হলে তাদের জন্য রোজা ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়। তিনি পানাহার করতে পারেন। কারণ তার বিরত থাকায় কোন লাভ নেই। যেহেতু সেইদিনের রোজা তাকে কাযা করতে হবে। এটি ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ীর অভিমত ও ইমামআহমাদ থেকে বর্ণিত দুইটি অভিমতের একটি। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন:

من أكل أول النهار فليأكل آخره

"দিনের প্রথম অংশে যে ব্যক্তি খেয়েছে দিনের শেষভাগেও সে খেতেপারে।" অর্থাৎ যার জন্য দিনের প্রথম অংশে রোজা ভঙ্গ করা জাযেয তাঁর জন্যদিনের শেষ অংশেও রোজা ভঙ্গ করা বৈধ।" সমাপ্ত [মাজমূ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনেউছাইমীন (১৯/৫৯) নং প্রশ্ন]

শাইখ উছাইমীনকে আরও প্রশ্ন করা হয়েছিল:

যে ব্যক্তি রমজান মাসের দিনের বেলায় শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে রোজা ভেঙ্গেছে ওজর দূর হয়ে যাওয়ার পর সে দিনের বাকি সময়ে পানাহার করাকি তার জন্য জাযেয হবে?

তিনি উত্তরে বলেন:

"তার জন্য পানাহার করা জাযেয। কারণ সে শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে রোজা ভঙ্গ করেছে। শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে রোজা ভঙ্গ করায় তার ক্ষেত্রে রমজানের দিবসের পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব থাকে না। তাই সেপানাহার করতে পারে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি রমজান মাসের দিনের বেলায় কোন শরিয়ত ওজর ছাড়া রোজা ভঙ্গ করেছে তার অবস্থা ভিন্ন। তার ক্ষেত্রে আমরা বলব: দিনের বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত থাকা তার জন্য ওয়াজিব। যদিও এরোজার কাযা পালন করাও তার উপর ওয়াজিব। এই মাসমালা দুইটির পার্থক্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।" সমাপ্ত। [মাজমূ ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনেউছাইমীন (১৯/৬০) নং প্রশ্ন]

তিনি আরও বলেন:

"সিয়াম বিষয়ক গবেষণা পত্রে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোন নারীর যদি হাযেয হয় এবং (রমজান মাসে) দিনের বেলায় তিনি পবিত্র হন তবে সেই দিনের বাকী অংশে তাকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে কি- এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন।

আমরা বলব: এ মাসমালায় ইমাম আহমাদ রাহিমাল্লাহু থেকে দুটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ থেকে সর্বজনবিদিত মত হল- দিনের বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী সমস্ত মুফাতিরাত থেকে বিরত থাকা সে নারীর উপর ওয়াজিব। সুতরাং সে পানাহার করবে না।

দ্বিতীয় মত হচ্ছে- তার জন্য মুফাতিরাত থেকে বিরত থাকাওয়াজিব নয়। তাই পানাহার করা তার জন্য জাযেয। আমরা বলব: এই দ্বিতীয় মতটিইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এরও অভিমত। এটি ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণিত। তিনি বলেন:

من أكل أول النهار فليأكل آخره

"যে ব্যক্তির জন্য দিনের প্রথম অংশে খাওয়া বৈধ তার জন্য দিনের শেষ অংশেও খাওয়া বৈধ।"

আমরা আরও বলব ভিন্ন মত আছে এমন মাসমালায় ক্ষেত্রে তালিবে ইলমের কর্তব্য হল দলিলগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং তার কাছে যে মতটি অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হয় সে মতটি গ্রহণ করা। আর দলিল যেহেতু তার পক্ষে রয়েছে সেহেতু ভিন্ন মতাবলম্বী ভিন্নমতের প্রতি ক্রক্ষেপ না করা। কারণ আমরা রাসূলকে অনুসরণ করার ব্যাপারে আদিষ্ট। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

"যেদিন তাদেরকে ডেকে বলবেন:তোমরা রাসূলগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে?" [২৮ সূরা আল-কাস্বাস্ব : ৬৫]

ভিন্ন মতাবলম্বীগণ একটা সহিহ হাদিস দিয়ে দলিল দেয়। সেটাহেছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনের মধ্যভাগে 'আশুরা'-র রোজাপালনের আদেশ দিয়েছিলেন। তখন সাহাবীরা দিনের বাকি অংশ রোজা-ভঙ্গকারী বিষয়থেকে বিরত থেকেছেন। আমরা বলব, এই হাদিসে তাদের পক্ষে কোন দলিল নেই। কারণ 'আশুরা'-র রোজা পালনের ক্ষেত্রে 'প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া' (হায়েয, নিফাস, কুফর ইত্যাদি)-র কোন ব্যাপার ছিল না। বরং সেক্ষেত্রে 'নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর' ব্যাপার ছিল।

'প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া' ও 'নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর' মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর' অর্থ হল- যে কারণে কোন বিধান আবশ্যকীয় হয় সে কারণ উপস্থিত হওয়ার আগে সেই হুকুমটি সাব্যস্ত হয়না। পক্ষান্তরে 'প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার' অর্থ হল- বিধান সাব্যস্ত আছে; কিন্তু প্রতিবন্ধকতা থাকায় সেটা বাস্তবায়ন করা যায় না। বিধান ওয়াজিব হওয়ারকারণ পাওয়া গেলেও এই প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতিতে বিধানটি পালন করা শুদ্ধ হবেনা।

এই মাসয়ালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য একটি মাসয়الا হলো- যেক্ষেত্রে রমজান মাসে দিনের বেলায় ইসলাম গ্রহণ করল তাঁর ক্ষেত্রে রোজার দায়িত্ব তার উপর নতুনভাবে বর্তাল।

এ রকম আরো একটি উদাহরণ হল- কোন নাবালেগ যদি রমজান মাসে দিনেরবেলায় সাবালক হয় এবং সে বে-রোজদার থাকে তবে তার ক্ষেত্রেও রোজার দায়িত্বটি নতুনভাবে বর্তায়।

তাই যে ব্যক্তি দিনের বেলায় ইসলাম গ্রহণ করেছে আমরা তাঁকেবলব: দিনের বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকা আপনার উপর ওয়াজিব। তবে এ রোজাটি আর কাযা করা আপনার উপর ওয়াজিব নয়।

অনুরূপভাবে রমজান মাসের দিনের বেলায় যে নাবালেগ বালেগ হয়েছেআমরা তাকে বলল: দিনের বাকী অংশে রোজা ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকাতোমরা উপর ওয়াজিব। তবে এ রোজাটি কাযা করা তোমার উপর ওয়াজিব নয়।

কিন্তু রমজানের দিনের বেলায় যে ঋতুবতী নারী পবিত্র হয়েছে তারক্ষেত্রে বিধানটি ভিন্ন। আলেমগণের ইজমা তথা সর্বসম্মত মত হচ্ছে- তার উপর রোজাটি কাযা করা ওয়াজিব। ঋতুবতী নারী যদি রমজানের দিনের বেলায় পবিত্র হয় তাহলে দিনের বাকী অংশ রোজা ভঙ্গকারী বিষয়াদি থেকে বিরত থাকায় তার কোনো উপকারে হবে না, এই বিরত থাকাকাটা রোজা হিসেবে গণ্য হবে না। বরং তাকে রোজাটি কাযা করতে হবে। এ ব্যাপারে আলেমগণ ইজমা করেছেন।

এই আলোচনার মাধ্যমে 'নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানো' ও 'প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া' এর মধ্যে পার্থক্য জানা গেল। সুতরাং হায়েযগ্রস্ত নারী রমজানের দিনের বেলায় পবিত্র হওয়ার মাসয়الاটি 'প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হওয়া' শ্রেণীর মাসয়الا। পক্ষান্তরে কোন শিশুর বালেগ হওয়া অথবা প্রশ্নকারীর উল্লেখিত রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে 'আশুরা' দিনের রোজা ফরজ হওয়া- এর মাসয়الاটি 'নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানো' শীর্ষক মাসয়الا। আল্লাহইতাওফিক দাতা। " সমাপ্ত।

[মাজমূ ফাৎওয়া আশ-শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৬০ নং প্রশ্ন)]

প্রশ্ন :

আমার বাবা চোয়ালের ব্যাঘ্য আক্রান্ত রোগী। ডাক্তার তাকে চোয়ালের নড়াচড়ার সচলতা বজায় রাখতে চুইংগাম খেতে বলেছেন। তাঁর সিয়াম পালনকালীন সময়ে কিচুইংগাম খাওয়া ঠিক হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

চুইংগাম চিবানোর ফলে এর থেকে এক ধরনের পদার্থ নিঃসৃত হয় এবং পেটে চলে যায়। তাই রমজানমাসে দিনেরবেলা রোযাপালনকারীর জন্য এটি ব্যবহারজায়েয নয়। এরবিকল্প হিসেবে চোয়ালের বিশেষ ব্যায়ামদ্বারা এরথেকে বিরত থাকা সম্ভব। আর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে ফজর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শুধু চুইংগাম চিবানো যেতে পারে।

তবে যদি এমন কোন চুইংগাম পাওয়া যায় যাতে এ জাতীয় কোনপদার্থ নেই, যা চিবানোর মাধ্যমে নিঃসৃত হয়- তবে তা চিবানো জায়েয হবে। কারণ তা রোযা পালনকারীর রোযা ভঙ্গ করবে না। যেহেতু এর কোন অংশ পাকস্থলীতে প্রবেশ করবেনা।

তবে আপনার বাবাকে এই পরামর্শ দেয়া হচ্ছে যে, তিনি যেন তা মানুষের সামনে না চিবান; যাতে করে যারা তাঁর অবস্থা ও ওজর সম্পর্কে অবগত নন এমন কোন ব্যক্তি তাঁর দ্বীনদারির ব্যাপারে দোষারোপ না করে। আর যদি এধরনের চুইংগাম না পাওয়া যায় অথবা আপনার বাবার দিনের বেলায় প্রচলিত চুইংগাম চিবানোর দরকার হয় এবং তা না করার কারণে যদি সুস্থতা বিলম্বিত হয় অথবা রোগ বেড়ে যায় তবে রমজান মাসে তাঁর জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। এক্ষেত্রে তিনি রোযাভঙ্গ করা দিনগুলোর রোযা পরবর্তীতে কাযা করবেন। এর দলীল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী :

(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة]

“আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরাবাক্বারা, ২:১৮৫]

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

প্রশ্ন :

আমার বাবা মারা গেছেন। তিনি মারা যাওয়ার আগের বছর রোগের কারণে রমজানের দুইদিনের রোযা রাখতে পারেননি। তিনি শাওয়াল মাসে মারা যান। তিনি বলেছিলেন যে, এই দুই দিনের রোযার পরিবর্তে তিনি মিসকীন খাওয়াবেন। এখন এর হুকুম কী এবং আমাদের উপরই বা কী করা ওয়াজিব? আমরা কি তার পক্ষ থেকে রোযা পালন করব এবং ফিদিয়া দিব, নাকি শুধু ফিদিয়া দিব? উল্লেখ্য যে, আমরা জানি না তিনি কি এই দুই দিনের পরিবর্তে ফিদিয়া দিয়েছিলেন অথবা রোযা রেখেছিলেন। তিনি ডায়াবেটিকসরোগে আক্রান্ত ছিলেন বিধায় খুব কষ্ট করে রমজান মাসে রোযা পালন করতেন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যদি আপনাদের বাবা বিগত রমজানের সিয়াম কাযা করতে সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী রমজান আসা পর্যন্ত এর কাযা আদায়ে অবহেলা করে থাকেন এবং এরপরে তিনি মারা যান, তবে আপনাদের জন্য উত্তম হল সেই দুই দিনের কাযা আদায় করা। এব্যাপারে দলীল হলো-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: “যেব্যক্তি তার জিম্মায় সিয়াম পালন বাকি রেখে মারা গেছে তার পক্ষ থেকে তার ওলি (আত্মীয়-পরিজন) রোযা পালন করবে।” [সহীহবুখারী (১৮৫১) ও সহীহ মুসলিম (১১৪৭)]

আর আপনারা যদি তাঁর পক্ষ থেকে স্থানীয় খাদ্যের এক স্বা' (প্রায় ৩ কিঃগ্রাঃ এর সমান) পরিমাণ খাদ্য কোন মিসকীনকে দান করেন তবে সেটাও যথেষ্ট হবে।

আর যদি পরবর্তী রমজান আসার আগে তিনি রোগের কারণে সেই দুই দিনের রোযা কাযা পালনে সক্ষম না হয়ে থাকেন তবে কোন কাযা আদায় করা বা ফিদিয়া আদায় করার প্রয়োজন নেই। কারণ এক্ষেত্রে তিনি দায়িত্ব পালনে কোন অবহেলা করেন নি।

আল্লাহই তাওফিক দাতা। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর রহমত ও শান্তিবর্ষণ করুন।” সমাপ্ত

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন গুদাইইয়ান, শাইখ সালেহ ফাওয়ান, আব্দুল আযীয আল শাইখ, শাইখ বাকর আবু যাইদ । [ফাতাওয়াআল-]

প্রশ্ন:

যে রোগ থেকে স্বভাবতঃ সুস্থতা আশা করা যায় না এমন হৃদরোগের কারণে ডাক্তারেরা জনৈক মহিলাকে রোযা পালন করতে নিষেধ করেছিলেন । তাই তিনি রমজানে রোযা না রেখে প্রতিদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াতেন । এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরো অগ্রগতি হয় । ফলে তাঁর হাটে ভাতের সার্জারি করা সম্ভব হয় এবং আলহামদুলিল্লাহ্, উক্ত সার্জারি সফল হয় । তবে তিনি বেশ কিছুদিন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন ছিলেন । এরপর তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং আল্লাহ্ তাকে গত রমজানে সিয়াম পালনের তাওফিক দেন । এখন তিনি জানতে চাচ্ছেন, যে দিনগুলোতে তিনি রোযা ভঙ্গ করেছিলেন সে ব্যাপারে কি করবেন? তিনি কি সেই দিনগুলোর রোযা কাজা করবেন । তাতে তাঁকে ১৮০ দিন রোযা রাখতে হবে । যা ছয় বছরের রোযার সমান । নাকি তিনি সে সময় রোযার পরিবর্তে যে ফিদিয়া (খাদ্য দান) আদায় করেছিলেন সেটাই তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

“ তিনি রোযা না-রেখে প্রতিদিনের পরিবর্তে যে ফিদিয়া আদায় করেছিলেন সেটাই তাঁর জন্য যথেষ্ট । সেই মাসগুলোর রোযা কাজা করা তাঁর উপর ওয়াজিব নয় । কারণ তিনি শরিয়ত অনুমোদিত ওজরগ্রস্ত (মায়ূর) । সেসময় তাঁর উপর যা ওয়াজিব ছিল তিনি তা পালন করেছেন ।

আল্লাহই তাওফিক দাতা । আল্লাহ্ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর রহমত ও শান্তিবর্ষণ করুন । ” সমাপ্ত

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ীকমিটি । সদস্য: শাইখ আব্দুল আযিয ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে বায, শাইখ আবদুর রায্য়াকু আফীফী, শাইখ আব্দুল্লাহ্ ইবনে গুদাইইয়ান ও শাইখ আবদুল্লাহ্ ইবনে কু'উদ ।

প্রশ্ন :

আমার বাবা বার্ধক্য ও অসুস্থতার কারণে অক্ষম হয়ে গোটা রমজান মাসে রোযারাখতে পারেননি । এই রোযাগুলোর কাযা পালন করার আগেই বাবা মারা গেছেন । দরিদ্রদেরকে অর্থ দানের মাধ্যমে আমরা তাঁর রোযার কাফফারা আদায় করেছি । পরবর্তীতে জানতে পারলাম যে, অর্থ দিয়ে কাফফারা দেয়ায় সেটা আদায় হবে না, খাদ্য দিয়ে কাফফারা আদায় করতে হয় । এখন প্রশ্ন হচ্ছে- আমরা কি তাহলে পুনরায় কাফফারা আদায় করব? এবং সেটার পরিমাণ কত?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

এক :

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাজহাবের জমহুর (অধিকাংশ) আলেমের মতানুযায়ী অর্থদানের মাধ্যমে রোযার ফিদিয়া আদায় যথেষ্ট নয়। বরং ওয়াজিব হল খাদ্যদানের মাধ্যমে রোযার ফিদিয়া আদায় করা। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর যাদের জন্যতা (সিয়াম পালন) কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদিয়া তথা একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।" [সূরা বাক্বারাহ, ২ : ১৮৪] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ আয়াতের তাফসিরে বলেছেন: "আয়াতে উদ্দেশ্য হচ্ছে- অশীতিপর বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যারা রোযা পালনে অক্ষম। তাঁরা উভয়ে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবেন।" [এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি (৪৫০৫)]

ফাতাওয়াল লাজনাদু দায়িমা (১০/১৯৮) তে এসেছে: "যখন ডাক্তারগণ এই সিদ্ধান্ত দেন যে আক্রান্ত রোগের কারণে আপনি রোযা পালন করতে পারবেন না এবং এরোগ থেকে সুস্থতাও আশা করা যায় না তখন আপনাকে বিগত ও আগত মাসগুলোর প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়াতে হবে, যার পরিমাণ হল দেশীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন খেজুর বা অন্য কোন খাদ্যের অর্ধ 'স্বা'। আপনি যদি ছুটে যাওয়া দিনগুলোর সম সংখ্যক দিন একজন মিসকীনকে রাতের বা দুপুরের খাবার খাইয়ে থাকেন তবে তা যথেষ্ট হবে। কিন্তু অর্থদানের মাধ্যমে ফিদিয়া দিলে সেটা যথেষ্ট হবে না।" সমাপ্ত।

অতএব বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি অথবা এমন রোগী যার সুস্থতা আশা করা যায় না তারা প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়াবেন। এর পরিমাণ স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন গম, খেজুর, অথবা চাল ইত্যাদি এর অর্ধ 'স্বা'। অর্ধ 'স্বা' প্রায় ১.৫ কিলোগ্রাম এর সমান। [দেখুন- ফাতাওয়া রমজান, পৃষ্ঠা- ৫৪৫]

তিনি চাইলে পুরো মাসের ফিদিয়া মাস শেষে একসাথেও আদায় করতে পারেন। যেমন ধরুন এক মাসের ফিদিয়া হবে- ৪৫ কিলোগ্রাম চাল। তিনি যদি রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে মিসকীনদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ান সেটা আরো ভাল। কারণ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনটি করতেন।

দুই: আপনারা যদি কোন আলেমের ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে অর্থের দ্বারা ফিদিয়া আদায় করে থাকেন তবে এ ফিদিয়া পুনরায় আদায় করতে হবে না। আর যদি আপনারা কাউকে জিজ্ঞেস না করে নিজেরাই তা করে থাকেন তবে সে ক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে পুনরায় খাদ্যের মাধ্যমে ফিদিয়া আদায় করা। এটি অধিকতর সতকর্তা অবলম্বিত ফতোয়া এবং আপনাদের বাবার দায়মুক্তির ক্ষেত্রে অধিক নিরাপদ। আল্লাহ আপনাদের বাবাকে রহম করুন ও তাঁকে ক্ষমা করে দিন।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্ন

কোন ধরনের রোগ রমজান মাসে একজন মানুষের জন্য রোযা ভঙ্গ করা বৈধ করে? যে কোন রোগ সেটা যদি হালকাও হয় তবে কি রোযা ভঙ্গ করা জায়েয?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অধিকাংশ আলেমের মতে, ঐদের মধ্যে চার ইমাম আবুহানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ রয়েছে- একজন রোগীর জন্য রমজান মাসে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নয় যদি না তার রোগ তীব্র হয়।

রোগের তীব্রতার অর্থ হলো :

১. রোযার কারণে যদি রোগ বেড়ে যায়।

২. রোযার কারণে যদি আরোগ্য লাভে বিলম্ব হয়।

৩. রোযার কারণে যদি খুব বেশি কষ্ট হয় যদিও বা তার রোগ বেড়ে না যায় বা সুস্থতা দেয় না হয়।

৪.এর সাথে আলেমগণ আরও যোগ করেছেন এমন কোন ব্যক্তি সিয়াম পালনের কারণে যার অসুস্থ হয়ে পড়ার আশংকা আছে।

ইবনে কুদামাহ (রাহিমাছল্লাহ)'আলমুগনী গ্রন্থে' (৪/৪০৩) বলেছেন:

“ যে রোগ রোযা ভঙ্গকরা বৈধ করে তা হলো তীব্র রোগ যা রোযা পালনের কারণে বেড়ে যায় অথবা সে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ বিলম্বিত হওয়ার আশংকা থাকে।” একবারইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করা হল, “ একজন রোগী কখন রোযা ভঙ্গ করতে পারবে?”

তিনি বললেন, “ যদি সে রোযা পালন করতেনা পারে।”

তাকে বলা হলো : “ যেমন জ্বর?”

তিনি বললেন, “ জ্বরের চেয়ে কঠিনতর কোন রোগ আছে কি!...”

আর যে সুস্থ ব্যক্তি রোযা রাখলে তার রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা হয় রোযাভঙ্গার ক্ষেত্রে তার হুকুম ঐ অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় রোযা রাখলে যার রোগবেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। কেননা সে রোগীর জন্য রোযা ভঙ্গ করা এ কারণে বৈধকরা হয়েছে যে রোযা রাখলে তার রোগ বেড়ে যেতে পারে, রোগ বিলম্বিত সারতে পারে। অনুরূপভাবে নতুন কোন রোগ সৃষ্টি হওয়াও একই অর্থবোধক।” (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)

ইমাম নববী (রহঃ) “আল-মাজমূ গ্রন্থে” (৬/২৬১) বলেছেন :

“ যে রোগীর রোগ মুক্তির আশা করা যায়, কিন্তু তিনি রোযা পালনে অক্ষমক্ষেত্রে রোযা পালন করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়.... যদি রোযার কারণে রোগীর কষ্ট হয় সেক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। রোযা ভঙ্গ করার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের অক্ষমতা শর্ত নয়। বরং আমাদের আলেমদের অনেকে বলেছেন: “ রোযাভঙ্গকরার ক্ষেত্রে শর্ত হলো রোযার কারণে এমন কষ্ট হওয়া যা সহ্য করাকষ্টসাধ্য।” (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)

আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: যে কোন রোগীর জন্যই রোযা ভাঙ্গা জায়েয; যদিও বা রোযার কারণে কষ্ট না হয়। তবে এটি একটি বিরল অভিমত। জমহুরআলেমগণ এই অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইমাম নববী বলেছেন:

“ হালকা রোগ যার কারণে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না সে ক্ষেত্রে রোযা ভাঙ্গা জায়েয নয়। এ ব্যাপারে আমাদের আলেমদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই।” [আল-মাজমূ' (৬/২৬১)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেছেন :

“ রোযা পালনের কারণে যে রোগীর উপর শারীরিক কোন প্রভাবপড়ে না, যেমন- হালকাসর্দি, হালকা মাথাব্যথা, দাঁতে ব্যথা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রোযা ভাঙ্গা জায়েয নয়। যদিও আলেমগণের কেউ কেউ নিম্নোক্ত আয়াতের দলীলের ভিত্তিতে বলেছেন যেতার জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়েয।

(ومن كان مريضاً...) [البقرة]

“ আর কেউ অসুস্থ থাকলে...” [সূরা বাক্বারাহ, ২ : ১৮৫]

তবে আমরা বলবো- এই হুকুমটি একটি ইল্লত (কারণ)এর সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হলো রোযা ভঙ্গকরাটা রোগীর জন্য বেশি আরামদায়ক হওয়া। যদি রোযা রাখার কারণে রোগীর উপর শারীরিক কোন প্রভাব না পড়ে তবে তার জন্য রোযা ভঙ্গকরা জায়েয নয়। বরং তার উপর রোযা রাখা ওয়াজিব।” [আশ্-শারহুলমুমতি (৬/৩৫২)]

রোজাদারের জন্য যা করা মুস্তাহাব

প্রশ্ন:

যে হাদিসগুলোর ব্যাপারে আলেমগণ বলেছেন “যাযিফ বা দুর্বল” সেসব হাদিস দিয়ে দোয়া করার হুকুম কি?

১. ইফতারের সময়: ‘আল্লাহুমা লা কা ছুমতু, ওয়া আলা রিয়কিকা আফতারতু’ (অর্থহে আল্লাহ্, আমি আপনার জন্যই রোযা রেখেছি এবং আপনার দেয়া রিয়কি দিয়ে ইফতার করছি।)

২. ‘আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। আসতাগফিরুল্লাহু। আসআলুকাল জান্নাহ, ওয়া আউজু বিকা মিনান্নার’ এ দোয়াটি পড়া কি শরিয়তসম্মত, জায়েয নাকি জায়েযনয়? নাকি মাকরুহ? নাকি শুদ্ধ নয়; হারাম?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

আপনি ইফতারের যে দোয়াটি উল্লেখ করেছেন সেটি একটি দুর্বল হাদিসে এসেছে। হাদিসটি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে মুয়ায বিন যাহরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পৌঁছেছে যে, যখন কেউ ইফতার করে তখন সে যেন বলে, আল্লাহুমা লা কা সুমতু, ওয়া আলা রিয়কিকা আফতারতু” (অর্থ- হে আল্লাহ্, আমি আপনার জন্য রোযা রেখেছি। এবং আপনার দেয়ারিয়কি দিয়ে ইফতার করছি।)

তবে এ দোয়ার পরিবর্তে সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে যেদোয়াটি বর্ণিত হয়েছে সেটাই যথেষ্ট। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন: “যাহাবায় যামাউ, ওয়াব তাল্লাতিল উরুকু ও ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহু।” (অর্থ-তৃষ্ণা দূর হয়ে গেল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হল এবং ইনশাআল্লাহু, সওয়াব সাব্যস্ত হল” [আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে’ হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়িত করেছেন])

দুই:

রোযাদারের জন্য রোযা অবস্থায় ও ইফতারকালীন সময়ে দোয়া করা মুস্তাহাব। দলিল হচ্ছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহু, যখন আমরা আপনাকে দেখি আমাদের অন্তরগুলো কোমল হয়ে যায় এবং আখেরাত মুখী হয়ে উঠি। আর আমরা যখন আপনার সাক্ষাত থেকে চলে যাই তখন দুনিয়া আমাদেরকে আকৃষ্ট করে, আমরা নারী ও সন্তানে মুগ্ধ হই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তোমরা আমার কাছে থাকাকালে যে অবস্থায় থাক সবদা যদি সে অবস্থায় থাকতে তাহলে ফেরেশতারা তাদের হাত দিয়ে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত, তোমাদের বাঁড়ীতে গিয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাত করত। আর যদি তোমরা গুনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের বদলে এমন এক কওমকে নিয়ে আসতেন যারা গুনাহ করত; যাতে করে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম: হে আল্লাহ্ রাসূল! আমাদেরকে জান্নাতের বিবরণ দিন, জান্নাতের ভবনগুলো কেমন হবে? তিনি বলেন: একটি ইট হবে স্বর্ণের, অপরটি হবে রৌপ্যের। প্লাস্টার হচ্ছে- উত্তম সুঘ্রাণের মিসক দিয়ে। কংকর হবে মুক্তা ও নীলকান্তমণির। মাটি হবে জাফরানের। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সেখানে নেয়ামত ভোগ করবে; কখনও দুর্ভোগে পড়বে না। চিরদিন সেখানে থাকবে; কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তার পোশাকাদি পুরাতন হবে না। তার যৌবন শেষ হবে না। তিন ব্যক্তির দোয়া ফেরত দেয়া হয় না: ন্যায়পরায়ন শাসক, রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করা অবধি এবং মজলুম ব্যক্তি। মজলুমের দোয়া মেঘের উপরে বহন করা হয়, মজলুমের দোয়ার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। রব্ব বলতে থাকেন: আমার গৌরবের শপথ, কিছু সময় পরে হলেও আমি তোমাকে সাহায্য করব।” [মুসনাদে আহমাদের তাহকীক এর মধ্যে শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

সুনানে তিরমিযির রেওয়াযেতে (২৫২৫) এসেছে, “রোযাদার ইফতার করাকালে...” [আলবানী সহিহুত তিরমিযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

অতএব, আপনি আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতে পারেন, জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারেন, ইসতিগফার করতে পারেন, শরিয়ত অনুমোদিত যেকোন দোয়া করতে পারেন। তবে, আপনি প্রশ্নে যে ভাষ্যে দোয়াটি উল্লেখ করেছেন “আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আসতাগফিরুল্লাহু, আসআলুকাল জান্নাহ, ওয়াআউযুবিকা মিনান্নার” এ ভাষায় আমরা দোয়াটি পাইনি।

আল্লাহ্ ভাল জানেন।

প্রশ্ন:

রোযার সুন্নতগুলো কি কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোযার অনেক সুন্নত রয়েছে, যেমন-

এক:

যদি কেউ রোযাদারকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে ঝগড়া করতে আসে তাহলে রোযাদারতার দুর্ব্যবহারের জবাব ভাল ব্যবহার দিয়ে বলবে: ‘নিশ্চয় আমি রোযাদার’। যেহেতু সহিহ বোখারী ও সহিহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “সিয়াম হচ্ছে ঢালস্বরূপ। অতএব, কেউ যেন মন্দ কথা না বলে, মূর্খ আচরণ না করে। যদি কোন লোকতার সাথে ঝগড়া করে কিংবা তাকে গালি দেয় তাহলে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার কাছে মিসকের ঘ্রাণের চেয়ে উত্তম। (আল্লাহ বলেন) আমার কারণে সে পানাহার ও যৌনসুখ বর্জন করেছে। রোযা আমারইজন্য। আমিই রোযার প্রতিদান দিব। এক নেকীর প্রতিদানে দশ নেকী দিব।” [সহিহবুখারী (১৮৯৪) ও সহিহ মুসলিম (১১৫১)]

দুই:

রোযাদারের জন্য সেহেরী খাওয়া সুন্নত। সহিহ বোখারী ও সহিহ মুসলিমে আনাসবিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা সেহেরী খাও; কারণ সেহেরীতে বরকত রয়েছে।” [সহিহবুখারী (১৯২৩) ও সহিহ মুসলিম (১০৯৫)]

তিন:

বিলম্বে সেহেরী খাওয়া সুন্নত। দলিল হচ্ছে, সহিহ বুখারীতে আনাস (রাঃ)যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সেহেরী খেলাম। এরপর তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। আমি বললাম: আযান ও সেহেরী মাঝে কতটুকু সময় ছিল? তিনি বলেন: পঞ্চাশ আযাত তেলাওয়াত করার সমান সময়।” [সহিহ বুখারী (১৯২১)]

চার:

অবিলম্বে ইফতার করা সুন্নত। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “মানুষ ততদিন পর্যন্ত কল্যাণে থাকবে, যতদিন তারা অবিলম্বেইফতার করে।” [সহিহ বুখারী (১৯৫৭) ও সহিহ মুসলিম (১০৯৮)]

পাঁচ:

কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নত। যদি কাঁচা খেজুর না পাওয়া যায় তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে। যদি শুকনো খেজুরও না থাকে তাহলে পানি দিয়ে। দলিল হচ্ছে আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার আগে কয়েকটি কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি কাঁচা খেজুর না থাকত তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে। যদি শুকনো খেজুরও না থাকত, তাহলে কয়েক চোক পানি দিয়ে।” [সুনানে আবু দাউদ (২৩৫৬), সুনানে তিরমিযি (৬৯৬), ‘ইরওয়াউল গালিল’ গ্রন্থে ৪/৪৫ হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলা হয়েছে]

ছয়:

হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে সেটা বলে ইফতার করা সুন্নত। হাদিসে এসেছে ‘বিসমিল্লাহ্’ বলে ইফতার করা। সঠিক মতানুযায়ী ‘বিসমিল্লাহ্’ বলা ওয়াজিব; যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। আরও বর্ণিত হয়েছে, “আল্লাহুমা লাকা ছুমতু, ওয়া আলা রিয়কিকা আফতারতু। আল্লাহুমা তাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম।” (অর্থ- হে আল্লাহ, আপনার জন্যই রোযা রেখেছি এবং আপনার দেয়া রিয়ক দিয়ে ইফতার করেছি। হে আল্লাহ, আমার পক্ষ থেকে আপনি কবুল করে নিন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।) [ইবনুল কাইয়েম তাঁর ‘যাদুল মাআদ’ গ্রন্থে (২/৫১) বলেছেন, হাদিসটি দুর্বল] আরও বর্ণিত হয়েছে, “যাহাবায যামাউ, ওয়াবাতাল্লাতিল উরুকুওয়া সাবাতাল আজরু, ইনশাআল্লাহ্” (অর্থ- ভূষণ দূরীভূত হল, শিরাগুলো সিক্ত হল এবং ইনশাআল্লাহ, সওয়াব সাব্যস্ত হল) [সুনানে আবু দাউদ (২৩৫৭), সুনানেবাইহাকী (৪/২৩৯), ‘ইরওয়াউল গালিল’ গ্রন্থে (৪/৩৯) হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়িত করা হয়েছে]

রোযাদারের দোয়ার ফযিলতের ব্যাপারে আরও কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে; যেমন:

১। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তিনজনের দোয়া ফেরত দেয়া হয় না: পিতার দোয়া, মজলুমের দোয়া এবং মুসাফিরেরদোয়া।” [সুনানে বাইহাকী (৩/৩৪৫), আলবানী তাঁর ‘সিলসিলা সহিহা’ গ্রন্থে (১৭৯৭) হাদিসটিকে ‘সহিহ’ আখ্যায়িত করেছেন]

২। আবু উমাম (রাঃ) থেকে মারফু হাদিস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, “প্রতিদিনইফতারের সময় আল্লাহ কিছু মানুষকে (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করে দেন” [মুসানদে আহমাদ (২১৬৯৮), আলবানী ‘সহিহত তারগীব’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘সহিহ’ আখ্যায়িত করেছেন]

৩। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে মারফু হাদিস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয় প্রতিটি দিন ও রাতে আল্লাহ কিছু মানুষকে (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করেন; অর্থাৎ রমযান মাসে। নিশ্চয় প্রতিটি দিন ও রাতে প্রত্যেক মুসলিমেরজন্য একটি কবুলযোগ্য দোয়া রয়েছে।” [হাদিসটি ‘বায্ঘার’ বর্ণনা করেছেন; আলবানী ‘সহিহত তারগীব’ গ্রন্থে (১/৪৯১) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

প্রশ্ন

রোজাদারকে ইফতার করলে কী ধরণের সওয়াব পাওয়া যায়?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যায়েদ ইবনে খালেদআল-জুহানি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে সে রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে; রোজাদারের সওয়াব থেকে একটুও কমানো হবে না।” [সুনানেতিরমিযি (৮০৭), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৭৪৬), ইবনে হিব্বান তাঁর সহিহ গ্রন্থ (৮/২১৬) এ এবং আলবানী তাঁর ‘সহিহ আল-জামে’ গ্রন্থ (৬৪১৫) হাদিসটিকে ‘সহিহ’ বলেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “রোজাদারকে ইফতার করানো দ্বারাউদ্দেশ্য হচ্ছে- তাকে পেট ভরে তৃপ্ত করানো।” [আল ইখতিয়ারাত, পৃষ্ঠা-১৯]

সলফে সালেহিন খাবার খাওয়ানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁরা এটাকে মহান ইবাদত মনে করতেন।

জৈনিক সলফে সালেহিন বলেছেন: “ দশজন সাথীকে দাওয়াত দিয়ে তাদের পছন্দসই খাবার খাওয়ানো আমার কাছে দশজন গোলাম আজাদ করার চেয়ে প্রিয়।”

সলফে সালেহিনের অনেকে নিজের ইফতার অন্যকে খাওয়াতেন। এদের মধ্যে রয়েছেন-ইবনে উমর, দাউদ আল-তাঈ, মালিক বিন দিনার, আহমাদ ইবনে হাম্বল। ইবনে উমর এতিমও মিসকীনদের সঙ্গে না নিয়ে ইফতার করতেন না।

সলফে সালেহিনদের কেউ কেউ তাঁর নিজের ইফতার তার সঙ্গী সাথীদেরকে খাওয়াতেন এবং নিজে তাদের খেদমত করতেন। এদের মধ্যে অন্যতম- ইবনুল মুবারক।

আবু সাওয়ার আল-আদাওয়ি বলেন:

বনি আদি গোত্রের লোকেরা এই মসজিদে নামায পড়ত। তাদের কেউ কখনো একাকী ইফতার করেনি। যদি তার সাথে ইফতার করার জন্য কাউকে সাথে পেত তাহলে তাকে নিয়ে ইফতার করত। আর যদি কাউকে না পেত তাহলে নিজের খাবার মসজিদে নিয়ে এসে মানুষের সাথে খেত এবং মানুষকেও খেতে দিত।

খাবার খাওয়ানোর ইবাদতের মাধ্যমে আরও অনেকগুলো ইবাদত পালিত হয়:

নিমন্ত্রিত ভাইদের সাথে হৃদ্যতা ও ভালবাসা। যে হৃদ্যতা ও ভালোবাসাজালাতে প্রবেশের কারণ। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ তোমরা ঈমান আনা ছাড়া জান্নাত যেতে পারবে না। আর পারস্পারিকভালোবাসা ছাড়া তোমাদের ঈমান হবে না।” [সহিহ মুসলিম (৫৪)] দাওয়াত খাওয়ানোরমাধ্যমে নেক লোকদের সাহচর্য অর্জিত হয় এবং আপনার খাবার খেয়ে তারা নেককাজেরশক্তি পায়, এতে আপনার সওয়াব হয়।

প্রশ্ন

রমজানের দিনের বেলায় মিসওয়াক ব্যবহার করার হুকুম কী? মিসওয়াকের থুথু গিলে ফেলা কি জায়েয আছে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোজাকালে ও রোজা ছাড়া, দিবসের প্রথমভাগে অথবা শেষভাগে সবসময় মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। দলিল হচ্ছে-

১- ইমাম বুখারি (নং ৮৮৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কঠিনমনে না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশদিতাম।”

২- ইমাম নাসাঈ, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ মিসওয়াক হচ্ছে- মুখ পবিত্রকারী ও রব্বকেসন্তুষ্টকারী” [নাসাঈ (৫), আলবানী সহিহ নাসাঈ গ্রন্থে (৫) হাদিসটিকে সহিহবলেছেন]

এ হাদিসগুলোত সবসময় মিসওয়াক করা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে দলিল পাওয়া যায়। এবিধান থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজাদারকে বাদ দেননি। বরং হাদিসগুলো রোজাদার ও রোজাদার নয় এমন সকলকে শামিল করে।

মিসওয়াক করার পর থুথু গিলে ফেলা জায়েয। তবে যদি মিসওয়াকের কোন কিছু ছুটেমুখে থাকে তাহলে সেটা ফেলে দিয়ে থুথু গিলে ফেলবে। যেমন রোজাদারের জন্য ওজুকরা জায়েয। ওজুর পানি মুখ থেকে ফেলে দিয়ে থুথু গিলে ফেলা জায়েয। কুলিরপানি মুখ থেকে শুকিয়ে ফেলা আবশ্যকীয় নয়।

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' (৬/৩২৭) কিতাবে বলেন:

মুতাওয়াল্লি ও অন্যান্যরা বলেন: “রোজাদার কুলি করার পর কুলির পানি ফেলেদেয়া অপরিহার্য। কোন কাপড় বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে মুখ শুকানো অপরিহার্য নয়- এব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই।” সমাপ্ত

ইমাম বুখারি (রহঃ) বলেন:

রোজাদার কর্তৃক কাঁচা ও শুকনো মিসওয়াক ব্যবহার করা শীর্ষক অধ্যায়... আবুহুরায়রা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কঠিন মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক ওজুর সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।” বুখারি বলেন: “এ বিধান থেকে রোজাদারকে বাদ দেয়া হয়নি।” আয়েশা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “মিসওয়াক হচ্ছে- মুখ পবিত্রকারী ওরব্বকে সন্তুষ্টকারী” আতা ও কাতাদা বলেন: “তার থুথু সে গিলে ফেলবে।”

ইবনে হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেন:

“এ শিরোনামের মাধ্যমে তিনি যারা রোজাদারের জন্য কাঁচা মিসওয়াক করাকে মাকরুহ মনে করেন ইঙ্গিতে তাদের মতের প্রত্যুত্তর দিয়েছেন।”

এক্ষেত্রে তিনি রোজাদারকে অন্য কারো থেকে আলাদা করেননি। যেমনিভাবে কাঁচামিসওয়াক থেকে শুকনো মিসওয়াককে আলাদা করেননি। শিরোনামকে এভাবে গ্রহণ করলে এশিরোনামের অধীনে যে কয়টি হাদিস উল্লেখ করেছেন সবগুলোর সাথে শিরোনামের সামঞ্জস্যতা ফুটে উঠে। আর এ সবগুলো বিধানকে অন্তর্ভুক্তকারী বাণীটি আবুহুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে- “তিনি তাদেরকে প্রত্যেক ওজুর সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতেন।” এ কথাটির দাবী হচ্ছে- প্রত্যেক সময় ও প্রত্যেক অবস্থায় মিসওয়াক করা জায়েয।

আতা ও কাতাদা বলেন: “থুথু গিলে ফেলবে”

শিরোনামের সাথে এ উক্তিটির সামঞ্জস্য হলো- সর্বোচ্চ যে ভয়টি হতে পারে সেটা হচ্ছে- মিসওয়াকের কিছু মুখে মিশে যাওয়া। এ মিশে যাওয়া জিনিশটি কুলিরপানির মত। যদি সেটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে থুথু গিলে ফেলে তাতে রোজার কোন ক্ষতি হবে না। [ইবনে হাজারের বক্তব্য সংক্ষেপে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

সঠিক মতানুযায়ী দিবসের প্রথমভাগে হোক বা শেষভাগে হোক রোজাদারের জন্য মিসওয়াক করা সুন্নত। [ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৪৬৮]

মিসওয়াক কাঁচা হলেও দিনের যে কোন সময় মিসওয়াক করা সুন্নত। যদি রোজাদার মিসওয়াক করে এবং মিসওয়াককালে ঝাঁঝ অনুভব করে বা এ জাতীয় কোন স্বাদ অনুভব করে এবং সেটা গিলে ফেলে অথবা থুথুসহ মুখ থেকে মিসওয়াক বের করে আবার মুখে দেয় এবং থুথু গিলে ফেলে এতে করে রোজার কোন ক্ষতি হবে না। [আল-ফাতাওয়াআল-সাদিয়া, পৃষ্ঠা- ২৪৫]

মিসওয়াকের মধ্যে থুথুর সাথে মিশে যায় এমন কোন পদার্থ থাকলে এ জাতীয় মিসওয়াক পরিহার করবে; যেমন- “সবুজ মিসওয়াক”। অনুরূপভাবে মিসওয়াক তৈরীতে যদি লেবু বা পুদিনা পাতার ফ্লেবার ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটাও পরিহার করবে। আরমুখের ভেতরে মিসওয়াকের ছেঁড়া অংশ ঢুকে গেলে সেগুলো ফেলে দিবে। ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কিছু গিলে ফেলা নাজায়েয। অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু পেটে ঢুকে গেলে কোন ক্ষতি নেই। [সাবউনা মাসয়ালা ফিস সিয়াম]

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

ইফতার করা কি ফরজ না অন্যকিছু? যদি কোন মুসলিম মাগরিবের নামাযের সময় মসজিদে হাজির হয়, যে সময়টি ইফতারেরও সময়; এমতাবস্থায় সে কি আগে ইফতার করে নামায ধরবে; নাকি নামায পড়েতারপর ইফতার করবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

অনতিবিলম্বে ইফতার করা সুন্নত । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে সেপ্রমাণই পাওয়া যায় । সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ যতদিন মানুষ অনতিবিলম্বে ইফতারকরবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে ।” [সহিহ বুখারি (১৮২১) ও সহিহ মুসলিম (১৮৩৮)]

সূতরাং যা করা উচিত সেটা হচ্ছে- কয়েক লোকমামুখে দিয়ে নামাযে যাওয়া; যাতে করে ক্ষুধা দূর হয় । নামায থেকে ফিরে এসেনিজের চাহিদামত খেয়ে নেয়া যায় ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেইকরতেন । আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের আগে কয়েকটি কাঁচা খেজুর খেয়ে ইফতার করতেন । যদিকাঁচা খেজুর না থাকত তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে । যদি শুকনো খেজুরও না থাকততাহলে কয়েক ঢোক পানি দিয়ে ।” [সুনানে তিরমিজি; রোজা/৬৩২, আলবানী সহিহ আবুদাউদ গ্রন্থে (৫৬০) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

মুবারকপুরী হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন: এ হাদিস থেকে অনতিবিলম্বে ইফতার করা মুস্তাহাব- এর পক্ষে জোরালো ইঙ্গিত পাওয়া যায় ।

প্রশ্ন

আমরা রোজা রেখে ইফতারের সময় কি দু'আ করতে পারি ।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন:রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইফতার করে বলতেন:

" ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَتَبَّتْ الأَجْزُ إِنشاء الله "

অর্থ- “ তৃষ্ণা দূর হয়েছে; শিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং প্রতিদান সাব্যস্তহয়েছে; ইনশাআল্লাহ” [সুনানে আবু দাউদ (২৩৫৭), দারা কুতনী (২৫), ইবনে হাজারতাঁর ‘আত-তালখিসুল হাবির’ গ্রন্থে (২/২০২) বলেন: হাদিসটির সনদ ‘হাসান’]

পক্ষান্তরে

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

অর্থ- “ হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিযিক দিয়েইফতার করছি ।” এ দু'আটি আবু দাউদ (২৩৫৮) বর্ণনা করেছেন । এটি মুরসাল হাদিস ওযযিফ (দুর্বল) । আলবানি প্রণীত ‘যযিফ আবু দাউদ’ গ্রন্থ (৫১০) ।

যে কোন ইবাদতের পর দু'আ করার পক্ষে শরিয়তের অনেক মজবুত দলিল রয়েছে ।যেমন- নামাযের পর দু'আ করা । হজ্জ আদায় করার পর দু'আ করা । ইনশাআল্লাহ, রোজাওএ বিধানের বাইরে নয় । আল্লাহ তাআলা রোজার বিধান সংক্রান্ত আয়াতের

মাঝখানে দু'আর আয়াত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: "আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, বস্তুতঃ আমি রয়েছে সন্নিহিত। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।" [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৬] এ মাসে দু'আর গুরুত্ব তুলে ধরতে আল্লাহ তাআলা এ স্থানে এ আয়াতটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

আল্লাহ তাআলা অবহিত করছেন যে, তিনি বান্দাদের নিকটবর্তী; তাকে ডাকলে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন। এটি তাদেরকে প্রতিপালন করার, তাদের চাহিদা পূরণ করার ও ডাকে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে জ্ঞাপন। অতএব, তারা যদি তাঁকে ডাকে তাহলে তারা তাঁর রুবুবিয়্যত (প্রতিপালকত্ব) এর প্রতি ঈমান আনল। এরপর তিনি তাদেরকে দুইটি নির্দেশ দেন, তিনি বলেন: "কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের একান্ত কর্তব্য।" [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৬]

এক. তিনি তাদেরকে ইবাদত ও ইস্তিআনা (সাহায্য প্রার্থনা) এর যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা তামিল করা।

দুই. তাঁর রুবুবিয়্যত (প্রতিপালকত্ব) ও উলুহিয়্যত (উপাসকত্ব) এর প্রতি ঈমান আনা। অর্থাৎ তিনিই তাদের রব্ব (প্রতিপালক) ও ইলাহ (উপাস্য)। এজন্য বলা হয়: আকিদা ঠিক থাকলে ও পরিপূর্ণ আনুগত্য থাকলে দু'আ কবুল হয়। যেহেতু আল্লাহ দু'আর আয়াতের পরে বলেছেন: "কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের একান্ত কর্তব্য।"

[মাজমুউল ফাতাওয়া, ১৪/৩৩]

প্রশ্ন

রমজান মাসে কুরআন খতম করা কি একজন মুসলমানের জন্য জরুরী? যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে আমি এ সংক্রান্ত হাদিস পেশ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক:

দলিল সহ মাসয়ালার বিধান জানার আগ্রহের কারণে প্রশ্নকারী ভাইকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কোন সন্দেহ নেই এটাই হওয়া উচিত। প্রত্যেক মুসলমানের সে চেষ্টাই করা উচিত। যাতে করে তিনি কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী হতে পারেন।

ইরশাদুল ফুহুল গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪৫০-৪৫১) শাওকানী (রহঃ) বলেন:

যখন এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, একজন সাধারণ মানুষ আলেমকে জিজ্ঞেস করবে এবং একজন অপূর্ণ ব্যক্তি পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে, এরপর বলতে হয় সে ব্যক্তি দীনদার ও তাকওয়াবান হিসেবে পরিচিত আলেমকে জিজ্ঞেস করবে-কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানবান আলেম কে? কোন সে ব্যক্তি যার কাছে কিতাব ও সুন্নাহ বুঝার মতো প্রয়োজনীয় জ্ঞান রয়েছে? যাতে করে তারা তাকে উপযুক্ত ব্যক্তির সম্মান দিতে পারেন। এরপর সে ব্যক্তি সম্মানপ্রাপ্ত আলেমের কাছে গিয়ে তার মাসয়ালার কিতাব ও সুন্নাহ ভিত্তিক সমাধান চাইবে। এভাবে সে যথাযথ উৎস থেকে হক বা সঠিক বিষয়টি গ্রহণ করবে। বিধানটি যিনি জানেন তার কাছ থেকে জানবে এবং যে আলেমের অভিমত শরিয়ত বিরোধী হওয়ার সম্ভাবনা আছে; সে মত থেকে নিজেই নিষ্কৃতি দিবে।" সমাপ্ত

আদাবুল মুফতি ওয়াল মুসতাফতি গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৭১)ইবনুস সালাহ বলেছেন:

সামআনি উল্লেখ করেছেন যে, মুফতির কাছে দলিল তলব করতে কোন বাধা নেই। যাতে করে ফতোয়া প্রার্থী সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে। মুফতি তাকে দলিল উল্লেখ করতে বাধ্য যদি ফতোয়া প্রার্থী অকাট্যভাবে সেটা দাবী করে। আর যদি অকাট্যভাবে দাবী না করে তাহলে তিনি বাধ্য নন; কারণ হতে পারে সাধারণ মানুষের বোধ হয়তো সে পর্যায়ে পৌঁছবে না। আল্লাহই ভালজানেন। সমাপ্ত।

দুই:

হ্যাঁ, রমজান মাসে অধিক পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করা এবং কুরআন খতম করতে সচেষ্ট থাকা মুস্তাহাব। তবে সেটা ফরজ নয়। অর্থাৎ খতম করতে না পারলে গুনাহ হবেনা। তবে অনেক সওয়াব থেকে সে ব্যক্তি বঞ্চিত হবেন।

এর দলিল হচ্ছে- আবু হুরায়রা (রাঃ)থেকে ইমাম বুখারি (৪৬১৪) বর্ণিত হাদিস: “ জিব্রাইল (আঃ)নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রতিবছর একবার কুরআন পাঠ পেশ করতেন। আর যে বছর তিনি মারা যান সে বছর দুইবার পেশ করেন।”

ইবনে কাছির (রহঃ) ‘আল-জামেফি গারিবিল হাদিস’ গ্রন্থে (৪/৬৪) বলেন:

অর্থাৎ তিনি তাঁকে যতটুকু কুরআন নাযিল হয়েছে ততটুকু পাঠ করে শুনাতেন। সমাপ্ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে সলফে সালেহিনের আদর্শ ছিল রমজান মাসে কুরআন খতম করা। ইব্রাহিম নাখায়ি বলেন: আসওয়াদ রমজানের প্রতি দুই রাত্রিতে একবার কুরআন খতম করতেন। [আস-সিয়র, (৪/৫১)]

কাতাদা (রহঃ) সাতদিনে একবার কুরআন খতম করতেন। রমজান মাস এলে প্রতি তিনদিনে একবার কুরআন খতম করতেন। শেষ দশরাত্রি শুরু হলে প্রতিরাতে একবার কুরআন খতম করতেন। [আসসিয়র, (৫/২৭৬)]

মুজাহিদ (রহঃ)থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমজানের প্রতিরাত্রিতে কুরআন খতম করতেন। [নববির ‘আত তিবয়ান (পৃষ্ঠা-৭৪)] তিনি বলেন: উক্তিটির সনদ সহিহ।

মুজাহিদ (রহঃ)থেকে বর্ণিত আছে যে, আলীআল-আযদি রমজানের প্রতি রাত্রিতে একবার কুরআন খতম করতেন। [তাহযিবুল কামাল (২/৯৮৩)]

রবী’ বিন সুলাইমান বলেন: শাফেয়ী রমজান মাসে ষাটবার কুরআন খতম করতেন। [আসসিয়র (১০/৩৬)]

কাসেম বিন হাফেয ইবনে আসাকির বলেন: আমার পিতা নিয়মিত জামাতে নামাযও কুরআন তেলাওয়াত করতেন। প্রতি শুক্রবারে কুরআন খতম করতেন। রমজান মাসে প্রতিদিন খতম করতেন। [আসসিয়র (২০/৫৬২)]

ইমাম নববি কুরআন খতমের সংখ্যা বিষয়ক মাসয়ালার উপর টীকা লিখতে গিয়ে বলেন:

এ বিষয়ে নির্বাচিত অভিমত হচ্ছে-ব্যক্তি বিশেষের ভিন্নতার প্রেক্ষিতে এমাসয়ালার বিধানও ভিন্ন হবে। যে ব্যক্তি তার সূক্ষ্মচিত্তা দিয়ে খুঁটিনাটি বিষয় উদঘাটন করতে সক্ষম সে ব্যক্তি শুধু ততটুকু পড়বেন যতটুকু পড়ে তিনি এটি ভালভাবে বুঝে নিতে পারেন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তিইলম বিতরণে অথবা দ্বীনের অন্য কোন বিশেষ দায়িত্বে অথবা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছেন তিনিও। সেক্ষেত্রে তিনি ততটুকু পড়বেন যতটুকু পড়তে তার দায়িত্ব অবহেলা না হয়। আর যদি ব্যক্তি এ শ্রেণীর কেউ না হন তাহলে তিনি যত বেশি পড়তে পারেন ততবেশি পড়বেন; তবে যেন বিরক্তি আসার পর্যায়ে না পৌঁছে। সমাপ্ত। আততিবয়ান (পৃষ্ঠা-৭৬)]

কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআন খতম করার এতো তাগিদ ও এতগুরুত্বের পরেও সেটা মুস্তাহাব পর্যায়ে। এটি জরুরী ফরজ পর্যায়ে নয়; যেটা না করলে কোন মুসলমান গুনাহগার হবেন।

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: রোজাদারের উপর কুরআন খতম করা কি ফরজ?

তিনি উত্তরে বলেন: রমজান মাসে রোজাদারের জন্য কুরআন খতম করা ফরজ নয়। তবে ব্যক্তির উচিত রমজানে বেশি বেশি কুরআন পড়া। এটাই ছিল রাসূলের আদর্শ। গোটা রমজান মাসে জিব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কুরআন পাঠ করতেন। সমাপ্ত [মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (২০/৫১৬)]

আরও জানতে দেখুন [66063](#) ও [26327](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

আমি শুনেছি আল্লাহ তাআলা রমজান মাসকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। রমজানের প্রথম দশদিন- রহমত। দ্বিতীয় দশদিন- মাগফিরাত। তৃতীয় দশদিন- জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি। বলা হয় প্রত্যেক ভাগের জন্য আলাদা আলাদা দু'আ রয়েছে। প্রথমভাগে আমাদেরকে বলতে হবে, 'আল্লাহুম্মার হামনি ইয়া আরহামার রাহিমীন' (অর্থ- হে সর্বাধিক দয়াবান, আমাকে দয়া করুন)। দ্বিতীয়ভাগে বলতে হবে, 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলি য়ুনুবি, ইয়ারাব্বাল আলামীন' (অর্থ- হে জগতসমূহের প্রতিপালক, আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করেদিন।)। তৃতীয়ভাগে বলতে হবে, 'আল্লাহুম্মা আ'তিকনি মিনান নার; ওয়া আদখিলনিল জাহ্নাম' (অর্থ- হে আল্লাহ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত রাখুন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান)। এ ধরনের বক্তব্য কি সঠিক? এর পক্ষে কি দলিল আছে? রমজান মাসে কোন দু'আগুলো বেশি বেশি পড়া উচিত? আমার জ্ঞানানুযায়ী শুধু 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফউন; তুহিবুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি' এ দু'আটি রমজানের শেষ দশদিনে লাইলাতুল কুদর সন্ধানকালে বেশি বেশি পড়া উচিত। কিন্তু রমজানের অন্য রাত্রিগুলোতে পড়ার জন্য বিশেষ কোন দু'আ আছে কিনা?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইবনে খুয়াইমা তাঁর সহিহ গ্রন্থে সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসের শেষদিন আমাদের উদ্দেশ্য খোতবা দিলেন। তিনি বললেন: " হে লোক সকল! এক মহান মাস, এক মুবারক ময় মাস তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছে..."। [আল-হাদিস] সে হাদিসের রয়েছে " এ মাসের প্রথমভাগ হচ্ছে- রহমত। দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে- মাগফিরাত। আর তৃতীয় ভাগ হচ্ছে- জাহান্নাম থেকে নাজাত"

গোটা রমজান মাস আল্লাহর পক্ষ থেকে এক রহমত। গোটা মাসেই মাগফিরাত ওজাহান্নাম থেকে নাজাত হয়। রমজান মাসের বিশেষ কোন অংশ এ মর্যাদাগুলোর কোনএকটির জন্য খাস নয়। এটি আল্লাহর বিপুল রহমতের নিদর্শন।

ইমাম মুসলিম (১০৭৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, " যখন রমজান মাস আসে তখন রহমতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানগুলোকে শিকলাবদ্ধ করা হয়।"

তিরমিযি (৬৮২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, " রমজানের প্রথম রাত্রিতে শয়তানও অবাধ্য জ্বিনগুলোকে বন্দি করা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা হয়। জাহান্নামের কোন দরজা খোলা রাখা হয় না। জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। জান্নাতের কোন দরজা বন্ধ রাখা হয় না। একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে, হেকল্যাণ অশ্বেষী আগোয়ান হও। ওহে, মন্দ অশ্বেষী তফাৎ যাও। আল্লাহ প্রতিরাত্রিতে কিছু মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেন।" [আলবানী সহিহ তিরমিযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

এর ভিত্তিতে বলা যায়: রমজানের প্রথম দশদিনে রহমতের দু'আ করা, মাঝেরদশদিনে মাগফিরাতের দু'আ করা, শেষের দশদিনে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তিরজন্য দু'আ করা- বিদআত। শরিয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। এ ধরনের বিশেষ দু'আর কোনঅবকাশ নেই; যেহেতু এক্ষেত্রে রমজানের সকল দিন সমান। বরং একজন মুসলিম গোটা রমজান মাসব্যাপী দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করে আল্লাহর দরবারে দু'আকরবে। এ প্রার্থনার মধ্যে রহমত, মাগফিরাত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ওজান্নাত লাভের দু'আও থাকবে।

দুই:

একজন মুসলিমের উচিত কল্যাণ ও বরকতের মৌসুমকে কাজে লাগিয়ে এ মাসে কল্যাণ ওরহমতের দু'আ করা। আল্লাহর রহমত ও তাঁর ক্ষমা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমারব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিহিতে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনাকবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করাএবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতেপারে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৬]

সিয়ামের হুকুম আহকাম বর্ণনার মাঝখানে দু'আ করার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী এআয়াতে কারীমাটি উল্লেখ করার মধ্যে মাস পূর্ণ হওয়ার সময়; বরং প্রতিদিনইফতারের সময় অধিকহারে দু'আ করার দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। [তাফসিরে ইবনেকাছির (১/৫০৯) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহর কাছে দু'আকারীর আবেদনটা সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। দু'আকারী হাদিসেবর্ণিত দু'আগুলো বেশি বেশি পড়বে। দু'আর ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবে না। দু'আর শিষ্টাচারগুলো বজায় রাখবে। রমজান মাসে এবং রমজানের বাইরেও যে দু'আগুলো বেশিবেশি পড়া উত্তম সেগুলো হচ্ছে-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দিন, আখেরাতেও কল্যাণ দিনএবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে বাঁচান।) [সূরা বাকারা, আয়াত: ২০১]

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

(অর্থ- আর যারা প্রার্থনা করে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ওসন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয়। আর আমাদেরকে মুত্তাকীদেরনেতা বানিয়ে দিন।) [সূরা ফুরকান, আয়াত: ৭৪]

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ . رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

(অর্থ- হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামাযপ্রতিষ্ঠাকারী বানাও আর আমার সন্তানদেরকেও, হে আমার প্রতিপালক! আমারপ্রার্থনা কবুল কর। হে আমাদের প্রতিপালক! হিসাব গ্রহণের দিন আমাকে, আমারপিতামাতাকে আর মু'মিনদেরকে ক্ষমা করে দাও।) [সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪০-৪১]

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফউন তুহিবুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি

(অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল; ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও)।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْتُكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَادَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَقَرَّ بِهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَقَرَّ بِهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا.

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহ; আ'জিলিহি ও আজিলিহি; মাআলিমতু মিনহু ওয়ামা লাম আ'লাম। ওয়া আউজুবিকা মিনাশ শাররি কুল্লিহিআ'জিলিহি ওয়া আজিলিহি; মা আলিমতু মিনহু ওয়ামা লাম আলাম। আল্লাহুম্মা ইন্নিআসআলুকা মিন খাইরি মা

সাআলাকা আবদুকা ওয়া নাবিয়্যুকা । ওয়া আউজুবিকা মিনশাররি মা আ'যা মিনছ আবদুকা ওয়া নাবিয়্যুকা । আল্লাহুমা ইন্নি আসআলুকালজান্নাহ ওয়ামা কাররাবা ইলাইহা মিন কাওলিন ওয়া আমাল । ওয়া আউজুবিকা মিনালজান্নাহ ওয়ামা কাররাবা ইলাইহা মিন কাওলিন ওয়া আমাল । ওয়া আসআলুক আন তাজআলাকুল্লা কাযামিন কাযাইতাছ লি খাইরা ।

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সকল কল্যাণ প্রার্থনা করছি সেটা আসন্নহোক অথবা বিলম্বে হোক, সেটা আমার জানার ভিতরে হোক অথবা আমার অজানা হোক । আরআমি সকল অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি । সেটা আসন্ন হোক অথবা বিলম্বেহোক । সেটা আমার জানার ভিতরে হোক অথবা আমার অজানা হোক । হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও আপনার নবী আপনার কাছে যেসব কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন আমিও সেসবকল্যাণ প্রার্থনা করছি । হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও নবী আপনার কাছে যেসবঅকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন আমিও সেসব অকল্যাণ থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করছি । হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবংজান্নাতের নৈকট্য অর্জন করিয়ে দিবে এমন কথা ও কাজের প্রার্থনা করছি । আরজাহান্নাম থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নামে নিয়ে যাবে এমন কথা ওআমল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি । আরও প্রার্থনা করছি- আপনি আমার জন্য যে ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটা যেন ভাল হয় ।)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

(আল্লা-হুমা ইন্নি আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল- 'আ-ফিয়াতা ফিদদুনইয়া ওয়ালআ-খিরাতি । আল্লা-হুমা ইন্নি আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল-'আ-ফিয়াতা ফী দীনীওয়াদুনইয়াইয়া, ওয়া আহলী ওয়া মা-লী, আল্লা-হুমাসতুর 'আওরা-তী ওয়া আ-মিনরাও'আ-তি । আল্লা-হুমাহফায়নী মিন্মাইনি ইয়াদাইয়া ওয়া মিন খালফী ওয়া 'আনইয়ামীনী ওয়া শিমা-লী ওয়া মিন ফাওকী । ওয়া আ'উযু বি'আযামাতিকা আন উগতা-লা মিনতাহতী) ।

(অর্থ-“ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা প্রার্থনাকরছি । হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদেরনিরাপত্তা চাচ্ছি । হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ত্রুটিসমূহটেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নতাকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করুন । হে আল্লাহ!আপনি আমাকে হেফাযতেরাখুন আমার সম্মুখ দিক থেকে,আমার পিছনের দিক থেকে, আমারডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক থেকে । আর আপনারমহত্ত্বের ওসিলায় আশ্রয় চাচ্ছি নীচ থেকে গুপ্ত আক্রমণ থেকে” ।)

অনুরূপভাবে বান্দা কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত যেকোন দু'আ; কল্যাণকর যে কোন দু'আ করতে পারে । বান্দা গোপনে কায়মনোবাক্যেআল্লাহর কাছে দু'আ করবে । এ দু'আগুলোর কোনটিকে রমজানের সাথে খাস করে নিবেনা ।

অনুরূপভাবে ইফতারের শেষে এ দু'আটি পড়া মুস্তাহাব:

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَتَبَّتِ الأَجْرُ إِثْنَاءَ اللّهِ

অর্থ- “ তৃষ্ণা দূর হয়েছে; শিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং প্রতিদান সাব্যস্ত হয়েছে; ইনশাআল্লাহ” ।

শেষ দশদিন এ দু'আটি বেশি বেশি পড়া:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

আল্লাহুমা ইন্নাকা আফউন তুহিবুবল আফওয়া ফা'ফু আন্নি

(অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল; ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও) ।

আল্লাহই ভাল জানেন ।

প্রশ্ন

রোজার সুন্নতগুলো কি কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

রোজা একটি মহান ইবাদত । সওয়াবের আশাবাদী রোজাদারের সওয়াব আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: " বনি আদমের প্রত্যেকটি কাজের সওয়াব তার নিজের জন্য; রোজা ছাড়া । রোজা আমার জন্য; আমিই রোজার প্রতিদান দিব ।" [সহিহ বুখারী (১৯০৪) ও সহিহ মুসলিম (১১৫১)]

রমজানের রোজা ইসলামের একটি রোকন । রোজা ফরজ হোক অথবা নফল হোক একজন মুসলমানের রোজা পালনে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত; যাতেসে আল্লাহর কাছ থেকে উপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারে ।

রোজার অনেক সুন্নত রয়েছে । যেমন-

এক:

রোজাদারকে কেউ গালি দিলে অথবা তার সাথে ঝগড়া করলে এর বিনিময়ে তার সাথে ভাল ব্যবহার করে বলবে: " আমি রোজাদার" ।

দুই:

রোজাদারের জন্য সেহরী খাওয়া সুন্নত । সেহরীর মধ্যে বরকত রয়েছে ।

তিন:

অনতিবিলম্বে ইফতার করা সুন্নত; আর দেরিতে সেহরী খাওয়া সুন্নত ।

চার:

কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করা; কাঁচা খেজুর না পেলে শুকনো খেজুর দিয়ে; শুকনো খেজুরও না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করা সুন্নত ।

পাঁচ:

ইফতারের সময় এই দোয়াটি পড়া

"ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَتَبَّتْ الْأَجْرُ إِشْنَاءَ اللَّهِ"

" তৃষ্ণা দূর হয়েছে; শিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং প্রতিদান সাব্যস্ত হয়েছে; ইনশাআল্লাহ" ।

এ সংক্রান্ত দলিলগুলো জানতে [39462](#) নং প্রশ্নের জবাব দেখুন ।

ছয়:

রোজাদারের বেশি বেশি দু'আ করা মুস্তাহাব। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: " তিন ব্যক্তির দু'আফিরিয়ে দেয়া হয় না। ন্যায়পরায়ণ শাসক। রোজাদার; ইফতার করার পূর্ব পর্যন্ত। মজলুমের দু'আ।

মুসনাতে আহমাদ (৮০৪৩), মুসনাদ কিতাবের পাঠোদ্ধারকারী সম্পাদকগণ হাদিসটিকে অন্যান্য সহায়ক সনদ ও হাদিসের ভিত্তিতে 'সহিহ' বলেছেন।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন:

রোজাদারের জন্য রোজাপালনকালে নিজের জন্য, প্রিয়মানুষের জন্য এবং সকল মুসলমানের দুনিয়া ও আখেরাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দু'আ করা মুস্তাহাব [আল-মাজমু (৬/৩৭৫)]

সাত:

রোজার দিন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পালন করা মুস্তাহাব:

- মসজিদে বসে বসে কুরআন তেলাওয়াত করা ও আল্লাহর যিকির করা।

- শেষ দশদিন ইতিকাফ করা।

- তারাবীর নামায আদায় করা।

- বেশি বেশি দান সদকা করা।

- পরস্পর কুরআন অধ্যয়ন করা। সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: " রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ বদান্য মানুষ। তিনি সবচেয়ে বেশি বদান্য হতেন রমজান মাসে; যখন জিব্রাইল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। জিব্রাইল (আঃ) প্রতি রাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং একে অপরকে কুরআন পাঠকরে শুনাতেন। নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্ত বাতাসচেয়ে অধিক বদান্য ছিলেন। "

- অনর্থক ও বেহুদা কাজে সময় নষ্ট না করা; যা তাররোজার উপর প্রভাব ফেলতে পারে যেমন অতিরিক্ত ঘুম, অতিরিক্ত ঠাট্টা মশকরা ইত্যাদি। নানা রকম খাবার দাবার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত না হওয়া। কারণ রোজা পালনকালে এগুলো তাকে অনেক নেকীর কাজ করা থেকে বিরত রাখবে।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন:

রমজান মাসে মাগরিবের নামাযের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর খেতেন। এরপর জামাতের সাথে মাগরিবের নামায আদায় করতেন। প্রশ্ন হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ নামায পড়ার পর আগে কি সুন্নত আদায় করতেন নাকি ইফতার খেতেন? আমার এ প্রশ্নটি এসেছে এ ক্ষেত্রেও রাসূলের সুন্নত আদায় করার তীব্র আগ্রহ থেকে।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ হচ্ছে- সবচেয়ে পরিপূর্ণ আদর্শ। তিনি রোজা থাকলে কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার শুরু করতেন। যদি কাঁচা খেজুর না পেতেন তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে। যদি শুকনো খেজুরও না পেতেন তাহলে পানি দিয়ে ইফতার করতেন। এরপর মাগরিবের ফরজ নামায আদায় করতেন। ঘরে এসে সুন্নত নামায আদায় করতেন।

আনাস (রাঃ) বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার আগে কয়েকটি কাঁচা খেজুর খেয়ে ইফতার করতেন। যদি কাঁচা খেজুর না পেতেন কয়েকটি শুকনো খেজুর খেয়ে ইফতার করতেন। সেটাও না পেলে কয়েক টোক পানি দিয়ে ইফতার করতেন। [সুনানে আবু দাউদ, (২৩৫৬)]

দারা কুতনি তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে (২/১৮৫) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন এবং আলবানি তাঁর 'ইরওয়াউল গালিল' গ্রন্থে (৪/৪৫) হাদিসটিকে 'হাসান' আখ্যায়িত করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়তেন। যোহরের পরে দুই রাকাত নামায পড়তেন। মাগরিবের পর তাঁর নিজ ঘরে দুই রাকাত নামায পড়তেন। এশার পর দুই রাকাত নামায পড়তেন। জুমার পর ঘরে আসার আগে কোন নামায পড়তেন না; ঘরে এসে দুই রাকাত নামায পড়তেন। [সহিহ বুখারি (৮৯৫) ও সহিহ মুসলিম (৭২৯)]

তবে প্রশ্নে বিশেষ যে সুন্নতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না। আমরা মূলতঃই জানি না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের পর কিছু খেতেন কিনা? কেউ যদি ঘরে এসে দেখে যে, খাবারপ্রস্তুত আছে এবং নামায পড়তে গেলে খাবারের দিকে তার মন পড়ে থাকবে তাহলে সে আগে খেয়ে নিতে পারে; এরপর নামায পড়ল। যতক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের ফরজ নামাযের ওয়াক্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের ফরজ নামাযের ওয়াক্তও থাকে।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন:

রমজানের শেষ দশদিনে কি উমরা করা মুস্তাহাব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজান মাসে উমরা পালন করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইমাম বুখারি (১৭৮২) ও মুসলিম (১২৫৬) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “রমজান মাসে একটি উমরা পালন- হজ্জের সমতুল্য।”

এ হাদিসের বিধান গোটা রমজানকেই شامل করে; শুধু শেষ দশদিনকে নয়।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন:

রোজাদারের জন্য ইফতারের সময় একটি কবুলযোগ্য দু'আরসুযোগ রয়েছে। এ দু'আটি কখন করতে হবে: ইফতারের আগে; নাকি ইফতারের মাঝে; নাকি ইফতারের পরে? এ সময়ে পড়া যায় এমন কোন দু'আ যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়ে থাকে সেটা যদি উল্লেখ করতেন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এ প্রশ্নটি শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এর কাছে উত্থাপন করা হলে তিনি বলেন:

ইফতারের পূর্বে সূর্যাস্তের সময় এ দু'আটি করা যেতে পারে। কারণ এ সময়মানুষের অন্তর বিগলিত হওয়ার সাথে মানুষ নত হয়; উপরন্তু সে তো রোজাদার। এ অবস্থাপ্রলো দু'আ কবুলের উপকরণ। আর ইফতার করার পরে তো আত্মা প্রশান্ত হয়, মনখুশি হয়; তাই এ সময়ে গাফলতি পেয়ে বসা স্বাভাবিক। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ইফতারের পরে উচ্চারণ করার জন্য একটি দু'আ বর্ণিত হয়েছে যদি সে হাদিসটি সহিহ সাব্যস্ত হয়। সে দু'আটি হচ্ছে-

"ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَتَبَّتِ الأَجْرُ إِشَاءَ اللّهِ"

অর্থ- "তৃষ্ণা দূর হয়েছে; শিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং প্রতিদান সাব্যস্ত হয়েছে; ইনশাআল্লাহ"। [সুনানে আবু দাউদ, আলবানী হাদিসটিকে সহিহ আবু দাউদগ্রন্থ (২০৬৬) 'হাসান' বলেছেন] এ দু'আটি অবশ্যই ইফতারের পরে পাঠযোগ্য। অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে,

اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت

অর্থ- "হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিযিক দিয়ে ইফতার করছি।"

অতএব, আপনি যে দু'আকে উপযুক্ত মনে করেন সেটা পাঠ করতে পারেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

স্কুলে অধ্যয়নকালে আমি মনে করতাম যে, শুধু ইফতারের সময় বিশেষ দু'আ আছে; সেহেরির সময়ে নয়। কারণ সেহেরির সময় নিয়ত করা হয়; আর নিয়তের স্থান হলো অন্তর। তবে আমার স্বামী আমাকে বলেছেন যে, সেহেরির সময়ও বিশেষ দু'আ আছে। আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট করবেন- এই কথা সঠিক কিনা?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ, হাদিসে এমন কিছু দোয়া বর্ণিত হয়েছে যে দোয়াগুলো একজন রোজাদার ইফতারের সময় তথা রোজা ভঙ্গার সময় পড়বেন। যেমন রোজাদার বলবেন:

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَّتِ الأَجْرُ إِنْشَاءً اللهُ

“পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চাহতে সওয়াব সাব্যস্ত হল।” এছাড়াও রোজাদার তার পছন্দমত যে কোন দুআ করতে পারেন। এই দোয়া করার কারণ এই নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শ (সুন্নাহ) হতে সুনির্দিষ্টভাবে এ ক্ষেত্রে কোন উদ্ধৃতি আছে। বরং এজন্য যে, এটি একটি ইবাদতের সমাপ্তি পর্ব। এ ধরনের সময়ে একজন মুসলমানের দুআ করা শরীয়তসম্মত।

শাইখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন রাহিমাল্লাহুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

ইফতারের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত মাসনুন (সুন্নাহতে প্রমাণিত) দুআ আছে কি? এই দোয়া করার সময়ই বা কখন? একজন রোজা পালনকারী কি মুয়াজ্জিনের সাথে আযান পুনরাবৃত্তিকরবেন; নাকি তার ইফতার চালিয়ে যেতে থাকবেন?

উত্তরে তিনি বলেন :

“নিঃসন্দেহে ইফতারের সময় দু’আ কবুলের সময়। কারণ এটি একটি ইবাদত পালনের শেষ মুহূর্ত। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইফতারের সময় রোজাদার দুর্বল থাকে। আর মানুষ যত বেশি দুর্বল থাকে ও অন্তর যত নরম থাকে সে তত বেশি আল্লাহর প্রতি অনুগত ও বিনয়ী হয়। ইফতারের সময়ের মাসনুন দুআ হল:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

“হে আল্লাহ আমি আপনার জন্য রোজাপালন করলাম এবং আপনার দেয়া রিযিকদ্বারা ইফতার করলাম।”

এ বিষয়ে আরও একটি দোয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে:

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَّتِ الأَجْرُ إِنْشَاءً اللهُ

“পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চাহতে সওয়াব সাব্যস্ত হল।”

এই হাদীসদ্বয় সাব্যস্তের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকলেও আলেমগণের কেউ কেউ এই হাদীসদুটোকে “হাসান” হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যাই হোক, আপনি ইফতারের সময় এই দুআ দুটি পড়তে পারেন অথবা অন্য যে কোন দুআ করতে পারেন। এটি দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত।” সমাপ্ত [মাজমু ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনে উছাইমীন (প্রশ্ন নং ১৯/৩৪১)]

“পিপাসা দূরীভূত হল...” ও “হে আল্লাহ, আপনার জন্য রোজা পালন করলাম...” এই দুই হাদীসের তাখরীজ (সনদ-বিশ্লেষণ) জানতে দেখুন (26879) নং প্রশ্নের উত্তর। সেখানে প্রথম হাদীসটির “যয়ীফ” (দুর্বল) হওয়া ও দ্বিতীয় হাদীসটির “হাসান” (মধ্যমমান) হওয়ার বর্ণনা রয়েছে এবং সেখানে দুআ সংক্রান্ত শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ এর ফতোয়াও উল্লেখ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে সেহেরির সময় পড়তে হয় এমন কোন বিশেষ দুআ নেই। শরীয়তসম্মত হল, খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে বা আল্লাহর নামে শুরু করা এবং খাওয়া শেষে আলহামদুলিল্লাহ পড়ে তাঁর প্রশংসা করা, যেমনটি সবখাওয়ার বেলায় করা হয়।

তবে যে ব্যক্তি রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর সেহেরি খায় তিনি এমন একটি সময় পান যে সময়ে আল্লাহ তাআলা অবতরণ করেন এবং যে সময়ে দোয়া কবুল হয়। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

يُنزَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَعِزُّنِي فَأَعِزُّهُ. رواه البخاري () ومسلم ()

“রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে আমাদের মহান রব্ব দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। অবতরণ করে তিনি বলতে থাকেন: ‘কে আমার কাছে দোয়া করবে? আমি তার দোয়া কবুল করব। কে আমার কাছে প্রার্থনা করবে? আমি তাকে দান করব। কে আমার কাছে ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।’ [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী (১০৯৪) ও মুসলিম (৭৫৮)] সুতরাং এ সময়ে দুআ করাযেতে পারে। যেহেতু এটি দুআ কবুলের সময়; সেহরির সময় হিসেবে নয়।

আর নিয়্যতের স্থান হচ্ছে অন্তর। জিহ্বা দ্বারা নিয়্যত উচ্চারণ করা- শরিয়তসম্মত নয়। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন: “যে ব্যক্তি মনেমনে সংকল্প করলো যে, সে পরের দিন রোজা পালন করবে, তবে তার নিয়্যত করা হয়ে গেলো।” (37643) ও (22909) নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

প্রশ্ন

রমজানের দিনের বেলায় কোন আমলটি উত্তম- কুরআন তেলাওয়াত; নাকি নফল নামায আদায়?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ ছিল তিনি রমজান মাসে বিভিন্ন ধরণের ইবাদত বেশিবেশি পালন করতেন। রমজানের রাতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে কুরআন অধ্যয়ন করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিতেই সবচেয়ে বেশি দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। এর সাথে জিবরাঈল (আঃ) যখন তাঁর সাথে দেখা করতেন তখন তিনি বহমান বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন। তাঁর দানশীলতা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেত রমজান মাসে। এ মাসে তিনি বেশি বেশি দান-সদকা করতেন, অন্যের প্রতি ইহসান করতেন, কুরআন তেলাওয়াত করতেন, নামায আদায় করতেন, যিকির ও ইতিকাফ করতেন। এই মহান মাসে এসব ইবাদত পালন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ।

কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত ও নফল নামায আদায় দুটোর মধ্যে কোনটাকে প্রাধান্য দেয়া হবে এটি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্ন হতে পারে। এর সঠিক মূল্যায়ন আল্লাহ করবেন; কারণ তিনি সব বিষয়ে জ্ঞাত। [শাইখ আব্দুল আযীযবিন বাযরচিত ‘আল জওয়াবুস্ সহীহ মিন আহকামি সালাতিল লাইলি ওয়াত তারাউয়ীহ’ (পৃঃ৪৫) শীর্ষকবইহতেসংকলিত]

বিশেষ কোন একটা আমল নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির জন্য উত্তম হতে পারে। আবার অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে অন্য কোন আমল উত্তম হতে পারে। এটি নির্ভর করবে কোন আমলটি ব্যক্তিকে আল্লাহর অধিক নৈকট্য হাছিল করিয়ে দেয়। কোন কোন মানুষ নফলনামায পড়াকালে বেশ খুশখুশু অবলম্বন করতে পারেন। যার ফলে অন্য আমলের তুলনায় এ আমলের মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য বেশি হাছিল করতে পারেন। তাই এআমল পালন করা তার জন্য অধিক উত্তম।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

রোজাদারের জন্য যা করা বৈধ

প্রশ্ন

আপনাদের কাছে আশা করব যে এই প্রশ্নটির জবাব দিবেন: রোযা অবস্থায় আঙ্গুলের সমপরিমাণ এক টুকরো জীবানুনাশক কটন দিয়ে জিহ্বা ও দাঁত মোছা কি জায়েয হবে? এ কটনরোযা অবস্থায় দুর্গন্ধ ও জীবানু দূর করতে ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন ফ্লেভারের পাওয়া যায়; যেমন পুদিনা পাতার ফ্লেভার...।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

আপনিযে জিনিস ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন সেটি ব্যবহার করতে কোন আপত্তি নেই; এই শর্তে যদি কোন কিছু গলার ভেতরে চলে না যায় । বরং মুখের ভেতরে কিছু থেকেগেলে মানুষ তা ফেলে দিবে কিংবা গড়গড়া কুলি করে ফেলবে ।

শাইখ সালাহ আল-ফাওয়ান (হাফিযাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

“ ফার্মেসিগুলোতে মুখের জন্য বিশেষ পারফিউম পাওয়া যায় । সেটা এক ধরণের স্প্রে । রমযান মাসের দিনের বেলায় মুখের গন্ধ দূর করার জন্য এটি ব্যবহার করা জায়েয হবে কি? ”

জবাবে তিনি বলেন: রোযা অবস্থায় মুখের স্প্রের বদলে মিসওয়াক ব্যবহার করাই যথেষ্ট; যা ব্যবহার করার প্রতিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেছেন । আর যদি কেউ স্প্রে ব্যবহার করে এবং কোন কিছু গলার ভেতরে চলে না যায় তাহলে কোন অসুবিধা হবে না । তবে রোযার কারণে মুখে যে গন্ধ হয় সেটাকে অপছন্দ করা উচিত নয় । যেহেতু তাইবাদত পালনের আলামত ও আল্লাহর কাছে প্রিয় । হাদিসে এসেছে: “ রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিসকের ঘ্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয় । ” [আল-মুনতাকা মিন ফাতাওয়াশ শাইখ সালাহ আল-ফাওয়ান (৩/১২১)]

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ ।

প্রশ্ন

কোন মুসলিমের জন্য রোযা রেখে যে নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন তার সাথে টেলিফোনে কথা বলা কি জায়েয?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

বিয়ের প্রস্তাব দেয়া নারীর সাথে কথা বলার কিছু শর্ত রয়েছে ।

যদি এ শর্তগুলো পরিপূর্ণ হয়; বিশেষতঃ যৌন উত্তজনা জেগে উঠা থেকে নিরাপদ থাকা যায় এবং কথা বলার প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা জায়েয হবে । আর যদি শর্তগুলোর কোন একটি পরিপূর্ণ না হয় সেক্ষেত্রে এই কথা বলাটা শরিয়তে নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে পড়বে । যদি রোযা অবস্থায় কোন শরয়ী সীমালঙ্ঘন সংঘটিত হয় তাহলে সেটা রোযার উপর সওয়াব কমানোর প্রভাব ফেলবে । আর সীমালঙ্ঘনটি মর্যাদাপূর্ণ সময়ে সংঘটিত হওয়ায় এর গুনাহ জঘন্যতর হবে । কেননা রোযাদারের উচিত তার রোযাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ও সওয়াবকমিয়ে ফেলে এমন কিছু থেকে বেঁচে থাকা ।

প্রশ্ন

রোযা রাখার ক্ষেত্রে আমার একটি সমস্যা আছে। সেটি হল প্রতিদিন রোযা রাখার শুরুতে খাবারপাকস্থলি থেকে আমার কণ্ঠনালী পর্যন্ত উঠে যায়। কখনও কখনও কণ্ঠনালী অতিক্রম করে যায়। এটি প্রাত্যহিক ঘটে। এখন আমার কী করণীয়? আমি কি সেই দিনগুলোর রোযাপুনরায় রাখব? উল্লেখ্য, এ বিষয়টি রমযানের প্রতিদিন ঘটে।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

খাবারের অবিশিষ্টাংশ কিংবা কিছু তরল পাকস্থলি থেকে গলাতে উঠে আসা এটি মানুষের ইচ্ছায় ঘটে না। কিন্তু হতে পারে এটি রোগ। আবার হতে পারে পাকস্থলি ভরে যাওয়ার কারণে।

একে বলা হয় “ওগরানো”। যেক্ষেত্রে এটি ঘটে তার উপর ওয়াজিব হলো পারলে এটি মুখ থেকে ফেলে দেয়া। আর যদি ফেলে দিতে সক্ষম না হয় এবং এটি পাকস্থলিতে ফিরে যায় তাহলে কোন অসুবিধা নাই। রোযার উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না।

ইবনে হাযম (রহঃ) বলেছেন:

“গলা থেকে বের হয়ে আসা ‘ওগরানো’ রোযা নষ্ট করবে না; যতক্ষণ না এটি মুখে চলে আসার পরে ও ফেলে দিতে দিতে সক্ষম হওয়ার পরে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সেটাকে ফিরিয়ে নেনে।” [আল-মুহাল্লা (৪/৩৩৫) থেকে সমাণ্ড]

প্রশ্ন

সহবাস-উত্তরফরয গোসল করতে ফজর পর্যন্ত দেরী করা কি জায়েয? নারীদের ক্ষেত্রে হাযেযজনিতও নিফাসজনিত গোসল ফজর পর্যন্ত দেরী করা কি জায়েয?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি কোন নারী ফজরের পূর্বে পবিত্রতা দেখতে পান তাহলে রোযা রাখা তার উপর আবশ্যিক। তবে ফরয গোসল ফজর পর্যন্ত দেরী করতে কোন অসুবিধা নাই। তবে সূর্যোদয় পর্যন্ত দেরী করা যাবে না। অনুরূপ বিধান সহবাস-উত্তর ফরয গোসলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এমন ব্যক্তিও ফরয গোসল সূর্যোদয় পর্যন্ত দেরী করতে পারবে না। বরং পুরুষের উচিত অবিলম্বে গোসল করে নেয়া; যাতে করে ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করতে পারে।

প্রশ্ন

রমযান মাসের দিনের বেলায় নারীদের জন্য সুরমা ব্যবহার করা ও কিছু কসমেটিকস সামগ্রী ব্যবহার করার হুকুম কী? এসব জিনিস কি রোযাভঙ্গ করবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলেমদের সঠিক মতানুযায়ীসূরা লাগালে নারী পুরুষ কারো রোযা ভাঙ্গবে না। কিন্তু রোযাদারের জন্য এগুলোরাতে বেলায় ব্যবহার করা উত্তম। অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য সাবান, ওয়েলইত্যাদি যেসব জিনিস দিয়ে চেহারাকে সূশ্রী করা হয়; যেগুলো বাইরের ত্বকেরসাথে সম্পৃক্ত। যেমন- মেহেদী, মেকআপ করা ইত্যাদি। তবে মেকআপ করলে যদিচেহারার ক্ষতি হয় তাহলে ব্যবহার করা উচিত হবে না।

প্রশ্ন

যদি কারো দাঁতে ব্যথা হয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় এবংডাক্তার তার দাঁত স্কেলিং করে কিংবা ফিলিং করে কিংবা কোন একটি দাঁত তুলেফেলে— এগুলো কি তার রোযার ওপর কোন প্রভাব ফেলবে? যদি ডাক্তার তার দাঁতকেঅবশ করার জন্য কোন ইনজেকশন দেয় সেটা কি তার রোযার ওপর কোন প্রভাব ফেলবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রশ্নে যে বিষয়গুলোর কথাউল্লেখ করা হয়েছে রোযার শুদ্ধতার ওপর এসব কর্মের কোন (নেতিবাচক) প্রভাবনেই। বরং এগুলো ক্ষমার্হ। তবে তাকে সাবধান থাকতে হবে যাতে করে কোন ঔষধ বারুজ যেন গিলে না ফেলে। অনুরূপভাবে উল্লেখিত ইনজেকশনেরও রোযার শুদ্ধতার ওপর (নেতিবাচক) কোন প্রভাব নেই। যেহেতু এ ধরণের ইনজেকশন পানাহারের আওতায় পড়েনা। মূলবিধান হলো—রোযার শুদ্ধতা [উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহঃ)

মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত মুতানাওয়িয়া (১৫/২৫৯)

প্রশ্ন

রমযানের দিনের বেলায় মুখ পরিষ্কার করার জন্য টুথপেস্ট ব্যবহার করলে কি রোযা ভেঙ্গে যাবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি টুথপেস্ট গলার ভেতরেচলে না যায় তাহলে এটি রোযাকে নষ্ট করবে না। তবে, উত্তম হচ্ছে-- টুথপেস্টরাত্রে ব্যবহার করা। আর দিনে মিসওয়াক ব্যবহার করা।

আল্লাহ্ আমাদেরকে ও আপনাকে তাঁর ইবাদত করার তাওফিক দিন।

প্রশ্ন

আমি শুচিবায়ু (OOD) তে আক্রান্ত। রমযান মাসে আমি যখনওজু করতাম তখন বেশি বেশি থুথু ফেলতাম, এই ভয়ে না জানি গলার ভেতরে পানি চলেযায়। একবার আমি স্নায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ইচ্ছা করে পানি খেয়েফেলেছি। এখন আমি এ গুনার কাফফারা বা প্রতিকার কিভাবে করতে পারি?

একবার রমযানে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার মা বাদাম শুকাতেন। সে বাদামগুলোতিনি আমার পাশে রেখেছিলেন। আমি অনুভব করলাম যে, আমার মুখে কিছু একটা আছে; আমি জানি না, সেটা খাদ্যের অবশিষ্টাংশ; নাকি বাদাম। আমি উঠে গিয়ে কুলি করবএই অলসতা থেকে গিলে ফেলেছি। এখন আমার কি করণীয়?

অপর এক রম্যানে আমার মুখের ভেতরে কিছু ওয়ুর পানি রয়ে গিয়েছিল। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সে পানি গিলে ফেলেছি।

সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে— যে ব্যক্তি উঠে গিয়ে কুলি করার অলসতা থেকে বমি গিলে ফেলেছে তার ব্যাপারে লুকুম কি?

আমি এখন স্তন্যদায়ী। আমি আল্লাহর কাছে তওবা করেছি। আমি কিভাবে আমার পাপের কাফফারা বা প্রতিকার করতে পারি?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

আপনার উপর ফরয হচ্ছে— যে দিনগুলোর রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করেছেন সেগুলোর কাযা পালন করা; সেটামুখে থাকা পানি গিলে ফেলার মাধ্যমে হোক, যে পানি থুথুর পানি নয়; কারণ থুথুরপানি গিলে ফেললে রোযা ভাঙবে না কিংবা মুখে থাকা খাদ্যের অবশিষ্টাংশ গিলেফেলার মাধ্যমে হোক কিংবা মুখে চলে আসা বমি গিলে ফেলার মাধ্যমে হোক। আপনি এমন দিনগুলোর সংখ্যা নির্ধারণ করবেন এবং সে দিনগুলোর কাযা রোযা পালন করবেন। পাশাপাশি স্বেচ্ছায় আপনি যা করেছেন সেটার জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে তওবাকরবেন। এ রোযাগুলোর কাযা পালন করা দুধ পান করানোর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ফরয হবে। কারণ স্তন্যদায়ী নারীর জন্য রোযা রাখাটা কষ্টকর হলে কিংবা এতে নিজের স্বাস্থ্যহানির আশংকা হলে কিংবা সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকা হলে দুধ পান করানোর মেয়াদের মধ্যে কাযা রোযা পালন করা তার উপর ফরয নয়। আর আপনি কঠিন শুচিবায়ু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া এবং মায়ুবিক চাপে থাকা: আমরা আশা করছি এক্ষেত্রে আপনার কোন দোষ নেই। তবে, ওয়াসওয়াসা বা শুচিবায়ু রোধকরার চেষ্টা করা আবশ্যিকীয় এবং এটার প্রতি ভ্রক্ষেপ না করা। কারণ শুচিবায়ুর চিকিৎসার সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে— এটাকে গুরুত্ব না দেয়া ও এর প্রতিভ্রক্ষেপ না করা এবং এর চাহিদামাফিক কিছু না করা। শুচিবায়ুর চিকিৎসার ব্যাপারে জানতে দেখুন: 111929 নং ও 60303 নং প্রশ্নোত্তর। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনি বলেছেন: “ একবার আমি মায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ইচ্ছা করে পানি খেয়ে ফেলেছি”।

আপনি যদি এর দ্বারা বুঝাতে চান যে, আপনার মুখে কুলির যে পানি রয়েছে সেটাবা সেটার কিছু অংশ গিলে ফেলেছেন: তাহলে আপনার রোযা ভেঙ্গে গেছে। এক্ষেত্রে আপনার উপর ফরয হল— তওবা করা এবং সে দিনের রোযার কাযা পালন করা।

আর আপনি যদি এর দ্বারা বুঝাতে চান যে, কুলি করার পর মুখের পানি বাহিরে ফেলে দিয়ে থুথু গিলে ফেলেছেন: তাহলে আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়। বুজাইরিমি (রহঃ) তার ‘হাশিয়াতে’ (২/৩৭৮) বলেন: “ গড়গড়া কুলি করার পর থুথুফেলে দেয়া সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও গিলে ফেললে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু এর থেকে বেঁচে থাকা কঠিন।” [সমাণ্ড]

অনুরূপভাবে আপনি বলেছেন: “ আমার মুখের ভেতরে ওয়ুর কিছু পানি রয়ে গিয়েছিল”:

যদি এই পানিটি কুলির পানি হয় তাহলে আপনার রোযা ভেঙ্গে গেছে। আপনাকে এর কাযা পালন করতে হবে।

আর যদি কুলি করার পর ও মুখ থেকে পানি ফেলে দেয়ার পর মুখে যে আর্দ্রতাথাকে সেটা হয়ে থাকে: তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়।

তিন:

যদি কেউ তার দাঁতের মাঝে আটকে থাকা খাবার ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলে; যা সেবের করে ফেলতে সক্ষম, তাহলে এর দ্বারা তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলে; যেমন থুথুর সাথে গলার ভেতরে চলে গেল, এটাকে ফিরাতে পারল না; তাহলে তার রোযা সহিহ। তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়।

প্রশ্নকারী বোনের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে থাকাখাবার গিলে ফেলেছেন এবং উঠে গিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে অলসতা করেছেন। যদি সেটা রাতের বেলায় ঘটে থাকে তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে না। আর যদি ফজর হওয়ার পর ঘটে থাকে তাহলে তাকে আল্লাহর কাছে তওবা করার পাশাপাশি সেদিনের রোযা কাযা পালন করতে হবে।

চার:

যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি চলে এসেছে; তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়, তার রোযা সহিহ। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করেছে তাকে রোযাটি কাযাপালন করতে হবে।

যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি আসার পর তিনি বমি গিলে ফেলেছেন; যদি তিনি সেটা অনিচ্ছাকৃতভাবে করে থাকেন তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলেন তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে গেল এবং তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক। স্থায়ী ক্রিমটির আলেমগণ বলেন: যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি বমি এসে যায় তাহলে তার রোযানষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি গিলে ফেললেও রোযা নষ্ট হবেনা। [ফাতাওয়াল লাজনা দায়িমা (১০/২৫৪)]

প্রশ্ন

রমযান মাসে নন-ইমার্জেন্সি অপারেশনের ব্যাপারে আমার প্রশ্ন। যে অপারেশনের কারণে কিছুদিন রোযা ভাঙতে হবে; এটা কি জায়েয? উল্লেখ্য, অপারেশনটি করাতে রমযানের পর পর্যন্ত দেৱী করলে সার্জন ডাক্তারের ভ্রমণ ও আমার কর্মগত পরিস্থিতির কারণে সুযোগ ছুটে যেতে পারে।

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

যদি রমযানের পর পর্যন্ত দেৱী করলে রোগ বেড়ে যেতে পারে বা আরোগ্য লাভ বিলম্ব হতে পারে; যার ফলে রোগীর কষ্ট হবে কিংবা দেৱী করলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে; যেমন- বিকল্প এপয়েন্টমেন্ট অনেক পরে ছাড়া না পাওয়া কিংবা অভিজ্ঞ ডাক্তার ছুটে যাওয়া; এমন অবস্থাগুলোর প্রেক্ষিতে রমযান মাসে অপারেশন করাতে কোন সমস্যা নেই। যদি অপারেশনের কারণে রোযা ভাঙতে হয় তবুও।

আর যদি রমযানের পর অপারেশনটি করলে তেমন কোন সমস্যা বা কষ্ট না থাকে সেক্ষেত্রে এ অপারেশনের জন্য রোযা ভাঙা জায়েয হবে না। কারণ রমযানের রোযা একটি ফরয ইবাদত; তাই বিলম্বে সম্পাদন করা যায় এমন বিষয়ের জন্য ফরয ইবাদত বর্জন করা যাবে না।

এ উত্তর আমাদের শাইখ আব্দুর রহমান আল-বার্রাক যা বলেছেন সেটার সার-সংক্ষেপ।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

অ্যানেসথেসিয়া ইনজেকশনের কারণে কি রোযা ভাঙবে?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

লোকাল এ্যানেসথেসিয়া (শরীরের অংশবিশেষ অবশকরণ) ইনজেকশন দিলে রোযাভঙ্গবে না। যেহেতু এটি পানাহার নয় কিংবা পানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয়।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: রমযানের দিনের বেলায়দাঁত অবশ করার জন্য যে এ্যানেসথেসিয়া দেয়া হয় সে সম্পর্কে? জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এ্যানেসথেসিয়া গ্রহণ করলে সে দিনের রোযা কি কাযা পালন করতে হবে?

জবাবে তিনি বলেন: না; কেননা এ্যানেসথেসিয়া রোযা ভঙ্গ করে না। লোকালএ্যানেসথেসিয়া যে স্থানে দেয়া হয় শুধু সে স্থানটিকে অবশ করে; এটিপাকস্থলিতে পৌঁছে না। সুতরাং কেউ নফল রোযাদার হন কিংবা ফরয রোযাদার হন তিনিযদি এ্যানেসথেসিয়া গ্রহণ করেন তার রোযা শুদ্ধ।[ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারবথেকে সংকলিত]

দেখুন: ফাতাওয়াস শাইখ বিন বায (১৫/২৫৯)

কিন্তু, জেনারেল এ্যানেসথেসিয়া (পুরোপুরি অজ্ঞান করা) প্রয়োগ করা হলেএবং এতে রোগী গোটা দিন সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকলে তার উপর সে দিনের রোযা কাযাপালন করা আবশ্যিক হবে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: “ যদি কেউ সম্পূর্ণ দিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকে; কিছু সময়ও সজ্ঞান অবস্থায় না কাটায় তাহলে আমাদের ইমাম ও শাফেয়ির অভিমতঅনুযায়ী তার রোযা শুদ্ধ হবে না।” এরপর বলেন: “ অজ্ঞান ব্যক্তি যদি দিনের অংশবিশেষে জ্ঞান ফিরে পান, দিনের প্রথমাংশে হোক কিংবা শেষাংশে হোক তাহলে তাররোযা শুদ্ধ হবে।” [আল-মুগনি (৩/১২)]

এ আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, রোযাদার যদি দিনের বেলায় এ্যানেসথেসিয়াইনজেকশন গ্রহণ করে তবুও তার রোযা শুদ্ধ হবে। এ ইনজেকশন নেয়ার কারণে তাররোযা বাতিল হবে না। আর যদি এ ইনজেকশন ফজরের আগে গ্রহণ করে এবং ইনজেকশনেরপ্রভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায় তাহলে তার ঐ দিনের রোযা শুদ্ধ হবে না।

আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

আমি একটি কফি প্রস্তুতকারককোম্পানীতে চাকুরী করি। অনেক সময় আমরা কফির স্বাদ ও ঘ্রাণ যাচাই করার জন্যকফি চেখে দেখি। আমি জানি যে, রোযা রেখে চেখে দেখা জায়েয আছে; যদি খাবারভিতরে না যাওয়া নিশ্চিত করা যায়। যখন আমি কফি চেখে দেখি তখন অতি সাবধানতাবলম্বন করি; যাতে সামান্য পরিমাণও গিলে না ফেলি। কিন্তু চেখে দেখার কারণেমুখের মধ্যে কফির স্বাদ ও ঘ্রাণ থেকে যায়। রোযা রেখে এভাবে চেখে দেখলে কিরোযা নষ্ট হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি কোন রোযাদারের খাবারচেখে দেখার প্রয়োজন পড়ে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। এতে রোযার কোন ক্ষতিহবে না; যদি খাদ্যের কোন অংশ পেটের ভিতরে ঢুকে না যায়। এক্ষেত্রে কফি বাঅন্য কোন খাবার সবই সমান। যদি প্রয়োজন ছাড়া খাবার চেখে দেখা মাকরুহ; তবেএতে করে রোযা নষ্ট হবে না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: পাতিলের খাবার বা কোন কিছু চেখে দেখতে কোন অসুবিধা নেই।[বুখারীতে তালীক হিসেবে এসেছে]

ইমাম আহমাদ বলেন: খাবার চেখে দেখা বর্জন করাটাই আমার নিকট পছন্দনীয়। তবেযদি চেখে দেখে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। [আল-মুগনি (৪/৩৫৯)]

ইবনে তাইমিয়া 'ফাতাওয়া কুবরা' (৪/৪৭৪) গ্রন্থে বলেন: প্রয়োজন ছাড়া খাবার চেখে দেখা মাকরুহ; তবে এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। [সমাণ্ড]

শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল (ফাতাওয়াস সিয়াম, পৃষ্ঠা- ৩৫৬): খাবারচেখে দেয়ার কারণে কি রোযা বাতিল হবে? উত্তরে তিনি বলেন: যদি খাবার গিলে নাফেলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া এটি করা যাবে না। এমতাবস্থায় যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু খাবার পেটে ঢুকে যায় এতে করে আপনারোযা ভঙ্গ হবে না। [সমাণ্ড]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রতে (১০/৩৩২) এসেছে-

প্রয়োজন হলে রমযানের দিনের বেলায় খাবার চেখে দেখতে কোন অসুবিধা নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু গিলে না ফেললে রোযা শুদ্ধ হবে। [সমাণ্ড] ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে না ফেললে কেবল খাবারের ঘ্রাণ বা স্বাদ মুখে থেকে যাওয়ার কারণে রোযার উপর কোন প্রভাব পড়বে না। ইবনে সিরিন বলেন: কাঁচা মিসওয়াক ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই অর্থাৎ রোযাদারের জন্য। জিজ্ঞেস করা হলো- কাঁচা মিসওয়াকের তেবিশেষ একটা স্বাদ আছে। তিনি বলেন: পানিরও তো একটা স্বাদ আছে। আপনি তো পানিদিয়ে কুলি করে থাকেন।

শাইখ ইবনে উছাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল (৩/২৬১):

খিজুর, রুটি, বোল ইত্যাদি কোন খাবার প্রয়োজন ছাড়া চেখে দেখা মাকরুহ। প্রয়োজন থাকলে অসুবিধা নেই। এর কারণ হচ্ছে- খাবারের কিছু অংশ পেটে চলে যেতে পারে; হয়তবা ব্যক্তি নিজেও উপলব্ধি করতে পারবে না। এভাবে এ খাবার চেখে দেখা তার রোযাকে নষ্ট হওয়ার সম্মুখীন করে দিতে পারে। অন্যদিকে খাবারটি অতিস্বাদু হলে মজা নেয়ার জন্য আবার চেখে দেখতে পারে, হতে পারে খুব জোরে টানদিতে গিয়ে খাবারের কিছু অংশ পেটের ভিতরে চলে যাবে।

প্রয়োজনের স্বরূপ- যেমন কেউ যদি বাবুর্চি হন; যাকে খাবারের লবণ বা স্বাদ যাচাই করতে হয়; এ জাতীয় কোন প্রয়োজন। সমাণ্ড

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, রোযা রেখে আপনি কফি চেখে দেখতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ এর প্রয়োজন রয়েছে। যাতে এর কোন অংশ গলার ভিতরে চলেনা যায় সে ব্যাপারে আপনাকে সাবধান থাকতে হবে।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

গোসল করলে কি রোজা ভেঙ্গে যাবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোযাদারের জন্য গোসল করা বৈধ। গোসল রোযার উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।

ইবনে কুদামা 'আল-মুগনি' (৩/১৮) গ্রন্থে বলেন:

রোযাদারের জন্য গোসল করতে কোন অসুবিধা নেই। তিনি বুখারি (১৯২৬) ও মুসলিম (১১০৯) কর্তৃক সংকলিত এবং আয়েশা ও উম্মে সালামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসদিয়ে দলিল দেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপবিত্র থাকার অবস্থায় ফজর হয়ে যেত; এরপর তিনি গোসল করতেন ও রোযা রাখতেন।

আবু দাউদ জনৈক সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি দেখেছি যে, রোযা রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিপাসার কারণে অথবা গরমের কারণে মাথায় পানি ঢালছেন। [আলবানি সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

‘আউনুল মাবুদ’ গ্রন্থে বলা হয়:

এতে দলিল পাওয়া যায় যে, রোযাদারের জন্য গায়ের কিছু অংশে অথবা সারা শরীরে পানি ঢেলে গরম দূর করা জায়েয আছে। জমহুর আলেম এ মতই পোষণ করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা ফরজ গোসল, মুস্তাহাব গোসল বা জায়েয গোসলের মধ্যে পার্থক্য করেন না। সমাপ্ত

ইমাম বুখারি বলেন:

রোযাদারের গোসল করা শীর্ষক পরিচ্ছেদ। ইবনে উমর রোযা থাকা অবস্থায় কাপড়ভিজিয়ে সেটা গায়ে দিয়েছেন। ইমাম শাবী রোযা রেখে হাম্মামখানা বা গোসলখানাতে প্রবেশ করেছেন... হাসান বলেন: গড়গড়া কুলি করা ও ঠাণ্ডার জন্য গোসল করারোযাদারের জন্য জায়েয।

হাফেয ইবনে হাজার বলেন:

তাঁর বাণী: “রোযাদারের গোসল করা শীর্ষক পরিচ্ছেদ” অর্থাৎ গোসল করা জায়েয শীর্ষক পরিচ্ছেদ। আল-যাইন ইবনুল মুনাযির বলেন: ইমাম বুখারি বিশেষ কোন গোসলের কথা উল্লেখ না করে সাধারণভাবে গোসলের কথা বলেছেন; যাতে করে এর মধ্যে- সুলত গোসল, ফরজ গোসল ও জায়েয গোসল অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এর মাধ্যমে তিনি যেন, সেদিকে ইঙ্গিত করতে চাচ্ছেন যা রোযাদারের গোসলখানায় প্রবেশ করার নিষিদ্ধতার ব্যাপারে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। সে বর্ণনাটি আব্দুর রাজ্জাক সংকলন করেছেন; বর্ণনাটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে। সমাপ্ত

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রমযানের দিনের বেলায় স্ত্রীর পাশে ঘুমানো কি স্বামীর জন্য জায়েয?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

হ্যাঁ; এটি জায়েয। বরঞ্চ স্বামীর জন্য সহবাস ব্যতীত বা বীর্যপাতব্যতীত নিজের স্ত্রীকে উপভোগ করাজায়েয আছে।

ইমাম বুখারি (১৯২৭) ও মুসলিম (১১০৬) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রেখে স্ত্রীকে চুম্বন করতেন; স্ত্রীর সাথে মুবাশারা (আলিঙ্গন) করতেন। এবং তিনি ছিলেন তাঁর যৌনকাজ্ঞাকে নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে সক্ষম ব্যক্তি।

সিন্দিবলেন:

তাঁর কথা: ইউবায়ির (ببائش) বা মুবাশারা করতেন এ কথার অর্থ হচ্ছে- স্ত্রীর চামড়ার সাথে তার চামড়া ছোঁয়ানো। যেমন- গালের উপর গাল রাখা এবং এ জাতীয় কিছু।

উদ্দেশ্য হচ্ছে- চামড়ার সাথে চামড়া লাগানো। এখানে মুবাশারা দ্বারা-সহবাস উদ্দেশ্য নয়।

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

রোযাদার স্বামীর জন্য রোযাদার স্ত্রীর সাথে কি কি করা জায়েয?

উত্তরে তিনি বলেন:

ফরজ রোযা পালনকারী স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর সাথে এমন কিছু করা জায়েয হবে না; যাতে করে তার বীর্যপাত হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে সবমানুষ এক রকম নয়। কারো বীর্যপাত দ্রুত হয়ে যায়; আবার কারো ধীরেধীরে হয় এবং সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা রাখে। যেমনটি আয়েশা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি ছিলেন স্বীয় যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে সক্ষম ব্যক্তি।

আবার কিছু লোক আছে যারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; তার বীর্যপাত দ্রুত হয়ে যায়। এমন ব্যক্তি ফরজ রোযা পালনকালে তার স্ত্রীকে চুম্বন করা, আলিঙ্গন করা ইত্যাদির মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ হওয়া থেকে তাকে সাবধান থাকতে হবে। আর যদি ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে জানে যে, সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তাহলে তার জন্য স্ত্রীকে চুম্বন করা ও জড়িয়ে ধরা জায়েয আছে; এমনকি ফরয রোযার মধ্যেও। তবে, সাবধান! সহবাসের ব্যাপারে সাবধান! রমযান মাসে যার উপর রোযা রাখা ফরজ সে যদি সহবাসে লিপ্ত হয় তাহলে তার উপর পাঁচটি বিষয় অবধারিত হবে:

এক: গুনাহ।

দুই: রোযা ভেঙ্গে যাওয়া।

তিন: দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকা ফরজ। যেকোন ব্যক্তি কোন শরয়ি ওজর ছাড়া রমযানের রোযা ভঙ্গ করবে তার উপর বিরত থাকা ও সেদিনের রোযা কাযা করা ফরজ।

চার: সেদিনের রোযা কাযা করা ফরয। কারণ সে ব্যক্তি একটি ফরয ইবাদত নষ্ট করেছে; যার কারণে তার উপর এ ইবাদত কাযাকরা ফরজ।

পাঁচ: কাফফারা দেয়া। এ কাফফারা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাফফারা: একজন কৃতদাস আযাদ করা। কৃতদাস না পেলে লাগাতার দুইমাস রোযা রাখা। সেটাও করতে না পারলে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো।

আর যদি রোযা টি ফরজ রোযা হয় তবে রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে; যেমন যে ব্যক্তি রমযানের কাযা রোযা পালন করছে; এমন রোযা ভঙ্গ করলে দুইটি বিষয় অবধারিত হবে: গুনাহ ও রোযাটি কাযা করা। আর যদি রোযাটি নফল রোযা হয় তাহলে কোন কিছু আবশ্যিক হবে না। সমাপ্ত

প্রশ্ন

রোজাদারের জন্য কিদন্ত-চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জায়েয আছে? আমার দাঁতের চিকিৎসা করা একান্তজরুরী। আমি যদি রমজানের দিনের বেলায় রোজা রেখে দন্ত চিকিৎসকের কাছে যাই- এরহুকুম কি? যদি কোন কিছু গলার ভিতরে চলে যায় এবং আমি গিলে ফেলি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শাইখ আব্দুল আযিয বিনবায়কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যদি কোন ব্যক্তি দাঁতে ব্যথা নিয়েদন্ত চিকিৎসকেরশরণাপন্ন হয় এবং ডাক্তার তার দাঁতে স্কিলিং করে, অথবা ফিলিং করে অথবা কোনএকটি দাঁত ফেলে দেয়- এতে করে কি তার রোজার ক্ষতি হবে? যদি ডাক্তার তার দাঁতঅবশ করার জন্য ইনজেকশন দেয় সেক্ষেত্রে রোজার উপর এর কোন প্রভাব আছে কি?

উত্তরে তিনি বলেন: প্রশ্নে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে রোজার উপর এর কোনপ্রভাব নেই। বরং এটি করা যেতে পারে। তবে এ রোগীকে ঔষধ বাকোন কিছু গিলে ফেলাথেকে সাবধান থাকতে হবে। অনুরূপভাবে যে ইনজেকশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছেরোজার শুদ্ধতার ক্ষেত্রে সেটারও কোন প্রভাব নেই। যেহেতু এ ইনজেকশন পানাহারের পর্যায়ে পড়ে না এবং যেহেতু রোজাভঙ্গকারী কিছু সাব্যস্ত না হলে রোজা শুদ্ধ হওয়াটাই মূল বিধান। সমাণ্ড [আজওয়িবা মুহিম্মা তাতআল্লাকু বিআরকানিল ইসলাম]

আর যদি রাতের বেলায় ডাক্তার দেখানো সম্ভব হয় তাহলে সেটাই ভাল।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

একবার সেহেরীর পূর্বে আমারস্বপ্নদোষ হয়। কিন্তু আমি গোসল করতে পারিনি। গোসল করতে আমার তীব্র লজ্জাবোধছিল। কারণ আমার পিতামাতা জেনে যাবে যে, আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে। তাই গোসলনা করে আমি সেহেরী খেয়েছি। দুঃখজনক হল সেদিন আমি ফজরের নামাযও পড়িনি। তবেপরবর্তীতে গোসল করে আমি ফজরের নামায পড়েছি। আমি জানতে চাচ্ছি, আমার সেরোজাটা কি কবুল হয়েছে? কারণ আমার ধারণা হচ্ছে- আমি (স্বপ্নদোষজনিত) অপবিত্রঅবস্থায় সেহেরী খেয়ে ভুল করেছি। আমার রোজা কি কবুল হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কেউ যদি রাতের মধ্যে স্ত্রী সহবাস করে এবং অপবিত্র অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়েযায় তার রোজা শুদ্ধ হবে; অনুরূপভাবে রাতের বেলা অথবা দিনে ঘুমের মধ্যে কেউযদি অপবিত্র হয়ে যায় তার রোজাও শুদ্ধ হবে। বিলম্ব করে ফজর শুরু হওয়ার পরেগোসল করতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু কেউ যদি রমজানের দিনের বেলায় অর্থাৎফজরের পর থেকে সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে স্ত্রী সহবাস করে তাররোজা নষ্ট হয়।[স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/৩২৭)]

তবে দেরি করে সূর্যোদয়ের পর নামায আদায় করাআপনার জন্য হারাম। আপনার উপর ফরজ ছিল যথাসময়ে নামায আদায় করা। আপনার তীব্রলজ্জা এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কোন ওজর নয়; যার কারণে নামায আদায়ে এ বিলম্বকরা যেতে পারে। এখন আপনার কর্তব্য হচ্ছে- এ গুনাহ থেকে তওবা করা, ইস্তিগফারকরা (ক্ষমা প্রার্থনা করা)। আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাকে সকল ভাল কাজ করারতাওফিক দিন।

প্রশ্ন

রমজান মাসের আগমন উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় করা কি জায়েয আছে? নাকি এটা বিদআতের পর্যায়ে পড়বে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমজান মাসের আগমন উপলক্ষেশুভেচ্ছা বিনিময় করতে কোন দোষ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামতঁার সাথীবর্গকে রমজান মাস আগমনের সুসংবাদ দিতেন। তাদেরকে রমজানের ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেবর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ তোমাদের নিকট মোবারকময় রমজান মাস এসেছে। আল্লাহ তাআলা এ মাসে রোজা রাখা তোমাদের উপরফরজ করেছেন। এ মাসে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের

দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। উদ্ধত শয়তানগুলোকে শিকল পরানো হয়। এ মাসে এমন একটি রজনী রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি এ মাসের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় সে আসলেই বঞ্চিত। [সুনানে নাসাঈ (৪/১২৯), সহিহ তারগীব গ্রন্থে ১/৪৯০ হাদিসটি রয়েছে]

সাবউনা মাসয়ালা ফিস সিয়াম

প্রশ্ন

রাতের বেলা সহবাস করার পর কখনো কখনো দিবাভাগে জরায়ু থেকে বীর্য বের হয়, এতে কি রোজা ভঙ্গ হবে? এমতাবস্থায় নামাযের জন্য গোসল করা কি ফরজ হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক:

রাতের বেলা সহবাস করার পরদিনে যদি বীর্য বের হয় এতে রোজা ভঙ্গ হবে না। আমাদের জন্য সূর্যাস্ত থেকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস বৈধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানত করেছিলে, তবে তিনি তোমাদের তওবা গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা নিজ স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু লিখে রেখেছেন তা (সন্তান) তালাশ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো সুতা থেকে ভোরের শুভ্র সুতা পরিষ্কার ফুটে উঠে।...[সূর্যাবাকারা, আয়াত:১৮৭]

রাতে সহবাস করার কারণে দিনের বেলায় বীর্য বের হলে রোজা ভঙ্গ হবে না মর্মে আলেম সমাজ উল্লেখ করেছেন।

হানাফিমাযহাবের “আল-জাওহারাআল-নাইমিয়া” গ্রন্থ (১/১৩৮) বলা হয়েছে-

“যদি সহবাসকারী ফজরের সময় হুযুওযার আশংকা থেকে অঙ্গটি বের করে নেয় এবং ফজরের সময় শুরু হওয়ার পর বীর্যপাত করে এতে করে তার রোজা ভঙ্গ হবে না।” সমাপ্ত

মালেকি মাযহাবের “হাশিয়াতুদদুসুকি” গ্রন্থ (১/৫২৩) বলা হয়েছে-

কেউ যদি রাতের বেলায় সহবাস করে আর ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর তার বীর্যপাত হয়; প্রতীয়মান অভিমত হচ্ছে-এতে কোন অসুবিধা নেই। এ মাসয়ালা সে মাসয়ালার মত ‘কেউ যদি রাতের বেলায় সুরমা লাগিয়ে থাকে সে সুরমা যদি দিনের বেলায় তার গলায় এসে যায়’ সমাপ্ত। অনুরূপ অভিমত ‘শরহু মুখতাসারিখিলিল’ গ্রন্থ (২/২৪৯)তে ও রয়েছে।

শাফেইমাযহাবের আলেম ইমাম নববিতাঁর ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থ (৬/৩৪৮) এ বলেছেন-

“যদি কেউ ফজরের আগ থেকে সহবাস শুরু করে এবং ফজরের ওয়াক্তের সাথে সাথে অথবা ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার অনতিবিলম্বে অঙ্গটি বের করে বীর্যপাত করে তাহলে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ এ বীর্যপাত বৈধ সহবাসের কারণে ঘটেছে। একারণে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। যেমন- “কেউ যদি কিসাস হিসেবে কারো হাত কাটে; ফলে লোকটি মারা যায়।” সমাপ্ত।

দুই:

যদি সহবাস করে গোসল করে ফেলার পর বীর্ষপাত হয় সেক্ষেত্রে পুনরায় গোসলকরা ফরজ নয়। কারণ গোসল ফরজ হওয়ার কারণ তো একটি। সুতরাং এক কারণে দুইবার গোসল ফরজ হবে না। তবে যদি নতুন কোন উত্তেজনার কারণে বীর্ষটি বের হয় তাহলে গোসল ফরজ হবে।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

রোজাকালে ব্রাশ ও টুথপেস্টদিয়ে দাঁতমাজা কি জায়েয হবে? আমার জানামতে যদি টুথপেস্ট পেটে না যায় (গিলেনা ফেলে) তাহলে জায়েয। আশা করি এ বিষয়ে আপনার মতামত দিবেন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

টুথপেস্ট ব্যবহার করার বিষয়ে মাননীয় শাইখ বিন বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনিবলেন: “ যদি কোন কিছু গিলে ফেলা না হয় এতে কোন অসুবিধা নেই; যেমন মিসওয়াকব্যবহার করা শরিয়তসঙ্গত।” [ফাতাওয়াস শাইখ বিন বায (৪/২৪৭)]

শাইখ মুহাম্মদ সালেহ উছাইমীন বলেন:

এ মাসযালার শাখা মাসযালা হচ্ছে- রোজাদারের জন্য ব্রাশ ও টুথপেস্ট ব্যবহার করা কি জায়েয হবে? নাকি হবে না?

জবাব: জায়েয হবে। তবে উত্তম হচ্ছে- টুথপেস্টব্যবহার না করা। কারণ টুথপেস্টের মধ্যে গলার ভিতরে ও নীচের দিকে চলে যাওয়ারশক্তি প্রবল। তাই দিনের পরিবর্তে রাতে টুথপেস্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। [শাইখ উছাইমীনের “আল-শারহুল মুমতি” (৬/৪০৭, ৪০৮)]

প্রশ্ন

প্রশ্ন: মুখ সুগন্ধিময় করার জন্য ফামেসীতে বিশেষধরণের পারফিউম পাওয়া যায়। সেটা এক ধরণের স্প্রে। রমজান মাসে দিনের বেলায়মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে এ ধরণের পারফিউম ব্যবহার করা জায়েয আছে কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোজা অবস্থায় মুখসুগন্ধিকর এই স্প্রের পরিবর্তে মিসওয়াক করাই যথেষ্ট। মিসওয়াক করার ব্যাপারেনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেছেন। তবে কেউ যদি এইস্প্রে ব্যবহার করে এবং সেটা তার গলার ভিতরে না পৌঁছে, তবে এতে কোন অসুবিধানেই। এখানে উল্লেখ্য, রোজার কারণে রোজাদারের মুখে সৃষ্ট গন্ধকে অপছন্দ করাউচিত নয়। কারণ এটি আল্লাহ তাআলার একটি পছন্দনীয় আনুগত্য পালনের আলামত। হাদিসে রয়েছে-

(خُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ)

“ রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুবাসের চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।”

রোজা ভঙ্গের কারণসমূহ

প্রশ্ন

আমি হিজাব পরিধান করি না; এতে করে কি আমার রমযানের রোযা নষ্ট হয়ে যাবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

এক:

একজন মুসলিম নারী হিজাবপরতে আদিষ্ট। ইতিপূর্বে এই ওয়েবসাইটের একাধিক প্রশ্নোত্তরে হিজাবের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। সে প্রশ্নোত্তরগুলোতে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে কোনটি ছিল হিজাবের হুকুম বর্ণনা করা তথা হিজাব করা ওয়াজিব যেমনটি এসেছে 21536 নং প্রশ্নোত্তরে। কোন কোন প্রশ্নোত্তরে হিজাব ওয়াজিব হওয়ার দলিলগুলো আলোচিত হয়েছে। যেমন 13998 নং ও 11774 নং প্রশ্নোত্তরে। কোন কোন প্রশ্নোত্তরে হিজাবের শরয়ি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। যেমন 6991 নং প্রশ্নোত্তরে। আবার কোন কোন প্রশ্নোত্তরে মুসলিম নারীর জীবনে হিজাবের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

দুই:

কোন নারী যদি হিজাব না করেন তাহলে তিনি স্বীয় প্রভুর অবাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু তার রোযা সহিহ। কেননা পাপগুলো রোযাকে নষ্ট করে না; হিজাব না-করাও একটি পাপ। তবে পাপ রোযার সওয়াবেঘাটতি করে এবং হতে পারে গোটা সওয়াবই নষ্ট করে দেয়।

আমার আপনাকে রোযা রাখার পাশাপাশি হিজাব করার আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ রোযার উদ্দেশ্য কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকা নয়। বরং রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে- হারাম সবকিছু থেকে বিরত রাখা। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “পানাহার থেকে বিরত থাকা রোযা নয়; বরং অনর্থক ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকাই রোযা।” [মুস্তাদরাকে হাকিম, আলবানী 'সহিছুল জামে' গ্রন্থে (৫৩৭৬) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

অতএব আপনার রোযা রাখা যেন আপনাকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ধাবিত করে ও নিষেধ থেকে দূরে রাখে।

আমরা আল্লাহ্ কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনাকে তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টিজনক আমলগুলো করার তাওফিক দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

আমি প্রায় দুই মাস আগে সন্তান প্রসব করেছি। এখনও নিফাসের রক্ত বন্ধ হয়নি। রেডিওগ্রাফার ডাক্তার পরীক্ষা করে আবিষ্কার করলেন যে, জরায়ুর ভিতরে বাচ্চার প্লাসেন্টার একটি টুকরো রয়ে গেছে। এটি দূর করার জন্য আমি অপারেশন করিয়েছি। অপারেশন করিয়েছি রমযানের এক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর। অপারেশনের পর থেকে আমি রোযা রাখছি। যদিও রক্তপাত এখনও বন্ধ হয়নি। এখন আমি কি করব? আমার রোযা রাখা কি সঠিক? এখন কি সহবাস করা যাবে; অপারেশনের পরে রক্তপাত এখন একেবারে কম।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

নিফাসের সর্বোচ্চ সীমা চল্লিশ দিন। চল্লিশ দিন পর নারী পবিত্র হয়ে যাবেন। তিন রোযা রাখবেন, স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে; এমনকি যদি রক্তপাত হয়তবুও। চল্লিশ দিন পরের রক্তপাত রক্তক্ষরণ হিসেবে গণ্য হবে; নিফাস হিসেবে নয়।

ইতিপূর্বে এ বিষয়টি দলিলসহ বিস্তারিত [106464](#) নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব, অপারেশনের পর আপনার রোযা রাখা সঠিক; এমনকি রক্তপাত চলমান থাকলেও।

রমযান মাসের যে এক সপ্তাহ আপনি রোযা রাখেননি সেগুলো কাযা করা আপনার উপর আবশ্যিক।

আর চল্লিশ দিন পর থেকে যে নামাযগুলো আপনি পড়েননি সেগুলো ইনশাআল্লাহ্ কাযা করা আপনার উপর আবশ্যিক নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

রমযান মাসে **polident** নামক দাঁতের আঠা ব্যবহার করা কি জায়েয; উল্লেখ্য এর কোন ঘ্রাণ বা স্বাদ নেই।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

উল্লেখিতদাঁতের আঠা ও সমজাতীয় আঠাগুলো সাধারণতঃ দাঁতের মাড়ির ওপর ডেন্টালইমপ্লান্টকে অনড়ভাবে বসানোর জন্য, মুখের ভেতরে এর নড়াচড়া রোধ করার জন্য এবং চিবানো ও কথা বলার সময়ে অবিচল রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়।

রোযা অবস্থায় এটি ব্যবহার করার হুকুম নিম্নোক্তবিষয়ের ওপর নির্ভর করে: এই আঠা কি মুখের ভেতরে দ্রবীভূত হয় বা এর থেকে কোন ক্ষুদ্রাংশ কি ভাঙ্গে; নাকি এমনটি ঘটে না?

এটি জানা যাবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কিংবা বিশেষজ্ঞদেরকে জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে।

জনৈক ডেন্টাল বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাদেরকে জানান যে, সাধারণতঃ এ আঠা থেকে কোন কিছু দ্রবীভূত হয় না, মুখের ভেতরে এর কোন কিছু গলে না এবং কোন ক্ষুদ্রাংশ ভাঙ্গে না। কারণ সাধারণতঃ এটি ইমপ্লান্টের ফাঁকা জায়গার ভেতরে দেয়া হয়। এরপর এর মাধ্যমে মাড়ির ওপরে ইমপ্লান্টটি মজবুতভাবে বসে থাকে, যে জন্য এটাকে তৈরী করা হয়েছে।

ইমপ্লান্টটি খোলার সময় কিংবা এটি স্থান থেকে নড়ে গেলে এর ক্ষুদ্রাংশ ভাঙ্গার সম্ভাবনা তৈরী হয়। সেক্ষেত্রে এই আঠালো উপাদানের ভঙ্গাংশগুলো ছুটে ছুটে মুখে জমা হয়। এই ক্ষুদ্রাংশগুলো মুখে জমিয়ে কোন কষ্ট ছাড়া খুব সহজে মুখ থেকে ফেলে দেয়া যায়।

মুখের অভ্যন্তরে খাবারের যে ক্ষুদ্রাংশ থেকে যায় কিংবা মিসওয়াকের যে অংশ মুখের ভেতরে ছিড়ে যায় সেগুলোর ক্ষেত্রে এটি করা আবশ্যিকীয়।

আর গলে গেলে তো সেটি: রোযাদারের অজান্তেই বানিয়ন্ত্রণের বাইরে পেটে চলে যাবে। তবে গলে যাওয়া এই পদার্থের বৈশিষ্ট্য নয়। এটি টুথপেস্টের মত নয় যে, মুখের ভেতরে কিছু থেকে গলে দ্রবীভূত হয়ে পেটেনেমে যাবে।

চিকিৎসা ক্ষেত্র সংক্রান্ত রোযা ভঙ্গকারী বিষয়াবলীর ব্যাপারে ফিকাহ একাডেমীর সিদ্ধান্তে এসেছে:

এক: নিম্নোক্ত বিষয়াবলী রোযা ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না:

৬। দাঁতের রুট ক্যানেল করা, দাঁত ফেলা, মিসওয়াক দিয়ে কিংবা ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা; যদি ব্যক্তি কোন কিছু গলায় চলে গেলে সেগুলো গিলে না ফেলে।

আরও জানতে দেখুন [13619](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

আমি যখন স্ত্রী-সহবাস করেছি তখন আমি জানতাম না যে, ফজরের আযান হয়ে গেছে। আমি এটি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল আরও কয়েক মিনিট পর পাঁচটা বাজে আযান দিবে। কিন্তু পরবর্তীতে পরিষ্কার হয়েছে যে, পাঁচটা বাজার ১৫মিনিট আগেই আযান দেয়। এক্ষেত্রে সমাধান কি? আমি ও আমার স্ত্রীর উপর কি কাফফারা ওয়াজিব। উল্লেখ্য, সহবাস আমাদের উভয়ের সম্মতিক্রমে হয়েছে। আমরা সবেমাত্র ২৪ ঘন্টা পূর্বে সফর থেকে ফিরেছি। তখনও নামাযের সময়সূচী আমাদের জানা হয়নি। আমরা পৌঁছার দ্বিতীয় দিনে হঠাৎ করে রমযানের ঘোষণা পেয়েছি।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি আপনি যেভাবে উল্লেখ করেছেন সেভাবে হয়ে থাকে; তাহলে আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়। কেননা যে ব্যক্তি ফজর হয়নি মনে করে কোনরোয়া ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, তখন ফজর হয়ে গিয়েছিল; সেক্ষেত্রে আলেমদের দুটো অভিমতের মধ্যে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী রোযাটির কাযা নেই। চাই সেই রোযা ভঙ্গকারী বিষয়টি পানাহার হোক কিংবা সহবাস হোক।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন: আমি পছন্দ করছি যে, সহবাস, খাওয়া ও পান করা এবং রোযা ভঙ্গকারী অন্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো তিনটি শর্ত পূর্ণ হওয়া ছাড়া কোন ব্যক্তির রোযাকে ভঙ্গ করবে না:

১। রোযাদারের জানা থাকতে হবে যে, এটি রোযা ভঙ্গকারী; অন্যথায় রোযা ভঙ্গ হবে না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “*আর এ ব্যাপারে তোমরা কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বেচ্ছায় করেছে (তা অপরাধ)*। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আহযাব, আয়াত: ৫]

এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: “*হে আমাদের প্রভু! আমরা যদি বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না।*” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬] তখন আল্লাহ তাআলা বললেন: আমি সেটাই করলাম।

এবং যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “*আমার উম্মত থেকে ভুল ও বিস্মৃতি এবং যে ক্ষেত্রে তাদেরকে জবরদস্তি করা হয় সেটার গুনাহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।*”

অজ্ঞব্যক্তি ভুলকারী। যেহেতু সে যদি জানত তাহলে সেটি করত না। সুতরাং অজ্ঞব্যক্তি যদি অজ্ঞতাবশতঃ কোন রোযা ভঙ্গকারী বিষয় করে ফেলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। তার রোযাপরিপূর্ণ ও সঠিক; চাই তার সে অজ্ঞতা হুকুম সম্পর্কে হোক কিংবা সময় সম্পর্কে হোক।

সময় সম্পর্কে অজ্ঞতার উদাহরণ হলো: সে ধারণা করেছে যে, এখনও ফজরের ওয়াক্ত হয়নি; তাই সে খাবার গ্রহণ করেছে। তার রোযা সহিহ।

২। রোযাদারের জ্ঞাতসারে বিষয়টি ঘটা; যদি বিস্মৃতিবশতঃ হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

৩। রোযাদার স্বেচ্ছায় সেটি করা। যদি তার অনিচ্ছায় সেটি ঘটে তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। [মাজমুউফাতাওয়াস শাইখ বিন উছাইমীন (১৯/২৮০) থেকে সমাপ্ত]

শাইখকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: জনৈক ব্যক্তি নব-বিবাহিত। সেই ব্যক্তি শেষ রাতে এই ভেবে স্ত্রীসহবাস করেছে যে, এখনও রাত বাকী আছে। এর মধ্যে নামাযের ইকামত দেয়া হয়। এব্যাপারে আপনারা কি বলবেন? তার উপর কি বর্তাবে?

তিনি জবাব দেন: “ তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না; পাপও না, কাফফারাও না, কাযাও না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস কর। তাদের সাথে অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে।

এবং তিনি বলেছেন: আরতোমাদের কাছে কালো রেখা থেকে প্রভাতের সাদা রেখা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার চলে গিয়ে ভোরের আলো উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত) তোমরাপানাহার কর [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

তাই খাওয়া, পান করা ওসহবাস করা এ তিনটি সমান। এ তিনটির মধ্যে পার্থক্য করার পক্ষে কোন দলিল নেই। এ প্রত্যেকটি রোযার নিষিদ্ধ বিষয়। এর কোনটি যদি অজ্ঞতা বা বিস্মৃতিরঅবস্থায় ঘটে থাকে তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।” [সমাণ্ড]

এর মাধ্যমে পরিষ্কারহয়ে গেল যে, আপনাদের উভয়ের উপর কোন কিছু বর্তাবে না; না রোযাটি কাযা করা, আর না কাফফারা। এই হুকুম সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি আপনারা সেই দিনেররোযা রেখে থাকেন। যদি আপনারা সেই দিনের রোযা না-রাখেন এই ভেবে যে, সহবাসের কারণে আপনাদের রোযা ভেঙ্গে গেছে; সেক্ষেত্রে আপনাদের উপর রোযাটির কাযা করাছাড়া অন্য কিছু আবশ্যিক হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

রমযানেরদিনের বেলা করোনা (কোভিড-১৯)-এর পরীক্ষা বা নমুনায়ন করার হুকুম কি? এতে কিরোযা ভেঙ্গে যাবে; নাকি ভঙ্গবে না? উল্লেখ্য, নমুনায়ন কখনও মুখ থেকে, কখনও নাক থেকে করা হয়।

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

রমযানের দিনের বেলা করোনা (কোভিড-১৯) এর পরীক্ষা বা নমুনায়ন করাতে কোন বাধা নেই। চাই সেটি মুখ থেকে করা হোক কিংবা নাক থেকে। কেননা নমুনায়নের স্টিকটি গলায় বা নাকে ঢুকানো রোযা ভঙ্গকারী নয়।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানেরদিনের বেলা করোনা (কোভিড-১৯) এর পরীক্ষা বা নমুনায়ন করাতে কোন বাধা নেই। চাই সেটি মুখ থেকে করা হোক কিংবা নাক থেকে। কেননা নমুনায়নের স্টিকটি গলায়বা নাকে ঢুকানো রোযা ভঙ্গকারী নয়।

কঠনালী ও মুখেরঅভ্যন্তর বলতে কি বুঝায় সেটি ফিকাহবিদ আলেমগণ নির্দিষ্ট করেছেন। যেখানেকোন কিছু পৌঁছেলে রোযা ভেঙ্গে যায়। ইতিপূর্বে 312620 প্রশ্নোত্তরে সেটিআলোচনা করা হয়েছে।

যদি ধরে নেয়া হয় যেননমুনায়নের স্টিকটি কঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায় তদুপরি সেটি রোযা ভঙ্গ করবেনা। কেননা সেটি পানাহার নয় কিংবা পানাহারের স্থলাভিষিক্ত নয়। এবং স্টিকটির কোন কিছু পাকস্থলীতে পৌঁছে না। অতএব শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ওএকদল আলেমের মতানুযায়ী এটি রোযা ভঙ্গকারী নয়। কোন বিষয়গুলো রোযা ভঙ্গ করবে না এ সম্পর্কে ‘ফিকাহ একাডেমী’ এর সিদ্ধান্তে এসেছে:

১৫. পাকস্থলীতে গ্যাসস্কোপ (gastroscope) ঢুকানো; যদি এর সাথে অন্য কোন দ্রবণ বা পদার্থ ঢুকানো না হয়। [একাডেমীর ম্যাগাজিন (২/১০/৪৫৩-৪৫৫) থেকে সমাণ্ড]

পাকস্থলীতেগ্যাসস্কোপ ঢুকালে সেটি কঠনালী ও গলবিল পার হয়ে পাকস্থলীতে পৌঁছেযায়। তা সত্ত্বেও সেটি রোযা ভঙ্গ করে না। অতএব, করোনার নমুনায়নের স্টিককঠনালী পর্যন্ত ঢুকলে সেটি রোযা ভঙ্গ না করা অধিক যুক্তিযুক্ত; থাকতোনাকে ঢুকালে রোযা ভঙ্গবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

যেহেতু আমরা এখন করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য মাস্ক পরি। কখনও কখনও যখন আমি মাস্কের নীচ থেকে কথা বলি তখন কিছু লাল মাস্ক পর্যন্ত বেরিয়ে আসে, কিন্তু খুবই সামান্য। যেহেতু মাস্কটি ঠোঁটের সাথে লেগে থাকে; আমি সেটাকে আলাদা করতে পারি না। আমি জানি না যে, এটি কি দ্বিতীয়বার মুখে চলে গেল; নাকি যাইনি? এতে করে কি রোযা ভঙ্গ হবে? আর যদি ঠোঁটের মধ্যেই এটি শুকিয়ে যাওয়ার পর আমি ঠোঁটদ্বয় একটির সাথে অপরটিকে মিলাই; এরপরেও কি এর প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে? নাকি শুকিয়ে গেলে কোন অসুবিধা নাই?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

যদি লাল বা থুথু ঠোঁট পর্যন্ত চলে আসে, এরপর কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে সেটিকে গিলে ফেলে; যেমন জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজালো কিংবা অনুরূপ কিছু মাধ্যমে অনিচ্ছাকৃতভাবে— তাহলে তার ওপর কোন কিছু আবশ্যিক হবেনা। অনুরূপভাবে শুকিয়ে গেলে এরপর ঠোঁটদ্বয় মিলিয়ে ফেললে। কারণ শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এর প্রভাব দূর হয়ে যায়। রোযা ভাঙ্গার মূলতঃই কোন কারণ বলবৎ থাকে না; না ইচ্ছাকৃত, আর না ভুলক্রমে। পক্ষান্তরে, যদি ঠোঁট পর্যন্ত থুথু চলে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে সেটাকে গিলে ফেলে; তাহলে রোযা ভাঙ্গার ব্যাপার মতভেদ রয়েছে। বিস্তারিত জবাবে সেই মতভেদ দেখুন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি লাল বা থুথু ঠোঁট পর্যন্ত চলে আসে, এরপর কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে সেটিকে গিলে ফেলে; যেমন জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজালো কিংবা অনুরূপ কিছু মাধ্যমে অনিচ্ছাকৃতভাবে; তাহলে তার ওপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে না। অনুরূপভাবে শুকিয়ে গেলে এরপর ঠোঁটদ্বয় মিলিয়ে ফেললে। কারণ শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এর প্রভাব দূর হয়ে যায়। রোযা ভাঙ্গার মূলতঃই কোন কারণ বলবৎ থাকে না; না ইচ্ছাকৃত, আর না ভুলক্রমে। পক্ষান্তরে, যদি ঠোঁট পর্যন্ত থুথু চলে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে সেটাকে গিলে ফেলে; তাহলে রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে:

শাফেয়ি ও হাম্বলিমাযহাব মতে, এর মাধ্যমে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কেননা থুথু এর স্বস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। থুথুর স্থান হচ্ছে মুখের অভ্যন্তর। তাই বেরিয়ে পড়া থুথুকে গিলে ফেলা অন্য যে কোন বিচ্ছিন্ন জিনিসকে গিলে ফেলার মত।

যেই থুথু গিলে ফেললে রোযা ভাঙ্গবে না সে প্রসঙ্গে ইমাম নববী বলেন: “ এর স্বস্থান থেকে এটাকে গিলে ফেলা। যদি মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, এরপর জিহ্বা দিয়ে কিংবা অন্য কিছু দিয়ে মুখে ফিরিয়ে নেয়; তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেন: এমনকি যদি ঠোঁটের পিঠে বেরিয়ে আসে, এরপর মুখে ফিরিয়ে নিয়ে গিলে ফেলে; তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কারণ এই ফিরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকসুরকারী এবং যেহেতু থুথু ক্ষমাহের স্থান থেকে বেরিয়ে গেছে। আল-মুতাওয়াল্লি বলেন: যদি ঠোঁট পর্যন্ত বেরিয়ে যায়, এরপর মুখে ফিরিয়ে নিয়ে গিলে ফেলে; তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।” [আল-মাজমু (৬/৩৪২) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: “ যদি তার থুথু বেরিয়ে কাপড়ে পড়ে, কিংবা আঙ্গুলের মাঝখানে পড়ে কিংবা ঠোঁটের মাঝখানে বেরিয়ে আসে; এরপর সেটা মুখে ফিরে যায় ও সেটাকে গিলে ফেলে তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কেননা সেই ব্যক্তি মুখ ব্যতীত অন্য স্থান থেকে সেটাকে গিলে ফেলেছে। তাই এটি অন্য কোন জিনিস গিলে ফেলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।” [আল-মুগনী (৩/১৭) থেকে সমাপ্ত]

হানাফি মাযহাব মতে, যদি থুথু মুখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এরপর মুখে ফিরিয়ে নেয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে; অন্যথায় নয়।

ফাতহুল ক্বাদির গ্রন্থে (২/৩৩২) বলেন: “ যদি তার থুথু মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, এরপর মুখে প্রবেশ করায় ও গিলে ফেলে; যদি মুখের সাথে এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়; বরং মুখের ভেতরে যা আছে সেটার সাথে সংযুক্ত থাকে; যেমন- কোন সুতা থুথুকে চুষে নিল; তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। আর যদি থুথু মুখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সেটাকে নিয়ে মুখে ফিরিয়ে দেয়া হয়; তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

তবে কোন কাফফারা আবশ্যক হবে না। যেমনিভাবে কেউ যদি অন্য কারো থুথু গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যায়। আর যদি মুখের ভেতরে থুথু জমার পর সেটাকে গিলে ফেলে তাহলে সেটা মাকরুহ। তবে এতেরোযা ভাঙ্গবে না।” [সমাণ্ড]

যে থুথু মাস্কের মধ্যে জমা হয় ও মুখ থেকে বাহিরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; সেটাকে এড়িয়ে চলা বাঞ্ছনীয়। সেটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে পুনরায় মুখে ফিরিয়ে নেয়া ও গিলে ফেলা যাবে না।

আর যেটাকে এড়িয়ে চলা কঠিন কিংবা যেটা অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখে ঢুকে যায়; সেটা ক্ষমাহ। কেননা তাৎসামান্য। যা থেকে বেঁচে চলা কঠিন। শরিয়ত ওয়ু করার পর মুখের মধ্যে যেটুকু পানির প্রভাব মুখে থেকে যায় সেটাকে ক্ষমা করে দিয়েছে।

আর যেটার ব্যাপার নিশ্চিত জানা যায় না; সেটা কি দ্বিতীয়বার মুখে প্রবেশ করেছে; নাকি করেনি; এর প্রভাবকে অকার্যকর করে দেয়া ও বিবেচনায় না-নেয়ায় যুক্তিযুক্ত। কেননা মূলবিধান হলো এটি রোযা ভঙ্গকারী না-হওয়া এবং থুথু মুখে ফিরে না-যাওয়া।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

আমি নাসিৎ কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। আজ আমি এলার্জি টেস্ট করার পদ্ধতি শিখেছি। প্রত্যেক গ্রুপের ছাত্রেরা কেবল টেস্ট করার এ পদ্ধতি শেখার জন্য একে অপরকে স্যালাইন ইনজেকশন পুশ করেছে? এর হুকুম কী? উল্লেখ্য এই ইনজেকশনটি চামড়ায় প্রদেয় Intra dermal শ্রেণীর।

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

চামড়ার নীচে স্যালাইন ইনজেকশন দিয়ে এলার্জি টেস্ট করতে কোন অসুবিধা নাই; যেহেতু এর মাধ্যমে পুষ্টি সাধিত হয় না।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

চিকিৎসাশ্রেণীয় ইনজেকশন রোযা ভঙ্গ করে না; যদি না এটি খাদ্যের স্থলাভিষিক্ত না হয়। যেমন ভিটামিন এবং রক্তে যে সব তরল প্রবেশ করানো হয়।

ফিকাহ একাডেমীর সিদ্ধান্ত ৯৩(১/১০)-এ “চিকিৎসা সংক্রান্ত রোযা ভঙ্গকারী বিষয়াবলীর ব্যাপারে এসেছে:

“নিম্নোক্ত বিষয়াবলী রোযাভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না... ত্বকে, পেশীতে কিংবা শিরাতে প্রদেয় চিকিৎসা শ্রেণীয় ইনজেকশন; তবে খাদ্যজাতীয় তরল ও ইনজেকশন ব্যতীত।” [সমাণ্ড]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে পেশীতে, শিরাতে কিংবা নিতম্বে প্রদেয় ইনজেকশন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: “শিরাতে, পেশীতে ও নিতম্বে প্রদেয় ইনজেকশন নিতে কোন অসুবিধা নাই। যেহেতু এমন ইনজেকশনের মাধ্যমে রোযাদারের রোযা ভাঙ্গে না। কারণ এটি রোযাভঙ্গকারী নয় এবং রোযাভঙ্গকারী বিষয়াবলীর স্থলাভিষিক্তও নয়। যেহেতু এটি পানাহার নয় এবং পানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয়। ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, এমন ইনজেকশন রোযার উপর প্রভাব ফেলবে না। বরং যে ইনজেকশন রোযাদারকে পানাহার থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয় এমন ইনজেকশন প্রভাব ফেলবে।” [ফাতাওয়াস সিয়াম (পৃষ্ঠা-২২০) থেকে সমাণ্ড]

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে চামড়ার নীচে স্যালাইন ইনজেকশন দিয়ে এলার্জি টেস্ট করতে কোন অসুবিধা নাই; যেহেতু এর মাধ্যমে পুষ্টি সাধিত হয় না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

আমি আমার স্ত্রীর সাথে দিনের বেলায় তার রমযানের ভঙ্গকৃতকাযা রোযা রাখা অবস্থায় সহবাস করেছি। কারণ আমার ধারণা ছিল কাযা রোযারবিধানও নফল রোযার বিধানের মত। পরবর্তীতে আমি ভিন্ন কথা শুনেছি। সুতরাং এমাসযালার হুকুম কী? এতে কি আমার উপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানের কাযা রোযা পালনওয়াজিব রোযা রাখার অন্তর্ভুক্ত; যে রোযা কোন শরয়ি ওজর ছাড়া বাতিল করা কারোজন্য জায়েয নয়। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি কাযা রোযা পালন শুরু করে তার উপরআবশ্যিক হল উক্ত রোযা সম্পূর্ণ করা। এই রোযা নফল রোযার মত নয়। নফল রোযাপালনকারী নিজেই নিজের কর্তা; যখন ইচ্ছা তখন ভেঙ্গে ফেলতে পারে, চাইলে নাওভাঙ্গতে পারে।

উম্মে হানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ আমিতো রোযাদার ছিলাম; কিন্তু রোযা ভেঙ্গে ফেলেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: আপনি কি কোন কাযা রোযা পালন করছিলেন? উম্মে হানী (রাঃ) বললেন: না। তখন তিনি বললেন: যদি নফল রোযা হয় তাহলে কোন ক্ষতিনাই।"[সুনানে আবু দাউদ (২৪৫৬), আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন] এ হাদিসটিপ্রমাণ করে যে, যদি এটা ফরয রোযা হয় তাহলে তার ক্ষতি করবে। এখানে ক্ষতিদ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- গুনাহ।

কিন্তু আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যা ঘটেছে সেটার ব্যাপারে কথা হচ্ছে: কেবল রমযান মাসের দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাসের কারণে স্ত্রী-সহবাসেরকাফফারা ওয়াজিব হয়; অন্যথায় নয়। অতএব, আপনার উপর এমন কিছু আবশ্যিক হবে না। আপনার স্ত্রীর উপর উক্ত দিনের রোযাটি কাযা করা আবশ্যিক হবে। তবে আল্লাহরকাছে তাওবা করতে হবে এবং এমন কর্মে পুনরায় লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প করতে হবে।

ইবনে রুশদ বলেন: "রমযানের কাযা-রোযা ইচ্ছা করে ভেঙ্গে ফেললেও কাফফারাওয়াজিব হবে না। কেননা উক্ত কাযা রোযার ক্ষেত্রে এমন পবিত্রতা নেই যা মূলসময়ের (তথা রমযানের) রয়েছে।"[বিদায়াতুল মুজতাহিদ (২/৮০)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সমগ্রতে (১০/৩৫২) এসেছে: "কাফফারা ওয়াজিব হয় এমনব্যক্তির উপর যে ব্যক্তি রমযান মাসে সহবাস করেছে— সময়ের পবিত্রতার কারণে। পক্ষান্তরে, আলেমগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কাযা রোযার ক্ষেত্রে কাফফারাওয়াজিব হয় না।"

প্রশ্ন

মেনিনজাইটিস এর টীকা নিলে কি রোযা ভাঙ্গবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মেনিনজাইটিসএর টীকা নিলে রোযা ভাঙ্গ হবে না। টীকা নিতে কোন আপত্তি নাই। তবে রাতেরবেলায় নেয়া সম্ভবপর হলে সেটা করা অধিক সতর্কতাপূর্ণ।

আল্লাহুই তাওফিকদাতা।

প্রশ্ন

রোযা রেখে রমযানের দিনের বেলায় করোনা (কোভিড-১৯)-এর টীকা নেয়ার হুকুম কী?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

রমযানের দিনের বেলায় করোনার টিকা নিতে কোন অসুবিধানেই। যেহেতু এটি চিকিৎসা শ্রেণীয় ইনজেকশন; যা রোযা নষ্ট করে না। কেননা এটি পানাহার নয়; পানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয় এবং পানাহারের স্বাভাবিক পথ তথামুখ বা নাক দিয়ে এটাকে প্রবেশ করানো হয় না।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানের দিনের বেলায় করোনার টিকা নিতে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু এটি চিকিৎসা শ্রেণীয় ইনজেকশন; যা রোযা নষ্ট করে না। কেননা এটি পানাহার নয়, পানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয় এবং পানাহারের স্বাভাবিক পথ তথা মুখ বা নাক দিয়েও এটাকে প্রবেশ করানো হয় না।

১৪১৮ হিজরীর ২৩-২৮ শে সফর সৌদি আরবের জেদ্দাতে অনুষ্ঠিত ফিকাহ একাডেমীর দশম অধিবেশনের সিদ্ধান্তে এসেছে:

“ চিকিৎসা সংক্রান্ত রোযাভঙ্গকারী বিষয়াবলী” বিষয়ে একাডেমীতে পেশকৃত গবেষণাসমূহ পর্যালোচনা এবং ১৪১৮ হিজরীর ৯-১২ সফর (১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪-১৭ জুন) মরক্কোর ‘কাসাব্লাঙ্কা’ শহরে ফিকাহ একাডেমী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ‘ইসলামিক মেডিকেল অর্গানাইজেশন’ কর্তৃক নবম ‘ফিকাহ ও মেডিকেল সিম্পোজিয়াম’ এর পক্ষ থেকে ইস্যুকৃত গবেষণাপত্র, গবেষণা প্রবন্ধ ও সুপারিশগুলো পর্যালোচনা এবং অংশগ্রহণকারী ফিকাহবিদ ও ডাক্তারগণের আলোচনা-পর্যালোচনা শুনা এবং কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকাহ বিশারদদের বক্তব্য জানার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তদিচ্ছে:

এক: নিম্নোক্ত বিষয়াবলী রোযাভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না:

৮। ত্বকে, পেশীতে কিংবা শিরাতে প্রদত্ত চিকিৎসা শ্রেণীয় ইনজেকশন; তবে খাদ্যজাতীয় তরল ও ইনজেকশন বাদ দিয়ে।” [ফিকাহ একাডেমীর জার্নাল, সংখ্যা-১০ থেকে সমাপ্ত]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৫২) এসেছে:

“ রোযাদারের জন্য রমযানের দিনের বেলায় পেশীতে ও শিরাতে ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা নেয়া জায়েয। তবে রোযাদারের জন্য রমযানের দিনের বেলায় খাদ্যজাতীয় ইনজেকশন নেয়া জায়েয নয় কেননা তা পানাহার গ্রহণের পর্যায়ভুক্ত। এ ধরণের ইনজেকশন নেয়া রোযানা-রাখার কৌশল হিসেবে গণ্য হবে। পেশীতে ও শিরাতে যদি রাতে ইনজেকশন নেয়ার সুযোগ থাকে তাহলে সেটা করা ভাল।” [সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“ যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত আলেমগণ সেগুলোকে রোযাভঙ্গকারী বিষয়ের অধিভুক্ত করেছেন; যেমন- নিউট্রিশন ইনজেকশন। নিউট্রিশন ইনজেকশন বলতে সেসব ইনজেকশন নয় যেগুলো শরীরকে চাঙ্গা করে বা সুস্থ করে। বরং নিউট্রিশন ইনজেকশন হচ্ছে যেগুলো গ্রহণ করলে পানাহার লাগে না।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে: যে সকল ইনজেকশন পানাহারের স্থলাভিষিক্ত নয় সেগুলো রোযা ভঙ্গ করবে না। চাই সেগুলো শিরাতে পুশ করা হোক কিংবা রানে কিংবা অন্য যে কোন স্থানে।” [শাইখ উছাইমীনের ফতোয়া ও পুস্তিকা সমগ্র (১৯/১৯৯)]

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

“ টিকার ইনজেকশন কি রোযার উপর প্রভাব ফেলবে?”

জবাবে তিনি বলেন: প্রভাব ফেলবে না। রোযা সহিহ। যে ইনজেকশনগুলো টিকা হিসেবে কিংবা চিকিৎসা হিসেবে পুশ করা হয় সঠিক মতানুযায়ী সেগুলো রোযার উপর প্রভাব ফেলবে না। তবে নিউট্রিশন ইনজেকশন ব্যতীত। কারণ নিউট্রিশন ইনজেকশন রোযার উপর প্রভাব ফেলবে। সাধারণ ইনজেকশন, টিকার ইনজেকশন বা এ জাতীয় অন্যান্য ইনজেকশন রোযার উপর প্রভাব ফেলবে না। অতএব, সঠিক মতানুযায়ী টিকার ইনজেকশন রোযার উপর প্রভাব ফেলবে না। রোযা সঠিক।

উপস্থাপক: জাযাকুমুল্লাহ খাইরা। চাই এই ইনজেকশন পেশীতে পুশ করা হোক কিংবা শিরাতে?

শাইখ: হ্যাঁ। আমভাবে (পেশীতে দেয়া হোক বা শিরাতে)। এটাই সঠিক। [\[শাইখ বিন বাযের ওয়েবসাইট থেকে সমাণ্ড\]](#)

শাইখ ড. সাদ আল-খাছলান (হাফিয়াহুল্লাহ) বলেন:

“যে ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলায় করোনার টিকার ডোজ নিল তার রোযা কি নষ্ট হবে?”

জবাব: তার রোযা নষ্ট হবে না। কেননা করোনার টিকা চিকিৎসা শ্রেণীয় ইনজেকশন। অগ্রগণ্য মতানুযায়ী চিকিৎসাশ্রেণীয় ইনজেকশন রোযা ভঙ্গ করে না। কেননা এ ধরনের ইনজেকশন পানাহার নয় কিংবা পানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয়।

মূল বিধান হল: রোযার শুদ্ধতা। তাই সুস্পষ্ট কোন বিষয় ছাড়া আমরা এ মূল বিধানকে পরিবর্তন করব না।

অতএব, আমরা বলব: রোযাদারের জন্য করোনার টিকা নিতে কোন অসুবিধা নাই। এতে রোযা ভাঙ্গবে না।” [ভিডিও ক্লিপ থেকে]

আল্লাহুই সর্বত্ত্ব।

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি পিপাসার কারণে পানি পান করে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে তার জন্যে কি সেইদিন আহার করা জায়েয হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যেই ব্যক্তি তীব্র পিপাসার কারণে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে; তথা মারা যাওয়ার আশংকা থেকে কিংবা তীব্র ক্ষতির আশংকা থেকে কিংবা কঠিন কষ্টের কারণে রোযা পরিপূর্ণকরতে পারেনি— তার কর্তব্য হল দিনের অবশিষ্ট সময় উপবাস পালন করা। তার জন্য আহার গ্রহণ করা কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পান করা— জায়েয হবে না। বরং যতটুকু পান করলে সে ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে রক্ষা পাবে ততটুকুই পান করবে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস থাকবে। পরবর্তীতে এ দিনটির রোযা কাযা পালন করবে।

কাশশাফুল কিনা গ্রন্থে (২/৩১০) বলেন: আবু বকর আল-আজুররি বলেন: যে ব্যক্তির পেশা কষ্টকর সেব্যক্তি যদি রোযা রাখার কারণে মৃত্যুর আশংকা করে এবং কাজটি ছেড়ে দিলে ক্ষতিগ্রস্ততার আশংকা করে তাহলে সে ব্যক্তি রোযা ছেড়ে দিবে এবং রোযাটির কাযা পালন করবে। আর যদি কাজটি ছেড়ে দিলে সে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়: তাহলে রোযানা-রাখার কারণে সে গুনাহগার হবে এবং ভবিষ্যতে কাজটি ছেড়ে দিবে। আর যদি কাজটি ছেড়ে দিলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ওজরের কারণে তার গুনাহ হবে না। [সমাণ্ড]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৩৩) এসেছে:

“মুকাল্লাফ (শরয়ি ভারপ্রাপ্ত) ব্যক্তি কেবল চাকুরীজীবী হওয়ার কারণে রমযানের রোযা না-রাখা নাজায়েয। তবে রোযার কারণে যদি তার বড় ধরনের কষ্ট হয় এবং রমযানের দিনের বেলায় রোযানা-রাখতে সে ব্যক্তি বাধ্য হয় তাহলে যতটুকু (খাদ্য-পানীয়) গ্রহণ করার মাধ্যমে তার কষ্ট দূরীভূত হবে ততটুকুর মাধ্যমে সে ব্যক্তি তার রোযা ভঙ্গ করবে। এরপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস পালন করবে ও সবার সাথে ইফতার করবে এবং এই দিনটির রোযা কাযা পালন করবে।” [সমাণ্ড]

শাইখ বিন বায়কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

“কোন লোক যদি বিশেষ কোন কারণে রোযা ভেঙ্গে ফেলে; যেমন- তীব্র পিপাসাগ্রস্ত হয়ে; রোযা ভাঙ্গার পরে সেব্যক্তি কি তার পানাহার চালিয়ে যাবে এবং পানাহার করাকে বৈধ মনে করবে? এ অবস্থায় তার করণীয় কী?”

জবাব: তার জন্য পানাহার বৈধ নয়। বরং সে তার প্রয়োজন পরিমাণ পান করে এরপর উপবাস পালন করবে; যদি পিপাসার কারণে রোযা ভেঙ্গে থাকে। আর যদি ক্ষুধার কারণে রোযা ভেঙ্গে থাকে তাহলে যতটুকু খেলে তার প্রাণ বাঁচে ততটুকু খাবে; এরপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাসপালন করবে। তবে পানাহার চালিয়ে যাবে না। সে তো জরুরী পরিস্থিতির কারণে পানাহার করেছে। এরপর সে উপবাস চালিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি কোনব্যক্তিকে পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য কিংবা শত্রু থেকে বাঁচানোর জন্য উদ্যোগী হয়; কিন্তু রোযা না-ভেঙ্গে বাঁচাতে না পারে তাহলে সে রোযাভেঙ্গে তার ভাইকে উদ্ধার করবে। এরপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস পালন করবে। পরবর্তীতে কেবল এই দিনটির রোযা কায্য করবে। কেননা সে জরুরী পরিস্থিতিতে রোযাটি ভেঙ্গেছে। কারণ একজন মুসলিম ব্যক্তির জীবন বাঁচানো ওয়াজিব।” [শাইখবিন বায়ের ফতোয়াসমগ্র (১৬/১৬৪) থেকে সমাণ্ড]

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

পাইলসএর রোগের তেল বা মলম ব্যবহার করলে কি রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কায্য পালন করা আবশ্যিক হবে; চাই সেটা অভ্যন্তরীণ ব্যবহার হোক কিংবা বহিঃ অংশে ব্যবহার হোক?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পাইলসের মলম বা তেল ব্যবহার করাতে রোযার উপর কোন প্রভাব পড়বে না।

আল্লাহুই তাওফিকদাতা, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ আব্দুল আযিয আলে শাইখ, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন গাদইয়ান, শাইখ সালেহ আল-ফাওয়ান, শাইখ বকর আবু যায়েদ।

ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমা- আল-মাজমুআ আস্-ছানিয়া (৯/২১১)

প্রশ্ন

আমি কোন এক ইউরোপিয়ান দেশে রমযান মাসে কল্পনায় এমন এক যৌন উত্তেজনার শিকার হয়েছি যে, বীর্য বেরিয়ে গেছে। রোযা ভেঙ্গে গেছে এ বিশ্বাস থেকে আমার মন আমাকে প্ররোচিত করেছে; ফলে আমি হস্ত মৈথুনে লিপ্ত হয়েছি। এখন আমার উপর কি কায্য আবশ্যিক; নাকি কাফফারা? জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

একজন মুসলিমের উপর আবশ্যিক হচ্ছে তার কান, চোখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আল্লাহু যাকিছু হারাম করেছেন সেগুলোতে পতিত হওয়া থেকে সুরক্ষা করা। মূল অবস্থা হলো রোযা অন্তরগুলোকে পরিশুদ্ধ করে এবং রোযাদারকে যৌন কামনা-বাসনায় পতিত হওয়া থেকে হেফযত করে।

কল্পনার মাধ্যমে বীর্যপাত করলে এর ফলে রোযা ভাঙ্গবে কিনা এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। মালেকি মাযহাবের আলেমগণ রোযা ভাঙ্গার অভিমত দেন। জমহুর (অপরাপর মাযহাবের) আলেমগণের মতে রোযা ভাঙ্গবে না। বাহ্যতঃ যা প্রতীয়মান হচ্ছে তারা রোযা ভাঙ্গবে না বলেছেন যেহেতু এক্ষেত্রে বান্দার কোন ইচ্ছা নেই। কল্পনা মানসপটে এসে যায়; যেটাকে রোধ করা যায় না। কিন্তু

ইচ্ছাকৃত কল্পনা করা ও বীর্যপাত করার জন্য কল্পনাকে অব্যাহত রাখা হলে সেটার মধ্যে ও বীর্যপাত করার জন্য দৃষ্টি দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বীর্যপাত করা পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করলে জমছুর আলেমরোয়া ভঙ্গ হওয়ার অভিমত পোষণ করেন।

আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়া-তে (২৬/২৬৭) এসেছে:

“হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণের অভিমত হচ্ছে: দৃষ্টিপাত ও কল্পনার মাধ্যমে বীর্যপাত হলে কিংবা মযী বের হলে রোয়া ভঙ্গ হবে না।

শাফেয়ী মাযহাবের সঠিক অভিমত হচ্ছে: যদি তার অভ্যাস এমন হয় যে, দৃষ্টিপাত করলে কিংবা বারবার দৃষ্টিপাত করলে বীর্যপাত হয়ে যায় তাহলে তার রোয়া ভেঙ্গে যাবে।

আর মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণের অভিমত হচ্ছে: অব্যাহতভাবে দৃষ্টিপাত করার মাধ্যমে বীর্যপাত হলে রোয়া ভেঙ্গে যাবে। কেননা সেটি এমন কর্মের মাধ্যমে বীর্যপাত; যাতে সুখানুভূতি রয়েছে এবং যা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভবপর।

কল্পনা থেকে বীর্যপাত হলে: মালেকী মাযহাবের আলেমদের মতে রোয়া ভেঙ্গে যাবে; আর হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মতে ভাঙ্গবে না। যেহেতু এর থেকে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়। [সমাণ্ড]

রোয়া যদি ভেঙ্গে যায় তাহলে আপনার উপর ওয়াজিব হল সে রোয়াটির কাযা পালন করা। আপনার উপর কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব নয়। যেহেতু সহবাসের মাধ্যমে রোয়া নষ্ট করা ছাড়া কাফফারা ওয়াজিব হয় না।

আপনার উপর ওয়াজিব হলো:

১। হস্তমৈথুনের গুনাহ থেকে তাওবা করা। হস্তমৈথুন হারাম হওয়ার ব্যাপারে [329](#) নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

২। ঐ দিনের রোয়াটি কাযা পালন করা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

নাকের স্প্রে ব্যবহার করার হুকুম কি? এটা কি রোয়ার উপর কোন প্রভাব ফেলবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

“জরুরী অবস্থায় এটি ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নাই। যদি রাত পর্যন্ত দেরী করা সম্ভবপর হয় তাহলে সেটাই অধিক সতর্কতামূলক।” [সমাণ্ড]

ফাদিলাতুশ শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহঃ)

“মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বলাত মুতানাওয়িয়াআ” (১৫/২৬৪)

প্রশ্ন

রোযা রাখার ক্ষেত্রে আমার একটি সমস্যা আছে। সেটি হল প্রতিদিন রোযা রাখার শুরুতে খাবারপাকস্থলি থেকে আমার কণ্ঠনালী পর্যন্ত উঠে যায়। কখনও কখনও কণ্ঠনালী অতিক্রম করে যায়। এটি প্রাত্যহিক ঘটে। এখন আমার কী করণীয়? আমি কি সেই দিনগুলোর রোযাপূনরায় রাখব? উল্লেখ্য, এ বিষয়টি রমযানের প্রতিদিন ঘটে।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

খাবারের অবিশেষাংশ কিংবা কিছু তরল পাকস্থলি থেকে গলাতে উঠে আসা এটি মানুষের ইচ্ছায় ঘটে না। কিন্তু হতে পারে এটি রোগ। আবার হতে পারে পাকস্থলি ভরে যাওয়ার কারণে।

একে বলা হয় “ওগরানো”। যেক্ষেত্রে এটি ঘটে তার উপর ওয়াজিব হলো পারলে এটি মুখ থেকে ফেলে দেয়া। আর যদি ফেলে দিতে সক্ষম না হয় এবং এটি পাকস্থলিতে ফিরে যায় তাহলে কোন অসুবিধা নাই। রোযার উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না।

ইবনে হাযম (রহঃ) বলেছেন:

“গলা থেকে বের হয়ে আসা ‘ওগরানো’ রোযা নষ্ট করবে না; যতক্ষণ না এটি মুখে চলে আসার পরে ও ফেলে দিতে সক্ষম হওয়ার পরে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সেটাকে ফিরিয়ে নেন।” [আল-মুহাল্লা (৪/৩৩৫) থেকে সমাণ্ড]

প্রশ্ন

মানুষের শরীর থেকে নির্গত রক্তের পরিমাণ সম্পর্কে আমি জানতে চাই যা রোযা ভঙ্গ করবে। কারণ আমি দীর্ঘদিন ধরে অনিয়মিতভাবে কিছু রক্তপাতসহ অর্শরোগে (হেমোরয়েডে) ভুগছি। রক্তের পরিমাণ প্রায় আধা কাপ হয়ে থাকে।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনাকে দ্রুত আরোগ্য করে দেন।

যেহেতু এই রক্ত রোগের কারণে বের হয় তাই আপনার রোযাটি সহিহ। এমনকি রক্ত যদি অনেকও নির্গত হয় তবুও আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে না। যেহেতু এই রক্ত আপনার ইচ্ছাকৃত কোন কর্মের কারণে বের হচ্ছে না।

রোযা ভঙ্গকারী রক্তের ক্ষেত্রে নীতি হচ্ছে নিম্নরূপ:

মানুষের দেহ থেকে নির্গত রক্তের দুটো অবস্থা:

এক: ব্যক্তির নিজের স্বেচ্ছায় কৃত কর্মের কারণে রক্ত বের হওয়া। সেক্ষেত্রে এর বিধান ব্যাখ্যাসাপেক্ষ:

১। যদি শিক্ষা লাগানোর কারণে রক্ত বের হয় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “শিক্ষা প্রদানকারী ও শিক্ষা গ্রহণকারীর রোযা ভেঙ্গে গেল।”

২। শিক্ষা লাগানো ছাড়া রক্তবের হওয়া; যেমন শিরা থেকে রক্ত বের করা। এ রক্ত যদি পরিমাণে এত বেশি হয় যেরোযাদারের শরীরের উপর এর প্রভাব পড়ে তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে; যেমন: রক্তদান করা। আর যদি পরিমাণে অল্প হয় যাতে রোযাদারের কোন ক্ষতি না হয় তাহলে রোযা নষ্ট হবে না; যেমন পরীক্ষা করার জন্য রক্ত দিলে রোযা নষ্ট হবে না।

দুই: ব্যক্তির অনিচ্ছায় রক্তবের হওয়া; যেমন কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে, নাক থেকে কিংবা শরীরের যে কোনস্থানের ক্ষত থেকে— এমন ব্যক্তির রোযা সহিহ যদি অনেক রক্ত বের হয় তবুও ।

এটি শাইখ উছাইমীনের ফতোয়ার সারাংশ । দেখুন: ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/১৩২) ।

কিন্তু ব্যক্তির অনিচ্ছায় বেরহওয়া রক্তের পরিমাণ যদি বেশি হয় যার ফলে সে দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে তার জন্যরোযা ভেঙ্গে ফেলা এবং এর বদলে রোযাটির কাযা পালন করা জায়েয হবে ।

প্রশ্ন

আমার এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে, সে রমযান মাসে হস্তমৈথুনে লিপ্ত হয়েছে । তার হুকুম কি? রমযান শেষ হওয়ার পর সে ঐ দিনের রোযা কাযা পালন করেছে । এরহুকুম কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

আপনারবন্ধুর জানা থাকা উচিত এই হস্তমৈথুনে লিপ্ত হওয়া শরিয়তে হারাম । এটি হারামহওয়া আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সূন্যাহ দ্বারা প্রমাণিত । এ সংক্রান্ত দলিল-প্রমাণ ইতিপূর্বে [329](#) নংপ্রশ্নোত্তরে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে । তাছাড়া মানুষের প্রকৃতিগত ওযুক্তিগত দিক থেকেও এটি গর্হিত । কোন মুসলিমের জন্য এমন কর্ম সংঘটনেরনিকটবর্তী হওয়াও সাজে না ।

তার জেনে রাখা উচিত ব্যক্তিরনিজের উপর পাপের কুপ্রভাব রয়েছে; নগদে দুনিয়াতে ও আখিরাতে; যদি সে তাওবা না করে কিংবা আল্লাহর রহমত তাকে আচ্ছাদন না করে । ইতিপূর্বে [23425](#) নং ও [8861](#) নং প্রশ্নোত্তরসমূহে সেসব বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে ।

এরপর আরও জেনে রাখা উচিতহস্তমৈথুনের অনেক ক্ষতি রয়েছে । হস্তমৈথুন শরীরকে দুর্বল করে দেয়, বান্দারসাথে তার প্রভুর দূরত্বকে জটিল করে তোলে এবং এটি মানসিক অবসাদের অন্যতমপ্রধান কারণ ।

আর প্রশ্নোত্তরেখিত মাসযালারহুকুম হল: যদি সে হস্তমৈথুন করে বীর্যপাত করে থাকে তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়েগেছে, তাঁর উপর গুনাহ আবশ্যিক হয়েছে । সে দিনের অবশিষ্টাংশ উপবাস থাকা তারউপর আবশ্যিক এবং সে দিনটির রোযা কাযা পালন করা আবশ্যিক ।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ ।

প্রশ্ন

যেব্যক্তি কনডম ব্যবহার করে রমযানের দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করেছে তারহুকুম কী? সে তার স্ত্রীকে জনৈক তালিবুল ইলমের ফতোয়া শুনিয়েছে যে, কনডমেরকারণে খতনার স্থানদ্বয় একটি অপরটিকে স্পর্শ করে না বিধায় সহবাস বাস্তবায়িতহয় না । তাই স্ত্রী তার স্বামীর ডাকে সাজা দিয়েছে ।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

এক:

রোযাদারের জন্য রমযানের দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম । যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সন্মোগ বৈধ করা হয়েছে । তারা তোমাদের পরিচ্ছদ, তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ । আল্লাহ জানেন যে, তোমরা ইতিপূর্বে অন্যায় করে

নিজেদের ক্ষতি করছিলে। পরে তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের কে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সংস্পর্শে যেতে পার এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা বরাদ্দ করে রেখেছেন (অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি) তা কামনা করতে পার। আর কালো রেখা থেকে প্রভাতের সাদারেখা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার চলে গিয়ে ভোরের আলো উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর। তারপর (পরবর্তী) রাত আসা পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আমার কারণে সে পানাহার ও যৌন-কামনা বর্জন করে। রোযা আমারই জন্য। আমি এর প্রতিদান দিব। একটি নেকীকে দশগুণ হিসেবে।” [সিহিহ বুখারী (১৮৯৪)]

যে ব্যক্তি কনডম ব্যবহার করে সহবাস করেছে সে তো নিজের যৌন-কামনাকে পূর্ণ করেছে; এতে কোন সন্দেহ নাই।

এই কনডম ব্যবহার করে সহবাস করলেও এর কারণে সকল বিধান আরোপিত হয়; যেমন গোসল ফরয হওয়া, রোযা নষ্ট হওয়া, হজ্জ নষ্ট হওয়া যদি প্রথম হালালের আগে করে থাকে, হাযেয অবস্থায় এটা করা হারাম হওয়া এবং এর মাধ্যমে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা ইত্যাদি।

ইমাম নববী (রহঃ) “আর-রওজা’ গ্রন্থে (১/৮২) বলেন:

“যদি কেউ তার পুরুষাঙ্গের উপর একটি ন্যাকড়া বেঁধে নিয়ে এটিকে প্রবেশ করায় তাহলে সঠিক মতানুযায়ী গোসল ফরয হবে। দ্বিতীয় মতানুযায়ী ফরয হবে না। তৃতীয় মতানুযায়ী যদি ন্যাকড়াটি মোটা হয় এবং যোনির আর্দ্রতা পুরুষাঙ্গে পৌঁছতে এবং একটি অঙ্গের উষ্ণতা অপরটিতে পৌঁছতে বাধা দেয় তাহলে গোসল ফরয হবে না; অন্যথায় ফরয হবে।

আমি বলব: আল-বাহর এর গ্রন্থাকার বলেছেন: হজ্জ নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রেও এই অভিমতগুলো প্রযোজ্য। সববিধিবিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।” [সমাণ্ড]

তুহফাতুল মুহতাজ গ্রন্থে (৩/৩৯৭) বলেন: “আলেমদের ইজমা হচ্ছে: সহবাস থেকে বিরত থাকা। অতএব সহবাসের মাধ্যমে রোযা ভেঙ্গে যাবে; এমনকি যদি বীর্ষপাত না করে তবুও।”

শারওয়ানি পূর্বোক্ত গ্রন্থের পাদটীকাতে বলেন: “রোযা ভেঙ্গে যাবে” এমনকি যদি সেটা কোন আচ্ছাদন ব্যবহার করে হয় তবুও। এটাই বাহ্যিক মর্ম। [সমাণ্ড]

কাশশাফুল কিনা গ্রন্থে (১/২০১) হাযেযবতী নারীর সাথে সহবাস করা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন: “এমনকি যদি পুরুষাঙ্গের উপর কোন আচ্ছাদন বেঁধে কিংবা পুরুষাঙ্গকে খলিতে ঢুকিয়ে সহবাস করা হয় তবুও।” [সমাণ্ড]

প্রশ্নোক্ত ফতোয়া দানকারী ভুল ফতোয়া দিয়েছেন। যে ফতোয়া রোযার ভিতকেই ধ্বংস করে দেয়। যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিষয়টি একটু ভেবে দেখেন তাহলে এই ফতোয়ার কদর্যতা তার কাছে পরিস্কারভাবে ফুটে উঠবে। যদি কোন ব্যক্তি পানাহার থেকে বিরত থেকে প্রতিদিন আচ্ছাদন ব্যবহার করে স্ত্রী সহবাস করতে থাকে; তাহলে এটা কোন ধরণের রোযা?!

হতে পারে সে এমন কোন ব্যক্তির ফান্দে পড়বে যে তাকে বলবে যে: বীর্ষপাত করা রোযা ভঙ্গকারী নয়। তখন সহবাসঘটবে, বীর্ষপাতও ঘটবে এরপরও বলবে: আমি রোযাদার!

এটি তামাশা; গোটা শরিয়ত এর থেকে পবিত্র।

এই বক্তব্যের ভিত্তিতে কেউ যদি কোন বেগানা নারীর সাথে সহবাস করে বলে যে, সে ব্যভিচার করেনি। কেননা সহবাসসংঘটিত হয়নি। তখন এই মুফতি তাকে কী বলবে?!

তাই অঙ্গটি ঢুকানো সম্পন্ন হওয়ার পরও আচ্ছাদন থাকার কারণে যে ব্যক্তি এটাকে সহবাস বলবে না তার কথার প্রতি ঞ্ক্ষিপ করার সুযোগ নাই। এমনকি যদি এমন কথা কোন ফকীহ বলে থাকেন তার প্রতিও। বিশেষতঃ এই পাতলা আচ্ছাদনগুলো স্বাদ লাভে কোন

প্রতিবন্ধকতা তৈরীকরে না। এই আছানদগুলো পুরুষাঙ্গের উপর ন্যাকড়া বাঁধার মত নয়; যেমনটি ফিকাহবিদগণ কল্পিত রূপ পেশ করেছিলেন।

দুই:

ফতোয়া কেবলমাত্র ফতোয়া দেয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হয়। তাই যে ব্যক্তি প্রশ্নোক্তগুণাতে লিপ্ত হয়েছে তার করণীয় নিম্নরূপ:

১। এই হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে তাওবা করা।

২। সহবাসের মাধ্যমে যে রোযাটি নষ্ট করেছে সেটি কাযা পালন করা।

৩। কাফফারা পরিশোধ করা। আরতা হল: একজন দাস আযাদ করা। যদি দাস না পায় তাহলে লাগাতরভাবে দুইমাস রোযারাখা। যদি তা না পারে তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো।

সহবাস করে সে বীর্ষপাত করুক কিংবা না করুক।

'আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়া'-তে (৩৫/৫৫) এসেছে: " যে ব্যক্তি রমযান মাসের দিনের বেলায় কোন ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে যৌনাঙ্গে সঙ্গম করেছে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মাঝে কোন মতভেদ নাই; চাই সে ব্যক্তি বীর্ষপাত করুক কিংবা না করুক।" [সমাণ্ড]

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলায় সহবাস করেছে তার কাফফারা কী? এবং খাদ্য দানের পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

" যদি কোন ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলায় স্ত্রী-সহবাস করে তাহলে তাদের প্রত্যেকের উপর কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব। কাফফারা হল: একজন মুমিন দাস মুক্ত করা। যদি তারা তা করতে অক্ষম হয় তাহলে তাদের প্রত্যেকের উপর লাগাতর ভাবে দুইমাস রোযা রাখা ওয়াজিব। যদি তারা লাগাতর ভাবে দুই মাস রোযা রাখতে অক্ষম হয় তাহলে তাদের উপর ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো ওয়াজিব। দাস মুক্ত করা ও সিয়াম পালনে অক্ষম হলে তাদের উপর ষাটজন মিসকীনকে দেশীয় খাদ্য খাওয়ানো ওয়াজিব হবে; তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে ত্রিশ সা' দেশীয় খাদ্য দিতে হবে। প্রত্যেক মিসকীনকে এক সা'। অর্ধ সা' স্বামীর পক্ষ থেকে; অর্ধ সা' স্ত্রীর পক্ষ থেকে। এবং সেই দিন সহবাস সংঘটিত হয়েছে সেই দিনের রোযাটি কাযা পালন করতে হবে। এরসাথে আল্লাহর কাছে তাওবা করা, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, অনুশোচিত হওয়া, গুনাহটি ছেড়ে দেয়া ও ইস্তিগফার করা তাদের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা রমযানের দিনের বেলায় সহবাস করা মহা অন্যায়। যাদের উপর রোযা রাখা আবশ্যিক তাদের জন্য এমহা অন্যায়ে লিপ্ত হওয়া নাজায়েয।" [শাইখ বিন বাযের ফতোয়াসমগ্র (১৫/৩০২)]

এর ভিত্তিতে: গরীব মানুষকে প্রদেয় খাদ্যের পরিমাণ অর্ধ সা' চাল বা অন্য কিছু। অর্থাৎ প্রায় দেড় কিলোগ্রাম।

প্রশ্ন

আপনারা 221471 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করেছেন যে, যেকোনো হস্তমৈথুন করা হারাম জেনেও রমযান মাসে সেটা করে; হস্তমৈথুন করারসময় সে যদি নাও জানে যে, হস্তমৈথুন করলে রোযা ভেঙ্গে যায় তবুও তার রোযাবাতিল হয়ে যাবে। কেননা হস্তমৈথুন করা হারাম এইটুকু জানার মাধ্যমেই এর থেকেবিরত থাকা তার উপর ওয়াজিব। কিন্তু, আপনারা 107624 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করেছেন যে, যে নারী হিযাব পরে না, সে যদি বেপর্দা হওয়ার বিধান হারাম জানাসত্ত্বেও বেপর্দা হয় তদুপরি এ গুনাহর কারণে তার রোযা ভঙ্গ হবে না। সুতরাং এদুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলোনির্দিষ্ট; কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে সেগুলো উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলোহল: সহবাস, পানাহার, যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত যেমন- স্যালাইনইনজেকশন, হস্তমৈথুন, শিঙ্গা লাগানো, ইচ্ছাকৃত বমি ও হায়েয। ইতিপূর্বে 38023 নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়গুলো উদ্ধৃত হয়েছে।

রোযা ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে হস্তমৈথুন ও বেপর্দার মধ্যে পার্থক্য হল: হস্তমৈথুন সত্ত্বাগতভাবে রোযা ভঙ্গকারী ও রোযার সাথে সাংঘর্ষিক। দলিল হচ্ছে--আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা বলেন: রোযা আমারই জন্য। আমিইএর প্রতিদান দিব। বান্দা আমার জন্য পানাহার ও যৌনসুখ বর্জন করে।" হস্তমৈথুনযৌনসুখ। তাই সেটি পানাহারের ন্যায় রোযা ভঙ্গকারী।

ইবনে হাজার আল-হাইতামী (রহঃ) বলেন: "হস্তমৈথুন নিজেই রোযাভঙ্গকারী।" [আল-ফাতাওয়া আল-ফিকহিয়া আল-কুবরা (২/৭৩)]

শাইখ মুহাম্মদ মুখতার আস-শানক্বিতি বলেন:

তিনি (আল্লাহ) বলেছেন: "যৌনসুখ"। এটাকে তিনি সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন। ফলে বড় যৌনসুখ যা সহবাসের মাধ্যমে অর্জিত হয় সেটাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং যে যৌনসুখ হস্তমৈথুনের মাঝে হাছিল হয় সেটাও অন্তর্ভুক্ত করেছে। যখন সে বীর্যপাত করে তখন তার যৌনসুখ লাভ হয়। এটাই হচ্ছে বড় যৌনসুখ। এ দিকথেকে সে বে-রোযাদার গণ্য হয়। কেননা রোযাদার তার যৌনসুখকে ত্যাগ করে। যেকোনো হস্তমৈথুন করলে সে তো আর যৌনসুখকে ত্যাগ করল না।" [শারহুল যাদিলমুস্তাকনি (৪/১০৪) থেকে সমাপ্ত]

আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়া গ্রন্থে (৪/১০০) এসেছে:

"মালেকি মাযহাব, শাফেয়ি মাযহাব, হাম্বলি মাযহাব ও হানাফি মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের মতে: হাত দিয়ে হস্তমৈথুন রোযাকে বাতিল করে দেয়।" [সমাপ্ত]

পক্ষান্তরে, বেপর্দা হওয়া রোযা ভঙ্গকারী নয়। বরং তা গীবত, মিথ্যাইত্যাদি অন্য গুনাহসমূহের মত একটি গুনাহ: যেগুলোর কারণে রোযার সওয়াব কমে যায়; কিন্তু রোযা ভাঙ্গে না।

ইতিপূর্বে 50063 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচিত হয়েছে যে, গুনাহ রোযাদারের সওয়াব কমিয়ে দেয়। কখনওকখনও এত বেশি গুনাহ করা হয় যে, রোযার সম্পূর্ণ সওয়াব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু রোযাকে নষ্ট করে না। বরং এ গুনাহ সত্ত্বেও তার রোযা সহিহ হবে এবং রোযাদারের উপর থেকে ফরযিয়ত দায়িত্ব খালাস হবে এবং তাকে কাযা পালন করার আদেশ দেয়া হবে না।

প্রশ্ন

এনিমা দেয়ার হুকুম কী? রোযা রাখা অবস্থায় রোগীকে যে এনিমা দেয়া

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কোষ্ঠকাঠিন্য ঠেকানোর জন্যরোগীদেরকে যে এনিমা ইনজেকশন দেয়া হয় আলেমগণ এর বিধান সম্পর্কে মতভেদকরেছেন। কেউ বলেছেন: যা কিছু পেটে পৌঁছে সেটা রোযা ভঙ্গকারী এ মূলনীতিরভিত্তিতে এটি রোযা ভঙ্গ করবে। অপর দল আলেম বলেন: এনিমা রোযা ভঙ্গ করবে না। যেসব আলেম এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)। তিনি বলেন: এটি পানাহার নয়: কিংবা পানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয়।

আমার অভিমত হল: এ ক্ষেত্রে ডাক্তারদের অভিমতের প্রতি নজর দেয়া। যদিডাক্তারেরা বলেন: এটি পানাহারের মত; তাহলে এটাকে পানাহারের অধিভুক্ত করাআবশ্যিক হবে এবং এটি রোযাভঙ্গকারী গণ্য হবে। আর যদি ডাক্তারেরা বলেন:পানাহার শরীরকে যা দেয় এটি শরীরকে সেটা দেয় না। তাহলে এটি রোযা ভঙ্গকারীহিসেবে গণ্য হবে না।

প্রশ্ন

পরীক্ষা করার জন্য ৫ সেমি রক্তের নমুনা গ্রহণ করলে সেটা কি রোযার উপর প্রভাব ফেলবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এটি রোযার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। যেহেতু এটি অল্প; যা রোযাদারকে দুর্বল করে না।

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে রমযানের রোযা রাখা অবস্থায় পরীক্ষা করানোর জন্যরক্ত নেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেন: এ ধরণের পরীক্ষারোযাকে নষ্ট করবে না। বরং এটি ক্ষমার্হ। কেননা এর প্রয়োজন রয়েছে। আর এটিশরিয়তের দলিল থেকে সুস্পষ্টভাবে অবগত রোযা-ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর শ্রেণীভুক্তনয়।"।[মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায (১৫/২৭৪)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: রোযাদার ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষা করা সম্পর্কে? জবাবে তিনি বলেন:

"পরীক্ষা করানোর জন্য রোযাদারের শরীর থেকে রক্ত বের করা হলে রোযা নষ্টহবে না। কেননা অনেক সময় পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তারকে রোগীর শরীর থেকে রক্তনিত্তে হয়। এটি রোযাকে নষ্ট করবে না। কেননা সেটা সামান্য রক্ত; যা শরীরের উপরশিংগার মত প্রভাব ফেলে না। তাই এটি রোযা ভঙ্গকারী নয়। আসল অবস্থা হল: রোযাঅটুট থাকা। আমরা শরিয়তের দলিল ছাড়া রোযাকে নষ্ট বলতে পারি না। এখানে এমনকোন দলিল নাই যে, এ সামান্যটুকু রক্ত নিলে রোযাদারের রোযা ভেঙ্গে যাবে।পক্ষান্তরে রোযাদারের শরীর থেকে যদি বেশি পরিমাণ রক্ত নেয়া হয়; যেমন অন্যকোন মুখাপেক্ষী লোকের শরীরে পুশ করার জন্য যদি রোযাদার থেকে শিংগার মত বেশিপরিমাণে রক্ত নেয়া হয় তাহলে এর দ্বারা তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। অতএব, কারোরোযা যদি ফরয রোযা হয় তার জন্য অন্যকে এত বেশি পরিমাণ রক্ত দান করা জায়েযহবে না। তবে রক্তপ্রার্থী রোগী যদি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে; যে অবস্থায়সূর্য ডোবা পর্যন্ত অপেক্ষা করার সুযোগ নাই এবং ডাক্তারেরা যদি এ সিদ্ধান্তদেন এ রোযাদারের রক্ত রোগীর কাজে আসবে এবং তার জরুরত পূর্ণ করবে তাহলেএমতাবস্থায় রক্ত দান করতে অসুবিধা নাই। সে ব্যক্তি রোযা ভেঙ্গে ফেলেপানাহার করবে যাতে করে সে শক্তি ফিরে পায় এবং এ দিনটির রোযা অন্যদিন কাযাকরবে।"[সমাণ্ড]

প্রশ্ন

নাকের ইনহেলার ব্যবহার করার হুকুম কী?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

"জরুরী অবস্থায় সেটা ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নাই। আর যদি রাত পর্যন্ত দেবী করা সম্ভব হয়; তাহলে সেটা করা সতর্কতাপূর্ণ।"[সমাণ্ড]

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহঃ)

মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বিন বায (১৫/২৬৪)

ইসলামী ফিকাহ একাডেমী-এর সিদ্ধান্তে এসেছে:

"নিম্নোক্ত বিষয়গুলো রোযা ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না...চোখের ড্রপ, নাকের ড্রপ, কানের ক্লিনার, নাকের ড্রপ, নাকের ইনহেলার; যদি এ ঔষুধগুলোরকিংদাংশ গলার ভেতরে চলে যায় তাহলে যেন গিলে না ফেলে।"[একাডেমীর ম্যাগাজিন (১০/২/৪৫৪ থেকে সমাপ্ত)

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

যে রোযাদার বমি করে সেটা অনিচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলেছে তার হুকুম কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমিকরে তাহলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি চলে আসে তাহলেতার রোযা নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি গিলে ফেলে তাররোযাও নষ্ট হবে না।

আল্লাহুই তাওফিকদাতা, আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীবর্গের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

প্রশ্ন

এক ধরনের ট্যাবলেট আছে হার্টের রোগীরা যে ট্যাবলেটগুলোব্যবহার করে থাকেন। এ ট্যাবলেটটি জিহ্বার নীচে রাখা হয়; গিলে ফেলা হয় না। শরীর সেটাকে চুষে নেয়। এ ধরনের ট্যাবলেট কি রোযা ভঙ্গ করবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ডাক্তারেরা বলেন, জিহ্বারনীচের স্থানটি শরীরের সবচেয়ে দ্রুত ঔষধ চুষে নেয়ার স্থান। এ কারণে কিছুহৃদরোগের তড়িৎ চিকিৎসা হচ্ছে জিহ্বার নীচে একটি ট্যাবলেট রাখা। যেট্যাবলেটটি সরাসরি ও দ্রুত শরীর চুষে নেয় এবং রক্ত এটাকে হার্টে পৌঁছিয়েদেয়। ফলস্বরূপ হার্টের তাৎক্ষণিক সমস্যা বন্ধ হয়ে যায়।

এ ধরনের ট্যাবলেট রোযা ভঙ্গ করবে না। কেননা এটি মুখে চুষে নেয়; পাকস্থলিতে কিছু প্রবেশ করে না।

যে ব্যক্তি এ ধরনের ট্যাবলেট ব্যবহার করেন তার কর্তব্য মুখে এ ট্যাবলেটগলে যাওয়ার পর শরীর এটাকে চুষে নেয়ার পূর্বে এর কোন অংশ গিলে না ফেলা।

"ইসলামী ফিকাহ একাডেমি"-এর সিদ্ধান্তে এসেছে:

"নিম্নোক্ত বিষয়গুলো রোযা ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না: ... বুকে ব্যাথা (Angi na)-র চিকিৎসা কিংবা অন্য কোন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে জিহ্বার নীচেযে ট্যাবলেট বা অন্য কিছু রাখা হয় সেটা থেকে নির্গত কোন পদার্থ গলার ভিতরেচলে না গেলে।"[সমাণ্ড]

দেখুন: "ফিকাহ একাডেমির ম্যাগাজিন" (১০/২/৯৬, ৪৫৪), ড. আহমাদ আল-খলিল রচিত "মুফাতিরাতুস সিয়াম আল-মুআসিরা" (পৃষ্ঠা- ৩৮, ৩৯)।

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি শ্বাসকষ্টে ভুগেন রমযানের দিনের বেলায় মুখে ইনহেলার নেয়াতে কি তার রোযা ভঙ্গ হবে

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।।

রমযানের দিনের বেলায় হাঁপানির ইনহেলার নিলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

(হাঁপানির ইনহেলার রোযা ভঙ্গ করবে না। কেননা সেটি সংকুচিত গ্যাস য়াফুসফুসে চলে যায়; খাদ্য নয়। রোগীর এটা সব সময় প্রয়োজন; রমযানে ও অন্য সময়ে। [বিন বাযের ফাতাওয়াদ দাওয়াহ; সংখ্যা- ৯৭৯] এবং দেখুন: "রোযার সত্তরটিমাসমালা" শীর্ষক পুস্তিকা।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: "এই ইনহেলার বাষ্প দেয়; এটি পাকস্থলিতে পৌঁছোনা। তাই আমরা বলব: রোযা অবস্থায় আপনি এই ইনহেলার ব্যবহার করতে কোন অসুবিধানাই। এর দ্বারা আপনার রোযা ভঙ্গ হবে না।"[সমাণ্ড][ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা- ৪৭৫]

স্থায়ী কমিটির আলেমগণ বলেন:

"হাঁপানির ঔষধ যা রোগী শ্বাসনালী দিয়ে টেনে নিঃশ্বাসের সাথে ফুসফুসেনিয়ে যান; পাকস্থলিতে নয়: এটি পানাহার নয় এবং পানাহারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণওনয়...তাই অগ্রগণ্য মনে হচ্ছে এ ঔষধ ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না।[সমাণ্ড]

[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (১/১৩০)]

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

মুয়াজ্জিন দ্বিতীয় আযান দিচ্ছেন এমতাবস্থায় সেহেরী খাওয়াঅব্যাহত রাখা কি জামেয হবে; নাকি সেহেরী খাওয়া পরিত্যাগ করতে হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।।

এর বিধান বিশ্লেষণসাপেক্ষ। যদি মুয়াজ্জিন ফজর হওয়ার পর আযান দেন (অর্থাৎ সুবহে সাদিক হওয়ার পর আযানদেন) তাহলে খাওয়া পরিহার করা ও উপবাস শুরু করা আবশ্যিক। যেহেতু নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "বিলালের আযান যেন তোমাদেরকেসেহেরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কারণ সে রাত থাকতে আযান দেয়। অতএব, তোমরাপানাহার চালিয়ে যাও যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়।" এ বিধানের মূলদলিল হল আল্লাহর বাণী: "তোমরা খাও ও পান কর; যতক্ষণ না ভোরের কালো রেখাথেকে শুভ রেখা ফুটে না উঠে।" এ জন্য যদি জানা যায় যে, ফজর উদিত হয়েছে তখনপানাহার থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক; আযান না দেয়া হলেও যেমন মরুভূমিতে আযানদেয়া হয় না কিংবা আযান না শুনলেও।

আর যদি মুয়াজ্জিন ফজর হওয়ার আগেই আযান দেয় কিংবা তার আযানের ব্যাপারেসন্দেহ হয় যে, সেটা কি ফজরের ওয়াক্তমত হয়েছে নাকি হয়নি; সেক্ষেত্রে সেব্যক্তি ফজর হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হওয়া অবধি পানাহার করতে পারেন; সেটা ফজরেরওয়াক্ত হওয়ার সময় নির্দিষ্ট করা আছে এমন ঘড়ির সময় দেখার মাধ্যমে কিংবা নির্ভরযোগ্য মুয়াজ্জিনের আযানের মাধ্যমে যার ব্যাপারে জানেন যে, তিনি ফজরেরওয়াক্ত হলেই আযান দেন।

তাই এমন আযানের অবস্থায়ও সে ব্যক্তি পানাহার করতে পারবেন কিংবা তার হাতেযে খাবার বা পানীয়টুকু আছে সেটা সম্পূর্ণ করতে পারবেন। যেহেতু এ আযানটি সুবহে সাদিক হওয়ার আযান নয়; বরং সম্ভাব্য আযান।

প্রশ্ন

আমি পাকস্থলীর অ্যাসিডে ভুগছি। যার কারণে অ্যাসিডযুক্ত তরলখাদ্যাদ্যনালীর মুখে ফিরে আসে। এটা কি রোযা ভঙ্গের কারণ হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পাকস্থলি থেকে তরল পদার্থফিরে আসাটা মানুষের অনিচ্ছায় ঘটে। অনেক সময় মানুষ অল্পতা বা তিক্ততাখাদ্যাদ্যনালীতেও অনুভব করে। কিন্তু সেটা মুখ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে না। এমতাবস্থায় এটি রোযা ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা তা মুখ পর্যন্তবেরিয়ে আসেনি।

যদি মুখ পর্যন্ত চলে আসে তাহলে সেটার হুকুম কিষ্টিগত বমি (القيء) বা বমির (القئ) হুকুম। الفللس শব্দটির অর্থ কেউ বলেছেন: বমি। কেউ বলেছেন: সামান্যবমি; তথা যা পেট থেকে বেরিয়েছে কিন্তু এতে মুখ ভরে যায়নি। কেউ কেউ বলেন: তাহল পাকস্থলি ভরে যাওয়ার প্রেক্ষিতে পাকস্থলির মুখ থেকে যা বেরিয়েআসে [দেখুন: ইমাম নববীর 'আল-মাজমু' (৪/৪)]

এর হুকুম হচ্ছে যদি মুখ দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া সম্ভব হওয়ার পরেও কেউসেটাকে পেটে ফিরিয়ে নেয় তাহলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি বের করতে নাপারার কারণে গিলে ফেলে তাহলে তার রোযার কোন ক্ষতি হবে না। দেখুন: [12659](#) নং প্রশ্নোত্তর।

'আল-শারহুস সাগির' গ্রন্থে (১/৭০০) (الفللس) সম্পর্কে বলেন: "যদি সেটাফেলে দেয়া না যায় (গলা অতিক্রম না করার কারণে) তাহলে তার উপর কোনকিছুবর্তাবে না।"

ইবনে হায়ম তার 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে (৪/৩৩৫) বলেন: "গলা থেকে যে (الفللس) বের হয় সেটা রোযা ভঙ্গ করবে না; যদি না ব্যক্তি মুখে চলে আসার পরেএবং ফেলা দেয়া সম্ভবপর হওয়ার পরেও ইচ্ছাকৃতভাবে সেটাকে গিলে ফেলে।"

তিনি আরও বলেন (৪/৩৪৮):

"দাঁত থেকে নির্গত (الفللس) ও রক্ত গলাতে চলে না গেলে যে, রোযা ভঙ্গ হবেনা এ ব্যাপারে আমরা কোন মতভেদ জানি না। এমনকি যদি কোন মতভেদ পাওয়া যায়সেটার প্রতি কোন ঝঞ্জেপ করা হবে না। কেননা (কুরআন-সুন্নাহর) কোন টেক্সটএর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হওয়াকে আবশ্যিক করে না।" [সংক্ষেপে সমাপ্ত]

মুযাত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল-মুনতাকা'-তে (২/৬৫) বলেন: "মালেক থেকেবর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: রমযানের রোযাকালীন সময়ে যে ব্যক্তির সামান্য বমিমুখে চলে আসার পর সে এটাকে পুনরায় গিলে ফেলে তার উপর কাযা আবশ্যিক হবে না। ইবনুল কাসেম বলেন: মালেক এ মত থেকে প্রত্যাভর্তন করেছেন। তিনি বলেন: যদি সামান্য বমি এমন স্থান পর্যন্ত চলে আসে যে, ব্যক্তি চাইলে এটাকে ফেলে দিতে পারে; তদুপরি গিলে ফেলে তাহলে তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক হবে। শাইখ আবুলকাসেম বলেন: যদি জিহ্বাতে চলে আসার পরেও কেউ গিলে ফেলে তাহলে তার উপর কাযাপালন আবশ্যিক হবে। আর যদি এই স্থানে পৌঁছার আগে গিলে ফেলে তাহলে তার উপরকোন কিছু আবশ্যিক হবে না।" [সমাণ্ড]

'আল-ইনসাফ' গ্রন্থে বলেন:

বমি বা (الفلس) মুখে চলে আসার পর যদি কেউ সেটাকে গিলে ফেলে তাহলে তাররোযা ভেঙ্গে যাবে; এমনকি সেটা অতি সামান্য হলেও। যেহেতু এর থেকে বেঁচে থাকাসম্ভব। এটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন (অর্থাৎ ইমাম আহমাদ) [সমাণ্ড]

'হাশিয়াতুল আদাওয়ি' গ্রন্থে (১/৪৪৮) বমির লুকুম উল্লেখ করার পর বলেন: "(الفلس) বমির মত; যা পাকস্থলি ভরে যাওয়ার পর পাকস্থলির মুখ থেকে বেরিয়ে যায়।" [সমাণ্ড]

প্রশ্ন

রমযানের রোযার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে; আমি যদি সোমবার ওবুহস্পতিবারে সেহেরী না খেয়ে রোযা রাখতে চাই। যেহেতু আমি ফজরের জন্য ওসেহেরী খাওয়ার জন্য জাগতে পারি না। সেহেরী না খেয়ে রোযা রাখা কি জায়েয হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন: "...রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য সেহেরী খাওয়া শর্ত নয়। বরং সেহেরী খাওয়ামুস্তাহাব। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরাসেহেরী খাও; কারণ সেহেরীতে বরকত রয়েছে।" [মুত্তাফাকুন আলাইহি]

প্রশ্ন

জনৈক নারী হায়েয থেকে পবিত্র হয়েছেন কিনা এ সন্দেহথাকাবস্থায় রোযা রাখা শুরু করেছেন। সকালে দেখলেন যে, তিনি পবিত্র। পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে রোযা রাখায় তার রোযা কি সঠিক হয়েছে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তার রোযা রাখা সঠিক হয়নি। ঐদিনের রোযা কাযা করা তার উপর আবশ্যিক। কেননা আসল অবস্থা হল— হায়েয চলমানথাকা। তিনি পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে রোযা ধরায় ইবাদতটি শুদ্ধহওয়ার শর্ত পূর্ণ হয়েছে কিনা; এ ব্যাপারে সন্দেহ নিয়ে তিনি ইবাদতে প্রবেশকরেছেন। এটি কোন ইবাদত সঠিক হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। [সমাণ্ড]

[মাজমুউ ফাতাওয়া বিন উছাইমীন; ফাতাওয়াস সিয়াম (১০৭, ১০৮)]

প্রশ্ন

চোখের ভ্রূপের তিক্ত স্বাদ যদি গলায় ঢুকে যায় তাহলে কিরোয়া ভেঙ্গে যাবে? যদি রোয়া ভেঙ্গে যায় তাহলে যে নারী চোখে ভ্রূপ দিয়ে দিনেরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছে, সে জানে না যে, সে কি গিলে ফেলেছে; নাকি গিলেনি— এরহুকুম কী হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

চোখের ভ্রূপ কি রোয়া নষ্টকরবে; নাকি করবে না— এ নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনেতাইমিয়া (রহঃ) ও শাইখ বিন উছাইমীন (রহঃ) এর মনোনীত অভিমত হচ্ছে— চোখের ভ্রূপরোয়া নষ্ট করবে না।

শাইখ বিন উছাইমীন বলেন: শাইখুল ইসলাম ইবনেতাইমিয়া (রহঃ) এর অভিমত হচ্ছে—সুরমা লাগানো রোয়াকে নষ্ট করে না। এমনকি সুরমার স্বাদ যদি গলায় পৌঁছে যায় তবুও। তিনি বলেন: যেহেতু এটাকে পানাহার আখ্যায়িত করা হয় না। কিংবা এটিপানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয়। পানাহারের মাধ্যমে যা অর্জিত হয় এটার মাধ্যমেতা অর্জিত হয় না। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ ওসুস্পষ্ট অর্থবোধক এমন কোন হাদিস নাই যা প্রমাণ করবে যে, সুরমা দেয়া রোয়ানষ্টকারী। মূল অবস্থা হল— রোয়া ভঙ্গ না হওয়া এবং ইবাদত ত্রুটিমুক্ত থাকায়তক্ষণ পর্যন্ত না ইবাদতকে নষ্টকারী কিছু আমাদের কাছে সাব্যস্ত হয়। শাইখুলইসলাম (রহঃ) যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সেটাই সহিহ। এমনকি কেউ যদি তার গলারভেতরে এর স্বাদ অনুভব করে তবুও। শাইখুল ইসলাম ইবনেতাইমিয়ার এ অভিমতেরভিত্তিতে কেউ যদি রোয়া রেখে তার চোখে ভ্রূপ দেয় এবং গলার ভেতরে এর স্বাদ পায়তাহলে এ কারণে তার রোয়া ভাঙবে না। [আল-শারহুল মুমতি (৬/৩৮২)]

প্রশ্ন

রোয়াদার ব্যক্তি অসুস্থ হলে রমযানের দিনের বেলায় সাপোজিটরী ব্যবহার করার হুকুম কী?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

যদি কেউ অসুস্থ হয় তাহলেগুহুদ্বার দিয়ে সাপোজিটরী ব্যবহার করতে কোন আপত্তি নেই। কেননা এটি পানাহারনয় এবং পানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয়।

শরিয়তপ্রণেতা আমাদের ওপর হারাম করেছেন পানাহার। আর যা কিছু পানাহারেরস্থলাভিষিক্ত হবে সেটাকেও পানাহারের হুকুম দেওয়া হবে। আর যা কিছু শব্দগত ওভাবগত দিক থেকে এর মধ্যে পড়বে না সেটার ক্ষেত্রে পানাহারের হুকুম সাব্যস্তহবে না।

প্রশ্ন

রমযানের দিনের বেলায় ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা নেয়ার হুকুম কি; সেটা পুষ্টিদায়ক ইনজেকশন হোক কিংবা চিকিৎসার ইনজেকশন হোক?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

রোযাদারের জন্য রমযানেরদিনের বেলায় মাংসপেশী ও শিরাতে ইনজেকশন নেয়া জায়েয। তবে দিনের বেলায়পুষ্টিদায়ক ইনজেকশন গ্রহণ করা জায়েয নেই। কেননা তা খাদ্য ও পানীয়েরপর্যায়ভুক্ত। তাই এ ধরনের ইনজেকশন গ্রহণ করা রমযানের রোযা ভঙ্গার কৌশলহিসেবে গণ্য হবে। মাংসপেশী ও শিরাতে পুশ্কৃত ইনজেকশনও যদি রাতের বেলায় নেয়াযায় তাহলে সেটাই ভাল।

আল্লাহুই তাওফিকদাতা।

প্রশ্ন

আমি দুই মাসের গর্ভবতী। রমযান মাসে আমার বমি হয়। কখনও কখনওমাগরিবের কিছু সময় আগেও বমি হয়। কখনও কখনও আমি অনুভব করি যে, বমি আমারগলার ভেতরে ফিরে যাচ্ছে। এর হুকুম কী?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আলেমদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা রোযাভঙ্গের কারণ। আর কারো যদি বমি এসে যায় তাহলে তার রোযা ভঙ্গ হবে না।[এটিউল্লেখ করেছেন আল-খাতাবী ও ইবনুল মুনিয়র। দেখুন: আল-মুগনী (৪/৩৬৮)]

সুন্নাহ থেকে এর দলিল হচ্ছে তিরমিযি (৭২০)-এর সংকলিত আবু হুরায়রা (রাঃ)কর্তৃক বর্ণিত হাদিস: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যেব্যক্তির বমি এসে গেছে তার উপর কাযা নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমিকরেছে তাকে কাযা পালন করতে হবে।"[আলবানী সহিহুত তিরমিযি গ্রন্থে হাদিসটিকেসহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া "আল-ফাতাওয়া" গ্রন্থে (২৫/২৬৬) বলেন: আর বমি:যদি কেউ নিজে থেকে বমি করে তাহলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি কারো বমিএসে যায় তাহলে তার রোযা ভাঙ্গবে না।[সমাণ্ড]

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে এমন ব্যক্তির হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় রোযাবস্থায় যার বমি হয়ে গেছে তাকে কি ঐ দিনের রোযার কাযা পালন করতে হবে?

জবাবে তিনি বলেন: তার উপর কাযা পালন নেই। যে ব্যক্তি নিজে থেকে বমিকরেছে তাকে কাযা পালন করতে হবে। তিনি পূর্বোক্ত হাদিস দিয়ে দলিলদেন।[সমাণ্ড]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) কে রমযান মাসে বমি করলে রোযা ভাঙ্গবে কিনা— এসম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলেন: যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করেতাহলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি এসে যায় তাহলে রোযাভাঙ্গবে না। দলিল হচ্ছে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস। (তিনি পূর্বোক্তহাদিসটি উল্লেখ করেন।)

অতএব, যদি আপনার বমি হয়ে যায় তাহলে আপনার রোযা ভঙ্গ হবে না। এমনকি কেউযদি তার পাকস্থলিতে অস্বাভাবিকতা অনুভব করে এবং কিছু বের হয়ে আসবে এমনঅনুভব করে; সে ক্ষেত্রে আমরা কি বলব যে, সেটাকে আটকিয়ে রাখা আপনার উপরওয়াজিব? উত্তর: না। কিংবা সেটাকে টেনে আনা? উত্তর: না। কিন্তু আমরা বলব:আপনি নিরপেক্ষ অবস্থান নিন। বমিকে টেনে আনবেন না; প্রতিরোধও করবেন না। যদিআপনি বমিকে টেনে আনেন তাহলে আপনার রোযা ভেঙ্গে যাবে। যদি প্রতিরোধ করে রাখেন তাহলে আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। যদি আপনার কোন তৎপরতা ছাড়া বমিবেবর হয়ে আসে তাহলে আপনার স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হল না এবং আপনার রোযাও নষ্টহল না।[সমাণ্ড]

দুই:

যদি বমির কিছু অংশ ব্যক্তির অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেটে চলে যায় তাহলে তার রোযা শুদ্ধ হবে। কেননা তার ইখতিয়ার ছাড়াই সেটা চলে গেছে।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: এমন রোযাদার সম্পর্কে যে ব্যক্তির বমি এসেছে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে সে বমি গিলে ফেলেছে— তার ছকুমকী?

জবাবে তারা বলেন: যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়েযাবে। আর যদি বমি চলে আসে তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে যেহেতু অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি গিলে ফেলেছে তাই রোযা নষ্ট হবে না। [সমাণ্ড]

প্রশ্ন

এক ব্যক্তি এক মেয়েকে ভালবাসে। সে ঐ মেয়েকে রমযান মাসে বিয়ে করতে চায়। তার সাথে কথাবার্তা বলতে চায়। রমযান মাসে ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে ও রমযান মাসে তার সাথে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে ইসলামে কিনিষেধাজ্ঞামূলক কোন বিধি আছে?

লোকটি মেয়েটিকে অনেক ভালবাসে এবং বিয়ে করতে চায়। আশা করি এ ব্যাপারে আপনারা আমাকে উপদেশ দিবেন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলামী শরিয়তে এমন কিছু নাই যা রমযান মাসে কেবল রমযানটি মাস হওয়ার কারণে বিয়েতে বাধা দেয়; কিংবা অন্য কোন মাসে বিয়ে করতে বাধা দেয়। বরং বছরের যে কোন সময় বিয়ে করা জায়েয।

কিন্তু রোযাদারের জন্য ফজর থেকে সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়ে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করা নিষিদ্ধ। তাই যে ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার সাথে এবং রোযা নষ্টকারী বিষয়ে লিগু হওয়ার আশংকা না করে তার জন্য রমযানমাসে বিয়ে করতে কোন আপত্তি নেই।

তবে বাহ্যতঃ দেখা যায়, যে ব্যক্তি রমযান মাসে তার দাম্পত্য জীবন শুরু করতে চায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিনের বেলায় সে নতুন স্ত্রী থেকে ধৈর্য রাখতে পারে না। তাই সে হারাম কাজে লিগু হওয়া ও এ মর্যাদাবান মাসের পবিত্রতালঙ্ঘন করার আশংকা থাকে। এভাবে সে কবির গুনাতে লিগু হয়ে তার উপর রোযার কাযা পালন ও বড় কাফফারা ওয়াজিব হতে পারে। বড় কাফফারা হল একটি দাস আবাদকরা। দাস না পেলে দুইমাস লাগাতর রোযা রাখা। যদি রোযাও না রাখতে পারে তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানো। যদি একাধিক দিন সহবাস করে থাকে তাহলে সে দিনগুলোর সংখ্যা যত ততটি কাফফারা আসবে।

প্রশ্নকারীর জন্য উপদেশ হচ্ছে যদি তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার আশংকা করেন তাহলে তিনি যেন বিয়েটা রমযানের পরপর করেন। রমযান মাসে তিনি যেন নিজেকে ইবাদত করা, তেলাওয়াত করা ও কিয়ামুল লাইল পালন ইত্যাদি ইবাদতে ব্যস্ত রাখেন। আর যে মেয়েকে বিয়ে করতে চাওয়া হচ্ছে তার সাথে রমযান মাসে কথাবার্তা বলা সংক্রান্ত বিধান ইতিপূর্বে [13918](#) নং ও [13791](#) নং প্রশ্নোত্তরে আলোচিত হয়েছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী প্রায় ১৫ দিন আগে শাবান মাসে সন্তান প্রসব করেছে। তার নিফাসের রক্তস্রাব যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয় তাহলে কি সে নামায, রোযা, উমরা, কুরআন তেলাওয়াত ও তারাবীর নামায ইত্যাদি শরিয়ত দায়িত্বগুলো পালন করতে পারবে? নাকি তাকে ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হবে; যেমনটি কেউ কেউ বলছেন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

জমহুর আলেমের মতে, জমহুরের মধ্যে চার ইমামও রয়েছেন: নিফাসের সবিন্ন সময়ের নির্দিষ্ট কোন মেয়াদ নেই। কোন নারী যখনই নিফাস থেকে পবিত্র হবে তখনই গোসল করা, নামায ও রোযাপালন করা তার উপর ওয়াজিব; এমনকি সেটা যদি সন্তান প্রসবের ৪০ দিন আগে হয় তবুও। “ কেননা শরিয়তে নিফাসের সবিন্ন মেয়াদ সম্পর্কে কোন কিছু উদ্ধৃত হয়নি। এ ব্যাপারে বাস্তবে যা পাওয়া যায় সেটাই ভিত্তি। বাস্তবে নিফাসের মেয়াদ কমও পাওয়া যায়, বেশিও পাওয়া যায়।” [এটি বলেছেন ইবনে কুদামা তার ‘আল-মুগনি (১/৪২৮)]

বরং কোন কোন আলেম এ অভিমতের ওপর আলেমদের ইজমা (মতৈক্য) বর্ণনা করেছেন। তিরমিযি (রহঃ) বলেন: “ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবর্গ, তাবয়ীগণ এবং তাঁদের পরবর্তী আলেমগণ এ মর্মে ইজমা করেছেন যে, নিফাসগ্রস্ত নারী চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায পড়বেন না; তবে চল্লিশ দিনের আগেই যদি পবিত্রতা দেখেন তাহলে তিনি গোসল করে নামায পড়া শুরু করবেন।” [সমাণ্ড] দেখুন: আল-মাজমু (২/৫৪১)]

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয় (১৫/১৯৫): যদি নিফাসগ্রস্ত নারী চল্লিশ দিনের আগেই পবিত্র হয়ে যায় তাহলে তার জন্য রোযা রাখা ও নামায আদায় করা কি জায়েয হবে?

জবাবে তিনি বলেন: হ্যাঁ; যদি তিনি পবিত্র হয়ে যান তবে তার জন্য রোযা রাখা, নামায পড়া, হজ্জ করা ও উমরা করা জায়েয হবে এবং তার স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করাও বৈধ হবে। যদি কেউ ২০ দিনের দিন পবিত্র হয়ে যায় তাহলে তিনি গোসল করে নামায পড়বেন, রোযা রাখবেন এবং তার স্বামীর জন্য তিনি হালাল হবেন। উসমান বিন আবুল আস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এটাকে মাকরুহ মনে করতেন। তবে তার এ মাকরুহ মনে করার ব্যাখ্যা হবে তিনি এটাকে ‘মাকরুহে তানযিহি’ মনে করতেন এবং এটি এ সাহাবীর নিজস্ব ইজতিহাদ; যার পক্ষে কোন দলিল নেই।

সঠিক অভিমত হল: এতে কোন অসুবিধা নেই। যদি কেউ ৪০ দিনের আগেই পবিত্র হয় তাহলে তার এ পবিত্র সঠিক। চল্লিশ দিনের মধ্যে যদি পুনরায় স্রাব শুরু হয় তাহলে সঠিক মতানুযায়ী, চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেটা নিফাস হিসেবে গণ্য হবে। তবে, ইতিপূর্বে পবিত্র অবস্থায় তার পালনকৃত রোযা, নামায ও হজ্জ সহিহ। যেহেতু এগুলো পবিত্র অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। তাই এগুলো পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নেই। [সমাণ্ড]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (৫/৪৫৮) এসেছে:

“ যদি কোন নিফাসগ্রস্ত নারী চল্লিশ দিন পর্যন্ত পূর্ণ হওয়ার আগেই পবিত্রতা দেখতে পান তাহলে তিনি গোসল করে নামায ও রোযা পালন শুরু করবেন এবং তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে।” [সমাণ্ড]

স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল (১০/১৫৫) এমন এক নারী সম্পর্কে যিনি রমযানের সাতদিন আগে সন্তান প্রসব করে পবিত্র হয়েছেন এবং রমযানের রোযা পালন করেছেন। জবাবে তাঁরা বলেন: যদি বাস্তবে এমনটি হয়ে থাকে তাহলে পবিত্র অবস্থায় তার রমযানের রোযা পালন সহিহ; তাকে রমযানের রোযার কাযা পালন করতে হবে না। [সমাণ্ড]

প্রশ্ন

আমি শুচিবায়ু (COD) তে আক্রান্ত। রমযান মাসে আমি যখনও জু করতাম তখন বেশি বেশি থুথু ফেলতাম, এই ভয়ে না জানি গলার ভেতরে পানি চলে যায়। একবার আমি স্নায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ইচ্ছা করে পানি খেয়ে ফেলেছি। এখন আমি এ গুনার কাফ্ফারা বা প্রতিকার কিভাবে করতে পারি?

একবার রমযানে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার মা বাদাম শুকাতেন। সে বাদামগুলো তিনি আমার পাশে রেখেছিলেন। আমি অনুভব করলাম যে, আমার মুখে কিছু একটা আছে; আমি জানি না, সেটা খাদ্যের অবশিষ্টাংশ; নাকি বাদাম। আমি উঠে গিয়ে কুলি করব এই অলসতা থেকে গিলে ফেলেছি। এখন আমার কি করণীয়?

অপর এক রম্যানে আমার মুখের ভেতরে কিছু ওয়ুর পানি রয়ে গিয়েছিল। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সে পানি গিলে ফেলেছি।
সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে— যে ব্যক্তি উঠে গিয়ে কুলি করার অলসতা থেকে বমি গিলে ফেলেছে তার ব্যাপারে হুকুম কি?
আমি এখন স্তন্যদায়ী। আমি আল্লাহর কাছে তওবা করেছি। আমি কিভাবে আমার পাপের কাফফারা বা প্রতিকার করতে পারি?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

আপনার উপর ফরয হচ্ছে— যে দিনগুলোর রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করেছেন সেগুলোর কাযা পালন করা; সেটামুখে থাকা পানি গিলে ফেলার মাধ্যমে হোক, যে পানি খুথুর পানি নয়; কারণ খুথুরপানি গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গবে না কিংবা মুখে থাকা খাদ্যের অবশিষ্টাংশ গিলেফেলার মাধ্যমে হোক কিংবা মুখে চলে আসা বমি গিলে ফেলার মাধ্যমে হোক। আপনি এমন দিনগুলোর সংখ্যা নির্ধারণ করবেন এবং সে দিনগুলোর কাযা রোযা পালন করবেন। পাশাপাশি স্বেচ্ছায় আপনি যা করেছেন সেটার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে তওবাকরবেন। এ রোযাগুলোর কাযা পালন করা দুখ পান করানোর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ফরয হবে। কারণ স্তন্যদায়ী নারীর জন্য রোযা রাখাটা কষ্টকর হলে কিংবা এতে নিজের স্বাস্থ্যহানির আশংকা হলে কিংবা সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকা হলে দুখ পান করানোর মেয়াদের মধ্যে কাযা রোযা পালন করা তার উপর ফরয নয়। আর আপনি কঠিন শুচিবায়ু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া এবং স্নায়বিক চাপে থাকা: আমরা আশা করছি এক্ষেত্রে আপনার কোন দোষ নেই। তবে, ওয়াস ওয়াসা বা শুচিবায়ু রোধকরার চেষ্টা করা আবশ্যিকীয় এবং এটার প্রতি ক্রক্ষেপ না করা। কারণ শুচিবায়ুর চিকিৎসার সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে— এটাকে গুরুত্ব না দেয়া ও এর প্রতিক্রক্ষেপ না করা এবং এর চাহিদামাফিক কিছু না করা। শুচিবায়ুর চিকিৎসার ব্যাপারে জানতে দেখুন: 111929 নং ও 60303 নং প্রশ্নোত্তর। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনি বলেছেন: “ একবার আমি স্নায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ইচ্ছা করে পানি খেয়ে ফেলেছি”।

আপনি যদি এর দ্বারা বুঝাতে চান যে, আপনার মুখে কুলির যে পানি রয়েছে সেটাবা সেটার কিছু অংশ গিলে ফেলেছেন: তাহলে আপনার রোযা ভেঙ্গে গেছে। এক্ষেত্রে আপনার উপর ফরয হল— তওবা করা এবং সে দিনের রোযার কাযা পালন করা।

আর আপনি যদি এর দ্বারা বুঝাতে চান যে, কুলি করার পর মুখের পানি বাহিরেফেলে দিয়ে খুথু গিলে ফেলেছেন: তাহলে আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়। বুজাইরিমি (রহঃ) তার ‘হাশিয়াতে’ (২/৩৭৮) বলেন: “ গড়গড়া কুলি করার পর খুথুফেলে দেয়া সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও গিলে ফেললে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু এর থেকেবেঁচে থাকা কঠিন।” [সমাণ্ড]

অনুরূপভাবে আপনি বলেছেন: “ আমার মুখের ভেতরে ওয়ুর কিছু পানি রয়ে গিয়েছিল”:

যদি এই পানিটি কুলির পানি হয় তাহলে আপনার রোযা ভেঙ্গে গেছে। আপনাকে এর কাযা পালন করতে হবে।

আর যদি কুলি করার পর ও মুখ থেকে পানি ফেলে দেয়ার পর মুখে যে আর্দ্রতাথাকে সেটা হয়ে থাকে: তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়।

তিন:

যদি কেউ তার দাঁতের মাঝে আটকে থাকা খাবার ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলে; যা সেবের করে ফেলতে সক্ষম, তাহলে এর দ্বারা তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলে; যেমন খুথুর সাথে গলার ভেতরে চলে গেল, এটাকে ফিরাতে পারল না; তাহলে তার রোযা সহিহ। তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়।

দেখুন: [78438](#) নং প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্নকারী বোনের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে থাকাখাবার গিলে ফেলেছেন এবং উঠে গিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে অলসতা করেছেন। যদি সেটা রাতের বেলায় ঘটে থাকে তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে না। আর যদি ফজর হওয়ার পর ঘটে থাকে তাহলে তাকে আল্লাহর কাছে তওবা করার পাশাপাশি সেদিনের রোযা কাযা পালন করতে হবে।

চার:

যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি চলে এসেছে; তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়, তার রোযা সহিহ। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করেছে তাকে রোযাটি কাযাপালন করতে হবে।

যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি আসার পর তিনি বমি গিলে ফেলেছেন; যদি তিনি সেটা অনিচ্ছাকৃতভাবে করে থাকেন তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলেন তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে গেল এবং তার উপরকাযা পালন করা আবশ্যিক। স্থায়ী কমিটির আলেমগণ বলেন: যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি বমি এসে যায় তাহলে তার রোযানষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি গিলে ফেললেও রোযা নষ্ট হবে না। [ফাতাওয়াল লাজনা দায়িমা (১০/২৫৪)]

প্রশ্ন

রোযা অবস্থায় আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে। কিন্তু, আমি ঘুম থেকে জেগে বীর্যপাতের কোন কিছু দেখতে পাইনি। এর মানে আমি বীর্যপাত না করে স্বপ্ন দেখেছি। এমতাবস্থায় আমি কি গোসল করে আমার রোযা পূর্ণ করব; নাকি গোসলনা করেই পূর্ণ করব; নাকি রোযা ভেঙ্গে ফেলব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হয়েছে এরপর ঘুম থেকে জাগার পর সে বীর্যের কোন আলামত তার কাপড়ে দেখতে পায়নি তার উপর গোসল আবশ্যিক হবে না।

ইবনে কুদামা 'আল-মুগনি' গ্রন্থে বলেন:

যে ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হওয়াটা সে জেনেছে, কিন্তু (পোশাকে) বীর্য পায়নিতার উপরে গোসল ফরয নয়। ইবনুল মুনিযির বলেন: যত জন আলেমের অভিমত আমার মুখস্ত আছে তারা সকলে এই মতের উপর ইজমা করেছেন।

উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, উম্মে সুলাইম (রাঃ) বললেন: ইয়ারাসুলুল্লাহ! কোন মহিলার যদি স্বপ্নদোষ হয় তাহলে কি তার উপর গোসল ফরয হবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ; যদি পানি (বীর্য) দেখে [সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম] এ হাদিস নির্দেশ করেছে যে, যদি পানি (বীর্য) না দেখে তাহলে তার উপর গোসল ফরয নয় [সমাণ্ড]

দুই:

স্বপ্নদোষের কারণে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ স্বপ্নদোষ রোযাদারের অনিচ্ছায় ঘটে থাকে।

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে বলেন:

আলেমগণের ইজমা হচ্ছে- কারো স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভাঙ্গবে না। কারণ সেব্যক্তি এক্ষেত্রে অপারগ। যেমন- কারো অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন একটি মাছি যদি উড়ে এসে কারো পেটে ঢুকে যায়। এ মাসয়ালার দলিলের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে-ভিত্তি। পক্ষান্তরে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত: "যেব্যক্তি বমি করেছে, কিংবা যার স্বপ্নদোষ হয়েছে, কিংবা যে শিক্ষা লাগিয়েছে তার রোযা ভাঙ্গবে না" হাদিসটি 'যয়িফ' (দুর্বল); যা দলিল পেশ করার উপযুক্ত নয় [সমাণ্ড]

তিনি 'মুগনি' গ্রন্থে (৪/৩৬৩) আরও বলেন:

কারো যদি স্বপ্নদোষ হয় তার রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা স্বপ্নদোষ তার অনিচ্ছায় ঘটে থাকে। সুতরাং এটি ঐ মাসয়ালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ – কেউ যদি ঘুমিয়ে থাকে আর তার গলার ভেতরে কোন কিছু ঢুকে যায় [সমাণ্ড]

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে দিনেরবেলায় ঘুমিয়েছে এবং তার স্বপ্নদোষ হয়েছে, বীর্যও বের হয়েছে; সে কি ঐ দিনেররোযার কাযা পালন করবে?

জবাবে তিনি বলেন:

তার উপর কাযা আবশ্যিক নয়। কেননা স্বপ্নদোষ তার ইচ্ছাধীন নয়। কিন্তু, তার উপর গোসল ফরয; যদি বীর্য দেখে থাকে [মাজমুউল ফাতাওয়া (১৫/২৭৬)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল রমযানের দিনের বেলায় যার স্বপ্নদোষ হয়েছে?

জবাবে তিনি বলেন: তার রোযা সহিহ। স্বপ্নদোষের কারণে রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা স্বপ্নদোষ তার এখতিয়ারে নেই। ঘুমন্ত অবস্থায় কলম তুলে রাখায় [সমাণ্ড]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৭৪) এসেছে:

যে ব্যক্তির রোযা অবস্থায় কিংবা হজ্জ বা উমরার ইহরাম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হয়েছে তার কোন গুনাহ নেই; তার উপর কাফফারা নেই। এটি তার রোযার উপর, হজ্জের উপর বা উমরার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। তার উপর ফরয হল: জানাবাতেরগোসল করা; যদি সে বীর্যপাত করে থাকে [সমাণ্ড]

প্রশ্ন

রোযা অবস্থায় সাইনোসাইটিস রোগীর পেটের ভেতরে নাকেরশ্লেষ্মা চলে গেলে তার রোযার হুকুম কী? একই রোগী যদি নাকে রক্তসহ ঘুম থেকেজেগে উঠে এবং তার মুখে রক্তের স্বাদ পায় সেক্ষেত্রে হুকুম কী?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলেমগণ সকলে এই মর্মে একমতযে, যদি কফ ও শ্লেষ্মা রোযাদারের পেটের ভেতরে চলে যায়, রোযাদার এটাকে ফেলেদিতে না পারে এক্ষেত্রে তার রোযা নষ্ট হবে না। কারণ এটি রোযাদারের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভেতরে ঢুকে গেছে।

শাইখ যাকারিয়া আল-আনসারী আল-শাফেয়ী (রহঃ) বলেন:

“ যদি শ্লেষ্মা মুখ থেকে কিংবা নাক থেকে নিজেই রোযাদারের পেটে চলে যায়, রোযাদার সেটা ফেলে দিতে না পারে সেক্ষেত্রে ওজরের কারণে সে ব্যক্তির রোযাভাঙ্গবে না।” [‘আসনাল মাতালিব’ (১/৪১৫) থেকে সমাণ্ড]

আর যদি রোযাদার ফেলে দিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও গিলে ফেলে তবে কিছু কিছুআলেমের মতে, যেমন ইমাম শাফেয়ীর মতে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও (এক বর্ণনা অনুযায়ী) ইমাম আহমাদ এর মতানুযায়ী রোযা ভাঙ্গবে না। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন [দেখুন: ‘আল-মাওসুআআল-ফিকহিয়্যা’ (৩৬/২৫৯-২৬১)]

ইবনে নুজাইম আল-হানাফি (রহঃ) বলেন:

“ যদি শ্লেথ্মা রোযাদারের মাথা থেকে নাকে প্রবেশ করে, এরপর রোযাদারইচ্ছাকৃতভাবে সেটাকে নাক দিয়ে টেনে নেয় এবং সেটা গলার ভেতরে চলে যায়সেক্ষেত্রে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কেননা শ্লেথ্মা থুথুরপর্যায়ভুক্ত...” [‘আল-বাহরুর রাযেক শারছ কানযিদ দাক্কায়িক’ (২/২৯৪) থেকেসমাণ্ড]

মালেকী মাযহাবের আলেম নাফরায়ি (রহঃ) বলেন:

“ কফ বুক থেকে জিহ্বার মাথায় বের হয়ে আসে এবং গিলে ফেলে এতে তার উপর কাযাপরিহার্য হবে না; এমনকি সে যদি এটা ফেলে দিতে সক্ষম হয় তবুও। একই ধরণেরবিধান শ্লেথ্মার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শ্লেথ্মা যদি জিহ্বায় চলে আসে এবংসেটাকে গিলে ফেলে এতে করে কাযা পালন করা অপরিহার্য হবে না।” [‘আল-ফাওয়াকিহআদ-দাওয়ানি’ (১/৩০৯) থেকে সমাণ্ড]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“ যদি শ্লেথ্মা মুখে না আসে অর্থাৎ অনুভব করে যে, সেটা মস্তিষ্ক থেকেনির্গত হয়ে পেটে চলে গিয়েছে সেক্ষেত্রে এটি রোযা ভঙ্গ করবে না। কেননা এটিদেহের বহিঃ অংশে পৌঁছে নাই। মানুষের মুখ শরীরের বহিঃ অংশের পর্যায়ভুক্ত। যদি মুখে পৌঁছার পর গিলে ফেলে সেক্ষেত্রে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি মুখেনা পৌঁছে তাহলে সেটা দেহের অভ্যন্তরে থাকার পর্যায়ভুক্ত। তাই রোযা ভঙ্গকরবে না।

এ মাসয়ালায় অপর একটি মত রয়েছে। সেটি হচ্ছে, যদি শ্লেথ্মা মুখে পৌঁছে এবংসেটাকে গিলে ফেলে তবুও এটা রোযা ভঙ্গ করবে না। এটাই অগ্রগণ্য অভিমত। কেননা, এটি মুখ থেকে বের হয়নি। এটাকে গিলে ফেলা পানাহার হিসেবে গণ্য হবেনা।” [‘আল-শারছুল মুমতি’ (৬/৪২৪)]

সারকথা: সাইনোসাইটিসের কারণে শ্লেথ্মা, রক্ত বা এ জাতীয় যেসবপ্রতিক্রিয়া ঘটে সেসবের কারণে আপনার রোযা নষ্ট হবে না। কিন্তু, আপনি যদিএগুলো বের করে ফেলে দিতে পারেন রোযা পালনের সতর্কতাস্বরূপ সেটা করা ভাল।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনাকে সুস্থ করে দেন ও রোগ মুক্ত করেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

কোন রোযাদার যদি রমযান মাসেরদীর্ঘ ২৮ দিন নাক দিয়ে রক্ত পড়া রোগে আক্রান্ত হয় এর হুকুম কী? আমিআপনাদেরকে জানাচ্ছি যে, আমার বয়স ৫৯ বছর। আমি জীবনে কোনদিন নাক পড়া রোগেআক্রান্ত হইনি। গত বছর রমযান মাসে আমি ভোর থেকে ইফতারের সময়ের মাঝে ৩ থেকে ৬বার নাক দিয়ে রক্ত পড়ায় আক্রান্ত ছিলাম। আমার গলার ভেতরেও রক্ত চলে আসত।পরে জমাটবাধা রক্ত আমি ফেলে দিতাম।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনি যা উল্লেখ করেছেন যদিতেমনি ঘটে থাকে তাহলে আপনার রোযা শুদ্ধ। কেননা আপনার ইচ্ছার বাইরে আপনিনাক দিয়ে রক্ত পড়া রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। সূতরাং এ রোগের কারণে আপনার উপররোযা ভাঙ্গার হুকুম দেয়া হবে না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় শরিয়ি বিধান সহজ হওয়ারদলিল থেকে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, “ আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোনদায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬]আল্লাহ্ আরও বলেন, “ আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা করতে চাননা।” [সূরা মায়িদা, আয়াত: ০৬]

আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা, আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাথীদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।[সমাণ্ড]

ফতোয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ।

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, শাইখ আব্দুল্লাহ্ গাদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন ক্বুয়দ ।

[ফাতাওয়াল লাজনা আদ-দায়িমা লিল বৃহস ওয়াল ইফতা (১০/২৬৪-২৬৫)]

ফতোয়াসমগ্রে আরও রয়েছে-

“ যদি রোযা থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার শরীর থেকে রক্তপাত ঘটে তাহলে তার রোযা ভঙ্গবে না ।” [সমাণ্ড]

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন গাদইয়ান ।

[ফাতাওয়াল লাজনা আদ-দায়িমা লিল বৃহস ওয়াল ইফতা (১০/২৬৪-২৬৮)]

প্রশ্ন

স্যুলাইন, ভিটামিন ইনজেকশন, শিরাতে পুশকৃত ইনজেকশন ও সাপোজিটরি ব্যবহারে কি রোযা ভঙ্গবে? আমি অগ্রগণ্য অভিমতটি জানতে চাই ।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

এক:

যা কিছু পানাহার, কিংবা পানাহারের স্থলাভিষিক্ত সেটাই রোযা ভঙ্গকারী অন্তর্ভুক্ত । ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলেমগণ বলেন:

“ রোযা ভঙ্গকারী বিষয় অনেক । এর মধ্যে রয়েছে- ইচ্ছাকৃত পানাহার । পানাহারেরঅধীনে পড়বে প্রত্যেক খাদ্য বা পানি যা পেটে প্রবেশ করে । রাইস টউবেরমাধ্যমে নাক দিয়ে যা পেটে পৌঁছানো হয় সেটাও এর অধিভুক্ত হবে । অনুরূপভাবেখাদ্যের বিকল্প ইনজেকশনও এর অধিভুক্ত হবে ।” [ফাতওয়াল লাজনা আদ-দায়িমা (৯/১৭৮)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“ রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলো হচ্ছে- খাওয়া ও পান করা: সে খাদ্য বা পানীয় যেশ্রেণীরই হোক না কেন । খাওয়া ও পান করার অধিভুক্ত হবে ইনজেকশনসমূহ । অর্থাৎ ঐসকল ইনজেকশনসমূহ যেগুলো শরীরে পুষ্টি যোগায় কিংবা খাদ্যের মাধ্যমে শরীরেযে শক্তি অর্জিত হয় এসব ইনজেকশনের মাধ্যমেও একই শক্তি অর্জিত হয় । তাই এগুলোরোযা ভঙ্গ করবে... ।” [মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসায়িলিল উছাইমীন (১৯/২১)]

তিনি আরও বলেন:

আলেমগণ মুফাভিরাত বা রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর অধিভুক্ত করেছেন ঐ সববিষয়কে যেগুলো পানাহারের পর্যায়ে পড়ে । যেমন- পুষ্টিদায়ক ইনজেকশন । যে সকলইনজেকশনের মাধ্যমে শরীর চাঙ্গা হয় কিংবা রোগ মুক্ত হয় এটি সেসব ইনজেকশন নয় ।বরং এটি হচ্ছে পুষ্টিদায়ক ইনজেকশন; যা পানাহারের স্থলাভিষিক্ত । এ আলোচনারভিত্তিতে যে সব ইনজেকশন পানাহারের স্থলাভিষিক্ত নয় সেগুলো রোযা ভঙ্গ করবেনা । চাই সে ইনজেকশন রগে দেয়া হোক কিংবা রানে দেয়া হোক কিংবা অন্য কোন স্থানদিয়ে দেয়া হোক ।[শাইখ উছাইমীনের ‘মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলিল উছাইমীন (১৯/১৯৯)]

দুই:

কিছু কিছু রোগীকে রগ দিয়ে যে স্যালাইন পুশ করা হয় এটি রোযা ভঙ্গ করবে। কেননা এটি খাদ্য দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। (কারণ এর মধ্যে লবণ ও তরল রয়েছে) যাপেটে প্রবেশ করবে এবং এর দ্বারা শরীর উপকৃত হবে।

তিন:

ভিটামিন ইনজেকশন ও রগে পুশ করা ইনজেকশন:

যদি এ সকল ইনজেকশন শরীরকে চাঙ্গা করার জন্য, ব্যথ্যা দূর করার জন্য, কিংবা লাঘব করার জন্য, জ্বর কমানোর জন্য গ্রহণ করা হয় এবং এটি পুষ্টিগুণসম্পন্ন না হয় তাহলে এসব ইনজেকশনের কারণে রোযা ভঙ্গ হবে না।

পক্ষান্তরে, যদি পুষ্টিগুণ সম্পন্ন হয় তাহলে এটি রোযা নষ্ট করবে। কারণ এটি খাবার ও পানীয়ের স্থলাভিষিক্ত; তাই এটাকে খাবার ও পানীয়ের হুকুম দেয়া হবে।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি বলেন: চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রোযাদারের জন্য রমযানের দিনের বেলায় পেশীতে ইনজেকশন দেয়া জায়েয আছে। কিন্তু, রোযাদারের জন্য খাদ্য-ইনজেকশন গ্রহণ করা নাজায়েয। কেননা ইনজেকশন গ্রহণ করা খাবার-দাবার গ্রহণ করার ন্যায়। তাই এ ধরনের ইনজেকশন গ্রহণ করা রমযান মাসেরোযা ভাঙ্গার একটা একটা কৌশল। যদি পেশীতে ও রগের ইনজেকশন রাতের বেলায় দেয়া যায় তাহলে সেটা উত্তম। [স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র থেকে (১০/২৫২) সমাপ্ত]

চার:

সাপোজিটরি রোযা ভাঙ্গে না। কারণ এটি চিকিৎসার জন্য গ্রহণ করা হয়। এটি খাবার ও পানীয় এর মধ্যে পড়ে না।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

রোযাদার ব্যক্তি অসুস্থ হলে গুহ্যদ্বার দিয়ে প্রবেশকৃত সাপোজিটরিব্যবহারে কোন গুনাহ নেই। কেননা এটি পানাহার নয় এবং পানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয়। শরিয়ত প্রণেতা আমাদের উপর শুধু পানাহার করা হারাম করেছেন। অতএব, যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত সেটাকে পানাহারের হুকুম দেয়া হবে। আর যা কিছু এরকম নয় সেগুলো শব্দগত কিংবা অর্থগতভাবে পানাহারের অধীনে পড়বে না। ফলে সেগুলোর জন্য পানাহারের হুকুমও সাব্যস্ত হবে না। [ফাতাওয়া ওয়ারাসায়িলিল উছাইমীন (১৯/২০৪)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি গাড়ী এক্সিডেন্টের শিকার হয়ে বেহুশ অবস্থায় রমযান মাসে প্রবেশ করেছে এবং ২২ দিন পর সে সস্থিত ফিরে পেয়েছে তার কর্তব্য কী?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এ প্রশ্নটি শাইখ মুহাম্মদ বিন উছাইমীনের কাছে পেশ করা হয়েছে, তিনি বলেন:

অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, রোগের কারণে কিংবা রোগ ছাড়া অন্য কোন কারণে কেউজ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকলে তার উপর নামাযের আবশ্যিকীয় দায়িত্ব থাকে না। তাই তার উপর নামায কাযা করা আবশ্যিক নয়। কিন্তু, জ্ঞান হারানোর কারণে সে যেদিনগুলোর রোযা রাখতে পারেনি সে দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর আবশ্যিক।

নামায ও রোযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, নামায আবর্তমান। তাই কেউ যদি তারছুটে যাওয়া নামায না পড়ে থাকে সে নামায পরের দিন তাকে পড়তে হয়। কিন্তু, রোযার দায়িত্ব আবর্তমান নয়। এ কারণে ঋতুগ্রস্ত নারীকে রোযার কাযা পালন করতেহয়; নামাযের কাযা পালন করতে হয় না।

প্রশ্ন

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তাই ফজরের আযান শুনিনি। ঘড়ির এলার্ম সঠিক সময়ের চেয়ে বিলম্বে সেট করা ছিল। আমি এক গ্লাস পানি পান করার পর নামাযের ইকামত শুনতে পেলাম। এমতাবস্থায় আমার উপর কী বর্তাবে? সে ব্যাপারে আমাকে অবহিত করুন। আপনারা সওয়াব পাবেন।

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

যে ব্যক্তি ফজরের ওয়াক্ত হয়নি মনে করে, পানাহার করে ফেলেছে; পরবর্তীতেপ্রতীয়মান হয় যে তখন ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছে; আলেমদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ীতার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কেননা সে ব্যক্তি সময় সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তাইসে ওজরগ্রস্ত।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “ যদি রোযাদার অজ্ঞতাবশতঃ রোযা-ভঙ্গকারী কোনএকটি বিষয়ে লিপ্ত হয় সেক্ষেত্রে তার রোযা শুদ্ধ হবে। তার এ অজ্ঞতা সময়সম্পর্কে হোক কিংবা হুকুম সম্পর্কে হোক। সময় সম্পর্কে অজ্ঞতার উদাহরণ হল, কেউ শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠল, তার ধারণা ছিল যে, তখনও ফজরের ওয়াক্ত হয়নি, তাইসে পানাহার করে নিল। কিন্তু বাস্তবে প্রতীয়মান হল যে, তখন ফজরের ওয়াক্তহয়ে গিয়েছিল। এমন ব্যক্তির রোযা শুদ্ধ হবে। যেহেতু তিনি সময় সম্পর্কে অজ্ঞছিলেন।

আর হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতার উদাহরণ হচ্ছে, কোন রোযাদার শিক্ষা লাগাল। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, শিক্ষা লাগালে রোযা ভেঙে যায়। এমন ব্যক্তিরক্ষেত্রেও বলা হবে: আপনার রোযা শুদ্ধ। এই অভিমতের দলিল হচ্ছে, আল্লাহরবাণী: “ হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনিআমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমনবোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের উপর তেমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না। হে আমাদেররব! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনিআমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্যকরুন।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬] এটি কুরআনের দলিল।

আর সুন্নাহর দলিল হচ্ছে: ইমাম বুখারী তাঁর সহিহ গ্রন্থে আসমা বিনতেআবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন “ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের যামানায় একবার মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা ইফতার করে ফেললাম, এরপরসূর্য উঠল।” অর্থাৎ তারা দিন থাকতে ইফতার করে ফেলেছেন। কিন্তু তারা জানতেননা। বরং তাদের ধারণা হয়েছিল যে, সূর্য ডুবে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম তাদেরকে সে রোযাটি কাযা পালন করার নির্দেশ দেননি। যদি কাযাপালন করা ওয়াজিব হত তাহলে তিনি অবশ্যই তাদেরকে সে নির্দেশ দিতেন। আর যদিতিনি তাদেরকে নির্দেশ দিতেন তাহলে সে তথ্য আমাদের কাছে অবশ্যই পৌঁছত।” [মাজমুউল ফাতাওয়া ১৯]

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রোযা রাখা অবস্থায় আমরা যখন গলার ভেতরে রক্তেরস্বাদ অনুভব করি এবং কিছু থুথু ফেলে দিই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কী উক্তরোযাটির কাযা পালন করতে হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ ।

রোযাদার যদি গলার ভেতরে রক্তের স্বাদ অনুভব করে এতে তার রোযার কোন ক্ষতি হবে না; এমনকি সেটা যদি গিলে ফেলে তদুপরিও । তবে, যদি মুখে চলে আসার পর গিলে ফেলে তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে । একই বিধান প্রযোজ্য হবে শ্লেথ্মা, কফও গলার ভেতরে আরও যা কিছু আসতে পারে সবকিছুর ক্ষেত্রে ।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন, আমি কফ ও শ্লেথ্মার মাসয়ালার ক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, কিছু কিছু রোযাদার নিজেকে অনেক কষ্ট দিয়ে ফেলেন । আপনি দেখবেন, উনার গলার একেবারে ভেতরেও যদি কিছু থাকে তিনি সেটা বের করার চেষ্টা করেন । এটি ভুল । কেননা কফ ও শ্লেথ্মা রোযা ভঙ্গ করেনা । তবে যদি এগুলো মুখে চলে আসার পর গিলে ফেলে সেক্ষেত্রে কিছু কিছু আলেমের মতে, এগুলো রোযা ভঙ্গ করবে । আর অপর কিছু আলেমের মতে, সেক্ষেত্রেও এগুলো রোযাভঙ্গ করবে না ।

আর যদি গলার ভেতরের জিনিস নীচের দিকে নেমে পেটে চলে যায় সেক্ষেত্রে এগুলো রোযাভঙ্গ করবে না; এমনকি রোযাদার যদি সেটা অনুভব করেন তা সত্ত্বেও । অতএব, গলার ভেতরের জিনিস বের করে আনার জন্য নিজেকে কষ্ট দেয়া উচিত নয় । ” । [শাইখ উছাইমীনের ফতোয়াসমগ্র (১৯/৩৫৬) থেকেসমাণ্ড]

প্রশ্ন

রমযানের দিনের বেলায় শিক্ষা যে লাগায় ও যাকে লাগানো হয় উভয়ের রোযা কি ভেঙ্গে যাবে?

তাদের দুই জনের হুকুম কী? তাদের দুইজনেরই রোযা ভেঙ্গে যাবে? তাদের উভয়কে এরোযাগুলো আবার কাযা পালন করতে হবে? নাকি অন্য কোন দায়িত্ব আছে? আশা করি জানাবেন ।

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ ।

শিক্ষা যে লাগায় ও যাকে শিক্ষা লাগানো হয় উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যাবে । তাদের উভয়কে দিনের অবশিষ্টাংশ রোযা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে এবং রোযাটির কাযা পালন করতে হবে । যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ যে ব্যক্তি শিক্ষা লাগায় ও যাকে শিক্ষা লাগানো হয় উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যাবে । ” [সুনানে আবুদাউদ (২৩৬৭), সুনানে ইবনেমাজাহ (১৬৭৯), আলবানী ‘সহিহআবু দাউদ’ গ্রন্থে (২০৭৪)হাদিসটিকে ‘সহিহ’ বলেছেন]

আল্লাহুই তাওফিক দাতা, আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক ।

প্রশ্ন:

আমি এমন একটি পাকস্থলির রোগে আক্রান্ত যে, আমারমুখে তরল পদার্থ জমলে পাকস্থলি থেকে খাদ্য বেরিয়ে আসে । রমযান মাসে আমারএমনটি ঘটেছে । আমাকে কি রোযার কাযা পালন করতে হবে?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ ।

যদি রোযাদারের পাকস্থলি থেকে কোন কিছু মুখে চলে আসে তাহলে রোযাদারের কর্তব্য হচ্ছে সেটা থু দিয়ে ফেলে দেয়া । যদি রোযাদার ইচ্ছাকৃত ভাবে সেটা গিলে ফেলে তাহলে রোযা বাতিল হয়ে যাবে । আর যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে গিলে ফেলে তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না । আল্লাহুই উত্তম তাওফিক দাতা । আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবী বর্গের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক । [সমাণ্ড]

ফতোয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ আব্দুল আযিয আলেশাইখ, শাইখ আব্দুল্লাহ্ গুদইয়ান, শাইখ বাকর আবু যাইদ

প্রশ্ন:

রমযানে থুথুর কারণে কি রোযা ভেঙ্গে যাবে, নাকি ভাঙ্গবে না? কারণ আমার মুখে অনেক থুথু আসে। বিশেষতঃ আমি যখন কুরআন তেলাওয়াত করি এবং মসজিদে থাকি।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোযাদার যদি থুথু গিলে ফেলে এতে তার রোযা নষ্ট হবে না; এমনকি সে থুথু অনেক বেশি হলেও; সেটা মসজিদে হলেও কিংবা অন্য কোন স্থানে হলেও। তবে যদি কফের মত ঘন ক্লেমা হয় তাহলে গিলবে না। বরং আপনি মসজিদে থাকলে টিস্যু পেপারে কিংবা অন্য কিছুতে থু করে ফেলে দিবেন।

আল্লাহুই তাওফিকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীবর্গের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

ফতোয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (১০/২৭০)

যদি বলা হয়:

ইচ্ছাকৃতভাবে কফ গিলে ফেলা কি জায়েয আছে?

জবাব: রোযাদার ও বে-রোযাদার উভয়ের জন্যে কফ গিলে ফেলা নাজায়েয। কেননা কফ ঘৃণিত জিনিস। হতে পারে কফের মধ্যে এমন কিছু রোগ রয়েছে যা শরীর থেকে নিঃসরিত হয়েছিল। কিন্তু, কফ গিলে ফেললে রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা কফ মুখ থেকে বের হয়নি। কফ গিলে ফেলাটা পানাহার হিসেবে গণ্য হয় না। তাই কফ মুখে চলে আসার পরগিলে ফেললে এতে করে রোযা ভাঙ্গবে না [শাইখ উছাইমীনের 'আল-শারহুল মুমতি' গ্রন্থ (৬/৪২৮) থেকে সমাপ্ত]

প্রশ্ন:

কখনও কখনও রমযানে দিনের বেলায় আমি ক্লান্তি ওমাথা ব্যথা অনুভব করি। একজন আমাকে পরামর্শ দিলেন মাথা ব্যথা কমাতে সাপোজিটরি ব্যবহার করতে। এ ঔষধ ব্যবহার করলে কি রোযা ভেঙ্গে যাবে; নাকি ভাঙ্গবে না? দয়া করে জানাবেন; আল্লাহ্ আপনাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানের দিনের বেলায় সাপোজিটরী ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে রোযাদারকে যদি ডুশদিতে হয় সেটাও রোযা ভঙ্গকারী নয়। কেননা এটার ব্যবহার রোযা ভঙ্গকারী হওয়ার পক্ষে কোন দলিল নেই। তাছাড়া এগুলো পানাহার নয় কিংবা পানাহারের পর্যায়ভুক্তও নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া 'আল-ইখতিয়ারাত' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৯৩) বলেন:

সুরমা লাগানো কিংবা ইনজেকশন (উদ্দেশ্য হচ্ছে ডুশ) রোযা ভঙ্গ করবে না।... এটি কিছু কিছু আলেমের অভিমত। [সমাণ্ড]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) 'আল-শারহুল মুমতি' গ্রন্থে (৬/৩৮১) বলেন:

এ মাসয়ালায় শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার অভিমতই অগ্রগণ্য [সমাপ্ত] অর্থাৎ ডুশ গ্রহণ করা রোযা ভঙ্গকারী নয়।

আল্লাহুই ভাল জানেন।

প্রশ্ন:

যারা রোযা রেখে বিভিন্ন শস্যদানা ভাঙ্গানোর কাজ করেন এ কাজ করাকালে শস্যদানার কিছু অংশ যদি ছুটে এসে গলার ভিতরে চুকে যায়।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এতে করে তাদের রোযার কোনক্ষতি হবে না। কেননা বিক্ষিপ্তভাবে এসব কিছু আসা তাদের ইচ্ছায় ঘটেনি। এগুলোতাদের পেটে যাক তাদের এমন কোন উদ্দেশ্যও ছিল না। এ প্রসঙ্গে আমি স্পষ্টকরে দিতে চাই যে, রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলো (যেমন- সহবাস, পানাহার, ইত্যাদি) ৩টি শর্ত পূর্ণ না হলে রোযা নষ্ট করবে না:

এক: রোযা ভঙ্গকারী বিষয়টি রোযাদারের জানা থাকতে হবে; জানা না থাকলে তাররোযা ভাঙ্গবে না। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী, অর্থ হচ্ছে "এ ব্যাপারেতোমরা কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বেচ্ছায় করেছে (তা অপরাধ)।" [সূরা আহযাব, আয়াত: ০৫] কুরআনে আরও এসেছে, "হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬] এর প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেন: সেটাই হবে। নবী সাল্লাল্লাহু এর বাণীতে এসেছে, "আমার উম্মতের উপর থেকে ভুল, বিস্মৃতি ও জবরদস্তির শিকার হয়ে তারা যা করে সেটা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।" অজ্ঞ ব্যক্তি ভুলকারী। যদি সে জানত তাহলে তো সেটা করত না। অতএব, কেউ যদি অজ্ঞতাবশতঃ রোযা ভঙ্গকারী কোন বিষয়ে লিপ্ত হয় তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না; বরং তার রোযা সহিহ হবে; তার সে অজ্ঞতা বিধানকেন্দ্রিক হোক কিংবা সময়কেন্দ্রিক হোক।

বিধানকেন্দ্রিক অজ্ঞতার উদাহরণ হচ্ছে: কোন ব্যক্তি যদি এই মনে করে কোন একটি রোযা ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয় যে, এটি রোযা নষ্ট করবে না; যেমন কেউ এইভাবে শিক্ষা লাগাল যে, শিক্ষা লাগালে রোযা ভাঙ্গে না; সেক্ষেত্রে তার রোযাসহিহ এবং তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। এ রকম অন্যান্য বিষয় যা ব্যক্তির ইচ্ছার বাইরে ঘটে যায় সেক্ষেত্রেও কোন দোষ হবে না এবং এ কারণে ব্যক্তির রোযা ভঙ্গ হবে না উল্লেখিত দলিলের কারণে।

সারকথা হচ্ছে: রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলো ৩টি শর্ত ব্যতিরেকে কোন মানুষের রোযা নষ্ট করবে না:

১। রোযা ভঙ্গকারী বিষয়টি ব্যক্তির জানা থাকা।

২। এতে লিপ্ত হওয়ার সময় ব্যক্তির স্মরণে থাকা।

৩। ইচ্ছাকৃতভাবে এতে লিপ্ত হওয়া।

আল্লাহুই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

যে চিকিৎসাগুলো জায়েয এবং রোযার সাথে সাংঘর্ষিক নয়এ সম্পর্কে স্কলারদের কোন মতামত আছে কি? বিশেষতঃ ১. ক্যাপসুল/সিরাপ ২. এ্যাজমার ইনহেলার ৩. সাপোজিটরি ৪. রগে ইনজেকশন দেয়া কি অনুমোদিত? হাটের সমস্যা সংক্রান্ত ইনহেলারের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতুএখানের ২০% শিশু হাটের সমস্যায় আক্রান্ত হয়। আশা করি আপনারা ব্যাখ্যা দিবেন এবং ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আপডেট পাঠাবেন।

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আমরা নিম্নে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করব। এগুলোর মধ্যে কোন্টি রোযা নষ্ট করবে, আর কোন্টি রোযা নষ্ট করবে না তা উল্লেখ করব। মূলত এ বিবরণটি 'ফিকাহ একাডেমী' এর মিটিং গুলোতে যোগবেষণাপত্রগুলো উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলোর সার-সংক্ষেপ:

এক: নিম্নোক্ত বিষয়গুলো রোযা ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না:

১. চোখের ড্রপ, কানের ড্রপ, কানের ক্লিনার, নাকের ড্রপ, নাকের ইনহেলার ইত্যাদির ব্যবহার। তবে এ ঔষুধগুলোর কিংদাংশ যদি গলার ভেতরে চলে যায় তাহলে যেন গিলে না ফেলে।

২. শ্বাসকষ্টজনিত রোগের চিকিৎসা কিংবা অন্য কোন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে জিহ্বার নীচে যে ট্যাবলেট বা অন্য কিছু রাখা হয় সেটা থেকে নির্গত কোন পদার্থ গলার ভিতরে চলে না গেলে।

৩. মেডিকেল টেস্টের জন্য যোনিপথে যা কিছু ঢুকানো হয়; যেমন- সাপোজিটরি, লোশন, কলপোস্কোপ, হাতের আঙ্গুল ইত্যাদি।

৪. স্পেকুলাম বা আই. ইউ. ডি. বা এ জাতীয় কোন মেডিকেল যন্ত্রপাতি জরায়ুর ভেতরে প্রবেশ করালে।

৫. নারী বা পুরুষের মুত্রনালী দিয়ে যা কিছু প্রবেশ করানো হয়; যেমন- ক্যাথিটার, সিস্টোস্কোপ, এক্সরে এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রঞ্জক পদার্থ, ঔষধ, মুত্রথলি পরিস্কার করার জন্য প্রবেশকৃত দ্রবণ।

৬. দাঁতের রুট ক্যানেল করা, দাঁত ফেলা, মেসওয়াক দিয়ে কিংবা ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিস্কার করা; যদি কোন কিছু গলায় চলে গেলে সেগুলো গিলে না ফেলে।

৭. গড়গড়া কুলি ও চিকিৎসার জন্য মুখে ব্যবহৃত স্প্রে; যদি কোন কিছু গলায় চলে আসলে সেটা গিলে না ফেলে।

৮. চিকিৎসার উদ্দেশ্যে চামড়াতে, পেশীতে, কিংবা রগে ইনজেকশন দেয়া; যদি সেটা পুষ্টিকর তরল বা ইনজেকশন না হয়।

৯. অক্সিজেন গ্যাস নেয়া।

১০. এ্যানেসথেসিয়ার জন্য ব্যবহৃত গ্যাস রোযা ভঙ্গ করবে না; যদি না রোগীকে এর সাথে কোন খাদ্য-দ্রবণ দেয়া হয়।

১১. চামড়া দিয়ে শরীরে যা কিছু প্রবেশ করে। যেমন- তৈল, মলম, মেডিসিন ও কেমিকেল সম্বলিত ডাক্তারি প্লাস্টার।

১২. ডাগায়নস্টিক ছবি তোলা কিংবা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হৃৎপিণ্ডের ধমনীতে কিংবা শরীরের অন্য কোন অঙ্গের শিরাতে ছোট একটি টিউব প্রবেশ করানো।

১৩. নাড়ীভূড়ি পরীক্ষা করার জন্য কিংবা অন্য কোন সার্জিকাল অপারেশনের জন্য পেটের ভেতর একটি মেডিকেল স্কোপ প্রবেশ করালেও রোযা ভাঙবে না।

১৪. কলিজা কিংবা অন্য কোন অঙ্গের নমুনাস্বরূপ কিছু অংশ সংগ্রহ করলেও রোযা ভাঙ্গবে না; যদি এ ক্ষেত্রে কোন দ্রবণ গ্রহণ করতে না হয়।

১৫. পাকস্থলীতে গ্যাসট্রোস্কোপ (gastroscope) ঢুকানো; যদি এর সাথে অন্য কোন দ্রবণ বা পদার্থ ঢুকানো না হয়।

১৬. চিকিৎসার স্বার্থে মস্তিষ্কে কিংবা স্পাইনাল কর্ডে কোন মেডিকেল যন্ত্র কিংবা কোন ধরনের পদার্থ ঢুকানো।

১৭. অনিচ্ছাকৃত বমি; তবে ইচ্ছা করে বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

দুই:

মুসলিম ডাক্তারের কর্তব্য হচ্ছে, উল্লেখিত চিকিৎসাগুলোর মধ্যে যেটি ইফতারের পরে করা সম্ভব সেটি ইফতারের পরে করার জন্য রোগীকে পরামর্শ দেয়া। যাতে করে, এ চিকিৎসা রোযার শুদ্ধতার উপর কোন প্রভাব তৈরী করার সম্ভাবনা না থাকে।

প্রশ্ন

রোযা ভঙ্গের কারণগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করবেন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ হেকমত অনুযায়ী রোযার বিধান জারী করেছেন। তিনি রোযাদারকে ভারসাম্য রক্ষা করে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন; একদিকে যাতে রোযা রাখার কারণে রোযাদারের শারীরিক কোন ক্ষতি না হয়। অন্যদিকে সে যেন রোযা বিনষ্টকারী কোন বিষয়ে লিপ্ত না হয়।

এ কারণে রোযা-বিনষ্টকারী বিষয়গুলো দুইভাগে বিভক্ত:

কিছু রোযা-বিনষ্টকারী বিষয় রয়েছে যেগুলো শরীর থেকে কোন কিছু নির্গত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- সহবাস, ইচ্ছাকৃত বমি করা, হায়েয ও শিঙ্গা লাগানো। শরীর থেকে এগুলো নির্গত হওয়ার কারণে শরীর দুর্বল হয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা এগুলোকে রোযা ভঙ্গকারী বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন; যাতে করে এগুলো নির্গত হওয়ার দুর্বলতা ও রোযা রাখার দুর্বলতা উভয়টি একত্রিত না হয়। এমনটি ঘটলে রোযার মাধ্যমে রোযাদার ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং রোযা বা উপবাসের ক্ষেত্রে আর ভারসাম্য বজায় থাকবে না।

আর কিছু রোযা-বিনষ্টকারী বিষয় আছে যেগুলো শরীরে প্রবেশ করানোর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- পানাহার। তাই রোযাদার যদি পানাহার করে তাহলে যে উদ্দেশ্যে রোযার বিধান জারী করা হয়েছে সেটা বাস্তবায়িত হবে না। [মাজমুউল ফাতাওয়া ২৫/২৪৮]

আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতে রোযা-বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর মূলনীতি উল্লেখ করেছেন:

“এখন তোমরা নিজ স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যাকিছু লিখে রেখেছেন তা (সন্তান) তালাশ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো সুতা থেকে ভোরের শুভ সুতা পরিষ্কার ফুটে উঠে...” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোযা-নষ্টকারী প্রধান বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে- পানাহার ও সহবাস। আর রোযা নষ্টকারী অন্য বিষয়গুলো নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাদিসে উল্লেখ করেছেন।

তাই রোযা নষ্টকারী বিষয় ৭টি; সেগুলো হচ্ছে-

১। সহবাস

২। হস্তমৈথুন

৩। পানাহার

৪। যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত

৫। শিঙ্গা লাগানো কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে রক্ত বের করা

৬। ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা

৭। মহিলাদের হায়েয ও নিফাসের রক্ত বের হওয়া

এ বিষয়গুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে- সহবাস; এটি সবচেয়ে বড় রোযা নষ্টকারী বিষয় ও এতে লিপ্ত হলে সবচেয়ে বেশি গুনাহ হয়। যে ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলা স্বেচ্ছায় স্ত্রী সহবাস করবে অর্থাৎ দুই খতনার স্থানদ্বয়ের মিলন ঘটাবে এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ লজ্জাস্থানের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে সে তার রোযা নষ্টকরল; এতে করে বীর্যপাত হোক কিংবা না হোক। তার উপর তওবা করা, সেদিনের রোযাপূর্ণ করা, পরবর্তীতে এ দিনের রোযা কাযা করা ও কঠিন কাফফারা আদায় করা ফরয। এর দলিল হচ্ছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন: “ একব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ধ্বংস হয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: কিসে তোমাকে ধ্বংস করল? সে বলল: আমি রমযানে (দিনের বেলা) স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন: তুমি কি একটি ক্রীতদাস আযাদ করতে পারবে? সে বলল: না। তিনি বললেন: তাহলে লাগাতার দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল: না। তিনি বললেন: তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল: না...! হাদিসটি সহিহ বুখারী (১৯৩৬) ও সহিহ মুসলিমে (১১১১) এসেছে।

স্ত্রী সহবাস ছাড়া অন্য কোন কারণে কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হয় না।

দ্বিতীয়: হস্তমৈথুন। হস্তমৈথুন বলতে বুঝায় হাত দিয়ে কিংবা অন্য কিছু দিয়ে বীর্যপাত করানো। হস্তমৈথুন যে রোযা ভঙ্গকারী এর দলিল হচ্ছে- হাদিসে কুদসীতে রোযাদার সম্পর্কে আল্লাহর বাণী: “ সে আমার কারণে পানাহার ও যৌনকর্মপরিহার করে” সুতরাং যে ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলা হস্তমৈথুন করবে তার উপর ফরয হচ্ছে— তওবা করা, সে দিনের বাকী সময় উপবাস থাকা এবং পরবর্তীতে সরোযাটির কাযা পালন করা। আর যদি এমন হয়— হস্তমৈথুন শুরু করেছে বটে; কিন্তু বীর্যপাতের আগে সে বিরত হয়েছে তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে; তার রোযাসহিহ। বীর্যপাত না করার কারণে তাকে রোযাটি কাযা করতে হবে না। রোযাদারের উচিত হচ্ছে— যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সবকিছু থেকে দূরে থাকা এবং সবকুচিন্তা থেকে নিজের মনকে প্রতিহত করা। আর যদি, মজি বের হয় তাহলে অগ্রগণ্যমতানুযায়ী— এটি রোযা ভঙ্গকারী নয়।

তৃতীয়: পানাহার। পানাহার বলতে বুঝাবে— মুখ দিয়ে কোন কিছু পাকস্থলীতে পৌঁছানো। অনুরূপভাবে নাক দিয়ে কোন কিছু যদি পাকস্থলীতে পৌঁছানো হয় সেটাও পানাহারের পর্যায়ভুক্ত। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ তুমি ভাল করে নাকে পানি দাও; যদি না তুমি রোযাদার হও।” [সুনানেতিরমিযি (৭৮৮), আলবানি সহিহ তিরমিযিতে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন] সুতরাং নাক দিয়ে পাকস্থলীতে পানি প্রবেশ করানো যদি রোযাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল করে নাকে পানি দিতে নিষেধ করতেন না।

চতুর্থ: যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত। এটি দুইটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। ১. যদি রোযাদারের শরীরে রক্ত পুশ করা হয়। যেমন- আহত হয়ে রক্তক্ষরণের কারণে কারো শরীরে যদি রক্ত পুশ করা হয়; তাহলে সে ব্যক্তির রোযা ভেঙ্গেযাবে। যেহেতু পানাহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে— রক্ত তৈরী। ২. খাদ্যের বিকল্প হিসেবে ইনজেকশন পুশ করা। কারণ এমন ইনজেকশন নিলে পানাহারের প্রয়োজন হয়না। [শাইখ উছাইমীনের ‘মাজালিসু শারহি রমাদান’, পৃষ্ঠা- ৭০] তবে, যেসব ইনজেকশন পানাহারের স্থলাভিষিক্ত নয়; বরং চিকিৎসার জন্য দেয়া হয়, উদাহরণতঃ ইনসুলিন, পেনেসিলিন কিংবা শরীর চাঙ্গা করার জন্য দেয়া হয় কিংবা টীকা হিসেবে দেয়া হয় এগুলো রোযা ভঙ্গ করবে না; চাই এসব ইনজেকশন মাংশপেশীতে দেয়া হোক কিংবা শিরাতে দেয়া হোক। [শাইখ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম এর ফতোয়াসমগ্র (৪/১৮৯)] তবে, সাবধানতা স্বরূপ এসব ইনজেকশন রাতে নেয়া যেতে পারে।

কিডনী ডায়ালাইসিস এর ক্ষেত্রে রোগীর শরীর থেকে রক্ত বের করে সে রক্তপরিশোধন করে কিছু কেমিক্যাল ও খাদ্য উপাদান (যেমন— সুগার ও লবণ ইত্যাদি) যোগ করে সে রক্ত পুনরায় শরীরে পুশ করা হয়; এতে করে রোযা ভেঙ্গে যাবে। [ফতোয়াবিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৯)]

পঞ্চম: শিক্ষা লাগানোর মাধ্যমে রক্ত বের করা। দলিল হচ্ছে— নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “ যে ব্যক্তি শিক্ষা লাগায় ও যারশিক্ষা লাগানো হয় উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যাবে।” [সুনানে আবু দাউদ (২৩৬৭), আলবানী সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে (২০৪৭) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

রক্ত দেয়াও শিক্ষা লাগানোর পর্যায়ভুক্ত। কারণ রক্ত দেয়ার ফলে শরীরের উপরশিক্ষা লাগানোর মত প্রভাব পড়ে। তাই রোযাদারের জন্য রক্ত দেয়া জায়েয নেই। তবে যদি অনন্যোপায় কোন রোগীকে রক্ত দেয়া লাগে তাহলে রক্ত দেয়া জায়েয হবে। রক্ত দানকারীর রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং সে দিনের রোযা কাযা করবে। [শাইখউছাইমীনের ‘মাজালিসু শাহরিহ রামাদান’ পৃষ্ঠা-৭১]

কোন কারণে যে ব্যক্তির রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে— তার রোযা ভাঙ্গবে না; কারণরক্ত ক্ষরণ তার ইচ্ছাকৃত ছিল না। [স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৬৪)]

আর দাঁত তোলা, ক্ষতস্থান ড্রেসিং করা কিংবা রক্ত পরীক্ষা করা ইত্যাদিকারণে রোযা ভাঙ্গবে না; কারণ এগুলো শিক্ষা লাগানোর পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণএগুলো দেহের উপর শিক্ষা লাগানোর মত প্রভাব ফেলে না।

ষষ্ঠ: ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা। দলিল হচ্ছে— “ যে ব্যক্তিরঅনিচ্ছাকৃতভাবেবমিএসে যায় তাকে উক্ত রোযা কাযা করতে হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায়বমি করল তাকে সে রোযা কাযা করতে হবে” [সুনানে তিরমিযি (৭২০), আলবানী সহিহতিরমিযি গ্রন্থে (৫৭৭) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

হাদিসে غلبه ذرعه শব্দের অর্থ।

ইবনে মুনিযির বলেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বমি করেছে আলেমদের ঐক্যবদ্ধ অভিমত (ইজমা) হচ্ছে তার রোযা ভেঙ্গে গেছে। [আল-মুগনী (৪/৩৬৮)]

যে ব্যক্তি মুখের ভেতরে হাত দিয়ে কিংবা পেট কচলিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বমিকরেছে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কিছু শুকেছে কিংবা বারবার দেখেছে এক পর্যায়েতার বমি এসে গেছে তাকেও রোযা কাযা করতে হবে।

তবে যদি কারো পেট ফেঁপে থাকে তার জন্য বমি আটকে রাখা বাধ্যতামূলক নয়; কারণ এতে করে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। [শাইখ উছাইমীনের মাজালিসু শাহরিহরামাদান, পৃষ্ঠা-৭১]

সপ্তম: হায়েয ও নিফাসের রক্ত নির্গত হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ যখন মহিলাদের হায়েয হয় তখন কি তারা নামায ও রোযা ত্যাগকরে না!?” [সহিহ বুখারী (৩০৪)] তাই কোন নারীর হায়েয কিংবা নিফাসের রক্তনির্গত হওয়া শুরু হলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে; এমনকি সেটা সূর্যাস্তেরসামান্য কিছু সময় পূর্বে হলেও। আর কোন নারী যদি অনুভব করে যে, তার হায়েযশুরু হতে যাচ্ছে; কিন্তু সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত রক্ত বের হয়নি তাহলে তাররোযা শুদ্ধ হবে এবং সেদিনের রোযা তাকে কাযা করতে হবে না।

আর হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত নারীর রক্ত যদি রাত থাকতে বন্ধ হয়ে যায় এবং সাথেসাথে তিনি রোযার নিয়ত করে নেন; তবে গোসল করার আগেই ফজরহয়ে যায় সেক্ষেত্রেআলেমদের মায়হাব হচ্ছে— তার রোযা শুদ্ধ হবে।

হায়েযবতী নারীর জন্য উত্তম হচ্ছে তার স্বাভাবিক মাসিক অব্যাহত রাখা এবংআল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটার উপর সন্তুষ্ট থাকা, হায়েয-রোধকারী কোন কিছু ব্যবহার না-করা। বরং আল্লাহ তার থেকে যেভাবে গ্রহণকরেন সেটা মেনে নেয়া অর্থাৎহায়েয এর সময় রোযা ভাঙ্গা এবং পরবর্তীতে সে রোযাকাযা পালন করা। উম্মুল মুমিনগণ এবং সলফে সালেহীন নারীগণ এভাবেই আমলকরতেন। [স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৫১)]

তাছাড়া চিকিৎসা গবেষণায় হায়েষ বা মাসিক রোধকারী এসব উপাদানের বহুমুখীক্ষতি সাব্যস্ত হয়েছে। এগুলো ব্যবহারের ফলে অনেক নারীর হায়েষ অনিয়মিত হয়ে গেছে। তারপরেও কোন নারী যদি হায়েষ বন্ধকারী ঔষধ গ্রহণ করার ফলে তার হায়েষের রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং জায়গাটি শুকিয়ে যায় সে নারী রোযা রাখতে পারবে এবং তার রোযাটি আদায় হয়ে যাবে।

উল্লেখিত বিষয়গুলো হচ্ছে- রোযা বিনষ্টকারী। তবে, হায়েষ ও নিফাস ছাড়া অবশিষ্ট বিষয়গুলো রোযা ভঙ্গ করার জন্য তিনটি শর্ত পূর্ণ হতে হয়:

-রোযা বিনষ্টকারী বিষয়টি ব্যক্তির গোচরীভূত থাকা; অর্থাৎ এ ব্যাপারে সে অজ্ঞ না হয়।

-তার স্মরণে থাকা।

-জোর-জবরদস্তির স্বীকার না হয়ে স্বেচ্ছায় তাতে লিপ্ত হওয়া।

এখন আমরা এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করব যেগুলো রোযা নষ্ট করে না:

-এনিমা ব্যবহার, চোখে কিংবা কানে ড্রপ দেয়া, দাঁত তোলা, কোন ক্ষতস্থানের চিকিৎসা নেয়া ইত্যাদি রোযা ভঙ্গ করবে না। [মাজমুউ ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম (২৫/২৩৩, ২৫/২৪৫)]

-হাঁপানি রোগের চিকিৎসা কিংবা অন্য কোন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে জিহ্বারনীচে যে ট্যাবলেট রাখা হয় সেটা থেকে নির্গত কোন পদার্থ গলার ভিতরে চলে নাগেলে সেটা রোযা নষ্ট করবে না।

-মেডিকেল টেস্টের জন্য যোনিপথে যা কিছু ঢুকানো হয়; যেমন- সাপোজিটর, লোশন, কলপোস্কোপ, হাতের আঙ্গুল ইত্যাদি।

-স্পেকুলাম বা আই, ইউ, ডি বা এ জাতীয় কোন মেডিকেল যন্ত্রপাতি জরায়ুর ভেতরে প্রবেশ করালে।

-নারী বা পুরুষের মূত্রনালী দিয়ে যা কিছু প্রবেশ করানো হয়; যেমন-ক্যাথিটার, সিস্টোস্কোপ, এক্সরে এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রঞ্জক পদার্থ, ঔষধ, মূত্রথলি পরিস্কার করার জন্য প্রবেশকৃত দ্রবণ।

-দাঁতের রুট ক্যানেল করা, দাঁত ফেলা, মেসওয়াক দিয়ে কিংবা ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিস্কার করা; যদি ব্যক্তি কোন কিছু গলায় চলে গেলে সেগুলো গিলে নাফেলে।

-গড়গড়া কুলি ও চিকিৎসার জন্য মুখে ব্যবহৃত স্প্রে; যদি কোন কিছু গলায় চলে আসলেও ব্যক্তি সেটা গিলে না ফেলে।

-অক্সিজেন, এ্যানেসথেসিয়ার জন্য ব্যবহৃত গ্যাস রোযা ভঙ্গ করবে না; যদি না রোগীকে এর সাথে কোন খাদ্য-দ্রবণ দেয়া হয়।

-চামড়া দিয়ে শরীরে যা কিছু প্রবেশ করে। যেমন- তৈল, মলম, মেডিসিন ও কেমিকেল সম্বলিত ডাক্তারি প্লাস্টার।

-ডাগায়নস্টিক ছবি তোলা কিংবা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হৃৎপিণ্ডের ধমনীতে কিংবা শরীরের অন্য কোন অঙ্গের শিরাতে ছোট একটি টিউব প্রবেশ করানোতে রোযাভঙ্গ হবে না।

-নারীভূড়ি পরীক্ষা করার জন্য কিংবা অন্য কোন সার্জিকাল অপারেশনের জন্য পেটের ভেতর একটি মেডিকেল স্কোপ প্রবেশ করালেও রোযা ভঙ্গবে না।

- কলিজা কিংবা অন্য কোন অঙ্গের নমুনা স্বরূপ কিছু অংশ সংগ্রহ করলেও রোযা ভঙ্গবে না; যদি এ ক্ষেত্রে কোন দ্রবণ গ্রহণ করতে না হয়।

- গ্যাসট্রোস্কোপ (gastroscope) যদি পাকস্থলীতে ঢুকানো তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না; যদি না সাথে কোন দ্রবণ ঢুকানো না হয়।

- চিকিৎসার স্বার্থে মস্তিষ্কে কিংবা স্পাইনাল কর্ডে কোন চিকিৎসা যন্ত্র কিংবা কোন ধরণের পদার্থ ঢুকানো হলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

আল্লাহই ভাল জানেন।

[দেখুন শাইখ উছাইমীনের 'মাজালিসু শারহি রামাদান' ও 'সিয়াম সংক্রান্ত ৭০টি মাসালা' নামক এ ওয়েব সাইটের পুস্তিকা]

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আল্লাহ তাআলা কি সে ব্যক্তির রোযা কবুল করবেন; যে ব্যক্তির ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট রয়েছে। সুদি ব্যাংকে তার শেয়ারেরলেনদেন রয়েছে, তাকে সুদি কারবারি ধরা হয়; নাকি তার রোযা কবুল করবেন না?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, " হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তাপরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।" [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৮]

এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাগণের প্রতি আহ্বান যেন তারা সুদ ত্যাগকরে, সুদ থেকে দূরে থাকে। কেননা আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন, " আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন; আর সুদকে হারাম করেছেন" [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৫]

সুদ ভক্ষণ মুসলমানদের লাঞ্চিত ও অপমানিত হওয়ার অন্যতম কারণ। নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি তোমরা আইনা ব্যবসা কর, কৃষিকাজ নিয়ে সন্তুষ্ট থাক, গরুর লেজ ধরে থাক এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকরা ছেড়ে দাও; তাহলে আল্লাহ তোমাদের উপর এমন জিল্লতি চাপিয়ে দিবেন, যেজিল্লতি থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করবেন না; যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর দ্বীনেরদিকে ফিরে আস।" [সুনানে আবু দাউদ (৩৪৬২); আলবানি 'সিলসিলা সহিহা' গ্রন্থে (১১) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

সুদি ব্যাংকের শেয়ার এর ব্যাপারে ইতোপূর্বে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তবে যে ব্যক্তি কোন কবিরা গুনাতে লিপ্ত হয়েছে- যেমন সুদি ব্যাংকের শেয়ারকেনা- এমন ব্যক্তি রোযা রাখলে তার শরয়ি দায় খালাস হবে; তবে এতে কমতিথাকবে। হতে পারে সে ব্যক্তি রোযা রাখার সওয়াব পাবে না। আল্লাহ তাআলার এবাণীটি একটু ভেবে দেখুন তো, " হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরাতাকওয়াবানহতে পার।" [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩] এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোযা ফরজকরার উদ্দেশ্য উল্লেখ করে দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে- আল্লাহর নির্দেশ পালন ওনিষেধগুলো বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহভীতি বা তাকওয়া অর্জন। নবী সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, " যে ব্যক্তি মিথ্যা ও মিথ্যা কর্ম ত্যাগ করল না; তার পানাহার ত্যাগ করা তে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" [সহিহ বুখারি (১৯০৩)] অর্থাৎ রোযার মাধ্যমে আল্লাহর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমরা পানাহার থেকে উপবাসকরব; বরং আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে- আমরা আল্লাহকে ভয় করব। যেহেতু আল্লাহবলেছেন, " যেন তোমরা তাকওয়াবানহতে পার।" [দেখুন 'আল-শারহুল মুমতি (৬/৪৩৫)]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন, হাদিসের বাণী:

" قول الزور والعمل به "

এর মধ্যে قول الزور দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- মিথ্যা কথা; আর العمل به বা মিথ্যাকর্মদ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- মিথ্যার দাবীর অনুযায়ী কাজ করা।

ইবনুল আরাবী বলেন, এ হাদিসের দাবী হচ্ছে- হাদিসে যে পাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্যক্তি এ পাপ করবে সে রোযার সওয়াব পাবে না। অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লাতে রোযার সওয়াব মিথ্যা ও মিথ্যাকর্মের গুনাহর চেয়ে হালকা।

বায়যাবী (রহঃ) বলেন, নিরেট ক্ষুধার্ত বা পিপাসার্ত থাকা রোযা ফরজ করার উদ্দেশ্য নয়; বরং রোযা ফরজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে- রোযা রাখার মাধ্যমে যৌনচাহিদাকে প্রশমিত করা, নফসে আশ্মারাকে নফসে মুতমাইন্বাহর অনুগত করা। যদি এটি হাছিল না হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা রোযার প্রতি কবুলের দৃষ্টিতে তাকাবেননা।

এ হাদিসটি দিয়ে দলিল দেয়া হয়ে থাকে যে, এ পাপগুলো রোযাকে অসম্পূর্ণ রাখবে। [ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]

প্রশ্ন:

আমাদের এলাকার মুয়াজ্জিনের আযান শুনে আমরা ইফতার করে ফেলেছি। এর ৭ মিনিট পর আমরা অন্য একটি মসজিদের আযান শুনি। পরে যখন আমাদের এলাকার মুয়াজ্জিনকে জিজ্ঞেস করি তিনি জানান যে, তিনি ভুলক্রমে আযান দিয়েছেন; তিনি ভেবেছেন সময় হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় এলাকাবাসীর উপর কি কোনকিছু অপরিহার্য হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

জমহুরআলেমের মতে, যে ব্যক্তিসূর্য ডুবে গেছে মনে করে, ইফতার করে ফেলেছে, এরপর জানতে পারে যে, সূর্য ডুবেনি; তাকে রোযাটি কাযা করতে হবে।

ইবনেকুদামা 'আল-মুগনি' গ্রন্থ (৪/৩৮৯) বলেন: "এটি অধিকাংশ ফিকাহবিদ ও অন্যান্য আলেমের অভিমত।" সমাপ্ত

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ীকমিটিকে যখন এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যিনি তার দুই মেয়ের কথার ভিত্তিতে ইফতার করে ফেলেছেন। এরপর যখন মাগরিবের নামাযের জন্য বের হন তখন শুনতে পান যে, মাত্র মুয়াজ্জিন মাগরিবের নামাযের আযান দিচ্ছে। জবাবে তারা বলেন: "যদি প্রকৃত পক্ষে সূর্য ডোবার পর আপনার ইফতার হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে রোযা কাযা করতে হবে না। আর যদি আপনার ইফতার সূর্যাস্তের পরে হয়ে থাকে অথবা সূর্যাস্তের পরে হয়েছে বলে আপনার প্রবল ধারণা হয়; অথবা আপনি এরকম সন্দেহ করে থাকেন তাহলে আপনাকে এবং আপনার সাথে যারা ইফতার করেছে তাদের সকলকে রোযাটি কাযা পালন করতে হবে। কারণ দিবস অবশিষ্ট থাকাটাই হচ্ছে মূল অবস্থা। আর এ মূল অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরের জন্য শরয়ি দলিল থাকতে হবে। আর এখানে শরয়ি দলিল হচ্ছে-সূর্যাস্ত যাওয়া।" সমাপ্ত [স্থায়ীকমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৮৮)]

শাইখ বিন বাযকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: এমনকিছু লোকসম্পর্কে যারা ইফতার করে ফেলার পর জানা যায় যে, সূর্য ডুবেনি। উত্তরে তিনি বলেন: জমহুর আলেমের মতে, যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে তিনি সূর্যাস্ত যাওয়ার আগে যেটুকু সময় বাকী আছে তাতে পানাহার থেকে বিরত থাকবেন এবং রোযাটি কাযা পালন করবেন। সূর্য ডুবেছে কিনা তা জানার জন্য যদি যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকেন তাহলে তিনি গুনাহগার হবেন না। অনুরূপভাবে শাবান মাসের ৩০ তারিখ দিনের বেলায় যদি কারো কাছে সাব্যস্ত হয় যে, এ দিনটি ১লা রমযান তাহলে তিনি বাকী সময়টুকু পানাহার থেকে বিরত থাকবেন এবং এ দিনের রোযাটিকায় পালন করবেন; তিনি গুনাহগার হবেন না। কারণ তিনি যখন পানাহার করেছেন তখন জানতেন না যে, এ দিনটি রমযান। তাই এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকার কারণে তার গুনাহ হবে না। তবে এ রোযাটি তাঁকে কাযা পালন করতে হবে। [সমাপ্ত; বিন বাযের ফতোয়া সমগ্র ১৫/২৮৮]

আর কিছু কিছু আলেমের মতে, রোযাটি শুদ্ধ হবে এবং কাযা করা আবশ্যিক হবেনা। এ অভিমতটি মুজাহিদ (রহঃ) ও হাসান (রহঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। একই অভিমত দিয়েছেন, ইসহাক (রহঃ), এক বর্ণনামতে ইমাম আহমাদ, আল-মুযানি, ইবনে খুযাইমা এবং ইবনে তাইমিয়া। শাইখ ইবনে উছাইমীন এ অভিমতকে অগ্রগণ্য ঘোষণা করেছেন। [দেখুন: ফাতহুল বারী (৪/২০০), ইবনে তাইমিয়া এর 'মাজমুউলফাতাওয়া' (২৫/২৩১), আল-শারহুলমুমতি (৬/৪০২-৪০৮)]

তাঁরা দলিল দেন বুখারি কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দিয়ে-হিশাম বিন উরওয়া ফাতেমা থেকে তিনি আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন: একবার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থাকায় আমরা ইফতার করে ফেললাম; এরপর আবার সূর্যদেখা গেল। হিশামকে

জিজ্ঞেস করা হল: তাদেরকে কি রোযাটি কাযা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন: অবশ্যই কাযা করতে হবে। মামার বলেন: আমি হিশামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: আমি জানি না-তারা কি কাযা করেছেন; নাকি করেননি।

হিশাম এর উক্তি: “অবশ্যই কাযা করতে হবে” এটি তাঁর নিজস্ব বোধ। তিনি এ কথা বলেননি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি রোযাটি কাযা করার নির্দেশ দিয়েছেন। একারণে হাফেয ইবনে হাজার বলেন: আসমা (রাঃ) এর হাদিসটিতে রোযাটি কাযা করা বা না-করা কোনটি সাব্যস্ত নয়। সমাণ্ড

শাইখ উছাইমীন “আল-শারহুল মুমতি” (৬/৪০২) বলেন: দিনের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকতে সূর্য ডুবে গেছে এ ভিত্তিতে তারা ইফতার করে ফেলেছেন। তারা শরিয়তের হুকুম জানেনা- এমনটি নয়। বরং তারা সূর্যের প্রকৃত অবস্থাটি সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা মনে করেনি যে, এখনো দিন অবশিষ্ট আছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কে রোযাটি কাযা করার নির্দেশও দেননি। যদি রোযাটি কাযা করা ফরজ হত; তাহলে সেটা আল্লাহর দেয়া শরিয়ত হিসেবে সাব্যস্ত হত এবং কাযা করার বিষয়টি হাদিসে সাব্যস্ত হয়। অতএব, যেহেতু সাব্যস্ত হয়নি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও কিছু বর্ণিত হয়নি সুতরাং মানুষের মূল অবস্থা হল-তার উপর কোন যিম্মাদারি বা কাযা করার দায়িত্ব না থাকা। সমাণ্ড

ইবনে তাইমিয়া ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ (২৫/২৩১) গ্রন্থে বলেন:

এতে প্রমাণিত হয় যে, কাযা করা ফরয নয়। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে রোযাটি কাযা করার নির্দেশ দিতেন তাহলে সেটা প্রচারিত হত; যেভাবে তাদের ইফতার করে ফেলার বিষয়টি প্রচারিত হয়েছে। যখন কাযা করার ব্যাপারটি প্রচারিত হয়নি এতে বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কাযা করার নির্দেশ দেননি। যদি বলা হয় যে, হিশাম বিন উরওয়াকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে: তাদেরকে কি কাযা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল? তিনি বলেছেন: অবশ্যই কাযা করতে হবে? উত্তরে বলা হবে: হিশাম (রহঃ) সেটা নিজের ইজতিহাদ থেকে বলেছেন। হাদিসে এটি বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে হিশামের যে ইলম ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় মামার এর বর্ণনা থেকে। মামার বলেন: আমি হিশামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: আমি জানি না-তারা কি রোযাটি কাযা করেছেন; নাকি কাযা করেননি। ইমাম বুখারি এউক্তি উল্লেখ করেছেন। হিশাম তার পিতা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাদেরকে রোযাটি কাযা করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। আর উরওয়া তার ছেলের চেয়ে অধিক অবহিত। [সংক্ষেপিত ও সমাণ্ড]

যদি আপনার সাবধানতা অবলম্বন করতঃ একটি রোযা রেখে দেন সেটা ভাল। আলহামদুলিল্লাহ; একদিনের রোযা রাখা তেমন কষ্টের কিছুনা। যা ঘটে গেছে সে জন্য আপনাদের কোন গুনাহ হবে না।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন:

জনৈক মুসাফির ব্যক্তি রমযানের রোযা ভেঙ্গে ফেলার নিয়ত করেছিলেন। কিন্তু রোযা ভাঙ্গার জন্য কোন খাবার-দাবার না পেয়ে সে নিয়ত থেকে ফিরে আসেন এবং মাগরিব পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করার নিয়ত করেন। এখন তার এ রোযার হুকুম কি?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

কোন রোযাদার যদি রোযা ভাঙ্গার নিয়ত করে তাহলে তার রোযা বাতিল হয়ে যায়। রোযা ভাঙ্গার নিয়ত যদি হয় দ্বিধাহীন ও সুদৃঢ়; এমনকি পরবর্তীতে কোনখাবার-দাবার না পেয়ে নিয়ত পরিবর্তন করেন তবুও তার রোযা ভেঙ্গে যাবে এবংতাকে এ দিনের পরিবর্তে অন্য একটি দিন রোযাটি কাযা করতে হবে। এটি মালেকি ওহাম্বলি মাযহাবের অভিমত।

তবে হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবের অভিমত এর বিপরীত। [দেখুন: বাদায়েউস সানায়ে ২/৯২, হাশিয়াতুদ দুসুকি ১/৫২৮, আল-মাজমু ৬/৩১৩, কাশশাফুল ফিনা ২/৩১৬]

নিম্নের আলোচনাতে তুলে ধরা হবে যে, রোযা বাতিল হওয়ার অভিমতটি অগ্রগণ্য; এমতের ভিত্তিতে বলতে হয় যদি তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলার নিয়ত করেন, এতে কোনদ্বিধা ও সংশয় না থাকে; কিন্তু পরবর্তীতে রোযা ভাঙ্গার জন্য কিছু না পেয়ে নিয়ত পরিবর্তন করেন তদুপরি তার রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং এ রোযাটির কাযা পালনকরা তার উপর অবধারিত হবে।

পক্ষান্তরে, সে ব্যক্তি রোযা ভাঙ্গবেন; নাকি ভাঙ্গবেন না এ নিয়োদ্ধিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকেন অথবা রোযা ভাঙ্গার বিষয়টিকে কোন কিছুই সাথে সম্পৃক্ত করেন; যেমন- আমি যদি খাবার বা পানীয় পাই রোযা ভাঙ্গব; অতঃপর রোযাভাঙ্গার মত কোন কিছু না পান তাহলে তার রোযা সহিহ হবে।

একবার শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: জনৈক মুসাফির ব্যক্তি রমজানের রোযা ভেঙ্গে ফেলার নিয়ত করেছে। কিন্তু রোযা ভাঙ্গার জন্য কোন কিছু না পেয়ে নিয়ত পরিবর্তন করেছে এবং মাগরিব পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করেছে। এ ব্যক্তির এরোযার হুকুম কি?

উত্তরে শাইখ বলেন: তার রোযা সহিহ নয়। তার উপর কাযা আদায় করা ফরজ। কারণে ব্যক্তি যখন রোযা ভাঙ্গার নিয়ত করেছেন তখনই তার রোযা ভেঙ্গে গেছে। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি যদি বলত- পানি পেলে রোজা ভাঙ্গব; নচেৎ আমি রোযাপূর্ণ করব; এরপর পানি না পায়। তবে এ ব্যক্তির রোযা সহিহ হবে। কারণ ইনি নিয়তত্যাগ করেননি। বরং রোযা ভাঙ্গটাকে বিশেষ কিছুই সাথে সম্পৃক্ত করেছেন; তবে যেহেতু সে জিনিশটি পাওয়া যায়নি; সুতরাং তার প্রথম নিয়ত ঠিক থাকবে।

প্রশ্নকারী বলেন: আমরা সে ব্যক্তিকে কি জবাব দিতে পারি যিনি বলেন, কোনআলেম বলেননি যে, নিয়ত রোযাভাঙ্গকারী বিষয়? তখন উত্তরে শাইখ বলেন: আমরা এব্যক্তিকে বলব, আলেমদের বই-পুস্তক (তথা ফিকাহর গ্রন্থ ও সংক্ষিপ্তসারগুলো) সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। 'যাদুল মুস্তানকি' গ্রন্থে এসেছে- যে ব্যক্তিরোযা ভাঙ্গার নিয়ত করেছে তার রোযা ভেঙ্গে গেছে।

আমি আপনাদেরকে অপরিচিত ও অযোগ্য লোকদের কাছ থেকে ইলম গ্রহণের ব্যাপারে সাবধান করছি। এ ধরণের কোন লোক যদি বলে, এ উক্তি আমার জানা নেই অথবা কোনআলেম এমন অভিমত দেননি; এ কথা থেকেও আমি আপনাদেরকে সাবধান করছি। এ ধরণেরকথায় তারা সত্যবাদী হতে পারে। যেহেতু তারা আলেমদের গ্রন্থগুলো চিনে না; কিতাবপুস্তক তারা পড়েনি; সে সম্পর্কে তারা কিছু জানে না।

যদি আমরা ধরে নিই এ ব্যাপারে আলেমগণের কিতাবে আমরা কিছুই পাইনি; কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি: "আমল হয় নিয়ত দ্বারা"। অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন।

যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলে থাকেন, আর এ ব্যক্তিরোযা ভাঙ্গার নিয়ত করে; তাহলে কি তার রোযা ভাঙ্গবে? হ্যাঁ; ভাঙ্গবে। [লিকাউল বাব আল-মাফতুহ থেকে সংকলিত, ২০/২৯] আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি অনিয়মিতভাবে রোজা রাখি। আমি জানতে চাই, যদি আমি পূর্ণাঙ্গ হিজাব না পরি আমার রোজা কি সহিহ হবে? আমি যখন চাকুরীতে যাই তখন আমার চুল, গর্দান ও হাতদ্বয় খোলা থাকে; এছাড়া অন্যান্য অঙ্গ ঢেকে রাখি।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বেগানা পুরুষের সামনে পরিপূর্ণ হিজাব পরিধান করার জন্য আমরা আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি; যাতে আপনার সিয়াম কবুল হয় এবং প্রতিদান কয়েকগুণ হয়। অনুরূপভাবে নামায ও অন্যান্য নেক আমল কবুল হয়। যদি কোন মুসলিম নারী রোজা রাখে; কিন্তু হিজাব না পরে এতে তার রোজা শুদ্ধ হবে। তবে হিজাব না পরার কারণে সে গুনাহগার হবে। অর্থাৎ বেপর্দার কারণে রোজা নষ্ট হবে না। তবে বেপর্দা নারী আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করার কারণে আল্লাহর শাস্তির হুমকির অন্তর্ভুক্ত। ওহে আল্লাহর বান্দী, আমরা আপনাকে আল্লাহর

নির্দেশ মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছি। “তারা যেন নিজেদের উপর জ্বিলবাব বা ঢিলেঢালা চাদর বুলিয়ে দেয়” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৯] এবং আল্লাহ তাআলার বাণী “তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে” [সূরাআল-নূর, আয়াত: ৩১] এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: “এবং তারা যেন নিজেদের আঁচল নিজেদের গ্রীবাদের উপর ফেলে দেয়...” [সূরা আল-নূর, আয়াত: ৩১]

প্রশ্ন

দাঁতের ফাঁক থেকে যে রক্ত বের হয় সেটা কি রোজা নষ্ট করবে? সেটা যদি অপর ব্যক্তির কারণে বের হয় অর্থাৎ অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক আঘাতের কারণে বের হয়; সে ক্ষেত্রে? বিষয়টি আমাদেরকে জানাবেন। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

দাঁতের ফাঁক দিয়ে যে রক্ত বের হয় সেটা রোজা নষ্ট করবে না। সে রক্ত কোন কারণ ছাড়া বের হোক অথবা কোন মানুষের আঘাতের কারণে বের হোক।

আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা, আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীবর্গের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (১০/২৬৭)

তবে রোজাদারের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এ রক্ত গিলে ফেলা হারাম; গিলে ফেললে রোজা নষ্ট হবে।

প্রশ্ন

একবার সেহেরীর পূর্বে আমার স্বপ্নদোষ হয়। কিন্তু আমি গোসল করতে পারিনি। গোসল করতে আমার তীব্র লজ্জাবোধ হচ্ছিল। কারণ আমার পিতামাতা জেনে যাবে যে, আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে। তাই গোসল না করে আমি সেহেরী খেয়েছি। দুঃখজনক হল সেদিন আমি ফজরের নামাযও পড়িনি। তবে পরবর্তীতে গোসল করে আমি ফজরের নামায পড়েছি। আমি জানতে চাচ্ছি, আমার সে রোজাটা কি কবুল হয়েছে? কারণ আমার ধারণা হচ্ছে- আমি (স্বপ্নদোষজনিত) অপবিত্র অবস্থায় সেহেরী খেয়ে ভুল করেছি। আমার রোজা কি কবুল হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কেউ যদি রাতের মধ্যে স্ত্রী সহবাস করে এবং অপবিত্র অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে যায় তার রোজা শুদ্ধ হবে; অনুরূপভাবে রাতের বেলা অথবা দিনে ঘুমের মধ্যে কেউ যদি অপবিত্র হয়ে যায় তার রোজাও শুদ্ধ হবে। বিলম্ব করে ফজর শুরু হওয়ার পরে গোসল করতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু কেউ যদি রমজানের দিনের বেলায় অর্থাৎ ফজরের পর থেকে সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে স্ত্রী সহবাস করে তার রোজা নষ্ট হয়। [স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/৩২৭)]

তবে দেরি করে সূর্যোদয়ের পর নামায আদায় করা আপনার জন্য হারাম। আপনার উপর ফরজ ছিল যথাসময়ে নামায আদায় করা। আপনার তীব্রলজ্জা এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কোন ওজর নয়; যার কারণে নামায আদায়ে এ বিলম্বকরা যেতে পারে। এখন আপনার কর্তব্য হচ্ছে- এ গুনাহ থেকে তওবা করা, ইস্তিগফার করা (ক্ষমা প্রার্থনা করা)। আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাকে সকল ভাল কাজ করার তাওফিক দিন।

প্রশ্ন

রমজানের দিনের বেলায় কু-অভ্যাস এর কারণে কি রোজা ভঙ্গ হবে; যদি বীর্য়পাত না হয়?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

হস্তমৈথুন (কু অভ্যাস) রোজা ভঙ্গের কারণ । যে ব্যক্তি হস্তমৈথুন করেছে তাকে সেদিনের রোজা কাযা করতে হবে এবং এই মহাপাপ থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে ।

শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন:

কেউ যদি রোজার দিন ইচ্ছাকৃতভাবে হস্তমৈথুন করে এবং বীর্য় বের হয় এতে তার রোজা ভেঙ্গে যাবে । যদি এ রোজাটি ফরজ রোজা হয়ে থাকে তাহলে তাকে এ রোজা কাযাকরতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে । কারণ রোজা রাখা বা রোজা না-রাখাকোন অবস্থাতেই হস্তমৈথুন করা জায়েয নয় । লোকেরা এটাকে কু-অভ্যাস বলে থাকে ।সমাণ্ড [ফাতাওয়াস শাইখ বিন বায, (১৫/২৬৭)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন:

“ যদি রোজাদার ব্যক্তি হস্তমৈথুন করে এবং বীর্য়পাত হয় তাহলে তার রোজাভেঙ্গে যাবে । যেদিন হস্তমৈথুন করেছে তাকে সেদিনের রোজা কাযা করতে হবে । তবেতাকে কাফফারা দিতে হবে না । কারণ কাফফারা শুধু সহবাসের মাধ্যমে রোজা ভঙ্গকরলে সেক্ষেত্রে ফরজ হয় ।তাকে তার কৃতপাপের জন্য তওবা করতে হবে ।” সমাণ্ড [ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৪৭৮]

উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে যদি হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্য়পাত হয় । আর যদি বীর্য়পাত না হয় তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না ।

শাইখ উছাইমীন ‘আল-শারহুল মুমতি’ গ্রন্থ (৬/৩৮৮) এ বলেন:

যদি হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্য়পাত না হয় তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না ।

আল্লাহই ভাল জানেন ।

প্রশ্ন

সেহেরি খাওয়ার পর আমি ঘুমিয়ে ছিলাম । এর মধ্যে আমি দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে জেগে উঠি । আমার মা কিছু পানি নিয়ে এলে আমি পানিপান করি । কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, ‘আমি রোজাদার’ । এরপর আবার ঘুমিলাম ।যখন জাগলাম তখন আমি রোজা পূর্ণ করতে চাইলাম । কিন্তু আমার মা বলেন: তুমিযখন পানি পান করেছ তখন তোমার রোজা ভেঙ্গে গেছে এবং তিনি আমাকে রোজা ভাঙ্গালেন । এমতাবস্থায়, এ রোজা ভাঙ্গাটি কি ইচ্ছাকৃত রোজা ভাঙ্গা হিসেবে গণ্য হবে? উল্লেখ্য পরবর্তীতে আমি এ রোজাটি কাযা করেছি । আমি কাফফারার বিষয়ে জানতে চাই । কারণ আমি মেয়ে মানুষ । আমার পিতাই আমার অভিভাবক । আমি বয়সে ছোট ।এমতাবস্থায় আমি কি করব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

এক:

যদি কোন রোজাদার ভুলে গিয়ে রমজানের দিনের বেলায় পানাহার করে ফেলে তার রোজা শুদ্ধ; তাকে কাযা আদায় করতে হবে না। এ বিষয়ে [50041](#) নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

তাই তুমি যে, ভুলে গিয়ে পানি পান করেছ এতে তোমার রোজার কোন ক্ষতি হয়নি। উচিত ছিল তোমার রোজাটি পূর্ণ করা। আর যেহেতু তুমি তোমার মায়ের কথা অনুযায়ী রোজা ভেঙ্গেছ এবং পরবর্তীতে ঐ রোজা কাযা করেছ- সুতরাং তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ। তোমার উপর কোন কাফফারা নেই। কারণ কাফফারা ওয়াজিব হয় কেউ রমজানের দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে। [38074](#) নং প্রশ্নোত্তরটি দেখতে পার।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন :

রমজান মাসে ফজরের আযানের আগ থেকে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করছিলাম। আযান চলাকালীন সময়েও আমি সহবাসরত ছিলাম। তবে আযান শেষ হওয়ার আগেই আমরা বিরত হয়েছি। আমার ধারণা ছিল যে, মুযাজ্জিনের আযান শেষ করার পূর্ব পর্যন্ত সহবাস করা জায়েয। এখন আমার করণীয় কি?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

যদি ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে মুযাজ্জিন আযান দেন, তাহলে ওয়াজিব হল ফজরের ওয়াক্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ (মুফাতিরাত) থেকে বিরত থাকা। তাই মুযাজ্জিন 'আল্লাহুআকবার' (আল্লাহ মহান) বলার সাথে সাথে খাদ্য, পানীয়, সহবাস ও সকল রোযাভঙ্গকারী বিষয় (মুফাতিরাত) থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক হয়ে যায়।

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

“ যদি ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সময় কারও মুখে খাবার থাকে, তবে সে যেন তা ফেলে দেয়। (খাবার) ফেলে দিলে - তার রোযা শুদ্ধ হবে, আর গিলে ফেললে - তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সময় সে সহবাসরত অবস্থায় থাকে, তবে সে অবস্থা থেকে তাৎক্ষণিক সেরে গেলে - তার রোযা শুদ্ধ হবে। আর যদি ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সময় সে সহবাসরত অবস্থায় থাকে এবং ফজরের ওয়াক্ত হয়েছে জেনেও সহবাসে লিপ্ত থাকে, তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে- এব্যাপারে 'আলেমগণের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। আর সে অনুসারে তার উপর কাফফারা আবশ্যিক হবে।” সমাপ্ত। [আল-মাজ্জমু' (৬ /৩২৯)]

তিনি আরও বলেন: “ আমরা উল্লেখ করেছি যে, ফজর উদিত হওয়ার সময় যদি কারো মুখে খাবার থাকে, তবে সে তা ফেলে দিবে ও তার রোযা সম্পন্ন করবে। আর যদি ফজর হয়েছে জেনেও সে তা গিলে ফেলে, তবে তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। এব্যাপারে কোন মতভেদ নেই”। আল-মাজ্জমু' (৬/৩৩৩) এর দলীল হচ্ছে ইবনে উমর ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম এর হাদিস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(إن بلالا يؤذن بليل , فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه

“ বিলাল (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) রাত থাকতে আযান দেন। তাই আপনারা খেতে থাকুন ও পান করতে থাকুন যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূম (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) আযান দেন।” [হাদিসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম সংকলন করেছেন এবং সহীহ গ্রন্থে এই অর্থের আরও হাদিস রয়েছে] সমাপ্ত

এপ্রেক্ষিতে বলা যায়, যদি আপনার এলাকার মুযাজ্জিন ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দেয়, তাহলে আযানের প্রথম তাকবীর শোনার সাথে সাথে আপনাকে সহবাস থেকে বিরত হয়ে যেতে হবে। আর যদি আপনি জেনে থাকেন যে, মুযাজ্জিন ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগেই আযান দেয় অথবা এব্যাপারে আপনি সন্দিহান থাকেন যে, তিনি কি সুবহে সাদিক হওয়ার আগে আযান দেন, নাকি পরে আযানদেন- সেক্ষেত্রে আপনার উপর করণীয় কিছু নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা ফজর পরিস্ফুট হওয়া পর্যন্ত খাওয়া, পান করা ও সহবাস করা বৈধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(فَالْآنَ يَا شِرْهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

“অতএব এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) লিখে রেখেছেন তা কামনা করতে পার। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ কালো সুতা (রাতের কালো রেখা) হতে উষার সাদা সুতা (সাদা রেখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।” [সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৭]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ীকমিটির 'আলেমগণকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:“ কোন ব্যক্তি আগেই সেহেরী খেয়েছে। কিন্তু ফজরের আযান চলাকালীন সময়ে অথবা আযান দেওয়ার ১৫ মিনিট পর পানি পান করেছে- এর হুকুম কী?

তাঁরা উত্তরে বলেন: “ প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি যদি জেনে থাকেন যে, সেই আযান সুবহে সাদিক পরিষ্কার হওয়ার আগে দেওয়া হয়েছিল তবে তার উপর কোন কাযা নেই। আর যদি তিনি জেনে থাকেন যে, সে আযান সুবহে সাদিক পরিষ্কার হওয়ার পরে দেওয়া হয়েছে তবে তার উপর উক্ত রোযা কাযা করা আবশ্যিক। আর তিনি যদি না জানেন যে, তার পানাহার ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে ঘটেছে, না পরে ঘটেছে সেক্ষেত্রে তাকে কোন রোযা কাযা করতে হবে না। কারণ এক্ষেত্রে মূল অবস্থা হচ্ছে- রাত বাকি থাকা। তবে একজন মু'মিনের উচিত তার সিয়ামের ব্যাপারে সাবধান থাকা এবং আযান শোনার সাথে সাথে রোযা ভঙ্গকারী সমস্ত বিষয় থেকে বিরত থাকা। তবে তিনি যদি জেনে থাকেন যে, এই আযান ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে দেওয়া হয়েছে তাহলে ভিন্ন কথা।” সমাপ্ত

[ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ : (২/২৪০)]

দুই:

যদি আপনি এই হুকুমের ব্যাপারে না জেনে থাকেন এবং মনে করে থাকেন যে, আযানের শেষ পর্যায়ে রোযা ভঙ্গকারী বিষয়াদি (মুফাতিরাত) থেকে বিরত হওয়া অনিবার্য হয়, তবে আপনার উপর কোন কাফফারা বর্তাবে না। তবে সাবধানতা বশতঃ আপনাকে সে রোযাটির কাযা আদায় করতে হবে। সেই সাথে দ্বীনের যেসব বিষয় জানা আপনার জন্য ওয়াজিব ছিল, সে ব্যাপারে অবহেলার জন্য তওবা ও ইস্তিগফার করতে হবে।

আল্লাহুই সবচেয়ে ভাল জানেন।

প্রশ্ন :

রমজানের আগে আমার স্ত্রী বিগত রমজান মাসের কিছু কাযা রোযা পালন করছিলেন। এমতাবস্থায় আমি তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়েছি। সে সবগুলো রোযা কাযা করতে পারিনি।

বিঃ দ্রঃ সে পূর্বেই আমার কাছে রোযা পালনের অনুমতি চেয়েছিল এবং আমি তাকে অনুমতি দিয়েছিলাম।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক:

যিনি কোন ওয়াজিব রোযা শুরু করেন (যেমন: রমজানের কাযা রোযা বা কসমভঙ্গের কাফফারা স্বরূপ রোযা) তার জন্য কোন ওজর (শরিয়ত অনুমোদিত অজুহাত) ছাড়া রোযাভঙ্গ করা জায়েয নয়। ওজরের উদাহরণ হচ্ছে-রোগ বা সফর।

যদি তিনি কোনো ওজরবশত অথবা ওজর ছাড়া রোযা ভঙ্গ করে থাকেন তবে সে রোযাটি পালন করা তার দায়িত্বে বাকি থেকে যাবে এবং যেদিনের রোযা বিনষ্ট করেছিলেন সেই দিনের পরিবর্তে অন্য একদিন তাকে রোযাপালন করে নিতে হবে।

যদি তিনি কোন ওজরছাড়া রোযাটি ভঙ্গ করে থাকেন তবে এ রোযাটি পুনরায় পালনকরার সাথে তাকে এই হারাম কাজ থেকে তওবা করতে হবে।

আপনার স্ত্রীর উপর কোন কাফফারা নেই। কারণ কাফফারা শুধু রমজান মাসে দিনের বেলা সহবাসের কারণে ওয়াজিব হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে (49985) নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই:

আপনি আপনার স্ত্রীর রোযা বিনষ্ট করে খুবই খারাপ কাজ করেছেন। কারণ কোন স্ত্রী যখন তার স্বামীর অনুমতি নিয়ে রমজানের কাযা রোযাপালন করে তখন স্বামীর তার রোযা বিনষ্ট করার কোন অধিকার নেই। তাই আপনাদের দু'জনের উচিত আল্লাহর কাছে তওবা করা। এ কাজের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। একাজ পুনরায় না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া। আর যদি আপনি আপনার স্ত্রীকে জোর পূর্বক বাধ্য করে থাকেন তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্ন: আমার বাবা মারা গেছেন (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমকরুন)। তিনি কিছু সম্পদ রেখে গেছেন। সে সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর মা আমাকে জানিয়েছেন যে, ২৫ কি ৩০ বছর আগেবাবা একবার রমজান মাসে তাঁর সাথে সহবাস করেছিলেন; যে ব্যাপারে আমার মাতাসম্মত ছিলেন। আমার মা যতটুকু স্মরণ করতে পারছেন, সে সময় আমার মায়ের একটা অপারেশন করার পর তিনি হাসপিটাল থেকে রিলিজ পেয়েছিলেন। তিনি আরো জানান যে, তিনি সে সময় বাবাকে বুঝিয়েছিলেন যে, এটি জায়েয নয় এবং এ ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞেস করা উচিত। কিন্তু বাবা মাকে বুঝিয়েছেন যে, তিনি তওবা করেছেন এবং আল্লাহ মহা-ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আমার মা আরো জানিয়েছেন যে, তিনি লজ্জার কারণে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে বা আমাদেরকে জানাতে পারেননি। এখন আমার মা চাচ্ছেন- তিনি দুই মাস রোযা পালন করে এর কাফফারা আদায় করবেন। আমি তাকে বলেছি যে, যা হয়েছে তাতে তাঁর কোন হাত ছিল না। তাই তাঁকে কিছু করতে হবে না। তাছাড়া তাঁর শারীরিক অবস্থাও এর জন্য প্রস্তুত নয়। এখন আমাদের মৃত পিতার ব্যাপারে আমাদের কী করণীয়? আর আমার মার উপর কী করণীয়?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।

এক :

যদি আপনার মা তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও রমজানে দিনের বেলায় তাঁর স্বামী কর্তৃক বাধ্য হয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন, তবে তার উপর কোন কাফফারা নেই। এর দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী :

(إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْبَرُوا عَلَيْهِ) . رواه ابن ماجة () وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة"

" নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের অজ্ঞতা জনিত ভুল, স্মৃতিভ্রমজনিত ভুল ও জোরজবরদস্তির শিকার হয়ে কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। " [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে মাজাহ্ (২০৪৩)। শাইখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ ইবনে মাজাহ্' তে সহীহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন]

আর যদি এক্ষেত্রে তিনি তাঁর স্বামীর আনুগত্য করে থাকেন তবে তাকে কাযা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ীকমিটির আলেমগণকে রমজান মাসে দিনের বেলায় সহবাসকারীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা বলেন:

“এব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল একজন দাসমুক্ত করা। যদি তিনি তা করতে না পারেন, তবে এক নাগাড়ে দুইমাস রোযা পালন করতে হবে। আর যদি তাও না করতে পারেন তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াবেন। প্রতি মিসকীনের জন্য এক মুদ (এক অঞ্জলি) গম এবং তাকে সেই দিনের পরিবর্তে কাযা রোযা আদায় করতে হবে। আর এক্ষেত্রে স্ত্রী যদি স্বামীর অনুগত হয়ে থাকে তবে স্ত্রীর হুকুমও স্বামীর হুকুমের ন্যায় (অর্থাৎ কাযা ও কাফ্ফারা আদায় করতে হবে)। আর যদি স্ত্রীকে বাধ্য করা হয়ে থাকে তবে তাকে শুধু কাযা আদায় করতে হবে।” সমাপ্ত

[ফাতাওয়াল্লাজনাৎ দায়িমা (১০/৩০২)]

অতএব, আপনার মায়ের উপর যদি কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে থাকে, তবে আপনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একাধারে দুইমাস সিয়াম পালনে সক্ষম নন তাহলে এক্ষেত্রে তার জন্য ৬০জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো যথেষ্ট হবে।

রমজানে দিনের বেলায় শারীরিক মিলনের কারণে ফরজ হওয়া কাফ্ফারা সম্পর্কে জানতে দেখুন (1672) নং প্রশ্নের উত্তর।

দুই :

আপনার বাবার উপর ফরজ ছিল পরপর দুইমাস একাধারে রোযা পালন করা এবং শারীরিক মিলনের দ্বারা যেই দিন রোযা ভঙ্গ করেছেন, সেই দিনের কাযা রোযা আদায় করা। কিন্তু যেহেতু তিনি তা না করেই মারা গেছেন তাই যেকোন এক ব্যক্তি তাঁর পক্ষ থেকে এ সিয়ামগুলো পালন করবেন। সিয়ামপালনকারী কে একাধারে দুইমাস রোযা রাখতে হবে। এর দলীল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী:

(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواه مسلم

“যে তার জিম্মায় রোযা রেখে মারা গেছে তার পক্ষ থেকে তার ওলি (আত্মীয়-পরিজন)রোযা পালন করবে।” [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম (১১৪৭)]

দুইমাস রোযা পালনকে একাধিক ব্যক্তির মাঝে ভাগ করা নেয়া জায়েয হবে না। বরং একজন ব্যক্তিকেই তা পালন করতে হবে। যাতে সাব্যস্ত হয় যে, তিনি একাধারে দুইমাস রোযা পালন করেছেন। অথবা তাঁরপক্ষ থেকে প্রতিদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: “যদি কোন মৃতব্যক্তির উপর একাধারে দুইমাসের রোযাবাকি থাকে, তবে তার ওয়ারিশদের মধ্য থেকে কেউ একজন নফল দায়িত্ব হিসেবে ঐ রোযা গুলো পালন করবে অথবা প্রতিদিনের রোযার বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে।” সমাপ্ত [আশ-শারহুলমুমতি’ (৬/৪৫৩)]

তিনি আরও বলেছেন:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রমজানের ফরজ রোযা বা মান্তের রোযা অথবা কাফ্ফারার রোযা অনাদায় রেখে মারা গেছে তার আত্মীয় স্বজন চাইলে তার পক্ষ থেকে সে রোযাগুলো পালন করতে পারে।” [ফাতাওয়ানূরুন আলাদদার্ব (২০/১৯৯)]

শাইখ সা’দী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

“যেব্যক্তি রমজানের কাযা রোযা বাকি রেখে মারা গেল, সেসুস্থ হওয়ার পরও সেই রোযা পালন করেনি; এক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের রোযার বদলে একজন মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজিব। যে কয়দিন রোযা ভেঙ্গেছেন সমসংখ্যক দিন।”

ইবনে তাইমিয়্যাহ এর মতে:

“তার পক্ষ থেকে রোযা পালন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং এটি একটি শক্তিশালী গ্রহণযোগ্য অভিমত।” সমাপ্ত [ইরশাদুউলিল বাস্বা'ইরিওয়াল আলবাব, পৃ: ৭৯]

মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ হতে এই খাদ্যখাওয়ানো ফরজ। আর কেউ যদি নফল দায়িত্ব হিসেবে এই খরচ বহন করে তাতেও কোন বাধা নেই।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

প্রশ্ন :

এক লোক রমজান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, কিন্তু বীযপাত হয়নি। এর হুকুম কী? আর সে স্ত্রীরই বা করণীয় কী- যিনি এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।।

রমজান মাসে দিনের বেলায় যে ব্যক্তি যৌন মিলন করে তিনি মুকীম (নিজ অঞ্চলে অবস্থানকারী) রোযাদার হলে তার উপর বড়-কাফফারা (আল কাফফারাতুল মুগাল্লাযাহ) ওয়াজিব হয়। আর তাহল একজন দাসমুক্ত করা। যদি তা না পায় তাহলে একাধারে দুই মাস সিয়াম পালন করা। আর যদি তাও না পারে তবে ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো।

যদি নারী সন্তুষ্ট চিন্তে যৌন মিলনে সাড়া দেয় তাহলে একই বিধান নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর যদি জোর পূর্বক নারীর সাথে সহবাস করা হয় তাহলে তার উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবেনা। আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মুসাফির হয় তবে সহবাসের কারণে তাদের কোন গুনাহ হবেনা, তাদের উপর কোন কাফফারা ও ওয়াজিব হবেনা এবং দিনের বাকি অংশ পানাহার ও যৌন মিলন থেকে বিরত থাকাও ওয়াজিব হবেনা। শুধু তাদের উভয়কে ঐ দিনের রোযা কাযা করতে হবে। যেহেতু মুসাফির অবস্থায় রোযাপালন করা তাদের জন্য বাধ্যতা মূলক নয়।

একইভাবে যে ব্যক্তি কোনো অনিবার্য প্রয়োজনে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে (যেমন কোন নিরপরাধ মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর নিমিত্তে) ঐ ব্যক্তি সেই দিন যদি যৌন মিলন করে, সেই দিন অনিবার্য প্রয়োজনে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কারণ এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কোন ওয়াজিব রোযা ভঙ্গ করেনি।

নিজ অঞ্চলে অবস্থানকারী (মুকীম) রোযাদার যদি যৌনমিলন করে রোযা ভেঙ্গে ফেলে যার উপর রোযা রাখা বাধ্যতামূলক তার উপর পাঁচটি জিনিস বর্তাবে-

১। সে গুনাহগার হবে।

২। তার সেই দিনের রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

৩। সেই দিনের বাকি অংশ পানাহার ও যৌনমিলন থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪। সেই দিনের রোযার কাযা করা ওয়াজিব হবে।

৫। (বড়) কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে।

কাফফারা আদায় করার দলীল হল সেই হাদিসটি, যা আবু হুরাইরাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন) থেকে বর্ণিত হয়েছে- এক ব্যক্তি রমজানের দিনের বেলায় তাঁর স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করেছিলেন। এই ব্যক্তি একাধারে দুইমাস রোযাপালন করা অথবা ষাটজন

মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াতে অক্ষম ছিলেন। তাই এই ব্যক্তিকার্যফারা পরিশোধের বাধ্যবাধকতা হতে রেহাই পান। কারণ আল্লাহ তাআলা কাউকেতার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না [সূরা বাক্বারাহ, ২:১৮৬] অপারগেরওপর কোন ওয়াজিব আরোপ করা যায় না।

যৌনমিলন যেহেতু সংঘটিত হয়েছে সূতরাং উপরোল্লিখিত মাসয়ালাতে বীর্যপাতহওয়া বা না-হওয়ার কারণে হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু ব্যাপারটি যদি এমন হয় যৌনমিলন ছাড়া বীর্যপাত হয়েছে সেক্ষেত্রে তাকে কার্যফারা আদায় করতে হবে না। বরং সে গুনাহগার হবে, দিনের বাকি অংশ তাকে যৌনমিলন ও পানাহারথেকে বিরত থাকতে হবে এবং রোযাটির কাযা করতে হবে।

- প্রশ্ন : এটি কারো অজানা নয় যে, যে ব্যক্তি রমজান মাসেদিনের বেলায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে, তার কার্যফারা হল- একজন দাসমুক্ত করা অথবা (তা না পারলে) একটানা দুই মাস রোযা রাখা অথবা (তা না পারলে) ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো। প্রশ্ন হল- ১- যে ব্যক্তি রমজান মাসের ভিন্ন ভিন্ন দিবসে নিজের স্ত্রীর সাথে একাধিকবার সহবাস করেছে, তাকে কি সহবাসকৃত প্রতিটি দিবসের পরিবর্তে দুই মাস করে রোযাপালন করতে হবে? নাকি যতদিন সহবাস করুক না কেন শুধু দুই মাস রোযা রাখাযথেষ্ট? ২- উপরে উল্লিখিত কার্যফারার হুকুম না জেনে কেউ যদি (রমজানের দিনের বেলায়) স্ত্রী-সহবাস করে (তার বিশ্বাস ছিল সে যেদিন সহবাস করবে শুধু সেই দিনেরবদলে একদিনের রোযা কাযা করতে হবে) তবে সে ব্যক্তির ব্যাপারে হুকুম কি? ৩- স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর উপরও কি একই হুকুম বর্তাবে? ৪- খাবার খাওয়ানোর বদলে কি অর্থ প্রদান করা জায়েয? ৫- স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে শুধু একজন মিসকীনকে খাওয়ালে চলবে কি? ৬- যদি খাওয়ানোর মত কাউকে না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কোন দাতব্য সংস্থাকেখাদ্যের মূল্য প্রদান করা যাবে কি না। যেমন- রিয়াদের আল-বিরর দাতব্যসংস্থা বা এ ধরনের অন্য কোন দাতব্য সংস্থা?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তির উপর রোযা পালন করাফরয:

এক:

তিনি যদি তার স্ত্রীর সাথে রমজানের কোন এক দিবসে একবার বা একাধিকবার সহবাস করেন তবে তার উপর একবার কার্যফারা আদায় করা আবশ্যিক হবে; যদি তিনি প্রথমবারসহবাস করার পর কার্যফারা আদায় না করে থাকেন। আর যদি তিনি কয়েকদিন দিবাভাগে সহবাস করে থাকেন তবে তাকে সম সংখ্যক দিনের কার্যফারা আদায় করতে হবে।

দুই:

তার উপর শারীরিক মিলনের কার্যফারা আদায় করা ফরয যদিও তিনি এই ব্যাপারে অজ্ঞ থেকে থাকেন।

তিন:

সহবাস করার ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি স্বামীকে সম্মতি দেয় তাহলে স্ত্রীর উপরও কার্যফারা ফরয হবে। আর যদি স্বামী জোরপূর্বক স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে স্ত্রীর উপর কোন কিছু ফরয হবে না।

চার:

খাদ্য খাওয়ানোর বদলে সমমূল্য অর্থ প্রদান করা জায়েয নয়। খাওয়ানোর পরিবর্তে অর্থ প্রদান করলে এতে অপিত দায়িত্ব পালন হবে না।

পাঁচ:

একজন মিসকীনকে তার পক্ষ থেকে অর্ধ'স্বা' ও তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে অর্ধ'স্বা' খাওয়ানো জায়েয। এতে তাদের দুইজনের পক্ষ থেকে ৬০ জন মিসকীনের একজনকে খাওয়ানো হয়েছে বলে গণ্য হবে।

ছয়:

কাফফারার সবগুলো খাদ্য শুধু একজন মিসকীনকে প্রদান করা জায়েযনয়। অনুরূপভাবে আল-বিব্বর চ্যারিটি বা অন্য কোন দাতব্য সংস্থাকে প্রদান করাও জায়েয নয়। কারণ তারা হয়ত ৬০ জন মিসকীনের মাঝে খাদ্য বিতরণ করবে না। মু'মিনের উচিত শরিয়ত কর্তৃক তার উপর আরোপিত কাফফারাসহ সকল ওয়াজিব পালনে সচেষ্ট হওয়া।

আল্লাহই তাওফিক্দাত। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

রোজার কাযা পালন

প্রশ্ন:

রমযান মাসে গর্ভধারণ ও প্রসব করার কারণে আমার বেশ কিছু রমযানের রোযা কাযা ছিল। আলহামদুলিল্লাহ; আমি সে রোযাগুলো কাযা পালন করেছি; তবে অবশিষ্ট সাতদিন ছাড়া। এ সাতটি রোযার মধ্যে তিনটি শাবান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর পালন করেছি। রমযানের আগেই আমি বাকী রোযাগুলোও পালন করতে চাই। আপনাদের ওয়েব সাইটে আমি পড়েছি যে, ঐ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য শাবান মাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশে রোযা রাখা জায়েয নেই; যে ব্যক্তির অভ্যাসগত রোযার মধ্যে এদিনগুলো পড়ে। আপনারা আমাকে জানাবেন (আল্লাহ আপনাদেরকে জ্ঞান দান করুন), আমার যে রোযাগুলো অবশিষ্ট আছে আমি কি এখন সে রোযাগুলো রাখব? যদি জবাব না-বোধক হয়; তাহলে আমি যে তিনদিন রোযা রেখেছি সে তিনটি রোযার কি হবে? সেগুলো কি দ্বিতীয়বার কাযা করতে হবে; নাকি কাযা করতে হবে না?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, “শাবান মাসের অর্ধেক পার হলে তোমরা রোযা রেখ না।” [সুনানে আবু দাউদ (৩২৩৭), সুনানে তিরমিযি (৭৩৮) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৫১), আলবানি সহিহ তিরমিযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

এ নিষেধাজ্ঞার বাহিরে থাকবে:

১. কোন ব্যক্তির অভ্যাসগত রোযা। যেমন- জৈনিক ব্যক্তি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রেখে থাকেন। তিনি তাঁর এ রোযাগুলো অব্যাহত রাখবেন; এমনকি সেটা যদি শাবান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পরে হয় তবুও। এর দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তোমাদের কেউ রমযানের একদিন কিংবা দুইদিন আগে রোযা রাখবে না। তবে, কেউ যদি কোন রোযা রেখে এসে থাকে তাহলে সে ব্যক্তি সে রোযা রাখতে পারে।” [সহিহ বুখারী (১৯১৪) ও সহিহ মুসলিম (১০৮২)]

২. যে ব্যক্তি শাবান মাসের অর্ধেক পূর্ণ হওয়ার আগ থেকেই রোযা রেখে আসে এবং অর্ধেকের পরেও লাগাতার রোযা রেখে যায় তাহলে সে ব্যক্তিও এ নিষেধাজ্ঞার অধীনে পড়বে না। এর দলিল হচ্ছে- আয়েশা (রাঃ) এর বাণী: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা শাবান মাস রোযা রাখতেন। অল্প কয়টি দিন ছাড়া বাকী শাবান মাস রোযা রাখতেন।” [সহিহ বুখারী (১৯৭০) ও সহিহ মুসলিম (১১৫৬) হাদিসের ভাষ্য ইমাম মুসলিমের]

ইমাম নববী বলেন:

আয়েশার বাণী: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা শাবান মাস রোযা রাখতেন। অল্প কয়টি দিন ছাড়া বাকী শাবান মাস রোযা রাখতেন।” দ্বিতীয় কথাটি প্রথম কথাটির ব্যাখ্যাস্বরূপ। তিনি যে বলেছেন ‘গোটা’ শাবান মাস এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- ‘অধিকাংশ’ শাবান মাস।

এ হাদিসটি প্রমাণ করে যে, শাবান মাসের অর্ধেকঅতিবাহিত হওয়ার পরও রোযা রাখা জায়েয; তবে যে ব্যক্তি অর্ধেকের আগে থেকেই রোযা চালিয়ে আসবে তার জন্য।

৩. অনুরূপভাবে এ নিষেধাজ্ঞার বাহিরে থাকবে রমযান মাসের কাযা রোযা।

ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর 'আল-মাজমু' গ্রন্থে (৬/৩৯৯) বলেন:

আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেন: রমযান মাসেরঅব্যবহিত পূর্বে ইয়াওমুশ শাক্ব বা সন্দেহের দিন রোযা রাখা সহিহ নয়; এব্যাপারে দ্বিমত নেই। তবে কেউ যদি কাযা রোযা, কিংবা মানতের রোযা কিংবাকাফফারার রোযা রাখে তাহলে জায়েয হবে। কেননা, এ দিনে কারণ সম্বলিত নফল রোযারাখা যদি জায়েয হয়; তাহলে ফরজ রোযা রাখা জায়েয হওয়া অধিক উপযুক্ত। কেননা, সে ব্যক্তির উপর যদি রমযানের শুধু একটি রোযা কাযা থাকে তাহলে সেটা কাযাপালন করা তার উপর ফরযে আইন বা সুনির্দিষ্ট ফরজ হয়ে যায়। যেহেতু কাযা পালনকরার সময় একেবারে সংকীর্ণ হয়ে গেছে।[সমাণ্ড]

সন্দেহের দিন হচ্ছে- শাবান মাসের ত্রিশ তারিখ; যদি মেঘের কারণে কিংবা ধুলির কারণে কিংবা এ জাতীয় অন্যকোন কারণে এইদিন চাঁদদেখা না যায়। এ দিনকে এজন্য সন্দেহের দিন বলা হয় যেহেতু এ দিনটি কি শাবানমাসের শেষ দিন; নাকি রমযান মাসের প্রথম দিন এ বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ।

উত্তরের সারাংশ হচ্ছে-

শাবান মাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশে রমযানের কাযারোযা রাখতে কোন অসুবিধা নেই। শাবান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গেলে রোযা নারাখার যে নিষেধাজ্ঞা সেই নিষেধাজ্ঞা এই রোযাকে অন্তর্ভুক্ত করবে না।

অতএব, আপনার তিনদিন রোযা রাখা সহিহ এবং রমযান মাস শুরু হওয়ার আগে বাকী দিনগুলোর কাযা রোযা পালন করা আপনার উপর কর্তব্য।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

আমার বান্ধবী প্রতি বছর রমযানের যে রোযাগুলো ভাঙ্গা পড়ত সেগুলোর কাযা পালন করত। কিন্তু রাত থেকে নিয়ত করত না। অর্থাৎ সে সকালে নিয়ত করত। সে জানত না যে, কাযা রোযার নিয়ত রাত থেকে করা ওয়াজিব। এভাবে রোযা পালনের হুকুম কী? তার উপরকি কাফফারা পরিশোধের পাশাপাশি রোযাগুলো পুনরায় রাখতে হবে? নাকি অন্যকিছু?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

সকল আলেমের অভিমত অনুযায়ী আপনার বান্ধবীর রমযানেরভাঙতি রোযাগুলোর কাযা পালন সঠিক হয়নি। তাই তার উপর ফরয সেই দিনগুলোর রোযাপুনরায় রাখা এবং তার উপর কোন কাফফারা ফরয নয়। এই হুকুম সর্বশেষ বছরেরক্ষত্রে প্রযোজ্য; যেহেতু সেই বছরের রোযা কাযা পালন করার সময় এখনও বলবৎআছে। পক্ষান্তরে, বিগত বছরগুলোর রোযার ব্যাপারে কোন কোন আলেম যেমন ইবনেতাইমিয়ার অভিমত হচ্ছে: যেই ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ কোন একটি ইবাদত ভুলভাবেসম্পাদন করে থাকে এবং ঐ ইবাদতটির সময় পার হয়ে যায় তাহলে সেই ইবাদতটি পুনরায়সম্পাদন করা তার উপর ওয়াজিব নয়। সুতরাং আপনার বান্ধবী যদি এই অভিমতটিকেগ্রহণ করেন তাহলে আশা করি এতে কোন গুনাহ নেই।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।।

প্রত্যেক ফরয রোযার জন্য রাত থেকে নিয়ত করা আবশ্যকীয়। এটি জমহুর আলেমের অভিমত। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি ফজরের পূর্ব থেকে রোযা রাখার নিয়ত পাকাপোক্ত করেনি তার রোযা নেই।” [সুনানে আবু দাউদ (২৪৫৪), সুনানে তিরমিযি (৭৩০), সুনানে নাসাঈ (২৩৩১)] সুনানে নাসাঈর ভাষ্যে রয়েছে: “যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রাত থেকে রোযা রাখার নিয়তকে সুদৃঢ় করেনি তার রোযা নেই।” [আলবানী 'সহিছ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

তিরমিযি (রহঃ) হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন: “কোন কোন আলেমের নিকট এ হাদিসটির অর্থ হল: যে ব্যক্তি ফজর উদিত হওয়ার আগে রোযা রাখার দৃঢ় সংকল্প করেনি, রাত থেকে নিয়ত করেনি; সেটা রমযানের রোযা হোক কিংবা কাযা রোযা হোক কিংবা মানতের রোযা হোক; তার রোযাজায়েয হবে না।

আর নফল রোযা হলে সেটার নিয়ত সকালে করলেও জায়েয হবে। এটি শাফেয়ি, আহমাদ ও ইসহাকের অভিমত।” [সমাণ্ড]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: “যদিফরয রোযা হয়; যেমন রমযানের রোযা বা কাযা রোযা, মানতের রোযা, কাফফারারোযা; তাহলে রাত থেকে নিয়ত করা আমাদের ইমামের নিকট, মালেক ও শাফেয়ি.... এরনিকট শর্ত। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদিসটি দিয়ে দলিল পেশ করেন।” [আল-মুগনী (৩/১০৯) থেকে সমাণ্ড]

ইমাম আবু হানিফা এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলেমের সাথে মতভেদ করেছেন। তিনি রোযার কিছু প্রকারের ক্ষেত্রে দিনের বেলা থেকে নিয়ত করলে জায়েয হবে বলেছেন। তবে তিনি অধিকাংশ আলেমের সাথেএ ব্যাপারে একমত যে, রমযানের কাযা রোযার নিয়ত রাত থেকে না করলে সে রোযা শুদ্ধ হবে না। বরং হানাফি মাযহাবের কোন কোন আলেম এই মর্মে ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।

আল-কাসানি আল-হানাফী 'বাদায়িউস সানায়ি' গ্রন্থে (২/৫৮৫) বলেন:

“সকল রোযার ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে ফজর উদিত হওয়ার সময় নিয়ত করা; যদি সেটা সম্ভবপর হয় কিংবা রাত থেকে নিয়ত করা...। যদি ফজর উদিত হওয়ার পর নিয়ত করে এবং সে রোযাটি ঋণশ্রেণীয় হয়; তাহলে ইজমার ভিত্তিতে তা জায়েয হবে না।” [সমাণ্ড]

তিনি ইতিপূর্বে (২/৫৮৪) ঋণশ্রেণীয় রোযা দ্বারা হানাফী আলেমদের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করেছেন যে, “তাহছে: কাযা রোযা, কাফফারার রোযা ও সাধারণ মানতের রোযা।” [সমাণ্ড]

এর সাথে দেখুন: ইবনে আবেদীন-এর 'রাদ্দুর মুহতার' (২/৩৮০)।

আরও জানতে পড়ুন: [192428](#) নং প্রশ্নোত্তর।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আপনার বান্ধবী রমযানের কাযা রোযার নিয়ত দিনের বেলা থেকে করায় সকল ইমামের মতে তার রোযা শুদ্ধ হয়নি।

তার উপর ফরয হল ঐ দিনগুলোর রোযা পুনরায় রাখা। তবে তার উপর কোন কাফফারা আবশ্যিক নয়; যেমনটি ইতিপূর্বে 26865 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচিত হয়েছে।

এই হুকুমটি তার সর্বশেষ বছরের রোযাগুলোর কাযা পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট; যে রোযাগুলো পালনের সময় এখনও বাকী আছে। আর আগের বছরগুলোর রোযার ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়ার মত কোন কোন আলেমের অভিমত হচ্ছে: অজ্ঞতা বশতঃ যে ইবাদত ভুলভাবে সম্পাদন করা হয়েছে এবং এর সময়পার হয়ে গেছে সে ইবাদতটি পুনরায় পালন করতে হবে না।

তাই যদি আপনার বান্ধবী এই অভিমতটিকে গ্রহণ করেন তাহলে আমরা আশা করছি যে, তার কোন গুনাহ হবে না।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

আমি জানি যে, নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্দেহের দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। রমযানের রোযার দুইদিন আগে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু, এই দিনগুলোতে রমযানের কাযা রোযা পালন করার আমার জন্য জায়েয হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

হ্যাঁ, গত রমযানের কাযা রোযা সন্দেহের দিন, রমযানের একদিন বা দুইদিন আগে পালন করা জায়েয আছে ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেসাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি সন্দেহের দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি রমযানের একদিন বা দুইদিন আগে থেকে রোযা রাখতেও নিষেধ করেছেন। কিন্তু, এনিষেধাজ্ঞা ঐ ব্যক্তির জন্যে নয় যার রোযা রাখার বিশেষ অভ্যাস রয়েছে। যেহেতুনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা রমযানের একদিন বা দুইদিন আগে রোযা রাখবে না। তবে কারো যদি রোযাখাকার অভ্যাস থেকে থাকে সে ব্যক্তি রোযা রাখতে পারে।" [সহিহ বুখারী (১৯১৪) ওসহিহ মুসলিম (১০৮২)] উদাহরণতঃ কারো যদি প্রতি সোমবার রোযা রাখার অভ্যাসথাকে এবং শাবান মাসের সর্বশেষ দিন সোমবারে পড়ে তার জন্য ঐ দিন নফল রোযারাখা জায়েয হবে; এ রোযা রাখতে তাকে নিষেধ করা হবে না।

যদি অভ্যাসগত নফল রোযা রাখা জায়েয হয় তাহলে রমযানের কাযা রোযা রাখা জায়েয হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ কাযা রোযা পালনকরা ওয়াজিব। কেননা কাযা রোযা পালন পরবর্তী রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয; এর বেশি নয়।

ইমাম নববী (রহঃ) 'আল-মাজমু' গ্রন্থে (৬/৩৯৯) বলেন:

আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেন: রমযান নিয়েসন্দেহপূর্ণ দিনে রোযা রাখা সহিহ নয়-এতে কোন মতভেদ নেই...। যদি কেউ এ দিনকাযা রোযা রাখে, মানতের রোযা রাখে, কিংবা কাফফারার রোযা রাখে তাহলে সেটাজায়েয হবে। কেননা বিশেষ কোন কারণে নফল রোযা রাখা যদি জায়েয হয় তাহলে ফরযরোযা রাখা জায়েয হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত; যে ওয়াক্তগুলোতে নামায পড়া নিষেধকরা হয়েছে সে ওয়াক্তগুলোর মত। আর যে ব্যক্তির উপর শুধু একদিনের রোযার কাযাপালন করা বাকী তার উপর সেদিন রোযা রাখা অবধারিত। কারণ তার কাযা রোযা পালনকরার সময়কাল সংকীর্ণ হয়ে গেছে। [সমাণ্ড]

প্রশ্ন

হায়েযের কারণে আমি রমযানেরকয়েকদিন রোযা থাকতে পারিনি। এটা কয়েক বছর ঘটেছে। এ পর্যন্ত আমি সে রোযাগুলোপালন করিনি। এখন আমার কী করণীয়?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে যে ব্যক্তি রমযানের কিছু রোযা ভেঙ্গেছে পরবর্তী রমযানআসার আগেই সে রোযাগুলোর কাযা পালন করা তার উপর ওয়াজিব।

এ অভিমতের সপক্ষে তারা দলিল দেন আয়েশা (রাঃ)কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন: "আমার উপর রমযানের যে রোযাগুলো কাযা থাকত সেগুলো শাবান মাসে ছাড়া কাযা পালন করতে পারতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থানের কারণে।"

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ):

শাবান মাসে কাযা রোযা শেষ করার তার যে আগ্রহ এরথেকে বুঝা যায়, পরবর্তী রমযান প্রবেশ করা পর্যন্ত কাযা রোযা পালনে দেরীকরা জায়েয নয়। [সমাণ্ড]

যদি পরবর্তী রমযান শুরু হয়েই যায় তাহলে দুইটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা:

কোন ওজরের কারণে বিলম্ব করা। যেমন- যদি অসুস্থ থাকে এবং পরবর্তী রমযান চলে আসা পর্যন্ত অসুস্থতা অব্যাহত থাকে; সেক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে তার গুনাহ হবে না। যেহেতু সে ওজরগ্রস্ত। তাকে শুধু কাযাপালন করতে হবে। সে যে দিনগুলোর রোযা ভেঙেছে সে দিনগুলোর কাযা পালন করবে।

দ্বিতীয় অবস্থা:

কোন ওজর ছাড়া কাযা পালনে বিলম্ব করা। উদাহরণতঃ তার কাযা পালন করার সুযোগ ছিল; কিন্তু সে পালন করেনি। এর মধ্যে পরবর্তী রমযান এসে গেছে। এ ব্যক্তি ওজর ছাড়া কাযা পালনে বিলম্ব করার কারণে গুনাহগার হবে। সকল ইমাম একমত যে, তার উপর কাযা পালন করা ওয়াজিব। কিন্তু, কাযা পালনের সাথে প্রতিদিনের বদলে একজন করে তাকে মিসকীন খাওয়াতে হবে কিনা- এ বিষয়ে তারা মতভেদ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদের মতে, তার উপর খাওয়ানো ওয়াজিব। তারা কোন কোন সাহাবী থেকে যে অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে; যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সেটা দিয়ে দলিল দেন।

আর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর অভিমত হচ্ছে- কাযা পালন করার সাথে খাবার খাওয়াতে হবে না।

তিনি দলিল দেন যে, যে ব্যক্তি রমযানের রোযাভঙ্গ করেছে আল্লাহ্ তাকে শুধু কাযা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন; খাবার খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করেননি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।" [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

দেখুন: আল-মাজমু (৬/৩৬৬), আল-মুগনি (৪/৪০০)

ইমাম বুখারী দ্বিতীয় অভিমতটি পছন্দ করেছেন। তিনি তাঁর সহিহ কিতাবে বলেন: ইব্রাহিম নাখায়ী বলেছেন: যদি অবহেলা করে এবং পরবর্তী রমযান এসে যায় তাহলে সে দুই রোযাই রাখবে। তিনি খাবার খাওয়ানোকে তার উপর আবশ্যিক মনে করতেন না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মুরসাল সনদে এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করা হয় যে, তারা খাওয়ানোর অভিমত পোষণ করতেন। এরপর ইমাম বুখারী বলেন: আল্লাহ্ খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করেননি। তিনি উল্লেখ করেছেন: "অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে"। [সমাণ্ড]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) 'খাওয়ানো ওয়াজিব নয়' এ অভিমতটি সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন: যদি সাহাবীদের মতামত কুরআনের বাহ্যিক ভাবের বিপরীত হয় তাহলে সেটাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি আছে। এমাসয়ালাতে খাওয়ানোটাকে আবশ্যিক করা কুরআনের বাহ্যিক ভাবের বিপরীত। কেননা আল্লাহ্ তাআলা শুধুমাত্র অন্য দিনগুলোতে কাযা পালন করা আবশ্যিক করেছেন। এরচেয়ে বেশি কিছু আবশ্যিক করেননি। অতএব, আমরা আল্লাহ্র বান্দাদের উপর এমন কিছু আবশ্যিক করতে পারি না যা আল্লাহ্ তাদের উপর আবশ্যিক করেননি; এমন কোন দলিল ছাড়া যে দলিলের মাধ্যমে ব্যক্তির দায় মুক্ত হতে পারে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে যে অভিমত বর্ণিত হয়েছে সেটা পালন করাকে মুস্তাহাব হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; ওয়াজিব হিসেবে নয়।

অতএব, এ মাসয়ালায় সঠিক অভিমত হচ্ছে- আমরা তাকেরোযা রাখার চেয়ে বেশি কোন দায়িত্ব দিব না। তবে, বিলম্ব করার কারণে সেব্যক্তি গুনাহগার হবে। [সমাণ্ড]

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, এক্ষেত্রে ওয়াজিব হল: কাযা পালন করা। তবে, সতর্কতামূলক কেউ যদি প্রতিদিনের বদলে একজন করে মিসকীন খাওয়ায় তাহলে সেটা ভাল।

প্রশ্নকারী বোনের কর্তব্য হল: যদি তিনি কোন ওজরছাড়া কাযা রোযা পালনে বিলম্ব করে থাকেন তাহলে তিনি আল্লাহর কাছে তওবাকরবেন। ভবিষ্যতে এ ধরণের গুনাহ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিবেন।

আমরা শুধু আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করতে পারি তিনি যেন আমাদেরকে তার প্রিয় ও সন্তুষ্টিমূলক আমল করার তাওফিক দেন।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

আমার স্ত্রীর উপর কিছু রোযা আগে থেকেই বাকী ছিল। কিন্তু সে ঠিকভাবে মনে করতে পারছে না যে, কয়দিনের রোযা। এখন সে কী করবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যিনিসফরের ওজর কিংবা রোগজনিত ওজর কিংবা হায়েয বা নিফাসজনিত ওজরের কারণেরময়ানের কিছু রোযা রাখতে পারেননি তার উপর ওয়াজিব হল— সে রোযাগুলোর কাযাপালন করা। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।" [সূরাবাকারা, ২:১৮৪]

আমেশা (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন: হায়েযেরক্ষেত্রে রোযা কাযা পালন করতে হয়; কিন্তু নামায কাযা পালন করতে হয় না কেন? জবাবে তিনি বলেন: "আমরা হায়েযগ্রস্ত হতাম; তখন আমাদেরকে রোযার কাযা পালনকরার নির্দেশ দেয়া হত, কিন্তু নামাযের কাযা পালন করার নির্দেশ দেয়া হতনা।" [সহিহ মুসলিম (৩৩৫)]

আপনার স্ত্রী যদি কতদিনের রোযার কাযা পালন তার উপর বাকী রয়েছে সেটা ভুলে যান এবং তার সন্দেহ হয় যে, উদাহরণতঃ ছয়দিন কিংবাসাতদিন; তাহলে তার উপর কেবল ছয়দিনের রোযা কাযা পালন করাই আবশ্যিক। কেননামূলবিধান হচ্ছে— দায়িত্বমুক্ত থাকা। তবে তিনি যদি সতর্কতামূলক সাতদিন রোযারাখেন তাহলে নিশ্চিতভাবে তার দায়িত্বমুক্ত হওয়ার জন্য সেটাই ভাল।

আর যদি তিনি কোন সংখ্যাই মনে করতে না পারেন তাহলে যতদিন রোযা রাখলে তার দায়িত্বমুক্ত হয় বলে তিনি প্রবল ধারণা করেন ততদিন রোযা রাখবেন।

শাইখ বিন উছাইমীন (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: জনৈক নারীর ওপর রময়ানের কিছুদিনের রোযা কাযা আছে। কিন্তু তিনি সন্দেহে পড়ে গেছেন যে, সেটা কি চারদিন; নাকি তিনদিন। এখন তিনি তিনদিন রোযা রেখেছেন। এমতাবস্থায় তার উপর কী আবশ্যিক?

জবাবে তিনি বলেন: "যদি কোন মানুষ সন্দেহে পড়ে যান যে, তার উপর কয়দিনের রোযা কাযা পালন করা ওয়াজিব; সেক্ষেত্রে তিনি কমসংখ্যাটাই ধরবেন। যদি কোন নারী বা পুরুষ সন্দেহ করেন যে, তার উপর কতদিনের রোযা কাযা আছে; নাকি চারদিনের? সেক্ষেত্রে তিনি কম সংখ্যাটাই ধরবেন। কেননা কম সংখ্যাটাই নিশ্চিত; বেশি সংখ্যাটা সন্দেহপূর্ণ। আর মূলবিধান হলো— দায়িত্বমুক্ত থাকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সতর্কতা হলো— সন্দেহের দিনগুলোরও কাযা পালন করা। কেননা যদি সে দিনটির রোযা তার ওপর ওয়াজিব থাকে তাহলে তো তার দায়িত্ব অবমুক্ত হল। আর যদি ওয়াজিব না হয়ে থাকে তাহলে সেটানফল রোযা হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা কোন নেক আমলের প্রতিদান নষ্ট করেন না। [নুরুল্লাহ আলাদ দারব ফতোয়াসমগ্র থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি কাযা পালন করতে ভুলে গেছে এবং আরেক রময়ান চলে এসেছে তার হুকুম কী?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

ফিকাহবিদগণএই মর্মে একমত যে, ভুলে যাওয়া একটি ওজর; যে ওজরের কারণে সব ধরণেরসীমালঙ্ঘনের পাপ ও শাস্তি মওকুফ করা হয়— এ সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহর অনেকদলিলের কারণে। তবে তারা এ নিয়ে মতভেদ করেছেন যে, ভুলে যাওয়া ব্যক্তির উপরফিদিয়া দেয়া বা এ জাতীয় কিছু কি বর্তাবে?

রমযানের রোযা কাযাপালনের কথা এমনভাবে ভুলে যাওয়া যে, অন্য রমযান চলে আসা সংক্রান্ত সবিশেষ এমাসয়ালায় আলেমগণ একমত যে, পরবর্তী রমযানের পর কাযা পালন করা তার উপরওয়াজিব। ভুলে যাওয়ার কারণে সেটি মওকুফ হবে না। তবে কাযা পালনের সাথে ফিদিয়াদেয়া (মিসকীন খাওয়ানো) ওয়াজিব কিনা এ ব্যাপারে তারা দ্বিমত করেছেন। একঅভিমত মতে: তার উপর ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব নয়। কেননা ভুলে যাওয়া এমন ওজর যারকারণে গুনাহ ও ফিদিয়া প্রদান মওকুফ হয়। শাফেয়ি মাযহাবের অধিকাংশ আলেম ওমালেকি মাযহাবের কিছু কিছু আলেমের অভিমত এটি।

দেখুন: ইবনে হাজারহাইতামি-র 'তুহফাতুল মুহতাজ' (৩/৪৪৫), নিহায়াতুল মুহতাজ (৩/১৯৬), মিনাছলজালিল (২/১৫৪), এবং শারহ মুখতাছারি খলিল (২/২৬৩)।

দ্বিতীয় অভিমত: তার উপরফিদিয়া প্রদান ওয়াজিব। ভুলে যাওয়া এমন একটি ওজর যার কারণে কেবল গুনাহমওকুফ হয়। এটি শাফেয়ি মাযহাবের আলেম খতবী শারবানী এর অভিমত। তিনি 'মুগনিলমুহতাজ' গ্রন্থে (২/১৭৬) বলেন: "তিনি বলেন: বাহ্যতঃ এর মাধ্যমে তার পাপমওকুফ হবে; ফিদিয়া নয়"। কিছু মালেকী আলেম এটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখকরেছেন।

দেখুন: মাওয়াহিবুল জালিল শারহ মুখতাছারি খলিল (২/৪৫০)।

অগ্রগণ্য অভিমত: ইনশা আল্লাহ প্রথম অভিমত। নিম্নোক্ত দলিলের কারণে:

এক. ভুলে যাওয়া ব্যক্তির শাস্তি মওকুফ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসসমূহের সার্বিকতা। যেমন আল্লাহর বাণী: "হে আমাদের প্রভু, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে শাস্তি দিবেননা।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬]

দুই. মূল অবস্থা হলব্যক্তির দায় মুক্ততা। তাই কোন দলিল ছাড়া তার উপর কাফফারা কিংবা ফিদিয়ার দায় বর্তানো জায়েয নয়। কিন্তু এই মাসয়ালাতে এমন কোন শক্তিশালী দলিল নেই।

তিন. মূলতঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে কাযা পালনে বিলম্ব করেছে তার উপরই এই ফিদিয়া ওয়াজিব কিনা সেটা মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়। হানাফী মাযহাব ও জাহেরী মাযহাবের মতে এটি ওয়াজিব নয়। শাইখ উছাইমীন ফিদিয়া দেয়া মুস্তাহাব হওয়ার মতকে নির্বাচন করেছেন। কারণ এইফিদিয়ার বিধান সাব্যস্তের ক্ষেত্রে কেবল কিছু কিছু সাহাবীর আমল ছাড়া অন্যকোন দলিল উদ্ধৃত হয়নি। আর এ দলিলটি দিয়ে মানুষকে ফিদিয়া দিতে বাধ্য করার মতশক্তি এতে নেই; তাহলে ওজরগ্রস্ত ব্যক্তিকে কিভাবে এই দলিল দিয়ে ফিদিয়াদিতে বাধ্য করা হবে; যে ওজরটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এমন ওজরেরক্ষেত্রে।

দেখুন: [26865](#) নং প্রশ্নোত্তর।

জবাবের সারসংক্ষেপ: তার উপর শুধু কাযা পালন ওয়াজিব। তাকে খাদ্য খাওয়াতে হবে না। বর্তমান রমযানের পর সে রোযাগুলো কাযা পালন করবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

যদি কেউ কোন ওজর ছাড়া রমযানের রোযা না-রেখে থাকে কিংবা ইচ্ছাকৃত ভাবে রোযা ভেঙ্গে থাকে যে দিনগুলোর রোযা সে ভঙ্গ করেছে সে দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর কি ফরয?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

রমযানেররোযা পালন ইসলামের অন্যতম একটি রুকন (মূল স্তম্ভ) । কোন মুসলিমের জন্য ওজরছাড়া রমযানের রোযা ত্যাগ করা বৈধ নয় । যে ব্যক্তি শরিয়ত অনুমোদিত কোন ওজরের কারণে (যেমন- অসুস্থ থাকা, সফরে থাকা, ঋতুগ্রস্ত হওয়া) রমযানের রোযা বাদদিয়েছে কিংবা ভঙ্গ করেছে; যে রোযাগুলো সে ভেঙ্গেছে সে রোযাগুলোর কাযা পালনকরা আলেমগণের ইজমার ভিত্তিতে তার উপর ফরয । যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন, “ আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্যসময় এই সংখ্যা পূরণ করবে ।” [সূরাবাক্বারা, ২ : ১৮৫]

আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে রমযানের রোযা বর্জন করেছে, সেটা একটিমাত্র রোযার ক্ষেত্রে হলেও (যেমন সে রোযারনিয়তই করেনি কিংবা কোন ওজর ছাড়া রোযা শুরু করে ভেঙ্গে ফেলেছে) সে কবিরাগুনাতে (মহাপাপে) লিপ্ত হয়েছে । তার উপর তওবা করা ফরয ।

অধিকাংশ আলেমের মতে, সে যে দিনগুলোর রোযাভেঙ্গেছে সে দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর ফরয । বরং কেউ কেউ এইমর্মে ইজমা উল্লেখ করেছেন ।

ইবনে আব্দুল বার বলেন: “ গোটা উম্মত ইজমা করেছেন এবং সকলে উদ্ধৃত করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা পালন করেনি, কিন্তু সে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার প্রতি বিশ্বাসী, সে অবহেলা করে, অহংকারবশতঃ রোযা রাখেনি, ইচ্ছা করেই তা করেছে, অতঃপর তওবা করেছে: তার উপররোযার কাযা পালন করা ফরয ।” [আল-ইযতিযকার (১/৭৭) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি বলেন:

“ আমরা এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ জানি না । কেননা রোযা তার দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে । সুতরাং রোযা পালন করা ছাড়া তার দায়িত্বমুক্ত হবে না । বরং যেভাবে ছিল সেভাবে তার দায়িত্ব থেকে যাবে ।” [আল-মুগনি (৪/৩৬৫)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৪৩) এসেছে:

যে ব্যক্তি রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে রোযাত্যাগ করে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমার ভিত্তিতে) কাফের । আর যেব্যক্তি অলসতা করে, কিংবা অবহেলা করে রোযা ছেড়ে দেয় সে কাফের হবে না ।কিন্তু, সে ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত (ইজমা সংঘটিত) একটি রুকন ছেড়ে দেওয়ারমাধ্যমে মহা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে । নেতৃবর্গের কাছ থেকে সে শাস্তি ওসাজা পাওয়ার উপযুক্ত; যাতে সে এবং তার মত অন্যেরা এর থেকে নিবৃত্ত হয় । বরংকিছু কিছু আলেমের মতে, সেও কাফের । সে যে রোযাগুলো ভঙ্গ করেছে সেগুলোর কাযাপালন করা ও আল্লাহর কাছে তওবা করা তার উপর ফরয ।[সমাপ্ত]

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:শরিয়ত অনুমোদিত কোন ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখে না তারহুকুম কী? তার বয়স প্রায় সতের বছর । তার কোন ওজর নেই । তার কি করা উচিত? তারউপর কি কাযা পালন করা ফরয?

জবাবে তিনি বলেন: হ্যাঁ, তার উপর কাযা পালন করা এবং তার অবহেলা ও বাড়াবাড়ির জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করা ফরয ।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এসংক্রান্ত যে হাদিসটি বর্ণিত আছে: “ যে ব্যক্তি কোন (শরয়ি) ছাড় ব্যতীতকিংবা রোগ ব্যতীত রমযান মাসের কোন একদিনের রোযা ভাঙ্গে সে সারা বছর রোযারাখলেও কাযা পালন হবে না ।” সে হাদিসটি দুর্বল, মুযতারিব, আলেমদের নিকট এটিসহিহ হাদিস নয় ।নুরুন আলাদ দারব ফতোয়াসমগ্র (১৬/২০১) থেকে সমাপ্ত]

কিছু কিছু আলেমের মতে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোযা রাখেনি তার উপর কাযা পালন নেই। বরং সে বেশি বেশি নফল রোযারাখবে। এটি জাহেরি মতাবলম্বীদের মায়হাব। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও শাইখউছাইমীন এ অভিমতটি পছন্দ করেছেন।

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি বলেন:

জাহেরি মতাবলম্বীদের অভিমত কিংবা তাদের অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে- ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারীর উপর কাযা নেই। শাফেয়িরছাত্র আব্দুর রহমান থেকে, শাফেয়ির মেযের ছেলে থেকেও এমন অভিমত বর্ণিত আছে। ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা-নামায ত্যাগকারীর ক্ষেত্রে এটি আবু বকর আল-ছুমাঈদিরওউক্তি: 'কাযা পালন করলে দায়িত্ব মুক্ত হবে না'। আমাদের মায়হাবের অনুসারীপূর্ববর্তী একদল আলেমের অভিমতও এটাই; যেমন- আল-জুযজানি, আবু মুহাম্মদআল-বারবাহারি, ইবনে বাত্তাহ।" [ফাতহুল বারী (৩/৩৫৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

বিনা ওজরে নামায কিংবা রোযা ত্যাগকারী কাযা পালন করবে না। [আল-ইখতিয়ারাত আল-ফিকহিয়া (পৃষ্ঠা-৪৬০) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলেন:

আর যদি মূলতই সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওজর ছাড়ারোযা ত্যাগ করে; তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক নয়। কেননা কাযা পালন করে তার কোন লাভ হবে না। যেহেতু তার থেকে সেটা কবুল করা হবে না। কারণ ফিকহী নীতি হচ্ছে, 'যদি নির্দিষ্ট কোন সময়ের সাথেসংশ্লিষ্ট ইবাদত কোন ওজর ছাড়া উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে পালন করা না হয় তাহলেতার থেকে সেটা কবুল করা হয় না।' [মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/৮৯) থেকে সমাপ্ত]

সারকথা:

যে ব্যক্তি রমযানের রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জনকরবে অধিকাংশ আলেমের মতে, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক। আর কিছু কিছুআলেমের মতে, কাযা পালন করা শরিয়তসিদ্ধ নয়। কেননা এটি এমন ইবাদত যে ইবাদতেরসময় পার হয়ে গেছে। তবে, অধিকাংশ আলেম যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটাঅগ্রগণ্য। কেননা, রোযা এমন ইবাদত যা ব্যক্তির দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে; সুতরাং এটি পালন করা ছাড়া দায়িত্ব মুক্ত হবে না।

প্রশ্ন

বিগত বছরগুলোতে আমি আমার পরিবারের সাথে থাকাবস্থায় কতরোযা ভেঙ্গেছি তা জানি না। যেহেতু আমরা গ্রামে থাকতাম। সেখানে রোযারবিধিবিধান সম্পর্কে কেউ কিছু জানত না। এ দিনগুলোতে আমি রোযা রাখিনি। আমিজানিও না যে, কতদিন রোযা ভেঙ্গেছি। সে দিনগুলোর বদলে আমি একটা অংকের অর্থদান করেছি। কিছু সময় পর এক বোনের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, এ দিনগুলোর রোযাকাযা পালন করা আমার ওপর ওয়াজিব। কিন্তু আমি এ দিনগুলোর সংখ্যা জানি না।এমতাবস্থায় আমি কি করব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শরিয়তের জরুরী মাসয়ালাগুলো জেনে নেয়া একজন মুসলিমের ওপর ওয়াজিব। সেগুলো দৃষ্টিভঙ্গিত বিধান হোক; যেমন- আকিদা ও ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কিংবা আমলগত বিধান হোক; যেমন- পবিত্রতা ও নামায ইত্যাদি। যদি কোন মুসলিম সম্পদশালী হয় তাহলে যাকাতের বিধিবিধান জেনে নেওয়াও তার ওপর ওয়াজিব। যদি কেউ ব্যবসায়ী হয় তাহলে ব্যবসায়ের বিধিবিধান জানাও তার ওপর ওয়াজিব। এভাবেঅন্যান্য ক্ষেত্রেও। যখন রমযান মাস ঘনিষে আসে তখন একজন মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তির ওপর রোযার বিধিবিধান জানা ওয়াজিব; এমনকি সে যদি রোযা রাখতে অক্ষম হয় তবুও। সেটা এজন্য যে, সে যেন রোযার বদলে যা করা ওয়াজিবসেটা জানতে পারে।

আপনি ও আপনার পরিবারের ওপর ওয়াজিব হল- এ সম্পর্কিত জ্ঞান ও জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে কসুর করায় তওবা করা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা ।

অর্থ পরিশোধ করা রোযা রাখতে অক্ষম বয়োবৃদ্ধ ওদীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্যেও জায়েয নয় । কেননা এ ধরণেরব্যক্তির রমযানের রোযা ভাঙ্গলে তাদের ওপর ওয়াজিব হল প্রতিদিনের বদলে একজনমিসকীনকে খাওয়ানো । যে দিনগুলোর রোযা ভাঙ্গা হয়েছে সেগুলোর বদলে খাওয়ানোর পরিবর্তে অর্থ পরিশোধ করা জায়েয নয় ।

অতএব, আপনি যে অর্থ দান করেছেন আমরা আশা করছি কিয়ামতের দিন সদকা হিসেবে আপনি সেটার সওয়াব পাবেন ।

আপনাদের ওপর ওয়াজিব হল: যে দিনগুলোতে রোযা ভেঙ্গেছেন সে দিনগুলোর কাযা রোযা পালন করা । আপনারা সতর্কতা অবলম্বন করে গণনা করবেন; যাতে করে নিশ্চিত সংখ্যাটা নির্ধারণ করতে পারেন । যদি সেটা নাপারেন তাহলে আপনারা প্রবল ধারণার উপর আমল করবেন । উদাহরণতঃ যদি আপনাদেরধারণা হয় যে, সেটা ৩০ দিন তাহলে এ দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা আপনাদের ওপরওয়াজিব । এভাবে কম হোক বা বেশি হোক এ পদ্ধতিতে করবেন । “ আল্লাহ্ কাউকে তারসাধ্যের বাইরে দায়িত্ব আরোপ করেন না ।” [সূরা বাক্বারা, ২:২৯৬]

আপনাদের ওপর এ দিনগুলোর রোযা লাগাতরভাবে রাখাওয়াজিব নয় । বরং সক্ষমতা ও সুযোগ অনুযায়ী আপনারা আলাদা আলাদাভাবে সেগুলোর রাখতে পারবেন । কিন্তু, আপনাদের কর্তব্য অবিলম্বে রোযাগুলো পালন করা এবং এরোযাগুলো পালনে পুনরায় বিলম্ব না করা ।

আপনার উপর আবশ্যিক গত বছরের রোযাগুলোর কাযা পালন আগে শুরু করা; যাতে করে সেগুলো পালন করার আগে পরবর্তী রমযান এসে না যায় ।

কোন কোন আলেমের অভিমত হল: রোযার পালন করার সাথেবিলম্ব করার কারণে প্রতিদিনের বদলে একজন করে মিসকীন খাওয়ানোও আপনাদের ওপরওয়াজিব । কিন্তু, অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে— শুধু রোযা রাখাই আপনাদের ওপরওয়াজিব । বিশেষতঃ আপনারা যদি গরীব হন । তবে যদি রোযা রাখার সাথে খাদ্যওখাওয়াতে পারেন তাহলে সেটা ভাল ।

আরও জানতে দেখুন:[39742](#) নং, [26212](#) নং ও [40695](#) নং প্রশ্নোত্তর ।

পূর্বোক্ত বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে যদি আপনারা হায়েযের মত শরয়ি ওজরের প্রেক্ষিতে রোযা ভেঙ্গে থাকেন । আর যদি আপনাদের এ রকম কোন ওজর না থাকে: তাহলে আপনাদের ওপর কোন কাযা পালন নেই । বরং আপনাদের ওপর ওয়াজিব হচ্ছে—তওবা করা, ক্ষমাপ্রার্থনা করা এবং ছুটে যাওয়া এদিনগুলোর রোযার বদলে নফল রোযা রাখা ও নেক আমল করা ।

আমরা এ মাসযালাটি ও এ সংক্রান্ত আলেমদের ফতোয়াগুলো [50067](#) নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করেছি; সেটা দেখে নিতে পারেন ।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ ।

প্রশ্ন

হায়েযের কারণে আমার স্ত্রীর ওপর গত রমযানের কিছু রোযারকাযা পালন করা বাকী আছে । সে এ রোযাগুলোর কাযা পালন করার পূর্বে আগামী রমযানআসার আগেই গর্ভবতী হয়ে গেছে । তার চিকিৎসক মহিলা ডাক্তার তাকে জানিয়েছে যে, গর্ভকালীন সময়ে সে কিছুতেই রোযা রাখতে পারবে না এবং দুধপান করানো কালীনসময়েও রোযা না রাখতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে— শারীরিকভাবে সে দুর্বল হওয়ার কারণে এবং গর্ভস্থ ফ্রুণের ওপর আশংকা থাকার কারণে । তাই সে এ দিনগুলোর রোযারাখতে পারবে না । এ দিনগুলোর রোযার জন্য তার কি করণীয়? এবং সে যদি আগামীরমযানের রোযাগুলো পরবর্তী রমযান আসার আগে না রাখতে পারে সেক্ষেত্রেও তারকরণীয় কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

যেব্যক্তি শরিয়ত স্বীকৃত কোন ওজরের কারণে রমযানের রোযা ভেঙ্গেছে আল্লাহ্‌তাকে পরবর্তী রমযান আসার আগ পর্যন্ত রমযানের রোযা কাযা পালন করার সুযোগদিয়েছেন। তবে, বিলম্ব করার এ সুযোগ পেয়ে কেউ যেন কাযা পালনকে মূলতবি করারপ্রতি প্ররোচিত না হয়। কেননা হতে পারে এমন কোন প্রয়োজন বা এমন কোন পরিবর্তনঘটবে যার ফলে তার পক্ষে কাযা পালন করা কঠিন হয়ে যাবে কিংবা সে পালন করতেপারবে না। বিশেষতঃ নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভধারণ, হায়েযগ্রস্ত হওয়া ওনিফাসগ্রস্ত হওয়ার বিষয় রয়েছে।

যদি কেউ কোন ওজর ছাড়া কাযা পালনে বিলম্ব করতেকরতে সময় সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে শাবান মাস শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সেকাযা রোযা পালন করতে না করে: তাহলে সে গুনাহগার হবে। আর যদি তার কোন ওজরথাকে তাহলে তার গুনাহ হবে না। উভয় অবস্থাতেই দ্বিতীয় রমযানের পরে কাযা পালনকরা তার ওপর আবশ্যিক হবে। কোন কোন আলেম কাযা পালন করার সাথে প্রতিদিনেরবদলে একজন করে মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজিব বলেছেন। যদি তার সাথে থাকে এবং সেতা করে তাহলে সেটাই হচ্ছে অধিক নিরাপদ। নচেৎ শুধু কাযা রোযা পালন করলেইচলবে।

আরও জানতে দেখুন:[26865](#) নং ও[21710](#) নং প্রশ্নোত্তর।

শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল-উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

যে ব্যক্তি কাযা রোযা পালনে এত বিলম্ব করেছে যে, পরবর্তী রমযান চলে এসেছে তার হুকুম কী?

জবাবে তিনি বলেন: আলেমদের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ীএক রমযানের কাযা রোযা পালনে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয নয়। কেননা আয়েশা (রাঃ) বলেছেন: “আমার ওপর রমযানের কাযা রোযা থাকত যেগুলো আমিশাবান মাসে ছাড়া পালন করতে পারতাম না।” এটি প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় রমযানেরপরে পালন করার কোন ছাড় নেই। যদি কোন ওজর ছাড়া এমনটি করে তাহলে সে গুনাহগারহবে এবং তার উপর ওয়াজিব হল দ্বিতীয় রমযানের পর অবিলম্বে কাযা রোযা পালনকরা। তার ওপর মিসকীন খাওয়ানো কি আবশ্যিক হবে; নাকি হবে না— এ ব্যাপারেআলেমগণ মতভেদ করেছেন। সঠিক কথা হল: তার ওপর মিসকীন খাওয়ানো আবশ্যিক হবে না। কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: “আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবেঅথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।” [সূরা বাকারা, ২:১৮৫]

আল্লাহ্‌ তাআলা এখানে কাযা পালন ছাড়া অন্য কিছু ওয়াজিব করেনি। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বিন উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৫৭)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয় যে,

এক নারী গত বছর রমযান মাসে কিছু রোযা ভেঙ্গেছে। অতঃপর শাবান মাসের শেষদিকে রোযাগুলোর কাযা পালন শুরু করেছে। এরমধ্যে তারহায়েয শুরু হয়ে গেছে এবং এ বছরের রমযান মাসও শুরু হয়ে গেছে। অথচ তার একটিরোযা কাযা পালন রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তার উপর কী কর্তব্য?

জবাবে তিনি বলেন: সে নারী এ বছরের রমযানের আগেযে রোযাটির কাযা পালন করতে পারেনি তার ওপর সে রোযাটির কাযা পালন করাওয়াজিব। এ বছরের রমযান মাস শেষ হলে গত বছরের যে রোযা তার ছুটে গেছে সেটারকাযা পালন করবে। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বিন উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৫৮)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞেস করা হয় যে,

এক নারী নিফাসের কারণে রমযানের রোযা ভেঙ্গেছেএবং দুধ পান করানোর কারণে কাযাও পালন করতে পারেনি। এরমধ্যে দ্বিতীয় রমযানশুরু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তার উপর কী ওয়াজিব?

জবাবে তিনি বলেন: এ নারীর ওপর ওয়াজিব হল যেদিনগুলোতে সে রোযা ভেঙ্গেছে সেগুলোর বদলে রোযা রাখা। এমনকি সেটা যদি দ্বিতীয় রমযানের পরে হয় তবুও। কেননা সে বিশেষ ওজরের কারণে প্রথম রমযান ও দ্বিতীয় রমযানের মাঝে কাযা পালন করতে পারেনি। কিন্তু যদি শীতকালে কাযা পালনকরা তার জন্য কষ্টকর না হয়, সেটা একদিন বাদ দিয়ে একদিন হলেও— তাহলে সেটাই তার উপর অনিবার্য। এমনকি সে যদি দুধ পান করায় তবুও। তার উচিত রমযানের যেরোযাগুলো ছুটে গেছে দ্বিতীয় রমযান আসার আগেই সেগুলোর কাযা পালন করা। যদি সেনা পারে তাহলে দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করলেও কোন অসুবিধানেই [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বিন উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৬০)]

সারকথা হল: এ দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা আপনার স্ত্রীর দায়িত্বে থাকা ঋণ। যখনই তার সক্ষমতা হবে তখনই সেগুলোর কাযাপালন করা অনিবার্য।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

আমার মা মারা গেছেন। তিনি জীবিত থাকতে আমাকে বলেগেছেন যে, তার উপর দুই বছরের রমজান মাসের রোযা কাযা করা বাকি আছে। যখন রমজানমাস এসেছিল তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি কাযা পালনকরে যেতে পারেননি। আমি কি তার পক্ষে রোযা আদায় করব, নাকি মিসকীন খাওয়াব? এই মিসকীন খাওয়ানোর পদ্ধতিটা কি? আমি কি একটি ছাগল জবাই করে সেই গোস্ত ৬০টি বাড়িতে বন্টন করে দিব, নাকি সেই খাবারের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ দানকরে দিব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বেশি ভাল হয় যদি আপনি আপনার মায়ের পক্ষ থেকে রোযা পালন করতে পারেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَوَلِيُّهُ

متفق على صحته

“ যে ব্যক্তি তার জিম্মায়রোযা পালন বাকি রেখে মারা গেছেন, তার পক্ষ থেকে তার ওলি (আত্মীয়-পরিজন) রোযা পালন করবে।” [বুখারী ও মুসলিম]

ওলি হচ্ছে- আত্মীয় স্বজন। যদি আপনার পক্ষে অথবা আপনি ছাড়া আপনার মায়ের অন্য কোন আত্মীয়ের পক্ষে রোযা পালন সম্ভবপর না হয়, তবে আপনি আপনার মায়ের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে অথবা আপনার সম্পদ থেকে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবেন। এর পরিমাণ হল- অর্থ স্বা' পরিমাণ স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য। আর যদি আপনি হিসেব করে সব খাবার জমা করে একজন ফকিরকে দিয়ে দেন তাহলেও জায়েয হবে।

আর আল্লাহুই তাওফিকদাতা। আল্লাহু আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর সালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন। “সমাণ্ড

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, শাইখ আব্দুর রায়যাক আফিফি, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন গুদাইয়ান।

প্রশ্ন :

যদি কোন মুসলিমের অনাদায়কৃত সালাত ও সিয়ামের সংখ্যা মনে না থাকে, তবে তিনি কিভাবে নামাজ ও রোযার কাযা করবেন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

অনাদায়কৃত সালাতের ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে :

প্রথম অবস্থা :

ঘুম বা ভুলে যাওয়ার মত শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে সালাত ছুটে যাওয়া । এ অবস্থায় তার উপরছুটে যাওয়া নামাযকাযা করা ওয়াজিব । এর দলীল হচ্ছে নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর বাণী: “যেব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে গেছে অথবা সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে ছিল, এরকাফফারা হচ্ছে- সে যখনই তা মনে করবেতখনই সালাত আদায় করে নিবে ।” [হাদিসটি ইমাম বুখারী (৫৭২)ও মুসলিম (৬৮৪)বর্ণনা করেছেন । হাদিসটির ভাষা ইমাম মুসলিমের]

মাযগুলো যে ধারাবাহিকতায় তার উপর ওয়াজিবছিল সে ধারাবাহিকতায় তিনি কাযাকরবেন । প্রথম নামাযটি প্রথমে আদায় করবেন । এর দলীল জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর হাদিস- “উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহুআনহু) খন্দকের যুদ্ধের দিনসূর্যাস্তের পর এসে কুরাইশ কাফিরদের গালি দিতে দিতে বললেন: “ইয়ারাসুলুল্লাহ, আমি আসরের সালাত আদায় করতে করতে সূর্য তো ডুবেই যাচ্ছিল!” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “আল্লাহর শপথ,আমিতো এখনো আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি ।” তারপর আমরা উঠে বৃত্তহান নামক উপত্যকায় গেলাম ।সেখানে তিনি সালাতের জন্য ওজুকরলেন । আমরাও সালাতের জন্য ওজু করলাম ।তিনি যখন আসরের সালাত পড়ালেন তখন সূর্য ডুবে গেছে ।আসরের পর তিনি মাগরিবের সালাত পড়ালেন ।” [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী (৫৭১)ও মুসলিম (৬৩১)]

দ্বিতীয় অবস্থা:

এমন ওজরের কারণে সালাত ছুটে যাওয়াযে সময় ব্যক্তির কোন হুঁশ থাকেনা ।যেমন-অজ্ঞান হওয়া । এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তিকে সালাতের বিধান থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় । তাই তাকে উক্ত সালাতেরকাযা করতে হয় না ।

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলেমগণকে কোন এক ব্যক্তি কর্তৃকপ্রশ্ন করা হয়েছিল: আমি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলাম । এর ফলে তিনমাস হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ছিলাম । এসময়ে আমার হুঁশ ছিল না । এ পুরো সময়েআমি কোন সালাত আদায় করিনি ।আমি কি এ সালাতগুলো কাযা করা থেকে অব্যাহতি পাব? নাকি আমাকে এ সালাতগুলো কাযা করতে হবে?

তাঁরা উত্তরে বলেন: “উল্লেখিত সময়ের সালাত কাযা করা থেকে আপনি অব্যাহতি পাবেন । কারণ তখন তো আপনার কোন হুঁশ ছিল না ।” [উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

তাঁদেরকে আরো প্রশ্ন করা হয়েছিল: যদি কেউ এক মাস অজ্ঞান অবস্থায় থাকেএবং এ পুরো সময়টাতোকোন সালাত আদায় না করে,তবে ইনিছুটে যাওয়া সালাত কিপদ্ধতিতে আদায় করবেন?

তাঁরা উত্তরে বলেন: “ এ সময়ে যে সালাতসমূহ বাদ গিয়েছে তা কাযা করতে হবেনা । কারণ উল্লেখিত অবস্থায় তিনি বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির হুকুমের মধ্যেপড়েন ।বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির উপর থেকে তো (শরিয়ি বিধান আরোপের) কলম উঠিয়ে নেয়াহয়েছে ।” [উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

[গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র(৬/২১)]

তৃতীয় অবস্থা:

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওজর ছাড়া সালাত ত্যাগ করা, আর তা কেবল দুই ক্ষেত্রেই হতে পারে:

এক:

সে যদি সালাতকে অস্বীকার করে, সালাত ফরজ হওয়াকে মেনে না নেয় তবে সে লোক কাফের- এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কারণ সে ইসলামের ভিতরে নেই। তাকে আগেই ইসলামে প্রবেশ করতে হবে, এরপর ইসলামের আরকান ও ওয়াজিব সমূহ পালন করতে হবে। আরকাফের থাকা অবস্থায় সে যে সালাতগুলো ত্যাগ করেছে সেগুলোর কাফা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয়।

দুই:

সে যদি অবহেলা বা অলসতাবশত সালাত ত্যাগ করে, তবে তার কাফা আদায় শুদ্ধ হবে না। কারণ সে যখন সালাত ত্যাগ করেছিল তখন তার কোন গ্রহণযোগ্য ওজর ছিল না। আল্লাহ তো সুনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করাকে তার উপর ফরজ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

“ নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মু'মিনদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।” [সূরানিসা, ৪:১০৩] অর্থাৎ নামাযের সুনির্দিষ্ট সময় আছে। আরেকটি দলীল হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: “ যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করবে যা আমাদের শরিয়তভুক্ত নয়- তবে তা প্রত্যাখ্যাত।” [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী (২৬৯৭) ও মুসলিম (১৭১৮)]

শাইখ আব্দুলআযীয ইবনে বায (রাহিমাহুল্লাহ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: আমি ২৪ বছর বয়সের আগে সালাত আদায় করিনি। এখন আমি প্রতি ফরজ সালাতের সাথে আরেকবার ফরজ সালাত আদায় করি। আমার জন্য কি তা করা জায়েয? আমি কি এভাবেই চালিয়ে যাব নাকি আমার উপর অন্য কোন করণীয় আছে?

তিনি বলেন:

“ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করে, সঠিক মতানুসারে তার উপর কোন কাফা নেই। বরং তাকে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে। কারণ সালাত ইসলামের একটি রুকন বা স্তম্ভ। সালাত ত্যাগ করা ভয়াবহ অপরাধসমূহের একটি। বরং ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করা 'বড় কুফর'-আলেমগণের দুইটি মতের মধ্যে এ মতটি অধিক বিশুদ্ধ। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: “ আমাদের ও তাদের (বিধর্মীদের) মাঝে পার্থক্য হলো সালাত। তাই যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করল সে কুফরিকরলো।” [ইমাম আহমাদ ও সুন্নের সংকলকগণ সহীহ সনদে বুয়াইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন]

এবং তিনি আরো বলেছেন: “ কোন ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরে পতিত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা।” [হাদিসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আরও অনেক হাদিস রয়েছে যাতে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।]

প্রিয় ভাই, এক্ষেত্রে আপনার উপর ওয়াজিব হলো আল্লাহর নিকট সত্যিকার অর্থে তওবা করা। আর তা হলো-(১) পূর্বে যা গত হয়েছে তার জন্য অনুতাপ হওয়া (২) সালাত ত্যাগ একেবারে ছেড়ে দেয়া এবং (৩) এ মর্মে দৃঢ় সংকল্প করা যে, এ কাজে আপনি আর কখনও ফিরে যাবেন না। আর আপনাকে প্রতি সালাতের সাথে বা অন্য সালাতের সাথে কাফা আদায় করতে হবে না। বরং আপনাকে শুধু তওবা করতে হবে। সকল প্রশংসা আল্লাহ'র জন্য। যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: “ হে মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তওবাকরো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” [২৮ আন-নূর:৩১]

আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেন: “ পাপ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার মূলতঃই কোন পাপ নেই।”

তাই আপনাকে সত্যিকার অর্থে তওবা করতে হবে। নিজের নফসের সাথে হিসাব-নিকাশ করতে হবে। সঠিক সময়ে জামাতের সাথে সালাত আদায়ের ব্যাপারে সদা-সচেতন থাকতে হবে। আপনার দ্বারা যা যা হয়ে গেছে - সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে এবং বেশি বেশি ভাল কাজ করতে হবে। আর আপনাকে কল্যাণের সুসংবাদ জানাই, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: “ আর যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং হিদায়েতের পথ অবলম্বন করে, নিশ্চয়ই আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল।” [সূরা ত্বাহা, ২০:৮২]

সূরা আল-ফুরকান এ শিরক, হত্যা, জিনা (ব্যভিচার) উল্লেখ করার পরআল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যে তা করল সে পাপ করল। কিয়ামাতের দিন তার শাস্তিদিগুণ করে দেয়া হবে এবং সে সেখানে অপমানিত অবস্থায় চিরকাল অবস্থান করবে। তবে ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে; আল্লাহতাদের খারাপ কাজসমূহকে ভাল কাজে পরিবর্তন করে দিবেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাক্ষমশীল, পরম দয়াময়।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ২৫:৬৯-৭০]

আমরা আল্লাহ’র কাছেপ্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে ও আপনাকে তাওফিকদান করেন, বিশুদ্ধ তওবা নসীব করেন ও সৎ পথেঅবিচলরাখেন।” [মাজমূফাৎওয়া শাইখবিন বায(১০/৩২৯,৩৩০)]

দ্বিতীয়ত:

রোজা কাযা করার প্রসঙ্গে:

আপনি যে সময় নামায পড়তেন না সে সময় যদি আপনি রোজাও না রেখে থাকেন তাহলেসেসব দিনের রোজার কাযা আদায় করা আপনার উপর ওয়াজিব নয়। কারণ নামায পরিত্যাগকারী কাফের, অর্থাৎ মুসলিম মিল্লাত হতে বহিষ্কারকারী বড় কুফরেলিগু। যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কোন কাফের যদি ইসলাম গ্রহণকরে তাহলে কুফরি অবস্থায় সে যে ইবাদতগুলো ত্যাগ করেছে সেগুলোর কাযা করা তারজন্য বাধ্যতামূলক নয়।

আর যদি আপনার রোজা না রাখাটা যে সময় নামায পড়া শুরু করেছেন সে সময়েহয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে সম্ভাব্য শুধু দুটো অবস্থা হতে পারে:

এক:

আপনি রাত হতে রোজার নিয়ত করেননি। বরং রোযা না রাখারসংকল্প ছিল। এক্ষেত্রে আপনার এ রোজার কাযা আদায় শুদ্ধ হবে না। কারণ আপনি কোন গ্রহণযোগ্য ওজর ছাড়া শরিয়ত নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করণীয় ইবাদত ত্যাগ করেছেন।

দুই:

আপনি রোজা শুরু করার পর তা ভেঙ্গে ফেলেছেন। এক্ষেত্রে আপনার উপর কাযাআদায়করা ওয়াজিব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামযখন রমজান মাসে দিনেরবেলায় যৌনমিলনকারী ব্যক্তিকে কাফফারা আদায় করার আদেশ দিলেনতখন বললেন: “আপনিসে দিনের পরিবর্তে একদিন রোযা পালন করুন।” [এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেনআবু-দাউদ (২৩৯৩), ইবনে মাজাহ (১৬৭১) এবং আলবানী “ইরওয়াউল গালীল” (৯৪০)এহাদিসটিকে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন]

একবার শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহকে রমজান মাসে দিনের বেলায়কোন ওজরছাড়া রোযা ভঙ্গ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল।

উত্তরে তিনি বলেন:

“রমজান মাসে দিনের বেলা কোন ওজর ছাড়া রোযা ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ। এরদ্বারা সে ব্যক্তি ফাসিকহয়ে যাবে। তার উপর আবশ্যকীয় হচ্ছে- আল্লাহর কাছেতওবা করে নেয়া, যেদিনের রোযা ভঙ্গ করেছিল সেইদিনের রোযার কাযা আদায় করাঅর্থাৎসে যদিরোযারাখার পর দিনের মাঝখানে কোনো ওজর ছাড়া রোযা ভঙ্গ করে থাকেসেদিনের রোযার কাযা আদায় করতে হবে। যেহেতু সে রোযা শুরু করেছিলএবংরোযারাখার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল এবং তা ফরজএই বিশ্বাসে তাতে প্রবেশ করেছে। তাই তার উপর এর কাযাআদায় করা বাধ্যতামূলক মান্তেরন্যায়।

আর যদি কোন ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে শুরু থেকেইরোযা না রাখে তবে অগ্রগণ্যমতানুসারে তাকে এ রোযার কাযা আদায় করতে হবে না। কারণ সে এর দ্বারা কোনউপকার পাবে না। যেহেতু এ আমল তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না। এক্ষেত্রেমূলনীতিটি হলো- সকল ইবাদত যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত, তা কোন ওজরছাড়া সেই নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব পালন করা হলে, তা তার থেকে কবুল করা হবে না। এর দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তিএমন কোন কাজ করল যা আমাদের শরিয়তের

অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।” কেননা এটি আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করার মধ্যে পড়ে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা জুলুম (অবিচার)। আর জালিম ব্যক্তির কাছ থেকে সেই জুলুম কবুল করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: “আর যারা আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারা হলো জালিম।” [সূরা বাক্বারাহ, ২:২২৯]

আর এটি এজন্য যে, সে ব্যক্তি যদি এই ইবাদত নির্ধারিত সময় হবার পূর্বেই পালন করতো তবে তা তার কাছ থেকে কবুল করা হত না। একইভাবে যদি তা সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরে পালন করে তবে তাও তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না। তবে যদি সে ওজরগ্রস্ত হয় সেটা ভিন্ন কথা।” সমাপ্ত। [মাজমু' ফাৎওয়া আশ-শাইখ ইবনে 'উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ৪৫)]

আর তার উপর ওয়াজিব হলো সকল পাপ কাজ থেকে আল্লাহর কাছে সত্যিকার তওবাকরা (উপরে উল্লেখিত বিন বাযের ফাৎওয়ায় তওবার তিনটি শর্তসহ) ওয়াজিব কাজসমূহ সময়মত পালন অব্যাহত রাখা, খারাপ কাজ ত্যাগ করা, বেশি বেশি নফল ও নৈকট্য লাভ হয় এমন কাজ করা।

আর আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

প্রশ্ন

শাওয়াল মাসের যে কয়দিন বাকী আছে সেদিনগুলো যদি রমজানের কাযা রোজা ও শাওয়ালের ছয় রোজা রাখার জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে কি কাযা রোজার আগে ছয় রোজা রাখা জায়েয হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সঠিক মতানুযায়ী শাওয়ালের ছয় রোজা রমজানের রোজা পূর্ণ করার সাথে সম্পৃক্ত। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

رواه مسلم

“যে ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা রাখল অতঃপর এ রোজার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখল সে যেন গোটা বছর রোজা রাখল।” [সহিহ মুসলিম (১১৬৪)]

হাদিসে উল্লেখিত **عَطَفَ** শব্দটি **التَّرْتِيبُ** (বিন্যাস) ও **التَّعْقِيبُ** (ক্রমধারা) অর্থে ব্যবহৃত হয়। এদিক থেকে হাদিসটি প্রমাণ করছে যে, আগে রমজানের রোজা পূর্ণ করতে হবে। সেটা সুনির্দিষ্ট সময়ে আদায় হিসেবে হোক অথবা (শাওয়ালমাসে) কাযাপালন হিসেবে হোক। অর্থাৎ রমজানের রোজা পূর্ণ করার পর শাওয়ালের ছয়রোজা রাখতে হবে। তাহলে হাদিসে উল্লেখিত সওয়াব পাওয়া যাবে। কারণ যে ব্যক্তির উপর রমজানের কাযা রোজা বাকী আছে সেতো পূর্ণ রমজান মাস রোজা রাখেনি। রমজান মাসের কিছুদিন রোজা রেখেছে। তবে কারো যদি এমন কোন ওজর থাকে যার ফলে তিনি শাওয়াল মাসে রমজানের কাযা রোজা রাখতে গিয়ে শাওয়ালের ছয়রোজা রাখতে পারেননি। যেমন কোন নারী যদি নিফাসগ্রস্ত (প্রসবোত্তর স্রাবগ্রস্ত) হন এবং গোটা শাওয়াল মাস তিনি রমজানের রোজা কাযা করেন তাহলে তিনি জিলক্বদ মাসে শাওয়ালের ছয় রোজা রাখতে পারবেন। কারণ এ ব্যক্তির ওজর শরিয়তে গ্রহণযোগ্য। অন্য যাদের এমন কোন ওজর আছে তারা সকলে রমজানের রোজা কাযা করার পর শাওয়ালের ছয় রোজা জিলক্বদ মাসে কাযা পালন করতে পারবেন। কিন্তু কোন ওজর ছাড়া কেউ যদি ছয় রোজানা রাখে এবং শাওয়াল মাস শেষ হয়ে যায় তাহলে সে ব্যক্তি এই সওয়াব পাবেন না। শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: কোন নারীর উপর যদি রমজানের রোজার ঋণ থেকে যায় তাহলে তার জন্য কি রমজানের ঋণের আগে শাওয়ালের ছয় রোজা রাখা জায়েয হবে; নাকি শাওয়ালের ছয়রোজার আগে রমজানের ঋণের রোজা রাখতে হবে? জবাবে তিনি বলেন: যদি কোন নারীর উপর রমজানের কাযা রোজা থাকে তাহলে তিনি কাযা রোজাপালনের আগে ছয়রোজা রাখবেন না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِنًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

رواه مسلم

“যে ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা রাখল এবং এ রোজার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখল সে যেন গোটা বছর রোজা রাখল।”
[সহিহ মুসলিম (১১৬৪)]

যার উপর কাযা রয়েছে সেতো রমজানের রোজা পূর্ণ করেনি। সুতরাং সে কাযাআদায়ের আগে এই রোজা পালনের সওয়াব পাবে না। যদি ধরে নেয়া হয় যে, কাযা রোজাপালন করতে গোটা মাস লেগে যাবে(যেমন-কোন নারী যদি নিফাসগ্রস্ত হন এবং তিনিগোটা রমজানে একদিনও রোজা রাখতে না পারেন, শাওয়াল মাসে তিনি রমজানের কাযারোজা রাখা শুরু করেন, কিন্তু কাযা রোজা শেষ করতে করতে জিলক্বদ মাস শুরু হয়েযায়) তাহলে তিনিজিলক্বদ মাসে ছয়রোজা রাখবেন।এতে করে তিনি শাওয়াল মাসে ছয়রোজা রাখার সওয়াব পাবেন। কেননা তিনি বাধ্য হয়ে এই বিলম্ব করেছেন (যেহেতুশাওয়াল মাসে তার পক্ষে রোজা রাখা সম্ভবপর ছিল না)। তাই তিনি সওয়াবপাবেন।[ফতোয়া সমগ্র ১৯/২০] দেখুন ফতোয়া নং-[4082](#)ও[7863](#)।

এর সাথে আরেকটু যোগ করে বলা যায়, যে ব্যক্তি বিশেষ কোন ওজরের কারণে রমজানের রোজা ভেঙ্গেছে সেটা কাযা করা তার দায়িত্বেফরজ। রমজানের রোজাইসলামের পঞ্চবুনিয়াদের অন্যতম। তাই এই ইবাদত পালনপ্রাধান্য পাবে এবং ফরজেরদায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়াকে অন্য মুস্তাহাব আমলের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে।দেখুন প্রশ্ন নং-[23429](#)।

প্রশ্ন

শাওয়ালের ছয় দিনের রোযা ও হায়েযজনিত কারণে রমজানের ভঙ্গ হওয়া দিনগুলোর কাযা রোযা এক নিয়তে পালন করা কি জায়েয হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

না, তা শুদ্ধ নয়। কারণ রমজানের না-রাখা রোযার কাযা পালন সম্পূর্ণ শেষ না করা পর্যন্ত শাওয়ালের ছয় রোযা রাখা যাবে না।

শাইখ ইবনে উছাইমীন ‘ফাতাওয়াস্ সিয়াম’ (৪৩৮) এ বলেছেন:

“যে ব্যক্তি আরাফাতের দিন অথবা আশুরার দিনে রোযা পালন করে এবং তার উপররমজানের কাযা রোযা অনাদায় থাকে তবে তার রোযা রাখাটা সহিহ। তবে তিনি যদি এইরোযার মাধ্যমে রমজানের কাযা রোযা পালনেরও নিয়ত করেন তবে তার দুটি সওয়াবহবে। আরাফাতের দিন অথবা আশুরার দিন রোযা পালনের সওয়াব ও কাযা রোযা আদায়েরসওয়াব। এটি সাধারণ নফল রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রমজানের রোযার সাথে যে নফলরোযার কোন সম্পর্ক নেই। তবে শাওয়ালের ছয় রোযা রমজানের সাথে সম্পৃক্ত। সরোযা রমজানের কাযা রোযা আদায়ের পরেই রাখতে হবে। তাই যদি কেউ কাযা আদায়েরআগে তা পালন করে তবে তিনি এর সওয়াব পাবেন না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহুআলাইহিস সালাম বলেছেন :

من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر

“যে ব্যক্তি রমজান মাসে রোযা পালন করল, সে রোযার পর শাওয়াল মাসেও ছয়দিন রোযা পালন করল, সে যেন গোটা বছর রোযা রাখল।”

আর এটি জানা বিষয় যে, যার উপর কাযা রোযা রয়ে গেছে সে রমজান মাসে রোযাপালন করেছে বলে ধরা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার কাযা রোযা আদায়সম্পূর্ণ করে।" সমাপ্ত।

প্রশ্ন

ঈদের দ্বিতীয় দিন কিংবা তৃতীয় দিন কাযা রোযা রাখা কি জায়েয আছে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।।

ঈদুল ফিতর শুধু একদিন। সেদিনটি হলো- শাওয়াল মাসের প্রথম দিন। পক্ষান্তরে, মানুষের মাঝে যে ধারণাব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, 'ঈদুল ফিতর তিনদিন' এটি শুধুমাত্র সামাজিক প্রথা ছাড়া আর কিছু নয়; এর উপরে কোন শরয়ি হুকুম বর্তায় না।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন:

"ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা শীর্ষক পরিচ্ছেদ"

এরপর তিনি আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন (হাদিস নং-১৯৯২) যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন ও ঈদুলআযহার দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

এ দলিলের ভিত্তিতে ঈদুল ফিতর শুধু একদিন মাত্র; যেদিন রোযা রাখা হারাম। তাই শাওয়াল মাসের দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিন রোযা রাখা হারাম নয়। তাই সে দুটিদিনে রমযানের কাযা রোযা রাখা কিংবা নফল রোযা রাখা জায়েয।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

আমি (জৈনিক নারী) কোন এক বছরের যে দিনগুলোতে আমার মাসিক পিরিয়ড ছিল সে দিনগুলোতে রোযা রাখিনি। এখন পর্যন্ত আমি সে রোযাগুলো রাখতে পারিনি; ইতিমধ্যে অনেক বছর গত হয়ে গেছে। রোযার যে ঋণ আমার দায়িত্বে আছে আমিসেগুলোর কাযা পালন করতে চাই। কিন্তু আমি জানি না যে, কয়দিনের রোযা আমার ঘিম্মাতে রয়েছে। এখন আমি কী করতে পারি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। অতপরঃ

আপনার উপর তিনটি বিষয় ওয়াজিব:

এক.

এ বিলম্ব করা থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং ইতিপূর্বে যে কসুরঘটেছে সেটার জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে পুনরায় এমন কিছুতে লিপ্ত নাহওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে মুমিনরা তোমরা সকল গুনাহ থেকে তাওবা কর; যাতে করে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।" [সূরা নূর, আয়াত: ৩১] আপনি যে বিলম্ব করেছেন এটি গুনাহ। সুতরাং এ গুনাহ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব।

দুই.

অনুমানিক সংখ্যক রোযা অবিলম্বে সম্পন্ন করা। যেহেতু আল্লাহ্ কাউকে তারসাথ্যের বাইরে দায়িত্বারোপ করেন না। তাই আপনার ধারণায় যে কয়দিনের রোযা আপনি রাখেননি সে কয়দিনের রোযা কাযা পালন করুন। যদি ধারণা হয় যে, দশদিনের রোযাতাহলে দশদিন রোযা রাখুন। যদি ধারণা হয় এর চেয়ে বেশি কিংবা কম তাহলে আপনার ধারণা মোতাবেক রোযাগুলো পালন করুন। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "আল্লাহ্কাউকে তার সাথ্যের বাইরে দায়িত্বারোপ করেন না।" [সূরা বাক্বারা, ২:২৮৬] এবং তাঁর বাণী: "তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় কর" [সূরা তাগাবুন, ৬৪: ১৬]

তিন.

যদি আপনার সামর্থ্য থাকে তাহলে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনের খাদ্য দান করুন। সবদিনের খাদ্য একজন মিসকীনকে দিলেও চলবে। আর যদি আপনি গরীব হন এবং খাদ্য দান করতে না পারেন; তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার উপর রোযা রাখা ও তাওবাকরা ছাড়া অন্য কিছু আবশ্যিক হবে না। সামর্থ্যবানকে খাদ্য দিতে হবে প্রতিদিনের বদলে স্থানীয় খাদ্যদ্রব্যের অর্ধ'সা'। এর পরিমাণ হচ্ছে- দেড়কিলো। আল্লাহ্ই তাওফিকদাতা।

প্রশ্ন

আমি যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে রোযা রেখেছি। নিয়ত করেছি যে, রমযানের কাযাকৃত রোযাগুলোর একটি রোযার। আমি যে, কাযা রোযার নিয়ত করেছি এতেকরে কি এটি আরাফার রোযা হিসেবে যথেষ্ট হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।।

আপনি যদি আরাফার দিনের রোযাটাকে রমযানের কাযা রোযার নিয়তে রাখেন তাহলে সেটা জায়েয হবে।

আল্লাহ্ তাওফিক দিন। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাথীবর্গের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তিবর্ষিত হোক [সমাণ্ড]

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন গাদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন কুয়ূদ [ফাতাওয়াল লাজনাদদায়িমাহ (১০/২৪৬, ২৪৭)]

প্রশ্ন

ঈদের দিনের পর থেকে শাওয়ালের যে ছয় রোযা রাখা হয় কোননারী হায়েযের কারণে রমযানের যে রোযাগুলো তার ছুটে গেছে সেগুলো কি আগে শুরু করবে, এরপর ছয় রোযা রাখবে; নাকি কিভাবে করবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস " যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখল এরপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখল সে যেন গোটা বছর রোযা রাখল।" [সহিহ মুসলিম (১৯৮৪)-এ উদ্ধৃত সওয়াবযদি তিনি পেতে চান তাহলে তার উচিত হবে প্রথমে রমযানের রোযাগুলো পূর্ণ করা। এরপর শাওয়ালের ছয় রোযা রাখা; যাতে করে তার উপর হাদিসের বাণী প্রযোজ্য হয় এবং উল্লেখিত সওয়াব পেতে পারে।

কিন্তু, যদি বৈধতার দিক দেখা হয় তাহলে কাযা রোযাগুলো পালন করার ক্ষেত্রে পরবর্তী রমযান প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করা তার জন্য জায়েয।

প্রশ্ন

যদি কেউ কোন ওজর ছাড়া রমযানের রোযা না-রেখে থাকে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙ্গে থাকে যে দিনগুলোর রোযা সে ভঙ্গ করেছে সে দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর কি ফরয?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানের রোযা পালন ইসলামের অন্যতম একটি রুকন (মূল স্তম্ভ)। কোন মুসলিমের জন্য ওজর ছাড়া রমযানের রোযাত্যাগ করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি শরিয়ত অনুমোদিত কোন ওজরের কারণে (যেমন-অসুস্থ থাকা, সফরে থাকা, ঋতুগ্ৰস্ত হওয়া) রমযানের রোযা বাদ দিয়েছে কিংবা ভঙ্গ করেছে; যে রোযাগুলো সে ভেঙ্গেছে সে রোযাগুলোর কাযা পালন করা আলেমগণের ইজমার ভিত্তিতে তার উপর ফরয। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে রমযানের রোযা বর্জন করেছে, সেটা একটি মাত্র রোযার ক্ষেত্রে হলেও (যেমন সে রোযার নিয়তই করেনি কিংবা কোন ওজর ছাড়া রোযা শুরু করে ভেঙ্গে ফেলেছে) সে কবিরা গুনাতে (মহাপাপে) লিপ্ত হয়েছে। তার উপর তওবা করা ফরয।

অধিকাংশ আলেমের মতে, সে যে দিনগুলোর রোযা ভেঙ্গেছে সে দিনগুলোর রোযাকাযা পালন করা তার উপর ফরয। বরং কেউ কেউ এই মর্মে ইজমা উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আব্দুল বার বলেন: “গোটা উম্মত ইজমা করেছেন এবং সকলে উদ্ধৃত করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা পালন করেনি, কিন্তু সে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার প্রতি বিশ্বাসী, সে অবহেলা করে, অহংকারবশতঃ রোযা রাখেনি, ইচ্ছা করেই তা করেছে, অতঃপর তওবা করেছে: তার উপর রোযার কাযা পালন করা ফরয।” [আল-ইযতিযকার (১/৭৭) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি বলেন:

“আমরা এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ জানি না। কেননা রোযা তার দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং রোযা পালন করা ছাড়া তার দায়িত্ব মুক্ত হবে না। বরং যেভাবে ছিল সেভাবে তার দায়িত্ব থেকে যাবে।” [আল-মুগনি (৪/৩৬৫)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৪৩) এসেছে:

যে ব্যক্তি রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে রোযা ত্যাগ করে সে ব্যক্তিসর্বসম্মতিক্রমে (ইজমার ভিত্তিতে) কাফের। আর যে ব্যক্তি অলসতা করে, কিংবা অবহেলা করে রোযা ছেড়ে দেয় সে কাফের হবে না। কিন্তু, সে ইসলামের সর্বজনস্বীকৃত (ইজমা সংঘটিত) একটি রুকন ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে মহা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। নেতৃবর্গের কাছ থেকে সে শাস্তি ও সাজা পাওয়ার উপযুক্ত; যাতে সে এবং তার মত অন্যেরা এর থেকে নিবৃত্ত হয়। বরং কিছু কিছু আলেমের মতে, সেও কাফের। সে যে রোযাগুলো ভঙ্গ করেছে সেগুলোর কাযা পালন করা ও আল্লাহর কাছে তওবা করা তার উপর ফরয। [সমাপ্ত]

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: শরিয়ত অনুমোদিত কোন ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখে না তার হুকুম কী? তার বয়স প্রায় সতের বছর। তার কোন ওজর নেই। তার কি করা উচিত? তার উপর কি কাযা পালন করা ফরয?

জবাবে তিনি বলেন: হ্যাঁ, তার উপর কাযা পালন করা এবং তার অবহেলা ও বাড়াবাড়ির জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করা ফরয।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সংক্রান্ত যে হাদিসটি বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি কোন (শরয়ী) ছাড়া ব্যতীত কিংবা রোগ ব্যতীত রমযানমাসের কোন একদিনের রোযা ভাঙ্গে সে সারা বছর রোযা রাখলেও কাযা পালন হবে না।” সে হাদিসটি দুর্বল, মুযতারিব, আলেমদের নিকট এটি সহিহ হাদিস নয়। [নূরুন আলাদদারব ফতোয়াসমগ্র (১৬/২০১) থেকে সমাণ্ড]

কিছু কিছু আলেমের মতে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোযা রাখেনি তার উপর কাযা পালন নেই। বরং সে বেশি বেশি নফল রোযা রাখবে। এটি জাহেরিমতাবলম্বীদের মায়হাব। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও শাইখ উছাইমীন এ অভিমতটি পছন্দ করেছেন।

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি বলেন:

জাহেরি মতাবলম্বীদের অভিমত কিংবা তাদের অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে-ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারীর উপর কাযা নেই। শাফেয়ীর ছাত্র আব্দুর রহমান থেকে, শাফেয়ীর মেযের ছেলে থেকেও এমন অভিমত বর্ণিত আছে। ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা-নামায ত্যাগকারীর ক্ষেত্রে এটি আবু বকর আল-ছুমাঈদিরও উক্তি: ‘কাযাপালন করলে দায়িত্ব মুক্ত হবে না’। আমাদের মায়হাবের অনুসারী পূর্ববর্তী একদল আলেমের অভিমতও এটাই; যেমন- আল-জুযজানি, আবু মুহাম্মদ আল-বারবাহারি, ইবনেবাগ্‌হ।” [ফাতহুল বারী (৩/৩৫৫) থেকে সমাণ্ড]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

বিনা ওজরে নামায কিংবা রোযা ত্যাগকারী কাযা পালন করবে না। [আল-ইখতিয়ারাত আল-ফিকহিয়া (পৃষ্ঠা-৪৬০) থেকে সমাণ্ড]

শাইখ উছাইমীন বলেন:

আর যদি মূলতই সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওজর ছাড়া রোযা ত্যাগ করে; তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক নয়। কেননা কাযা পালন করেতার কোন লাভ হবে না। যেহেতু তার থেকে সেটা কবুল করা হবে না। কারণ ফিকহীনীতি হচ্ছে, ‘যদি নির্দিষ্ট কোন সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত কোন ওজর ছাড়া উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে পালন করা না হয় তাহলে তার থেকে সেটা কবুল করা হয়না।’ [মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/৮৯) থেকে সমাণ্ড]

সারকথা:

যে ব্যক্তি রমযানের রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করবে অধিকাংশ আলেমের মতে, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক। আর কিছু কিছু আলেমের মতে, কাযা পালন করা শরিয়তসিদ্ধ নয়। কেননা এটি এমন ইবাদত যে ইবাদতের সময় পার হয়ে গেছে। তবে, অধিকাংশ আলেম যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটা অগ্রগণ্য। কেননা, রোযা এমন ইবাদত যা ব্যক্তির দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে; সুতরাং এটি পালন করা ছাড়া দায়িত্বমুক্ত হবে না।

প্রশ্ন

ফরয রোযার কাযা পালনকালে রোযা ভেঙ্গে ফেলার হুকুম?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যেব্যক্তি কোন ফরয রোযা পালন করা শুরু করেছে যেমন রমযানের কাযা রোযা কিংবা শপথ ভঙ্গের কাফফারার রোযা তার জন্য কোন ওজর ছাড়া (যেমন- রোগ ও সফর) উক্তরোযা ভেঙ্গে ফেলা জাযেয নয়।

যদি কেউ ওজরের কারণে কিংবা ওজর ছাড়া রোযাভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার উপর ঐ দিনের বদলে অন্য একদিন রোযা কাযা পালন করাফরয। তাকে কোন কাফফারা দিতে হবে না। কেননা কাফফারা ফরয হয় শুধুমাত্ররমযান মাসের দিনের বেলায় সহবাস করার কারণে।

যদি সে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া রোযাটি ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার উপর এ গুনাহর কাজ থেকে তওবা করা আবশ্যিক।

ইবনে কুদামা (৪/৪১২) বলেন:

যে ব্যক্তি কোন ফরয রোযা শুরু করেছে যেমন-রমযানের কাযা রোযা বা মানতের রোযা বা কাফফারার রোযা তার জন্য এর থেকেবেরিয়ে যাওয়া জায়েয নয়। আলহামদু লিল্লাহ; এ ব্যাপারে কোন মতভেদনেই [সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত]

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে (৬/৩৮৩) বলেন:

কেউ যদি রমযান ব্যতীত অন্য কোন রোযা পালনকালেসহবাসে লিপ্ত হয়; যেমন- রমযানের কাযা রোযা বা মানতের রোযা কিংবা অন্য কোনরোযা সেক্ষেত্রে কাফফারা দিতে হবে না। এটি সংখ্যা গরিষ্ঠ আলেমের অভিমত। কাতাদা বলেন: রমযানের কাযা রোযা নষ্ট করার কারণে তার উপর কাফফারা আবশ্যিক হবে [সমাপ্ত]

[দেখুন: আল-মুগনি (৪/৩৭৮)]

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়:

"একবার আমি রমযানের কাযা রোযা পালন করছিলাম। জোহরের পরে আমার ক্ষুধা লেগে গেল বিধায় আমি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করেফেললাম; ভুলে নয়, অজ্ঞতাবশতঃ নয়। আমার এ কর্মের হুকুম কী?"

জবাবে তিনি বলেন:

আপনার কর্তব্য ছিল রোযা পূর্ণ করা। ফরয রোযা (যেমন- রমযানের কাযা রোযা, মানতের রোযা) ভেঙ্গে ফেলা জায়েয নেই। এখন আপনার কর্তব্য হচ্ছে-আপনি যা করেছেন এর থেকে তওবা করা। যে ব্যক্তি তওবা করেআল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।" [মাজমুউল ফাতাওয়া (১৫/৩৫৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) জিজ্ঞেস করা হয় (২০/৪৫১):

"ইতিপূর্বের বছরগুলোতে আমি কাযা রোযা আদায়কালেইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছি। পরবর্তীতে ঐ দিনের বদলে অন্য একদিন রোযারেখেছি। আমি জানি না এভাবে একদিন রোযা রাখার মাধ্যমে কাযা পালন হয়েছে; নাকিআমাকে লাগাতার দুইমাস রোযা রাখতে হবে? আমার উপরে কি কাফফারা আবশ্যিক? দয়াকরে জানাবেন।

জবাবে তিনি বলেন:

কোন মানুষ যদি ফরয রোযা রাখা শুরু করেছে যেমনরমযানের কাযা রোযা, শপথ ভঙ্গের কাফফারার রোযা, হজ্জের মধ্যে ইহরাম থেকেহালাল হওয়ার আগে মাথা মুগুন করে ফেলার ফিদিয়াস্বরূপ কাফফারার রোযাইত্যাদি; তার জন্য কোন শরয়ি ওজর ছাড়া রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয নয়। তেমনিভাবেকেউ যদি কোন ফরয আমল শুরু করে তাহলে সে আমল শেষ করা তার উপর আবশ্যিক। আমলটিকর্তন করাকে বৈধকারী কোন শরয়ি ওজর ছাড়া সে আমল ছেড়ে দেয়া জায়েয নয়। এইনারী যিনি কাযা রোযা পালন করা শুরু করেছিলেন, এরপর কোন ওজর ছাড়া রোযাটিভেঙ্গে ফেলেছেন এবং অন্যদিন রোযাটির কাযা পালন করেছেন তার উপর কোন কিছুআবশ্যিক নয়। কেননা কাযা শুধু একদিনের বদলে একদিন হয়ে থাকে। কিন্তু, তারকর্তব্য হচ্ছে-বিনা ওজরে ফরয রোযা ভঙ্গ করার কারণে তওবা করা এবং আল্লাহরকাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।" [সমাপ্ত]

প্রশ্ন:

যে ব্যক্তি রমযান মাসের পর শাওয়ালের ছয় রোযারেখেছে কিন্তু রমযানের সবগুলো রোযা রাখেনি। শরিয়তস্বীকৃত ওজরের কারণেরমযানের দশটি রোযা ভেঙ্গেছে। সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির সম-পরিমাণ সওয়াবপাবে যে ব্যক্তি গোটা রমযান মাস রোযা রেখেছে এবং শাওয়াল মাসেও ছয় রোযারেখেছে। সে ব্যক্তি কি গোটা বছর রোযা রাখার সওয়াব পাবে? আশা করি, আমাদেরকেঅবগিত করবেন। আল্লাহ্ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।।

বান্দা যেসব আমল করেসেগুলোর সওয়াবের পরিমাণ নির্ধারণ করার দায়িত্ব আল্লাহ্র উপরে। বান্দা যদিআল্লাহ্র কাছে প্রতিদান প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের পথেঅক্লান্ত পরিশ্রম করে নিশ্চয় আল্লাহ্ তার প্রতিদান নষ্ট করবেন না।আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “ নিশ্চয় আল্লাহ্, ভাল কর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেননা। যে ব্যক্তির দায়িত্বে রমযানের রোযা অবশিষ্ট রয়েছে তার কর্তব্য হচ্ছে, প্রথমে রমযানের রোযা পালন করা; তারপর শাওয়ালের ছয় রোযা রাখা। কেননা যেব্যক্তি রমযানের রোযা পূর্ণ করেনি তার ক্ষেত্রে এ কথা বলা চলে না যে, সেরমযানের রোযা রাখার পর শওয়ালের ছয় রোযা রেখেছে।”

আল্লাহ্ই উত্তম তাওফিকদাতা এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের প্রতি আল্লাহ্ররহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

প্রশ্ন

অসুস্থতার কারণে আমি রমজানের পাঁচটি রোজা রাখতেপারিনি। এখন এ রোজাগুলো কি লাগাতরভাবে রাখতে হবে? নাকি প্রতি সপ্তাহে আমিএকটি করে রোজা রাখতে পারব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।।

রমজানের কাযা রোজারব্যাপারে সকল ইমাম একমত যে, কোন ব্যক্তি যে কয়দিনের রোজা রাখতে পারেনি সেকয়দিনের রোজা কাযা করবে। দলিল হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী: “ আর তোমাদের মধ্যে যেব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণকরবে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

এ দিনগুলোর ক্ষেত্রে লাগাতরভাবে রোজা রাখা ফরজ নয়। ইচ্ছা করলে আপনিলাগাতরভাবে রোজা রাখতে পারেন; আবার ইচ্ছা করলে আলাদা আলাদাভাবেও রোজা রাখতেপারেন। আপনার সাধ্যনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে একদিন অথবা প্রতি মাসে একদিনরোজা রাখতে পারেন। এর দলিল হচ্ছে- পূর্বোক্ত আয়াত। এ আয়াতের মধ্যে কাযাপালনের ক্ষেত্রে লাগাতরভাবে রোজা রাখার কোন শর্ত করা হয়নি। বরং শুধু যেকয়দিন রোজা ভঙ্গ করা হয়েছে সে সম সংখ্যক দিন রোজা রাখা ফরজ করাহয়েছে।[দেখুন আল-মাজমু (৬/১৬৭) ও আল-মুগনি (৪/৪০৮)]

স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: রমজানের কাযা রোজা অনিয়মিতভাবে রাখা জায়েয আছে কি?

জবাবে তাঁরা বলেন: হ্যাঁ, রমজানের রোজা অনিয়মিতভাবে রাখা জায়েয আছে।দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: “ আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবেঅথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫] আল্লাহ তাআলা কাযা পালনের ক্ষেত্রে লাগাতরভাবে রোজা রাখা শর্তকরেননি।[স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র থেকে সংকলিত (১০/৩৪৬)]

শাইখ বিন বাযের ফতোয়াসমগ্রতে (১৫/৩৫) এসেছে: যদি দুইদিন, তিনদিন বা আরওবেশিদিন রোজা না-রাখে তাহলে এ রোজাগুলো কাযা করা তার উপর ফরজ। তবেলাগাতরভাবে রাখতে হবে না। যদি লাগাতরভাবে রাখে সেটা উত্তম। আর যদিলাগাতরভাবে রাখতে না পারে তাতেও কোন অসুবিধা নেই।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন:

কোন এক বছর রমজান মাসের যে দিনগুলোতে আমারমাসিক ছিল সেদিনগুলোতে আমি রোজা ভেঙ্গেছি। কিন্তু অনেক বছর অতিবাহিত হয়েযাওয়ার পরেও আমি সে রোজাগুলো রাখতে পারিনি। আমি আমার দায়িত্বে থেকে যাওয়াসে রোজাগুলোর কাযা পালন করতে চাচ্ছি। কিন্তু কয়দিন আমি রোজা ভেঙ্গেছি সেটাআমার মনে নেই। এখন আমি কী করব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনাকে তিনটি কাজ করতে হবে:

এক: এই বিলম্বের কারণে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে; যে অবহেলা হয়েছে সেঅবহেলার কারণে অনুশোচনা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ রকম না করার দৃঢ় সিদ্ধান্তনিতে হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকল গুনাহ থেকেআল্লাহর কাছে তওবা কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” [সূরা নূর, আয়াত: ৩১] এবিলম্ব করাতে গুনাহ হয়েছে; এর থেকে তওবা করা ওয়াজিব।

দুই: একটা সংখ্যা ধরে নিয়ে অনতিবিলম্বে রোজা আদায় করে নেয়া। কারণ আল্লাহতাআলা কাউকে তার সাখ্যের বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। সুতরাং যে কয়দিনরোজা ভেঙ্গেছেন বলে ধারণ হছে সে কয়দিন কাযা করে নিন। যদি আপনার মনে হয়দশদিন তাহলে দশদিন কাযা করুন। যদি মনে করেন এর চেয়ে বেশি তাহলে এর চেয়েবেশি দিন অথবা কম দিন আপনার ধারণা অনুযায়ী কাযা করুন। যেহেতু আল্লাহ তাআলাবলেছেন: “আল্লাহ কাউকে তার সাখ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না।” [সূরাবাকারা, আয়াত: ২৮৬] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “সাখ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর” [সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬]

তিন: যদি আপনি সামর্থ্যবান হন তাহলে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনখাওয়ান। সবদিনের খাদ্য একজন মিসকীনকে দিয়ে দিলেও হবে। আর যদি আপনিঅসামর্থ্যবান হন তাহলে রোজা রাখা ও তওবা করাই যথেষ্ট হবে।

প্রতিদিনের বদলে অর্ধ’সা’ স্থানীয় খাদ্য বিতরণ করতে হবে। অর্ধ’সা’ এর পরিমাণ হছে- আড়াই কিলোগ্রাম।

প্রশ্ন

যে শিশু বালগ হওয়ার আগে থেকেরমজানের রোজা পালন করত। রমজান মাসের দিনের বেলায় সে বালগ হল। তাকে কি সেইদিনের রোজা কাযা করতে হবে? একইভাবে রমজান মাসে দিনের বেলা যে কাফের ইসলামগ্রহণ করল, যে নারী হায়েয থেকে পবিত্র হল, যে পাগল জ্ঞান ফিরে পেল, যেমুসাফির রোজা না-রাখা অবস্থায় স্বগৃহে ফিরে আসল, যে অসুস্থ ব্যক্তি রোজাছিল না, কিন্তু সে সুস্থ হয়ে উঠল - এ সমস্ত ব্যক্তির জন্য সেই দিনের বাকিঅংশ রোজাভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ও সেদিনের রোজার কাযা আদায় করাকি ওয়াজিব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের সবার ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাপারে আমরা আলেমগণের মতভেদ ও তাদের বক্তব্য (49008) নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করেছি।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের দুটি গ্রুপে ভাগ করা যেতে পারে :

১) কোন শিশু যদি বালেগ হয়, কোন কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে, কোন পাগল যদি জ্ঞান ফিরে পায়- তবে তাদের সবার হুকুম এক। সেট হল- ওজর বা অজুহাত চলে যাওয়ার সাথে সাথে দিনের বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী সমস্ত মুফাতিরা হতে বিরত থাকা ওয়াজিব। কিন্তু তাদের জন্য সেই দিনের রোজা কাযাকরা ওয়াজিব নয়।

২) অপরদিকে হায়েযগ্রস্ত নারী যদি পবিত্র হয়, মুসাফির ব্যক্তি যদি স্বগৃহে ফিরে আসে, অসুস্থ ব্যক্তি যদি আরোগ্য লাভ করে- এদের সবার হুকুম এক। এদের জন্য রোজা ভঙ্গকারী মুফাতিরা হতে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়। কারণ বিরত থাকতে তাদের কোন লাভ নেই। যেহেতু সেই দিনের রোজা কাযা করা তাদের উপর ওয়াজিব।

প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য:

প্রথম গ্রুপের মধ্যে তাকলিফের তথা শরয়ি ভার আরোপের সকল শর্তপাওয়া গেছে। শর্তগুলো হচ্ছে- বালেগ হওয়া, মুসলিম হওয়া ও আকল (বুদ্ধি) সম্পন্ন হওয়া। যখন থেকে তাদের উপর শরয়ি ভার আরোপ সাব্যস্ত হয়েছে তখন থেকে মুফাতিরা হতে বিরত থাকা রোজা ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থাকা তাদের উপর ওয়াজিব; কিন্তু সেই দিনের রোজা কাযা আদায় করা তাদের উপর ওয়াজিব নয়। কারণ যখন থেকে তাদের উপর মুফাতিরা হতে বিরত থাকা ওয়াজিব হয়েছে তখন থেকে তারা তা থেকে বিরত থেকেছে। এর আগে তো তারা রোজা পালনের ব্যাপারে মুকাব্বাফ (ভারপ্রাপ্ত) ছিল না।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় গ্রুপটি সিয়াম পালনের ব্যাপারে আইনতঃ মুকাব্বাফ ছিল। তাই তা পালন করা তাদের উপর ওয়াজিব ছিল। তবে তাদের শরয়িত অনুমোদিত ওজর থাকায় তাদেরকে রোজা না-রাখার বৈধতা দেয়া হয়েছে। এ ধরনের ওজর হচ্ছে- হায়েয, সফর ও রোগ। এসব ওজরের কারণে আল্লাহ রোজার বিধান তাদের জন্য কিছুটা সহজ করেছেন এবং রোজা না-থাকা তাদের জন্য বৈধ করেছেন। উল্লেখিত ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি রমজানের দিনের বেলায় বে-রোজদার থাকতে এ মাসের পবিত্রতাবিনষ্টকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। যদি রমজানের দিনের বেলায় তাদের ওজর দূর হয়ে যায় তবুও দিনের বাকী সময়টা রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে তাদের কোন লাভ নেই। কারণ রমজান মাসের পরে তাদেরকে সেই দিনের রোজা কাযাকরতে হবে।

শাইখ মুহাম্মদ বিন সালাহ উছাইমীন রাহিমাল্লাহু বলেছেন:

“যদি কোন মুসাফির রোজা না-রাখা অবস্থায় স্বগৃহে ফিরে আসে তবে তার জন্য রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়; দিনের বাকীসময়ে পানাহার করা তার জন্য বৈধ। যেহেতু তাকে এই দিনের রোজা কাযা করতে হবে। তাই এই দিনের অবশিষ্টাংশে পানাহার থেকে বিরত থেকে কোন লাভ নেই। এটা ই সঠিক মত। এটি ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ীর অভিমত এবং ইমাম আহমাদ থেকে দুইটি বর্ণনার একটি। তবে সে ব্যক্তির প্রকাশ্যে পানাহার করা উচিত নয়।” সমাপ্ত [মাজমূফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৫৮ নং প্রশ্ন)]

তিনি আরও বলেন:

“কোন হায়েযগ্রস্ত নারী অথবা নিফাসগ্রস্ত নারী দিনের বেলায় পবিত্র হলে তাদের জন্য রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়। তিনি পানাহার করতে পারেন। কারণ তার বিরত থাকায় কোন লাভ নেই। যেহেতু সেই দিনের রোজা তাকে কাযা করতে হবে। এটি ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ীর অভিমত ও ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত দুইটি অভিমতের একটি। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন:

من أكل أول النهار فليأكل آخره

“দিনের প্রথম অংশে যে ব্যক্তি খেয়েছে দিনের শেষভাগেও সে খেতে পারে।” অর্থাৎ যার জন্য দিনের প্রথম অংশে রোজা ভঙ্গ করা জায়েয তাঁর জন্য দিনের শেষ অংশেও রোজা ভঙ্গ করা বৈধ।” সমাপ্ত [মাজমূফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৫৯) নং প্রশ্ন)]

শাইখ উছাইমীন কে আরও প্রশ্ন করা হয়েছিল:

যে ব্যক্তি রমজান মাসের দিনের বেলায় শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে রোজা ভেঙেছে ওজর দূর হয়ে যাওয়ার পর সে দিনের বাকি সময়ে পানাহার করাকি তার জন্য জায়েয হবে?

তিনি উত্তরে বলেন:

“তার জন্য পানাহার করা জায়েয। কারণ সে শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে রোজা ভঙ্গ করেছে। শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে রোজা ভঙ্গ করায় তার ক্ষেত্রে রমজানের দিবসের পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব থাকে না। তাই সেপানাহার করতে পারে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি রমজান মাসের দিনের বেলায় কোনশরয়ি ওজর ছাড়া রোজা ভঙ্গ করেছে তার অবস্থা ভিন্ন। তার ক্ষেত্রে আমরা বলব: দিনের বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত থাকা তার জন্য ওয়াজিব। যদিও এরোজার কাযা পালন করাও তার উপর ওয়াজিব। এই মাসযালা দুইটির পার্থক্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।” সমাপ্ত। [মাজমূ ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনেউছাইমীন (১৯/৬০) নং প্রশ্ন]

তিনি আরও বলেন:

“সিয়াম বিষয়ক গবেষণা পত্রে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোন নারীর যদি হায়েয হয় এবং (রমজান মাসে) দিনের বেলায় তিনি পবিত্র হন তবে সেই দিনেরবাকী অংশে তাকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে কি- এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদকরেছেন।

আমরা বলব: এ মাসযালায় ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে দুটিঅভিমত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ থেকে সর্বজনবিদিত মত হল- দিনের বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী সমস্ত মুফাজিরাত থেকে বিরত থাকা সে নারীর উপর ওয়াজিব। সুতরাং সে পানাহার করবে না।

দ্বিতীয় মত হচ্ছে- তার জন্য মুফাজিরাত থেকে বিরত থাকাওয়াজিব নয়। তাই পানাহার করা তার জন্য জায়েয। আমরা বলব: এই দ্বিতীয় মতটিইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ি (রাঃ) এরও অভিমত। এটি ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণিত। তিনি বলেন:

من أكل أول النهار فليأكل آخره

"যে ব্যক্তির জন্য দিনের প্রথম অংশে খাওয়া বৈধ তার জন্য দিনের শেষ অংশেও খাওয়া বৈধ।"

আমরা আরও বলব ভিন্ন মত আছে এমন মাসযালার ক্ষেত্রে তালিবে ইলমের কর্তব্য হলদলিলগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং তার কাছে যে মতটি অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হয়সে মতটি গ্রহণ করা। আর দলিল যেহেতু তার পক্ষে রয়েছে সেহেতু ভিন্নমতাবলম্বীর ভিন্নমতের প্রতি ক্রক্ষেপ না করা। কারণ আমরা রাসূলকে অনুসরণকরার ব্যাপারে আদিষ্ট। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

"যেদিন তাদেরকে ডেকে বলবেন:তোমরা রাসূলগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলেন?" [২৮ সূরা আল-কাসাস : ৬৫]

ভিন্ন মতাবলম্বীগণ একটা সহিহ হাদিস দিয়ে দলিল দেয়। সেটাহচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনের মধ্যভাগে 'আশুরা'-র রোজাপালনের আদেশ দিয়েছিলেন। তখন সাহাবীরা দিনের বাকি অংশ রোজা-ভঙ্গকারী বিষয়থেকে বিরত থেকেছেন। আমরা বলব, এই হাদিসে তাদের পক্ষে কোন দলিল নেই। কারণ 'আশুরা'-র রোজা পালনের ক্ষেত্রে 'প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া' (হায়েয, নিফাস, কুফর ইত্যাদি)-র কোন ব্যাপার ছিল না। বরং সেক্ষেত্রে 'নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর' ব্যাপার ছিল।

'প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া' ও 'নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর' মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর' অর্থ হল- যে কারণেকোন বিধান আবশ্যকীয় হয় সে কারণ উপস্থিত হওয়ার আগে সেই হুকুমটি সাব্যস্ত হয়না। পক্ষান্তরে 'প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার' অর্থ হল- বিধান সাব্যস্ত আছে; কিন্তু প্রতিবন্ধকতা থাকায় সেটা বাস্তবায়ন করা যায় না। বিধান ওয়াজিব হওয়ারকারণ পাওয়া গেলেও এই প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতিতে বিধানটি পালন করা শুদ্ধ হবেনা।

এই মাস্যালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য একটি মাসয়ালা হলো- যেকোনো রমজান মাসে দিনের বেলায় ইসলাম গ্রহণ করল তাঁর ক্ষেত্রে রোজারদায়িত্ব তার উপর নতুনভাবে বর্তাল।

এ রকম আরো একটি উদাহরণ হল- কোন নাবালেগ যদি রমজান মাসে দিনেরবেলায় সাবালক হয় এবং সে বে-রোজদার থাকে তবে তার ক্ষেত্রেও রোজার দায়িত্বটিনতুনভাবে বর্তায়।

তাই যে ব্যক্তি দিনের বেলায় ইসলাম গ্রহণ করেছে আমরা তাঁকে বলব: দিনের বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকা আপনার উপরওয়াজিব। তবে এ রোজাটি আর কাযা করা আপনার উপর ওয়াজিব নয়।

অনুরূপভাবে রমজান মাসের দিনের বেলায় যে নাবালেগ বলেগ হয়েছে আমরা তাকে বলব: দিনের বাকী অংশে রোজা ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকাতোমরা উপর ওয়াজিব। তবে এ রোজাটি কাযা করা তোমার উপর ওয়াজিব নয়।

কিন্তু রমজানের দিনের বেলায় যে ঋতুবতী নারী পবিত্র হয়েছে তারক্ষেত্রে বিধানটি ভিন্ন। আলেমগণের ইজমা তথা সর্বসম্মত মত হচ্ছে- তার উপররোজাটি কাযা করা ওয়াজিব। ঋতুবতী নারী যদি রমজানের দিনের বেলায় পবিত্র হয়তাহলে দিনের বাকী অংশ রোজা ভঙ্গকারী বিষয়াদি থেকে বিরত থাকায় তার কোনোউপকারে হবে না, এই বিরত থাকাটা রোজা হিসেবে গণ্য হবে না। বরং তাকে রোজাটিকাযা করতে হবে। এ ব্যাপারে আলেমগণ ইজমা করেছেন।

এই আলোচনার মাধ্যমে 'নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানো' ও 'প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া' এর মধ্যে পার্থক্য জানা গেল। সুতরাং হায়েযগ্রস্তনারী রমজানের দিনের বেলায় পবিত্র হওয়ার মাসয়ালাটি 'প্রতিবন্ধকতা দূরীভূতহওয়া' শ্রেণীর মাসয়ালা। পক্ষান্তরে কোন শিশুর বলেগ হওয়া অথবা প্রঙ্ককারীরউল্লেখিত রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে 'আশুরা' দিনের রোজা ফরজ হওয়া- এরমাসয়ালাটি 'নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানো' শীর্ষক মাসয়ালা। আল্লাহইতাওফিক দাতা। " সমাপ্ত।

[মাজমূ ফাৎওয়া আশ-শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৬০ নং প্রশ্ন)]

প্রশ্ন

আমি বুলগেরিয়ার অধিবাসী একজন মুসলিম নারী। আমরা কমিউনিস্ট শাসনাধীনে ছিলাম। ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। বরং ইসলামের অনেক ইবাদত পালন আমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আমি ২০ বছর বয়স পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এরপর আমি শরয়ি বিধিবিধান মানতে শুরু করলাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- আমাকে কি ইতিপূর্বের অনাদায় নামায ও রোজাগুলো কাযা করতে হবে? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি যিনি আপনাদেরকে অত্যাচারী কমিউনিস্ট শাসন থেকে মুক্ত করেছেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর এই শাসন মুসলমানদের উপর নিপীড়ন চালিয়ে আসছিল। এ সময়কালে তারা মসজিদগুলো ধ্বংস করেছে। কোন কোন মসজিদকে জাদুঘরে পরিণত করেছে। ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। মুসলমানদের নাম গুলো পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিয়েছে, ইসলামী পরিচিতি নির্মূল করে ফেলেছে।

কিন্তু...আল্লাহ তাআলা তাঁর আলোকে পরিপূর্ণ করেই ছাড়লেন; যদিও কাফেরেরা সেটাকে অপছন্দ করুক না কেন?

সেই দুর্দান্ত প্রতাপশালী কমিউনিস্ট শাসন তার সকল দম্ব ও অহংকারসহ ১৯৮৯ সালে ভেঙ্গে পড়েছে। এ শাসনের পতনের ফলে মুসলমানেরা অত্যন্ত খুশি হয়েছে। তারা পুরাতন মসজিদগুলো পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে। তাদের শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়া শুরু করেছে। রাস্তাঘাটে আবার হিয়াব পরিহিতা নারী দেখা দেয়া শুরু হয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করছি

তিনি যেন মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মের দিকে সুন্দরভাবে ফিরিয়ে দেন। তাদেরকে বিজয় দান করেন, গৌরবময় করেন এবং তার শত্রুদেরকে অপদস্থ করেন।

দুই:

বুলগেরিয়ার মুসলমানদের একটি প্রজন্ম কমিউনিস্ট শাসনাধীনে বড় হয়েছে। যারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না; তবে তারা মুসলমান। কমিউনিস্ট শাসনাধীনে থেকে তারা ইসলামী শিক্ষা অর্জন করতে পারেনি। কমিউনিস্ট শাসকেরা কুরআন ও ইসলামীবই-পুস্তক বুলগেরিয়াতে প্রবেশ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল। এরা যারা ইসলামী হুকুম আহকাম, ইবাদত ও ফরজ আমলগুলো সম্পর্কে কিছুই জানত না তাদের উপর এ সকল ইবাদতের কোন কিছু কায্য করতে হবে না। কারণ কোন মুসলমান যদি শরিয়ী জ্ঞান অর্জন করতে না পারে, তার কাছে শরিয়তের বিধিবিধানের খবর না পৌঁছে তাকে এ ইবাদতগুলোর কোনটি কায্য করতে হয় না। দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না।" [সূরা বাকারা, আয়াত:২৮৬]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

মুসলমানদের মধ্যে এ নিয়ে কোন মতানৈক্য নেই যে ব্যক্তি দারুল কুফরে বাস করে, ঈমান আনার পর সে যদি হিজরত করতে অক্ষম হয় তাহলে সে যে অনুশাসনগুলো পালন করতে অক্ষম সেগুলো পালন করা তার উপর অবধারিত হবে না। বরং যে আমলগুলো তার সাধ্যের মধ্যে রয়েছে সেগুলো পালন করা তার উপর আবশ্যিক হবে। অনুরূপভাবে সে ব্যক্তি যে বিধানগুলো জানে না সেগুলোও পালন করা তার উপর আবশ্যিক হবেনা। সে যদি না জানে যে, তার উপর নামায ফরজ এবং একটা সময় পর্যন্ত নামায না পড়ে তাহলে আলেমদের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী সেসময়ের নামাযগুলো তাকে কায্য করতে হবে না। এটি ইমাম আবু হানিফা ও জাহেরী মাযহাবের অভিমত এবং ইমাম আহমাদের দুইটি অভিমতের একটি। অন্যান্য ফরজ ইবাদত যেমন-রমজানের রোজা, যাকাত আদায় ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই হুকুম। যদি সে ব্যক্তি মদ যে হারাম তা না জেনে মদ পান করে ফেলে আলেমগণের সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর শাস্তি কায়েম করা হবেনা। তবে নামায কায্য করার ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন।

পূর্বোক্ত মাসয়ালার ভিত্তি হচ্ছে- যে ব্যক্তি কোন অনুশাসন বা বিধান জানেনা তার উপরও কি সে বিধানের ভার অর্পিত হবে; নাকি না জানলে তার উপর সে বিধানের ভার অর্পিত হবে না?

এ মাসয়ালায় সঠিক অভিমত হচ্ছে-সংশ্লিষ্ট মাসয়ালার জ্ঞান অর্জনের সুযোগ না থাকলে সে বিধানের ভার তার উপর অর্পিত হবেনা। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি জানতে পারবে না যে, এটি তার উপর ফরজ ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সে বিধান কায্য করতে হবে না। সহিহ হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার পরেও সাদা সুতা থেকে কালো সুতা পার্থক্য করতে না পারার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করেছেন; কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে রোজা কায্য করার নির্দেশ দেননি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু সময় জুন্বি (গুরু অপবিত্রতা) অবস্থায় কাটিয়েছেন; নামায আদায় করেননি। তায়াম্মুম করে যে, নামায আদায় করা যায় সেটা তারা জানতেন না। যেমনটি ঘটেছে-আবু যার (রাঃ), উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও আম্মার (রাঃ) এর ব্যাপারে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাউকে নামায কায্য করার নির্দেশ দেননি।

এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই যে, বাইতুল মোকাদ্দাস এর বদলে কাবাকে কিবলা নির্ধারণের সংবাদ পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত মক্কাতে ও মরুভূমিতে একদল মুসলমান বাইতুল মোকাদ্দাস এর দিকে ফিরে নামায আদায় করছিলেন; কিন্তু তাদেরকে সে নামাযগুলো কায্য করার আদেশ দেয়া হয়নি। এ ধরণের আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। এ মতটি সলফে সালেহিন ও জমহুর আলেম যে নীতিটির উপর নির্ভর করেন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; সে নীতিটি হচ্ছে- "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে ভার আরোপ করেন না" সুতরাং কোন ইবাদত ফরজ হওয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাধ্য ও ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। কোন নির্দেশ পরিত্যাগ বা নিষেধে লিগু হওয়ার কারণে শাস্তি দেয়া হবে হুজ্জত কায়েম হওয়ার পর অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে অবহিত করণের পর। [মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/২২৫)]

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, আপনারা যে ইবাদতগুলো ফরজ হওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না সেগুলো কায্য আদায় করা আপনারদের উপর আবশ্যিক নয়।

আপনাদের জন্য উপদেশ হচ্ছে- শরিয়ী জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করুন; দ্বীনী বিষয়ে প্রজ্ঞা অর্জন করুন। ইসলাম সম্পর্কে জানা ও মানার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করুন। একটি মুসলিম প্রজন্ম গড়ে তুলুন; যাতে সাধারণভাবে মুসলমানেরা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে বিশেষতঃ আপনারদের দেশে যে চ্যালেঞ্জগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে তারা সেগুলো মোকাবিলা করতে পারে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন, ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন :

আমার বাবা মারা গেছেন। তিনি মারা যাওয়ার আগের বছর রোগের কারণে রমজানের দুই দিনের রোযা রাখতে পারেননি। তিনি শাওয়াল মাসে মারা যান। তিনি বলেছিলেন যে, এই দুই দিনের রোযার পরিবর্তে তিনি মিসকীন খাওয়ান। এখন এর হুকুম কী এবং আমাদের উপরই বা কী করা ওয়াজিব? আমরা কি তার পক্ষ থেকে রোযা পালন করব এবং ফিদিয়া দিব, নাকি শুধু ফিদিয়া দিব? উল্লেখ্য যে, আমরা জানি না তিনি কি এই দুই দিনের পরিবর্তে ফিদিয়া দিয়েছিলেন অথবা রোযা রেখেছিলেন। তিনি ডায়াবেটিকস রোগে আক্রান্ত ছিলেন বিধায় খুব কষ্ট করে রমজান মাসে রোযা পালন করতেন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যদি আপনাদের বাবা বিগত রমজানের সিয়াম কাযা করতে সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী রমজান আসা পর্যন্ত এর কাযা আদায়ে অবহেলা করে থাকেন এবং এরপরে তিনি মারা যান, তবে আপনাদের জন্য উত্তম হল সেই দুই দিনের কাযা আদায় করা। এ ব্যাপারে দলীল হলো-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: “যে ব্যক্তি তার জিম্মায় সিয়াম পালন বাকি রেখে মারা গেছে তার পক্ষ থেকে তার ওলি (আত্মীয়-পরিজন) রোযা পালন করবে।” [সহীহ বুখারী (১৮৫১) ও সহীহ মুসলিম (১১৪৭)]

আর আপনারা যদি তাঁর পক্ষ থেকে স্থানীয় খাদ্যের এক স্মা' (প্রায় ৩ কিঃগ্রাঃ এর সমান) পরিমাণ খাদ্য কোন মিসকীনকে দান করেন তবে সেটাও যথেষ্ট হবে।

আর যদি পরবর্তী রমজান আসার আগে তিনি রোগের কারণে সেই দুই দিনের রোযা কাযা পালনে সক্ষম না হয়ে থাকেন তবে কোন কাযা আদায় করা বা ফিদিয়া আদায় করার প্রয়োজন নেই। কারণ এক্ষেত্রে তিনি দায়িত্ব পালনে কোন অবহেলা করেন নি।

আল্লাহই তাওফিক দাতা। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।”
সমাপ্ত

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন গুদাইইয়ান, শাইখ সালেহ ফাওয়ান, আব্দুল আযীয আলে শাইখ , শাইখ বাকর আবু যাইদ। [ফাতাওয়াআল-]

প্রশ্ন :

আমি স্বেচ্ছায় রমজান মাসে একদিন রোযা ভেঙ্গে ফেলেছিলাম। এখন ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর নিয়তে করেছি। প্রশ্ন হচ্ছে- মিসকীনদেরকে কি একবারেই খাওয়ানো শর্ত, নাকি আমি প্রতিদিন তিন বা চারজন করে মিসকীন খাওয়াতে পারি? আমার পরিবারের সদস্যরা (যেমন আমার বাবা, মা ও ভাইয়েরা) যদি মিসকীন হয়ে থাকে আমি কি তাদেরকে খাওয়াতে পারি।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

সহবাস ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে যদি রমজানের রোযা ভঙ্গ করা হয়ে থাকে, তবে সঠিক মতানুযায়ী এর কোন কাফফারা নেই । তবে এক্ষেত্রে ওয়াজিব হল তওবা করা এবং সেই দিনের রোযা কাযা করা । আর যদি সহবাসের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করা হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে তওবা করতে হবে, সেই দিনের রোযা কাযা করতে হবে এবং কাফফারা আদায় করতে হবে । রোযার কাফফারা হলো একজন মুমিন দাস মুক্ত করা । যদি তা না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে লাগাতর দুইমাস সিয়াম পালন করতে হবে । আর সেটাও যদি তার পক্ষে সম্ভবপর না হয় তবে সে ব্যক্তি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে ।

যদি সে ব্যক্তি পূর্বে উল্লেখিত দাসমুক্তি ও সিয়াম পালনে অক্ষমতার কারণে মিসকীন খাওয়ায় তবে তাঁর জন্য মিসকীনদের কে একসাথে খাওয়ানো জায়েয । অথবা সাধ্যমত কয়েক বারে খাওয়ানোও জায়েয । তবে মিসকীনদের সংখ্যা অবশ্যই ষাট পূর্ণ করতে হবে । এই কাফফারার খাবার বংশমূল যেমন- বাবা, মা, দাদা, দাদী, নানা, নানী এদেরকে প্রদান করা জায়েয নয় । একইভাবে যারা বংশধর (শাখা) যেমন ছেলে মেয়ে, ছেলে মেয়েদের ছেলে মেয়ে তাদেরকেও প্রদান করা জায়েয নয় ।

আল্লাহই তাওফিক দাতা । আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন ।" সমাপ্ত ।

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

আশ-শাইখ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আযীয বিন বায, আশ-শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে গুদাইইয়ান, আশ-শাইখ সালেহ আল ফাওয়ান, আশ-শাইখ আবদুল আযীয আল আশ-শাইখ, আশ-শাইখ বাকর আবু যাইদ ।

প্রশ্ন :

রমজানের আগে আমার স্ত্রী বিগত রমজান মাসের কিছু কাযা রোযা পালন করছিলেন । এমতাবস্থায় আমি তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়েছি । সে সবগুলো রোযা কাযা করতেপারেনি ।

বিঃ দ্রঃ সে পূর্বেই আমার কাছে রোযা পালনের অনুমতি চেয়েছিল এবং আমি তাকে অনুমতি দিয়েছিলাম ।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

এক:

যিনি কোন ওয়াজিব রোযা শুরু করেন (যেমন: রমজানের কাযা রোযা বা কসম ভঙ্গের কাফফারা স্বরূপ রোযা) তার জন্য কোন ওজর (শরিয়ত অনুমোদিত অজুহাত) ছাড়া রোযাভঙ্গ করা জায়েয নয় । ওজরের উদাহরণ হচ্ছে-রোগ বা সফর ।

যদি তিনি কোনো ওজর বশত অথবা ওজর ছাড়া রোযা ভঙ্গ করে থাকেন তবে সে রোযাটি পালন করা তার দায়িত্বে বাকি থেকে যাবে এবং যে দিনের রোযা বিনষ্ট করেছিলেন সেই দিনের পরিবর্তে অন্য একদিন তাকে রোযা পালন করে নিতে হবে ।

যদি তিনি কোন ওজর ছাড়া রোযাটি ভঙ্গ করে থাকেন তবে এ রোযাটি পুনরায় পালন করার সাথে তাকে এই হারাম কাজ থেকে তওবা করতে হবে ।

আপনার স্ত্রীর উপর কোন কাফফারা নেই । কারণ কাফফারা শুধু রমজান মাসে দিনের বেলা সহবাসের কারণে ওয়াজিব হয় । এর বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে (49985) নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে ।

দুই:

আপনি আপনার স্ত্রীর রোযা বিনষ্ট করে খুবই খারাপ কাজ করেছেন। কারণ কোন স্ত্রী যখন তার স্বামীর অনুমতি নিয়ে রমজানের কাযা রোযা পালন করে তখন স্বামীর তার রোযা বিনষ্ট করার কোন অধিকার নেই। তাই আপনাদের দু'জনের উচিত আল্লাহর কাছে তওবা করা। এ কাজের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। এ কাজ পুনরায় না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া। আর যদি আপনি আপনার স্ত্রীকে জোর পূর্বক বাধ্য করে থাকেন তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্ন:

যে রোগ থেকে স্বভাবতঃ সুস্থতা আশা করা যায় না এমন হৃদরোগের কারণে ডাক্তারেরা জনৈক মহিলাকে রোযা পালন করতে নিষেধ করেছিলেন। তাই তিনি রমজানেরোযা না রেখে প্রতিদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াতেন। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরো অগ্রগতি হয়। ফলে তাঁর হার্টেভাল্ভের সার্জারি করা সম্ভব হয় এবং আলহামদুলিল্লাহ, উক্ত সার্জারি সফল হয়। তবে তিনি বেশ কিছুদিন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এরপর তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং আল্লাহ তাকে গত রমজানে সিয়াম পালনের তাওফিক দেন। এখন তিনি জানতে চাচ্ছেন, যে দিনগুলোতে তিনি রোযা ভঙ্গ করেছিলেন সে ব্যাপারে কি করবেন? তিনি কি সেই দিনগুলোর রোযা কাজা করবেন। তাতে তাঁকে ১৮০ দিন রোযা রাখতে হবে। যা ছয় বছরের রোযার সমান। নাকি তিনি সে সময় রোযার পরিবর্তে যে ফিদিয়া (খাদ্য দান) আদায় করেছিলেন সেটাই তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

“তিনি রোযা না-রেখে প্রতিদিনের পরিবর্তে যে ফিদিয়া আদায় করেছিলেন সেটাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। সেই মাসগুলোর রোযা কাজা করা তাঁর উপর ওয়াজিব নয়। কারণ তিনি শরিয়ত অনুমোদিত ওজরগ্রস্ত (মাযুর)। সে সময় তাঁর উপর যা ওয়াজিব ছিল তিনি তা পালন করেছেন।

আল্লাহই তাওফিক দাতা। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।”
সমাপ্ত

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ীকমিটি। সদস্য: শাইখ আবদুল আযিয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায, শাইখ আবদুর রায়ফারু আফীফী, শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে গুদাইয়্যান ও শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে কু'উদ।

প্রশ্ন : আমি রমজানে দিনের বেলায় সহবাসে লিপ্ত হওয়ায় কাফফারার রোযা আদায় শুরু করেছিলাম। রোযা পালনের ৫৭তম দিন সম্পন্ন করার পর অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ি যে আমি আর রোযা পালন করতে পারছিলাম না। তাই পরপর দুইদিন রোযা না রেখে পরের দিন থেকে রোযা পালন শুরু করি এবং ৬০ দিন পূরণকরি। এতে কি আমার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।

আপনি যা করেছেন তা ঠিকই করেছেন; আলহামদুলিল্লাহ। রোগজনিত কারণে কাফফারার ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হলে ক্ষতি নেই। কারণ রোগ হলো শরিয়ত অনুমোদিত ওজর। তাই রোগের কারণে ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হওয়াতে কোন সমস্যা নেই। আপনি যখন এরপর

আরও তিনদিন রোযা পালন করে কাফফারার রোযা পূর্ণ করলেন অতএব আপনার রোযা পালন শুদ্ধ হয়েছে এবং আপনার কাফফারাও আদায় হয়েছে। ওয়াল হামদুলিল্লাহ।” সমাপ্ত।

নফল রোজা

প্রশ্ন

রজব মাসে রোজা রাখার বিশেষ কোন ফজিলতের কথা বর্ণিত আছে কী?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রজব মাস হারাম মাসসমূহের একটি। যে হারাম মাসসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:....[সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৬] হারাম মাসগুলো হচ্ছে- রজব, যুলকদ, যুলহজ্জ ও মুহররম মাস।

বুখারি (৪৬৬২) ও মুসলিম (১৬৭৯) আবু বকরা (রাঃ) থেকে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “ বছর হচ্ছে- বার মাস। এর মধ্যে চার মাস- হারাম (নিষিদ্ধ)। চারটির মধ্যে তিনটি ধারাবাহিক: যুলকদ, যুলহজ্জ, মুহররম ও (মুদার গোত্রের) রজবমাস; যে মাসটি জুমাদাল আখেরা ও শাবান মাস এর মধ্যবর্তী।”

এ মাসগুলোকে ‘হারাম’ আখ্যায়িত করা হয় দুইটি কারণে:

১. এ মাসগুলোতে যুদ্ধ হারাম হওয়ার কারণে। তবে শত্রু যদি প্রথমে যুদ্ধের সূত্রপাত করে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

২. এ মাসগুলোতে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া অন্য মাসে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে বেশি গুনাহ।

তাই আল্লাহ তাআলা এ মাসগুলোতে গুনাহে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন: “ এগুলোতে তোমরা নিজেদের উপর জুলুম করোনা” [সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৬] যদিও এ মাসগুলোতে পাপে লিপ্ত হওয়া যেমন নিষিদ্ধ তেমনি অন্য যে কোন মাসে পাপে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ; তদুপরি এ মাসগুলোতে পাপে লিপ্ত হওয়া অধিক গুনাহ।

শাইখ সা’দী (রহঃ) (পৃষ্ঠা-৩৭৩) বলেন:

“ এগুলোতে তোমরা নিজেদের উপর জুলুম করো না” এখানে সর্বনামের একটা নির্দেশনা হতে পারে- বার মাস। আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এ মাসগুলো মানুষের হিসাব রাখার সুবিধার্থে সৃষ্টি করেছেন। এমাসগুলোতে তাঁর ইবাদত করা হবে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে এবং মানুষের কল্যাণের মাধ্যমে অতিবাহিত করা হবে। অতএব, এ মাসগুলোতে স্বীয় আত্মার উপর জুলুম করা থেকে সাবধান হোন।

আরেকটি সম্ভাবনা রয়েছে এখানে সর্বনামটি চারটি হারাম মাসকে নির্দেশ করছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে- এ মাসগুলোতে জুলুম করা থেকে বিরত থাকার বিশেষ নিষেধাজ্ঞা জারী করা। যদিও যে কোন সময় জুলুম করা নিষিদ্ধ। কিন্তু এ মাসগুলোতে জুলুমের গুনাহ বেশি মারাত্মক। সমাপ্ত

দুই:

কিন্তু রজব মাসে রোজা রাখা বা রজব মাসের কিছু অংশে রোজা রাখার ব্যাপারে কোন সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়নি। কিছু কিছু মানুষ রজবমাসের বিশেষ ফজিলত রয়েছে মনে করে এ মাসের বিশেষ কিছু দিনে যে রোজা রাখে এধরণের বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই।

তবে হারাম মাসসমূহে (রজব একটি হারাম মাস) রোজারাখা মুস্তাহাব মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিসবর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ হারাম মাসগুলোতে রোজা রাখ; এবং রোজা ভঙ্গও কর” [আবু দাউদ, হাদিস নং- ২৪২৮, আলবানী হাদিসটিকে যথার্থ বা দুর্বল বলেছেন]

এ হাদিসটি যদি সাব্যস্ত হয় তাহলে হারাম মাসেরোজা রাখা মুস্তাহাব প্রমাণ হবে। অতএব, যে ব্যক্তি এ হাদিসের ভিত্তিতে রজবমাসে রোজা রাখে এবং অন্য হারাম মাসেও রোজা রাখে এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে রজব মাসকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে রোজা রাখা যাবে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মাজমুউল ফাতাওয়া (২৫/২৯০) গ্রন্থে বলেন:

পক্ষান্তরে রজব মাসে রোজা রাখা সংক্রান্ত সবগুলো হাদিস দুর্বল; বরঞ্চ মাওযু (বানোয়াট)। আলেমগণ এর কোনটির উপর নির্ভর করেন না। ফজিলতের ক্ষেত্রে যে মানের দুর্বল হাদিস বর্ণনা করা যায় এটি সেমানের নয়। বরং এ সংক্রান্ত সবগুলো হাদিস মাওজু (বানোয়াট) ও মিথ্যা।

মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হারাম মাসসমূহেরোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। হারাম মাসগুলো হচ্ছে- রজব, যুলকদ, যুলহজ্জ, মুহাররম। এটি চারটি মাসের ব্যাপারেই এসেছে। বিশেষভাবে রজব মাসের ব্যাপার নয়। সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন:

“ রজব মাসে রোজা রাখা ও নফল নামায পড়ার ব্যাপারে যে কয়টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে সব ক’টি মিথ্যা” [আল মানার আল-মুনিফ, পৃষ্ঠা- ৯৬]

ইবনে হাজার (রহঃ) ‘তাবয়িনুল আজাব’ (পৃষ্ঠা- ১১) বলেন:

রজব মাসের ফজিলত, এ মাসে রোজা রাখা বা এ মাসেরবিশেষ বিশেষ দিনে রোজা রাখার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। অথবা এ মাসের বিশেষ কোন রাত্রিতে নামায পড়ার ব্যাপারে সহিহ কোন হাদিস নেই। সমাপ্ত

শাইখ সাইয়্যেদ সাবেক (রহঃ) “ ফিকহুস সুন্নাহ’ গ্রন্থে (১/৩৮৩) বলেন:

অন্য মাসগুলোর উপর রজব মাসের বিশেষ কোন ফজিলত নেই। তবে এটি হারাম মাসসমূহের একটি। এ মাসে রোজা রাখার বিশেষ কোন ফজিলত কোনসহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়নি। এ বিশেষ যে ক’টি বর্ণনা রয়েছে এর কোনটি দলিলহিসেবে গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়। সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীনকে ২৭ শে রজব সিয়াম ও কিয়াম পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলেন: “ সবিশেষ মর্যাদা দিয়ে ২৭ শেরজব সিয়াম ও কিয়াম পালন- বিদআত। আর প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রান্তি।” সমাপ্ত [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ উছাইমীন, (২০/৪৪০)]

প্রশ্ন

রমযানের পর শাওয়াল মাসে ছয় রোযা রাখাকে আপনি কি দৃষ্টিতে দেখেন? ইমাম মালেকের মুয়াত্তা গ্রন্থে এসেছে যে, ইমাম মালেক বিন আনাস রমযানের ঈদের পর ছয় রোযার ব্যাপারে বলেছেন যে, তিনি ইলম ও ফিকহধারী কোন ব্যক্তিকে পাননি যিনি এইরোযাগুলো রাখতেন। এবং তার কাছে কোন সালাফ থেকে এই মর্মে কোন বর্ণনা পৌঁছেনি। আলেমরা এটাকে মাকরুহ মনে করতেন এবং বিদআত হওয়ার আশংকা করতেন এবং অন্যকিছুকে রমযানের অধিভুক্ত করার আশংকা করতেন। এ কথা মুয়াত্তার প্রথম খণ্ড ২২৮নং এ রয়েছে।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

আবু আইয়ুব (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি রমজানমাসে রোযা রাখল, এর অনুবর্তীতে শাওয়াল মাসেও ছয়দিন রোযা রাখল—সে যেন গোটা বছর রোযা রাখল ।” [মুসনাদে আহমাদ (৫/৪১৭), সহিহ মুসলিম (২/৮২২), সুনানে আবু দাউদ (২৪৩৩) ও সুনানে তিরমিযি (১১৬৪)]

এটি সহিহ হাদিস; যা প্রমাণ করেছে, শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা সুন্নত । ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমাদ ও একদলআলেম ও ইমাম এর উপর আমল করেছেন । এই হাদিসের বিপরীতে কোন কোন আলেম যে কারণগুলো উল্লেখ করে এই রোযা গুলো রাখাকে মাকরুহ বলেন সেসব সঠিক নয় । যেমন— সাধারণ মানুষ মনে করে বসবে যে, এগুলো রমযানের রোযা, কিংবা কেউ এ রোযাগুলোকে ফরয রোযা ধারণা করার আশংকা, কিংবা তাঁর কাছে এমন কোন তথ্য পৌঁছেনি যে, পূর্ববর্তী কোন আলেম এ রোযাগুলো রেখেছেন; ইত্যাদি অনুমান সহিহ সুনানির মোকাবিলা করতে পারে না । আর যিনি জেনেছেন তিনি যিনি জানেন না তার উপর হুজ্জত (প্রমাণ) ।

আল্লাহ তাওফিক দিন ।

প্রশ্ন

শাওয়াল মাসের ছয় রোযা কি লাগাতরভাবে রাখা শর্ত নাকি আমি আলাদা আলাদাভাবে রাখতে পারি? কেননা আমি চাচ্ছি, প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে সাপ্তাহিক ছুটির দুই দিনে তিন ধাপে রোযাগুলো রাখতে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

শাওয়ালের রোযাগুলো লাগাতরভাবে রাখা শর্ত নয় । তাই এ রোযাগুলো কেউ আলাদা আলাদাভাবে রাখুক কিংবা লাগাতরভাবে রাখুক এতে কোন অসুবিধা নেই । তবে যত তাড়াতাড়ি আদায় করা যায় ততভাল । কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা ভাল কাজে অগ্রণী হও ।” আল্লাহ আরও বলেন: “তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে দ্রুত ছুটে আস ।” মুসা আলাইহিস সালাম বলেন: “আমি তাড়াতাড়ি আপনার কাছে আসলাম, আপনি সন্তুষ্ট হবেন এজন্য ।” [সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৮৪] তাছাড়া দেরী করলে নানা বিপদ-আপদ ঘটতে পারে । এটি শায়েফি মাযহাবের আলেমগণ ও হাম্বলি মাযহাবের কিছু কিছু আলেমের অভিমত । কিন্তু, অবিলম্বে আদায় না করে মাসের মাঝখানে কিংবা শেষে আদায় করলেও কোন অসুবিধা নেই ।

ইমাম নববী বলেন:

“আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেন: এ হাদিসের দলিলের ভিত্তিতে শাওয়াল মাসের ছয় রোযা রাখা মুস্তাহাব । শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে লাগাতরভাবে রোযাগুলো রাখা মুস্তাহাব । আর যদি আলাদাভাবে রাখে কিংবা শাওয়াল মাসের পরে রাখে তবুও জায়েয হবে এবং এ সুন্নত পালনকারী হিসেবে গণ্য হবে এ হাদিসের ব্যাপকতার কারণে । এবিষয়ে আমাদের আলেমগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই । ইমাম আহমাদ ও দাউদও এ অভিমতব্যক্ত করেছেন ।” [আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব]

প্রশ্ন

শাওয়াল মাসে ছয় রোজা রাখার হুকুম কি? এই রোজাগুলো রাখা কি ফরজ?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

রমজানের সিয়াম পালনের পরশাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখা সুন্নত-মুস্তাহাব; ফরজ নয়। শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোজা রাখার বিধান রয়েছে। এ রোজা পালনের মর্যাদা অনেক বড়, এতে প্রভূত সওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি এ রোজাগুলো পালন করবে সে যেন গোটা বছর রোজা রাখল। এবিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আবু আইয়ুব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখল এরপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখল সে যেন গোটা বছর রোজা রাখল।” সহিহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, জামেতিরমিজি, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহ। এ হাদিসকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য বাণী দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি বলেন: “ যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পরে ছয়দিন রোজা রাখবে সে যেন গোটা বছর রোজা রাখল: যে ব্যক্তি একটি নেকি করবে সে দশগুণ সওয়াব পাবে।” অন্য বর্ণনাতে আছে- “ আল্লাহ এক নেকিকে দশগুণ করেন। সুতরাং এক মাসের রোজা দশ মাসের রোজার সমান। বাকী ছয়দিন রোজা রাখলে এক বছর হয়ে গেল।” সুনানে নাসায়ী, সুনানে ইবনে মাজাহ। হাদিসটি সহিহ আত-তারগীব ও তারহীব (১/৪২১) গ্রন্থেও রয়েছে। সহিহ ইবনে খুজাইমাতে হাদিসটি এসেছে এ ভাষায়- “ রমজান মাসের রোজা হচ্ছে দশ মাসের সমান। আর ছয়দিনের রোজা হচ্ছে- দুই মাসের সমান। এভাবে এক বছরের রোজা হয়ে গেল।”

হাম্বলি মাযহাব ও শাফেয়ি মাযহাবের ফিকাহবিদগণ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, রমজান মাসের পর শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোজা রাখা একবছর ফরজ রোজা পালনের সমান। অন্যথায় সাধারণ নফল রোজার ক্ষেত্রেও সওয়াব বহুগুণ হওয়া সাব্যস্ত। কেননা একনেকিতে দশ নেকি দেয়া হয়।

এ ছাড়া শাওয়ালের ছয় রোজা রাখার আরও ফায়দা হচ্ছে- অবহেলার কারণে অথবা গুনাহর কারণে রমজানের রোজার উপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকে সেটা পুষিয়ে নেয়া। কেয়ামতের দিন ফরজ আমলের কমতি নফল আমল দিয়ে পূরণ করা হবে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কেয়ামতের দিন মানুষের আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। তিনি আরো বলেন: আমাদের রব ফেরেশতাদেরকে বলেন—অথচ তিনি সবকিছু জানেন- তোমরা আমার বান্দার নামায দেখ; সেকি নামায পূর্ণভাবে আদায় করেছে নাকি নামাযে ঘাটতি করেছে। যদি পূর্ণভাবে আদায় করে থাকে তাহলে পূর্ণ নামায লেখা হয়। আর যদি কিছু ঘাটতি থাকে তখন বলেন: দেখ আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কিনা? যদি নফল নামায থাকে তখন বলেন: নফল নামায দিয়ে বান্দার ফরজের ঘাটতি পূর্ণ কর। এরপর অন্য আমলের হিসাব নেয়া হবে। সুনানে আবু দাউদ।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

জনৈক ব্যক্তি শাওয়ালের ছয় রোজা রাখেন। কোন এক বছর তার অসুখ হল কিংবা কোন প্রতিবন্ধকতার শিকার হলেন কিংবা অলসতা করে রোজা রাখলেন না। এতে করে কি তার গুনাহ হবে? কেননা আমরা শুনেছি যে, যে ব্যক্তি এরোযাগুলো কোন বছর রাখে সে যেন এ রোযাগুলো আর না ছাড়ে।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ঈদের দিনের পরে শাওয়ালমাসে ছয় রোজা রাখা একটি সুন্নত। যে ব্যক্তি একবার রোযা রেখেছে কিংবা একাধিকবার রোযা রেখেছে তার উপর এ রোযা অব্যাহতভাবে রেখে যাওয়া ওয়াজিব হয় নাকি না রাখলে গুনাহগার হয় না।

আল্লাহই তাওফিকদাতা, আমাদের নবী মুহাম্মদ, তার পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীবর্গের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি শাওয়ালের ছয় রোযার মধ্যে তিনটি রোযা বীযের দিনগুলোর রোযার সাথে একই নিয়তে রাখবে সে কি ফযিলত পাবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

আমি আমাদের শাইখ আব্দুলআযিয বিন বায (রহঃ) কে এ মাসযালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। জবাবে তিনি বলেন: আশা করি তিনি সে ফযিলত পাবেন। কেননা তার ক্ষেত্রে এ কথা বলা সত্য যে, তিনি ছয় রোযা রেখেছেন এবং এ কথা বলাও সত্য যে, তিনি বীযের দিনগুলোর রোযারেখেছেন। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রশস্ত।

একই মাসযালার জবাবে শাইখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন আমাকে জবাবদিয়েছেন: হ্যাঁ। যদি কেউ শাওয়ালের ছয় রোযা রাখে তার উপর বীযের রোযাগুলো বাদহয়ে যাবে; হোক না তিনি বীযের দিনগুলোতে কিংবা আগে কিংবা পরে রোযাগুলো রাখুন না কেন। যেহেতু তার ক্ষেত্রে এ কথা বলা সত্য হয় যে, তিনি প্রত্যেকমাসের তিনদিন রোযা রেখেছেন। তিনি কি মাসের প্রথমে রোযাগুলো রাখলেন; নাকি মাঝে রাখলেন; নাকি শেষে রাখলেন সেটা ধর্তব্য নয়। সুন্নত নামায আদায় করার মাধ্যমে যেমন তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায পড়া বাদ হয়ে যায় এটি সেই শ্রেণীরআমল। কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে সুন্নত নামায পড়ে তাহলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করার বিধান বাদ হয়ে যায়...। আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

শাওয়ালের ছয় রোযা কি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রাখাটা সঠিক; যাতে করে আমি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখার সওয়াবও পেতে পারি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

হ্যাঁ। এতে কোন বাধা নেই। এভাবে রোযা রাখলে আপনার জন্য ছয় রোযার সওয়াব এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখার সওয়াবও লেখা হবে।

শাইখ মুহাম্মদ বিন উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"যদি এই ছয়দিনের রোযা সোমবারে বা বৃহস্পতিবারে পড়ে তাহলে তিনি দুটোসওয়াবই পেতে পারেন; যদি তিনি ছয় রোযার নিয়ত করেন এবং সোমবার বা বৃহস্পতিবারে রোযা রাখারও নিয়ত করেন। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কর্মসমূহ নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যা নিয়তকরেন সেটাই তার প্রাপ্য"। [সমাণ্ড]

মাননীয় শাইখ মুহাম্মদ বিন উছাইমীন (রহঃ)

ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/১৫৪)

প্রশ্ন

আমি শাওয়ালের ছয় রোযা রাখা কখন শুরু করতে পারি; যেহেতু এখন আমাদের বাৎসরিক ছুটি যাচ্ছে।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

শাওয়াল মাসের দ্বিতীয় দিনথেকে ছয় রোযা রাখা শুরু করা যায়। কেননা ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। আপনিচাইলে শাওয়াল মাসের যে কোন দিনসমূহে ছয় রোযা রাখতে পারেন। তবে, নেকীর কাজঅবিলম্বে করা উত্তম।

স্থায়ী কমিটির কাছে নিম্নোক্ত প্রশ্নটি এসেছে:

ছয় রোযা কি রমযানের পর ঈদের দিনের অব্যবহিত পরেই শুরু করা আবশ্যিক; নাকি ঈদের কয়েকদিন পর শাওয়াল মাসে লাগাতরভাবে রাখাও জায়েয; নাকি জায়েয নয়?

জবাবে তাঁরা বলেন: ঈদের দিনের অব্যবহিত পরেই ছয় রোযা রাখা আবশ্যিকীয় নয়। বরং ঈদের একদিন পর কিংবা কয়েক দিন পর শুরু করাও জায়েয। লাগাতরভাবে রাখা বাভেঙ্গে ভেঙ্গে রাখা; যেভাবে সুবিধা হয় সেভাবে রাখা জায়েয। এ বিষয়টি প্রশস্ত। এটি ফরয রোযা নয়; বরং সুন্নত রোযা।

আল্লাহুই তাওফিকদাতা, আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীবর্গের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

প্রশ্ন

আমি আশুরা সংক্রান্ত সবগুলো হাদিস পড়েছি। আমি কোনহাদিসে পাইনি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের সাথে পার্থক্য করার জন্য ১১ তারিখ রোযা রাখার কথা বলেছেন। তিনি শুধু বলেছেন: "আমি যদি আগামী বছর বাঁচি তাহলে অবশ্যই ৯ তারিখ ও ১০ তারিখ রোযা রাখব" ইহুদীদের সাথে পার্থক্য করণার্থে। অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীবর্গকেও ১১ তারিখ রোযা রাখার দিক-নির্দেশনা দেননি। অতএব, যে কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি কিংবা তাঁর সাহাবীবর্গ করেননি সেটা কি বিদাত হবে না? যে ব্যক্তি ৯ তারিখে রোযা রাখতে পারেনি সে কি শুধু ১০ তারিখে রোযা রাখবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুহররম মাসের ১১ তারিখে রোযা রাখাকে আলেমগণ মুস্তাহাব বলেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ দিনে রোযা রাখার নির্দেশ এসেছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আশুরার দিন (১০ তারিখে) রোযা রাখ। এক্ষেত্রে তোমরা ইহুদীদের সাথে পার্থক্য কর এবং আশুরার আগে একদিন বা পরে একদিন রোযা রাখ।" [মুসনাদে আহমাদ (২১৫৫)]

আলেমগণ এ হাদিসের শুদ্ধতা নিয়ে মতভেদ করেছেন। শাইখ আহমাদ শাকের হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন। আর মুসনাদ গ্রন্থের মুহাক্কিকগণ হাদিসটিকে 'যয়ীফ' (দুর্বল) বলেছেন।

এ হাদিসটি ইবনে খুযাইমাও এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আলবানী বলেন: "ইবনেআবি লাইলা নামক বর্ণনাকারীর মুখস্তশক্তির দুর্বলতার কারণে হাদিসটির সনদ 'যয়ীফ'। বর্ণনাকারী 'আতা' তার সাথে মতভেদ করেছেন এবং তিনি হাদিসটিকে ইবনেআব্বাস (রাঃ) এর উক্তি (মাওকুফ) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাহাবী ও বাইহাকীকর্তৃক সংকলিত সে সনদটি সহিহ [সমাণ্ড]

যদি এ হাদিসটির সনদ 'হাসান' পর্যায়ের হয় তাহলে তো ভাল। আর যদি হাদিসটি 'যয়ীফ' হয় তাহলে এমন ক্ষেত্রে আলেমগণ সহনশীলতা অবলম্বন করেন। কেননা হাদিসটির দুর্বলতা যৎসামান্য। যেহেতু হাদিসটি মিথ্যা বা বানোয়াট নয়। এবং যেহেতু হাদিসটি ফাযায়েলে আমল এর ক্ষেত্রে। বিশেষতঃ যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুহররম মাসে রোযা রাখার ব্যাপারে উৎসাহমূলক বর্ণনা এসেছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে মুহররম মাসের রোযা।" [সহিহ মুসলিম (১১৬৩)]

ইমাম বাইহাকী এ হাদিসটি পূর্বোক্ত ভাষায় তাঁর 'সুনানে কুবরা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অন্য এক বর্ণনার ভাষা হচ্ছে- "আগে একদিন ও পরে একদিন রোযা রাখ"। অর্থাৎ সে বর্ণনাতে "বা" এর পরিবর্তে "ও" রয়েছে।

হাফেয ইবনে হাজার তাঁর 'ইতহাফুল মাহারা' গ্রন্থে (২২২৫) হাদিসটি বর্ণনা করেন এ ভাষায়: "তোমরা এর আগে একদিন ও পরে একদিন রোযা রাখ"। এবং তিনি বলেন: "হাদিসটি আহমাদ ও বাইহাকী 'যয়ীফ সনদ'-এ বর্ণনা করেছেন; মুহাম্মদ বিন আবিলাইলা

এর দুর্বলতার কারণে। কিন্তু, তিনি এককভাবে হাদিসটি বর্ণনা করেননি। বরং তাকে অনুকরণ করেছেন: সালেহ বিন আবু সালেহ বিন হাইয়্য। [সমাণ্ড]

এ বর্ণনা থেকে ৯ তারিখ ও ১১ তারিখে রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়া জানা যায়।

কোন কোন আলেম ১১ তারিখে রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়ার আরেকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে- ১০ তারিখের রোযাটির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা। কারণহতে পারে লোকেরা মুহররম মাসের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকবে। যার কারণে সুনির্দিষ্টভাবে কোন দিনটি ১০ তারিখ সেটা হয়তো জানা যাবে না। তাই মুসলিম ব্যক্তি যদি ৯ তারিখ ও ১১ তারিখ রোযা রাখে তাহলে নিশ্চিতভাবে তার আশুরা (১০ তারিখ) এর রোযা রাখা হল।

ইবনে আবু শাইবা তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে (২/৩১৩) তাউস (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আশুরার আগে এক দিন ও পরে একদিন রোযা রাখতেন; ছুটে যাওয়ার ভয় থেকে।

ইমাম আহমাদ বলেন: "যে ব্যক্তি আশুরার রোযা রাখতে চায় সে যেন ৯ তারিখ ও ১০ তারিখ রোযা রাখে। তবে মাসগুলো নিয়ে কোন অনিশ্চয়তা থাকলে তাহলে তিনদিন রোযা রাখবে। ইবনে সিরিন এই অভিমত ব্যক্ত করতেন।" [সমাণ্ড] [আল-মুগনি (৪/৪৪১)]

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে ফুটে উঠল যে, তিন দিন রোযা রাখাকে বিদাত বলা ঠিক হবে না।

আর যে ব্যক্তি ৯ তারিখে রোযা রাখতে পারেনি সে ব্যক্তি শুধু ১০ তারিখে রোযা রাখতে কোন অসুবিধা নেই, এটা মাকরুহ হবে না। যদি এর সাথে ১১ তারিখও রোযা রাখে তাহলে সেটা উত্তম।

আল-মিরদাওয়ি তার 'ইনসাফ' গ্রন্থে (৩/৩৪৬) বলেন:

"মাযহাবের সঠিক মতানুযায়ী, এককভাবে ১০ তারিখ রোযা রাখা মাকরুহ নয়। শাইখতাকী উদ্দিন (ইবনে তাইমিয়া)ও একমত পোষণ করেছেন যে, মাকরুহ হবেনা। [সংক্ষেপিত ও সমাণ্ড]

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

শাবান মাসের অর্ধেকের পর রোযা রাখা কি জায়েয? কারণ আমি শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসের অর্ধেকের পর রোযা রাখতে বারণ করেছেন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "যখন শাবান মাসের অর্ধেক গত হবে তখন তোমরা আর রোযা রাখবে না।" [সুনানে আবু দাউদ (৩২৩৭), সুনানে তিরমিযি (৭৩৮), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৫১) এবং আলবানী 'সহিছত তিরমিযি' গ্রন্থে (৫৯০) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

এ হাদিসটি প্রমাণ করছে যে, শাবান মাসের অর্ধেক গত হওয়ার পর রোযা রাখা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ ১৬ তারিখ থেকে।

কিন্তু অন্য কিছু হাদিসে এ দিনগুলোতেও রোযা রাখা জায়েয হওয়ার কথা এসেছে। যেমন:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ তোমরা রমযানের একদিন বা দুইদিন আগে রোযা রাখবেন। তবে কারো যদি রোযা থাকার অভ্যাস থেকে থাকে সে ব্যক্তি রোযা রাখতে পারে।” [সহিহ বুখারী (১৯১৪) ও সহিহ মুসলিম (১০৮২)]

এ হাদিস প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তির রোযা থাকার অভ্যাস রয়েছে সেব্যক্তির জন্য অর্ধেক শাবানের পরেও রোযা রাখা জায়েয। যেমন যে ব্যক্তি প্রতিসোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা থাকে। কিংবা যে ব্যক্তি নিয়মিত একদিন রোযারাখে, একদিন রাখে না ... এ ধরণের।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা শাবান মাস রোযা রাখতেন। গোটা শাবানমাসের কিয়দংশ ছাড়া গোটা মাস রোযা রাখতেন [সহিহ বুখারী (১৯৭০) ও সহিহ মুসলিম (১১৫৬), ভাষ্য মুসলিমের]

ইমাম নববী বলেন: আয়েশা (রাঃ) এর উক্তি “ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা শাবান মাস রোযা রাখতেন। গোটা শাবান মাসের কিয়দংশ ছাড়া গোটা মাস রোযা রাখতেন” -র দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের ব্যাখ্যা। গোটা মাসের ব্যাখ্যা হচ্ছে- মাসের অধিকাংশ সময়। [সমাণ্ড]

এ হাদিস প্রমাণ করে যে, শাবান মাসের অর্ধেক গত হওয়ার পর রোযা রাখা বৈধ। কিন্তু যে ব্যক্তি আগের অর্ধেকের সাথে পরের অর্ধেক মিলিয়ে রোযা রাখবে তার জন্য।

শাফেয়ি মাযহাবের আলেমগণ এ সবগুলো হাদিসের উপর আমল করেছেন। তারা বলেন:

শাবান মাসের দ্বিতীয় অর্ধেকে রোযা রাখা শুধু তাদের জন্য বৈধ হবে যাদের রোযা রাখার বিশেষ কোন অভ্যাস আছে কিংবা তারা প্রথম অর্ধেক থেকে রোযা রেখে আসছে।

তাদের অধিকাংশ আলেমের মতে, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে- হাদিসে নিষেধাজ্ঞাটি হারাম বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাদের কোন কোন আলেমের মতে, -যেমন রুয়ানি- এখানে নিষেধাজ্ঞাটি মাকরুহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; হারাম অর্থে নয়।

[দেখুন: আল-মাজমু (৬/৩৯৯-৪০০), ফাতহুল বারী (৪/১২৯)]

ইমাম নববী ‘রিয়াদুস সালাহীন’ (পৃষ্ঠা-৪১২) গ্রন্থে বলেন:

“ পরিচ্ছেদ: অর্ধ শাবানের পর রমযানের একদিন আগে রোযা পালন করার উপরনিষেধাজ্ঞা; তবে যে ব্যক্তি এর আগে থেকে লাগাতার রোযা রেখে আসছে কিংবা যেব্যক্তির অভ্যাসগত রোযা এতে পড়ে যায়, যেমন যার অভ্যাস হচ্ছে- সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা পালন করা তারা ঐ দিনসমূহে রোযা পালন করতে পারবে।” [সমাণ্ড]

সংখ্যা গরিষ্ঠ আলেমের মতে, অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখা নিষিদ্ধ হওয়াসংক্রান্ত হাদিস দুর্বল। এর ভিত্তিতে তারা বলেছেন: অর্ধ শাবানের পর রোযারাখা মাকরুহ নয়।

হাফেয ইবনে হাজার বলেন:

সংখ্যা গরিষ্ঠ আলেমের মতে, অর্ধ শাবানের পর নফল রোযা রাখা জায়েয। তারা এব্যাপারে বর্ণিত হাদিসকে দুর্বল বলেন। ইমাম আহমাদ ও ইবনে মাজিন বলেছেন: হাদিসটি মুনকার। [ফাতহুল বারী থেকে সমাণ্ড] আরও যারা হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন: বাইহাকী ও তাহাবী।

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে বলেন: ইমাম আহমাদ এই হাদিস সম্পর্কে বলেছেন: হাদিসটি সংরক্ষিত নয়; আমরা এ হাদিস সম্পর্কে আব্দুর রহমান বিন মাহদিকে জিজ্ঞেস করেছি: তিনি হাদিসটিকে সহিহ বলেননি এবং আমাদের নিকট হাদিসটি রেওয়ায়েত করেননি। তিনি এ হাদিসটি এড়িয়ে যেতেন। আহমাদ বলেন: আলাএকজন নির্ভরযোগ্য রাবী (বর্ণনাকারী); এ হাদিসটি ছাড়া তার অন্য কোন হাদিস মুনকার নয়।” [সমাণ্ড]

আলা হচ্ছেন- আলা বিন আব্দুর রহমান। তিনি এ হাদিসটি তার পিতা থেকে তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) তাহযিবুস্ সুনান গ্রন্থে এ হাদিসকে যারা দুর্বল বলেছেন তাদের প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। তার বক্তব্যের সারাংশ হল: এ হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ সহিহ হাদিস। এ হাদিসটি আলা এককভাবে বর্ণনা করলেও তাতে দোষের কিছু নেই। যেহেতু আলা একজন ছিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী। ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে আলা-র সূত্রে তার পিতা থেকে তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) কয়েকটি হাদিস সংকলন করেছেন। এমন অনেক হাদিস রয়েছে যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নির্ভরযোগ্য রাবীগণ এককভাবে বর্ণনাকরেছেন এবং মুসলিম উম্মাহ সে হাদিসগুলো গ্রহণ করেছে ও সেগুলোর উপর আমল করেছে...। এরপর তিনি বলেন:

আর এ হাদিসটি শাবান মাসে রোযা রাখার প্রমাণ বহনকারী হাদিসগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার প্রসঙ্গে কথা হল: এ হাদিসদ্বয়ের মাঝে কোন সংঘর্ষ নেই। কারণ এ হাদিসগুলো শাবানের প্রথম অর্ধের সাথে মিলিয়ে দ্বিতীয় অর্ধের রোযা রাখার প্রমাণ বহন করে এবং ব্যক্তির অভ্যাসগত রোযা দ্বিতীয় অর্ধে রাখার প্রমাণ বহন করে। আর আলা-র হাদিস কোন অভ্যাস ব্যতিরেকে কিংবা প্রথম অর্ধের সাথে নামিলিয়ে স্বপ্রণোদিত হয়ে দ্বিতীয় অর্ধে রোযা রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। [সমাণ্ড]

শাইখ বিন বায (রহঃ) শাবান মাসের অর্ধাংশ গত হওয়ার পর রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: এটি সহিহ হাদিস; যেমনটি প্রিয় ভাই আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলাবানী বলেছেন। আর হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে- মাসের অর্ধেক শেষ হওয়ার পর নতুন করে রোযা রাখা শুরু করা। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি অধিকাংশ মাসরোযা রেখেছে কিংবা গোটা মাস রোযা রেখেছে সে ব্যক্তি সুন্নতেরই অনুসরণ করেছে। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ (১৫/৩৮৫) থেকে সমাণ্ড]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) রিয়াদুস সালাহীন এর ব্যাখ্যায় (৩/৩৯৪) বলেন:

এমনকি হাদিসটি যদি সহিহ সাব্যস্ত হয় তবুও হাদিসের নিষেধাজ্ঞা হারাম অর্থে নয়। বরং শুধু মাকরুহ অর্থে। কোন কোন আলেম হাদিসটির এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। তবে, কারো যদি রোযা রাখার বিশেষ অভ্যাস থাকে তাহলে সে ব্যক্তি অর্ধ শাবানের পরে হলেও রোযা রাখতে পারেন। [সমাণ্ড]

উত্তরের সারাংশ:

অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখা হারাম হিসেবে কিংবা মাকরুহ হিসেবে নিষিদ্ধ। তবে যে ব্যক্তির রোযা রাখার বিশেষ কোন অভ্যাস আছে কিংবা যে ব্যক্তি অর্ধ শাবানের আগে থেকে রোযা রেখে আসছে তার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হবে না। আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

এই নিষেধাজ্ঞার গূঢ় রহস্য হচ্ছে:

লাগাতার রোযা রাখার মাধ্যমে রমযানের রোযা পালনে দুর্বল হয়ে পড়বে।

যদি কেউ বলে যে, কেউ যদি মাসের শুরু থেকে রোযা রেখে আসে তাহলে তো সে আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে?

জবাব হচ্ছে: যে ব্যক্তি শাবান মাসের শুরু থেকেই রোযা রেখে আসছে তার কাছেরোযা রাখাটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এতে করে রোযা রাখার কষ্ট তার কাছে কম হয়।

আল-ক্বারী বলেন: নিষেধাজ্ঞাটি উম্মতের প্রতি দয়া স্বরূপ তানযিহমূলক; যাতেকরে তারা উদ্যমতার সাথে রমযানের রোযা পালন করা থেকে দুর্বল হয়ে না পড়ে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ শাবান মাস রোযা পালন করবে সে তো রোযাপালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বিধায় তার কষ্ট দূর হয়ে যাবে। [সমাণ্ড]

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন

আমার জন্যে গোটা শাবান মাস রোযা রাখা কি সুন্নত?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

শাবান মাসে বেশি বেশি রোযা রাখা মুস্তাহাব ।

হাদিসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা শাবান মাস রোযা রাখতেন ।

উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে টানা দুইমাস রোযা রাখতে দেখিনি । তবে তিনি রমযানের সাথে শাবান মাসও লাগাতারভাবে রোযা রাখতেন ।” [মুসনাদে আহমাদ (২৬০২২), সুনানে আবু দাউদ (২৩৩৬), সুনানে নাসাঈ (২১৭৫), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৪৮)]

হাদিসটি সুনানে আবু দাউদ এর ভাষ্যে এসেছে যে, “ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বছরের কোন মাসের গোটা অংশ রোযা রাখতেন না; শুধু শাবান মাস ছাড়া । তিনি শাবান মাস ও রমযান মাস লাগাতারভাবে রোযা রাখতেন ।” [আলবানী সহিহুআবি দাউদ গ্রন্থে (২০৪৮) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

এ হাদিসের বাহ্যিক ভাব থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা শাবান মাস রোযা রাখতেন ।

কিন্তু অন্য রেওয়াজে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু অংশ ছাড়া গোটা শাবান মাস রোযা রাখতেন ।

আবু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আয়েশা (রাঃ) কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম; তিনি বললেন: তিনি এমনভাবে রোযা রাখতে থাকতেন; আমরা বলতাম তিনি বুঝি রোযাতে কাটাবেন । আবার তিনি এভাবে রোযা বাদ দিতেন, ফলে আমরা বলতাম তিনি বুঝি আর রোযা রাখবেন না । আমি শাবান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে তাকে এত বেশি রোযা রাখতে দেখিনি । তিনি গোটা শাবান মাস রোযা রাখতেন । তিনি শাবান মাসের কিছু অংশ ছাড়া গোটা মাস রোযা রাখতেন ।

আলেমগণ এই হাদিসদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় করা নিয়ে মতভেদ করেছেন:

কোন কোন আলেমের মতে, এটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘটেছে । অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন বছর গোটা শাবান মাস রোযা রেখেছেন । আর কোন কোন বছর অল্প কিছুদিন ছাড়া গোটা মাস রোযা রেখেছেন । এটি শাইখ বিন বায (রহঃ) এর অভিমত [দেখুন: মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বিন বায (১৫/৪১৬)]

অপর একদল আলেমদের মতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান ছাড়া আর কোন মাসে সম্পূর্ণ মাস রোযা রাখেননি । তারা উম্মে সালামা (রাঃ) এর হাদিসকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনি সামান্য কিছু অংশ ছাড়া গোটা শাবানমাস রোযা রেখেছেন । তারা বলেন: আরবী ভাষাতে এভাবে বলা জায়েয আছে । যদি কেউমাসের বেশির সময় রোযা থাকে সেক্ষেত্রে বলা যায়: صام الشهر كله (সে গোটা মাস রোযা রেখেছে ।)

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: উম্মে সালামা (রাঃ) এর হাদিসের ভাষ্য: “ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বছরের কোন মাসের গোটা অংশ রোযা রাখতেন না; শুধু শাবান মাস ছাড়া । তিনি লাগাতারভাবে শাবান ও রমযান মাস রোযা রাখতেন ।” এর ব্যাখ্যা রয়েছে আয়েশা (রাঃ) এর হাদিসে । অর্থাৎ তিনি শাবানের অধিকাংশ সময় রোযা থাকতেন । ইমাম তিরমিযি ইবনুল মুবারক থেকে

বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: যদি কেউ মাসের অধিকাংশ সময় রোযা থাকে তার ক্ষেত্রে গোটা মাসরোযা থেকেছে বলা ভাষাগতভাবে বৈধ...” ।

ত্বীবি বলেন: এ হাদিসের ব্যাখ্যা এভাবে করা হবে যে, তিনি কোন কোন বার সম্পূর্ণ শাবান মাস রোযা রাখতেন। আবার কোন কোন বার মাসের অধিকাংশ দিন রোযা রাখতেন; যাতে করে কেউ এটা না ভাবে যে, রমযানের মত এটাও ওয়াজিব।

অতঃপর ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: প্রথম ব্যাখ্যাটিই সঠিক [সমাণ্ড]

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ শাবান মাস রোযা রাখেননি। তিনি এর সপক্ষে দলিল দেন সহিহ মুসলিম (৭৪৬)-এ বর্ণিত আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস দিয়ে যে, তিনি বলেন: আমি এমন কিছু জানি না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা কুরআন এক রাতে পড়েছেন, কিংবা ফজর পর্যন্ত সারারাত নামায পড়েছেন, কিংবা রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে সারা মাস রোযা রেখেছেন। তিনি আরও দলিল দেন বুখারী (১৯৭১) ও মুসলিম (১১৫৭) কর্তৃক সংকলিত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিস দিয়ে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে গোটা মাস রোযা রাখেননি।

উম্মে সালামা (রাঃ) এর হাদিসের ব্যাখ্যায় সিন্দি বলেন: شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ (রমযান ও শাবান মাস লাগাতর রোযা রাখতেন)। অর্থাৎ উভয়মাসের সম্পূর্ণ অংশ রোযা রাখতেন। হাদিসের বাহ্যিক ভাব হচ্ছে- তিনি গোটা শাবান মাসরোযা রাখতেন। কিন্তু, এমন কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে হাদিসগুলো এর বিপরীতবিষয় প্রমাণ করে। তাই এ হাদিসকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তিনি মাসের বেশিরভাগ সময় রোযা থাকতেন; যেন তিনি গোটা মাসেই রোযা থেকেছেন এবং রমযানের সাথে মিলিয়ে শাবান মাসও সিয়াম পালন করেছেন [সমাণ্ড]

যদি জিজ্ঞেস করা হয়: শাবান মাসে বেশি বেশি রোযা রাখার গুণ রহস্য কী?

জবাব হচ্ছে:

হাফেয ইবনে হাজার বলেন: এ ব্যাপারে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) এর যে হাদিসটি; যা ইমাম নাসাঈ, আবু দাউদ (আবু দাউদ সহিহ বলেছেন) ও ইবনে খুযাইমা সংকলন করেছেন। তিনি বলেন: আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শাবান মাসে যত বেশি রোযা রাখেন অন্য কোন মাসে আপনাকে এত রোযা রাখতে দেখিনি। তিনি বলেন: এটি রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী এমন এক মাস যে মাসসম্পর্কে মানুষ গাফেল, যে মাসে আমলগুলো রাবুল আলামীনের কাছে উত্তোলন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি আমি রোযা থাকা অবস্থায় যেন আমার আমল উত্তোলন করা হয় [আলবানী সহিহুন নাসাঈ গ্রন্থে (২২২১) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]

আল্লাহুই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

আমি এ বছর আশুরার রোযা রাখতে চাই। কিছু লোক আমাকে জানিয়েছেন যে, সন্নত হচ্ছে- আশুরার সাথে এর আগের দিন (৯ তারিখ)ও রোযা রাখা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোন দিকনির্দেশনা এসেছি কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার রোযা রাখলেন এবং রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন তখন সাহাবীবরা বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই দিনকে তো ইহুদী-নাসারারা মর্যাদা দিয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ইনশাআল্লাহ; আগামী বছর আমরা ৯ তারিখেও রোযা রাখব। তিনি বলেন: আগামী বছর আসার আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেলেন। [সহিহ মুসলিম (১৯১৬)]

ইমাম শাফেয়ি ও তাঁর অনুসারীরা, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক প্রমুখ আলেমগণ বলেন: ৯ তারিখ ও ১০ তারিখ উভয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১০ তারিখে রোযা রেখেছেন এবং ৯ তারিখে রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে: আশুরার রোযা রাখার একাধিক স্তর রয়েছে। সবনিম্নস্তর হচ্ছে- শুধু ১০ তারিখে রোযা রাখা। এর উপরের স্তর হচ্ছে- ৯ তারিখেরসাথে অন্য একদিনও রোযা রাখা। আর মুহররম মাসে যতবেশি রোযা রাখা যায় তত উত্তমও ভাল।

যদি কেউ বলেন যে, ১০ তারিখের সাথে ৯ তারিখ রোযা রাখার গুচ রহস্য কী?

জবাব হচ্ছে-

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: আমাদের মায়হাবের আলেমগণ ও অন্যান্য আলেমগণ ৯ তারিখে রোযা রাখার গুচ রহস্য সম্পর্কিত কয়েকটি দিক উল্লেখ করেছেন:

১. এর পিছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে- ইহুদীদের সাথে পার্থক্য তৈরী করা। যেহেতু তারা শুধু ১০ তারিখে রোযা রাখে। এটি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

২. আশুরার দিনের সাথে আরও একটি রোযাকে মিলানো। যেমনটি এককভাবে শুধু জুমার দিন রোযা রাখা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

৩। দশ তারিখের রোযাটির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা এই আশংকায় যে, চাঁদের হিসাবে কমতি হতে পারে, ভুল হতে পারে। তখন হিসাবে যেদিনই ৯ তারিখবাস্তবে সেই দিন ১০ তারিখ হবে। [সমাণ্ড]

উল্লেখিত এ দিকগুলোর মধ্যে আহলে কিতাবদের সাথে পার্থক্য তৈরী করা এটি সবচেয়ে মজবুত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাঃ) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক হাদিসে আহলে কিতাবদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকেবারণ করেছেন। যেমন, আশুরার ব্যাপারে তাঁর বাণী: “ যদি আমি আগামী বছর বাঁচিতাহলে অবশ্যই ৯ তারিখে রোযা রাখব।” [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা; খণ্ড-০৫]

ইবনে হাজার (রহঃ) “ যদি আমি আগামী বছর বাঁচি তাহলে অবশ্যই ৯ তারিখে রোযা রাখব।” এই হাদিসের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

তিনি যে, ৯ তারিখে রোযা রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন এর ব্যাখ্যা হচ্ছে-শুধু ৯ তারিখে রোযা রাখা নয়; বরং ১০ তারিখের সাথে ৯ তারিখেও রোযা রাখা; সতর্কতামূলক কিংবা ইহুদি-নাসারাদের বিরুদ্ধাচারণমূলক। শেষোক্ত কারণটি অগ্রগণ্য। সহিহ মুসলিমের কিছু রেওয়াজেত থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। [ফাতহুলবারী (৪/২৪৫)]

প্রশ্ন

আমি যদি মদ্যপ হই এবং আগামীকাল ও এর পরের দিন (মুহররম এর ৯ তারিখ ও ১০ তারিখ) রোযা রাখার নিয়তকরি আমার রোযা কি ধর্তব্য হবে এবং এর মাধ্যমে আমার বিগত এক বছর ও আগত একবছরের গুনাহ মাফ হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে রোযার মাধ্যমে আল্লাহ দুই বছরের গুনাহ মাফ করেন সেটা আরাফার দিনের রোযা। আর আশুরার রোযার মাধ্যমে আল্লাহ এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করেন। আরাফার দিনের রোযার ফযিলত সম্পর্কে জানতে [98334](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন। আর আশুরার রোযার ফযিলত সম্পর্কে জানতে [21775](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

দুই:

নিঃসন্দেহে মদ পান করা কবিরা গুনাহ। বিশেষতঃ পুনঃপুনঃ পান করতে থাকা। কারণ মদ হচ্ছে সকল অশ্লীলতার মূল। এটি সকল অনিষ্টের পথ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদের সাথে সম্পৃক্ত দশব্যক্তিকে লানত করেছেন। ইমাম তিরমিযি (১২৯৫) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের সাথে সংশ্লিষ্ট দশ ব্যক্তির ওপর লা'নত করেছেন: যে মদ তৈরি করে, যে মদ তৈরির নির্দেশ দেয়, যে মদ পান করে, যে মদ বহন করে, যার জন্য মদ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, যে মদ পান করায়, যে মদ বিক্রি করে, যে মদের আয় ভোগ করে, যে মদক্রয় করে, যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।” [আলবানি 'সহিহুত তিরমিযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

আপনার আবশ্যিকীয় কর্তব্য হচ্ছে- মদ পান বর্জন করা, মদের নেশা থেকে তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ হাদিসে এসেছে: আরাফার দিনের রোযা দুই বছরের পাপ মোচন করে। আশুরার দিনের রোযা এক বছরের পাপ মোচন করে। কিন্তু 'পাপ মোচন' করে এই শর্তবিযুক্তকথার দ্বারা তওবা ছাড়া কবিরা গুনাহ মাফ হওয়াটা আবশ্যিক হয় না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'এক জুমা থেকে অপর জুমা এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান' এর ব্যাপারে বলেছেন: “মাবের সব গুনাহকে মোচন করে যদি কবিরাগুনাহ থেকে বিরত থাকা হয়।” সবার জানা আছে যে, রোযার চেয়ে নামায উত্তম এবং আরাফার রোযার চেয়ে রমযানের রোযা উত্তম; অথচ কবিরা গুনাহ থেকে বিরত না থাকলে এগুলোর মাধ্যমে পাপ মোচন হয় না; যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এই হাদিসে) শর্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, এক, দুই দিনের নফল রোযার মাধ্যমে ব্যভিচার, চুরি, মদ পান, জুয়া, যাদু ইত্যাদি গুনাহ মাফ হবে?! অর্থাৎ এ ধরনের গুনাহ মাফ হবে না।” [আল-ফাতাওয়াআল-মিসরিয়্যা (১/২৫৪) সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন:

“কেউ কেউ বলে যে, আশুরার রোযা গোটা বছরের পাপমোচন করে। আর আরাফার রোযা সওয়াব বৃদ্ধির জন্য অবশিষ্ট থাকল। এই প্রবঞ্চিতলোকটি জানে না যে, রমযানের রোযা ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায আরাফার রোযা ও আশুরার রোযার চেয়ে উত্তম ও মহান। অথচ এগুলোর মাধ্যমে কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকারশর্তে পাপ মোচন হয়। তাই এক রমযান থেকে অপর রমযান, এক জুমা থেকে অপর জুমা 'সগিরা গুনাহ' মোচন করানোর মত শক্তি পায় না; যদি না এর সাথে কবিরা থেকে বিরত থাকা হয়। বরঞ্চ দুইটি বিষয় একযোগে হওয়ার পর সগিরা গুনাহ মাফ হয়।

তাহলে কিভাবে একদিনের নফল রোযা বান্দা কর্তৃক পুনঃপুনঃ সম্পাদিত সকল কবিরা গুনাহকে তওবা ছাড়া মাফ করাবে? এটি অসম্ভব।

তবে 'আরাফার রোযা ও আশুরার রোযা সারা বছরের পাপমোচন করে' এই সাধারণ অর্থ ধরলে এটি আশ্বাসমূলক দলিলগুলোর অন্তর্ভুক্ত হতেকোন বাধা নেই; যে দলিলগুলোর ক্ষেত্রে শর্ত পাওয়া ও প্রতিবন্ধকতা মুক্ত হওয়া প্রযোজ্য। তখন পুনঃপুনঃ কবিরা গুনাহ-তে লিপ্ত হওয়া গুনাহ মোচনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। আর কবিরা গুনাহ-তে পুনঃপুনঃ লিপ্ত না হলে তখন রোযা ও কবিরাগুনাহ-তে পুনঃপুনঃ লিপ্ত না-হওয়া এ দুটো যৌথ সহযোগিতার ভিত্তিতে সকল গুনাহমোচন করবে। যেমনিভাবে রমযানের রোযা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং কবিরা গুনাহহতে বিরত থাকা যৌথ সহযোগিতার ভিত্তিতে ছগিরা গুনাহগুলোকে মোচন করে। তবে আল্লাহ তাআলা যে বলেছেন, “তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যাকবিরা গুনাহ তা থেকে বিরত থাকলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো মার্জনা করেদিব।” [সূরা নিসা, আয়াত: ৩১] এর থেকে জানা যায় যে, কোন একটি বিষয়কে পাপমোচনের কারণ বানানো হলেও অন্য একটি কারণ এই কারণের সাথে একত্রিত হয়ে পাপমোচনে যৌথ সহযোগিতা করতে কোন বাধা নেই। আর দুইটি কারণ যৌথভাবে একটি কারণেরচেয়ে পাপ মোচনের শক্তি বেশি রাখে। 'কারণ' যত শক্তিশালী হবে পাপ মোচনেরক্ষমতা তত অধিক হবে। [আল-জাওয়াব আল-কাফি, পৃষ্ঠা-১৩ থেকে সমাপ্ত]

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ যে ব্যক্তি মদপান করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহ তার নামায কবুল করেন না। সে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। সে যদি পুনরায় তা পান করে তবে আল্লাহ চল্লিশদিন পর্যন্ত তার নামায কবুল করবেন না। যদি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। আবার যদি সে তা পান করে তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল করবেন না। কিন্তু সে যদি তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। চতুর্থবার পুনরায় সে যদি তা পান করে তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল করবেন না এবং তওবা করলেও আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন না। পরন্তু তাকে ‘নহরে-খাবাল’ (জাহান্নামীদের পূজের নহর) থেকে পান করাবেন।” [সুন্নে তিরমিযি (১৮৬২), আলবানি ‘সহিহত তিরমিযি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

মুবারকপুরী ‘তুহফাতুল আহওয়ালি’ গ্রন্থে বলেন:

বিশেষভাবে নামাযকে উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু শারীরিক ইবাদতের মধ্যে নামায সর্বোত্তম ইবাদত। অতএব, নামায যদি কবুল না হয় অন্য ইবাদত কবুল না হওয়া আরও অধিক যুক্তিযুক্ত। [তুহফাতুল আহওয়ালি (৫/৪৮৮) থেকে পরিমার্জিত ও সমাণ্ড]

একই ধরনের কথা ইরাকি ও মুনাওয়িও বলেছেন।

অতএব, পুনঃপুনঃ মদ পান করতে থাকলে যদি ইবাদতগুলো কবুল না হয় তাহলে আশুরার রোযা কিভাবে কবুল হবে?! আর কিভাবে এক বছরের পাপ মোচন করবে?!

আপনার কর্তব্য হচ্ছে- অবিলম্বে খালেস ওবিশ্বস্ত তওবা করা এবং মদ পানের মত জঘন্য যে কাজ করে আসছেন তা ছেড়ে দেয়া এবং আপনি যে কসুরের মধ্যে আছেন সেটার ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা। বেশি বেশি নেকির কাজ করা। আশা করি আল্লাহ আপনার তওবা কবুল করবেন, ইতিপূর্বে আপনি যে কসুর করেছেন ও আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করেছেন তা এড়িয়ে যাবেন।

তিন:

এতক্ষণ আমরা যা উল্লেখ করেছি এগুলো আরাফার দিনরোযা রাখা, আশুরার দিন রোযা রাখা কিংবা আপনার ইচ্ছানুযায়ী নামায, রোযা, সদকা ও কুরবানি ইত্যাদি অন্য যে কোন নফল আমল করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নয়। কারণ মদ পান করা এ সকল ইবাদত পালনে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে না। কবিরাগুনাহ-তে লিগু হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আপনি নিজেকে অন্য সকল নেকী ও ভাল কাজ থেকে দূরে রাখবেন; এতে তো অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকবে। বরং আপনি অবিলম্বে তওবা করুন, মদ পান ছেড়ে দিন, বেশি বেশি নেক কাজ করুন; এমনকি কখনও কুপ্রবৃত্তি যদি কোন গুনাহ করার ক্ষেত্রে আপনাকে পরাভূত করে ফেলে তবুও।

কেননা আমল সঠিক হওয়া ও কবুল হওয়া এক জিনিস; আর এক বছর বা দুই বছরের গুনাহ মোচনের বিশেষ মর্যাদা লাভ করা অন্য জিনিস।

জাফর বিন ইউনুস বলেন:

একবার তিনি শামের এক কাফেলার যাত্রী ছিলেন। আরবদস্যুরা কাফেলার উপর হামলা করে কাফেলাকে পাকড়াও করল। দস্যুরা কাফেলাকে দস্যুনেতার কাছে পেশ করল। সে এক থলি বের করল; এর ভিতরে চিনি ও বাদাম ছিল। দস্যুরা সবাই এগুলো খেল। কিন্তু দস্যুনেতা কিছুই খেল না।

আমি বললাম: তুমি খেলে না কেন? সে বলল: আমি রোযাদার!

আমি বললাম: তুমি ডাকাতি কর, সম্পদ ছিনিয়ে নাও, মানুষ হত্যা কর। আবার রোযাও থাক?!

সে বলল: শাইখ, আমি সংশোধনের জন্য কিছু সুযোগ রাখছি!!

একটা সময় পর আমি তাকে ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে দেখে বললাম: তুমি সেই লোক না?

সে বলল: সেই রোযা আমাকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে!![তারিখু দিমাশক (৬৬/৫২)]

প্রশ্ন

আল্লাহর নামে কসম (শপথ)সংক্রান্ত আমার একটি প্রশ্ন আছে। সেটা হচ্ছে, আমি আল্লাহর নামে শপথ করেছি যে, আমি অমুক স্থানে যাব না। কিন্তু, কসম করার এক সপ্তাহ পরে আমি সেস্থানে গিয়েছি। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, শাওয়ালের ছয় রোযার মধ্যে আমিতিনটি রোযা রাখব। এ তিনটি রোযা কি কসমের কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে? কিংবাকি? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আমরা প্রশ্নকারী ভাই এর প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করব:

১। প্রত্যেক মুসলিমের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে, যখন তখন ঐ সব বিষয়ে কসম করা থেকে নিজেকে হেফায়ত করা যেসব বিষয় আল্লাহর নামে কসম করার উপযুক্ত নয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে হেফায়ত কর।” [সূরামায়েদা, আয়াত: ৮৯]

শাইখ মুহাম্মদ বিন উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

মৌলিক বিধান হচ্ছে- বেশি বেশি শপথ না করা। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে হেফায়ত কর।” [সূরা মায়দা, আয়াত: ৮৯] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন আলেম বলেন: তোমরা বেশি বেশি শপথ করো না। নিঃসন্দেহে এটি উত্তম, নিরাপদ ও দায় মুক্ত থাকার জন্য শ্রেয়। [আল-শারহুল মুমতি (১৫/১১৭)]

২। যে স্থানে না-যাওয়ার জন্য আপনি শপথ করেছেন সেটি যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী নিষিদ্ধ স্থান হয়; যেখানে যাওয়া আপনার জন্য বৈধ নয়; তাহলে সে শপথপূর্ণ করা এবং সেখানে না-যাওয়া আপনার উপর ফরয। আর যদি সে স্থানে যাওয়া আপনার উপর ফরয হয়ে থাকে (যেমন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, কোন আত্মীয়কে দেখতে যাওয়া) তাহলে এ শপথ ভঙ্গ করা আপনার উপর ফরয; যদি যাওয়াটা আপনার উপরফরয হয়ে থাকে। আর যদি সেখানে যাওয়াটা মুস্তাহাব হয়ে থাকে, তাহলে শপথ ভঙ্গকরাও মুস্তাহাব। আর যদি সে স্থানে যাওয়াটা মুবাহ (বৈধ) হয়ে থাকে তাহলে আপনি দেখুন আপনার দ্বীনদারি ও দুনিয়াদারি জন্য কোনটা উত্তম, এবং আপনার রবের ভীতি তৈরীতে কোনটা উপযোগী সেটা করুন। যদি আপনার সে স্থানে যাওয়াটা উত্তম ওতাকওয়া পয়দাকারী হয় তাহলে আপনি সে স্থানে যান এবং আপনার শপথের কাফফারা দিয়েদিন। আর সে রকম না হলে আপনি সে স্থানে যাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।

আব্দুর রহমান বিন সামুরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যদি আপনি কোন একটি বিষয়ে শপথ করেন, এরপর দেখতে পান যে, অন্য বিষয়টি শপথকৃত বিষয়ের চেয়ে উত্তম তাহলে আপনি উত্তমটি পালন করুন এবং আপনার শপথ ভঙ্গের কাফফারা পরিশোধ করে দিন।” [সহিহবুখারী (৬৩৪৩) ও সহিহ মুসলিম (১৬৫২)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যেব্যক্তি কোন এক বিষয়ে শপথ করে ফেলার পর অন্য বিষয়টিকে উত্তম দেখতে পায় তাহলে সে যেন তার শপথের কাফফারা আদায় করে দেয় এবং যেটা উত্তম সেটাইকরে।” [সহিহ মুসলিম (১৬৫০)]

আল-মাওসুআ' আল-ফিকহিয়া গ্রন্থে(৮/৬৩) এসেছে-

বিরুদ্ধ ইয়ামিন (শপথ) এর মানে হচ্ছে- শপথের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত হওয়া এবং যা শপথ করা হয়েছে সেটা বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের জামিনদার করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যাকর নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন।” [সূরা নাহল, আয়াত: ৯১]

কোন ফরয আমল করা কিংবা হারাম কাজ পরিহার করার ক্ষেত্রে শপথ করা হলে তখন শপথ বাস্তবায়ন করা ফরয। তাই কোন নেককাজ করার শপথ করা হলে সে নেক কাজটি পালন করা হচ্ছে শপথ পূর্ণ করা। এক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গ করা হারাম। আর কোন ফরয আমল পরিত্যাগ করা কিংবা কোন গুনাহর কাজ করার শপথ করা হলে এটি বদ শপথ; এ ধরণের শপথ ভঙ্গ করা ফরয। আর যদি কোন নফল আমল করার শপথ করে যেমন নফল নামায পড়াকিংবা নফল সদকা করা; এক্ষেত্রে শপথ পূর্ণ করা মুস্তাহাব এবং শপথ ভঙ্গ করামাকরুহ।

আর যদি কোন নফল আমল পরিত্যাগ করার শপথ করে তাহলে এটি মাকরুহ শপথ এবং এশপথ পূর্ণ করাও মাকরুহ। বরং এ ক্ষেত্রে সুন্নত হচ্ছে- শপথ ভঙ্গ করা। আর যদি কোন মুবাহ কাজের ক্ষেত্রে শপথ হয় তাহলে সে শপথ ভঙ্গ করাও মুবাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ যদি আপনি কোন একটি বিষয়ে শপথ করেন, এরপর দেখতে পান যে, অন্য বিষয়টি শপথকৃত বিষয়ের চেয়ে উত্তম তাহলে আপনি উত্তমটি পালন করুন এবং আপনার শপথ ভঙ্গের কাফফারা পরিশোধ করে দিন।” [সমাণ্ড]

৩. আপনি শপথ ভঙ্গ করার বদলে তিনটি রোযা রাখার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটি নাজায়েয। তবে আপনি যদি দশজন মিসকীনকে খাবার দিতে কিংবা পোশাক দিতে অক্ষম হন তাহলে সেটা করতে পারেন। কারণ শপথ ভঙ্গের কাফফারা হচ্ছে- দশজন মিসকীনকে খাদ্য দেয়া কিংবা পোশাক দেয়া কিংবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করা। যে ব্যক্তির এগুলো কোনটি করার সামর্থ্য নেই সে তিনদিন রোযা রাখবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “ তোমাদের ইয়ামীনে লাগু (বৃথা শপথ) এর জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছে করে কর সেগুলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। এর কাফফারা হচ্ছে- দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরণের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও, বা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাসমুক্তি। অতঃপর যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফফারা। আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।” [সূরা মায়িদা, আয়াত: ৮৯]

দেখুন: [45676](#)নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

আপনার প্রশ্নের আরেকটি অংশ হচ্ছে, আপনি শপথের কাফফারার রোযা শাওয়ালমাসে রাখতে চাচ্ছেন এবং এ রোযাগুলোকে ছয় রোযার মধ্যে গুণতে চাচ্ছেন। বর্ণিত আছে যে, শাওয়ালের রোযার ফযিলত গোটা বছর ফরয রোযা রাখার সমান। তাই আমরা বলব: যদি আপনি মিসকীনকে খাদ্য দিতে ও পোশাক দিতে অক্ষম হওয়ায় আপনার দায়িত্বে রোযা রাখাই অবধারিত হয়ে যায় এক্ষেত্রে আপনি কাফফারার রোযাগুলোকে শাওয়ালের ছয় রোযার মধ্যে হিসাব করতে পারবেন না। কেননা, নফলরোযার নিয়ত ও ফরয রোযার নিয়ত একত্রে করা জায়েয নেই। কাফফারার রোযার জন্য স্বতন্ত্র বিশেষ নিয়তের প্রয়োজন রয়েছে; যেমনিভাবে শাওয়ালের ছয় রোযার জন্যেও নিয়তের প্রয়োজন। অতএব, কাফফারার জন্য আপনি যে তিনটি রোযা রাখবেন সে রোযাগুলোকে শাওয়ালের ছয় রোযার মধ্যে হিসাব করা যাবে না।

স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

শাওয়ালের ছয় রোযা, আশুরার রোযা ও আরাফার দিনের রোযা কি শপথ ভঙ্গের রোযা হিসেবে আদায় হবে? যদি ব্যক্তি শপথের সংখ্যা নির্ধারণ করতে অক্ষম হয়?

উত্তরে তারা বলেন: শপথের কাফফারা হচ্ছে, একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করা কিংবা দশজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো কিংবা তাদেরকে পোশাক দেয়া। যদি এগুলোর কোনটি কেউ করতে না পারে তাহলে সে প্রতিটি শপথ ভঙ্গের বদলে তিনদিন রোযা রাখবে।

আপনি বলেছেন যে, আপনি শপথের সংখ্যা হিসাব করতে অক্ষম: আপনার কর্তব্য হচ্ছে, কাছাকাছি সংখ্যা হিসাব করার চেষ্টা করা। এরপর এ শপথগুলোর মধ্যে যেগুলো আপনি ভঙ্গ করেছেন সেগুলোর কাফফারা আদায় করা। এভাবে করা আপনার জন্য যথেষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ।

আশুরার রোযা, আরাফার রোযা ও শাওয়ালের ছয় রোযা শপথ ভঙ্গের কাফফারার রোযা হিসেবে আদায় হবে না; তবে ব্যক্তি যদি নিয়ত করে যে, এটা কাফফারার রোযা; নফল রোযা নয় তাহলে আদায় হবে।

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন গাদইয়ান [ফাতাওয়াল লাজনাহ দায়িমাহ্ (২৩/৩৭,৩৮)]

শাইখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

প্রশ্নকারী বোন উল্লেখ করেছেন যে, তিনি শপথ করেছেন; এখন তিনি তিনদিনরোযা রেখে এ শপথের কাফফারা আদায় করতে চাচ্ছেন। আমার জন্যে কি এ রোযাগুলো শাওয়ালের ছয় রোযার সাথে রাখা জায়েয হবে? অর্থাৎ আমি ছয়দিন রোযা রাখব?

উত্তরে তিনি বলেন:

শপথকারী শপথ ভঙ্গ করলে তার জন্য রোযা দিয়ে কাফফারা আদায় করা জায়েয হবেনা; যদি না তিনি দশজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো কিংবা তাদেরকে পোশাক দেয়া কিংবা একজন কৃতদাস মুক্ত করার সামর্থ্য না রাখেন। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, "এর কাফফারা হচ্ছে- দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরণের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও, বা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজনদাসমুক্তি। অতঃপর যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফফারা।" [সূরা মায়িদা, আয়াত: ৮৯]

সাধারণ মানুষের কাছে একটা বিষয় মশহুর হয়ে গেছে যে, শপথ ভঙ্গ করার কাফফারা তিনদিন রোযা রাখা; চাই সে ব্যক্তি মিসকীনকে খাদ্য দেয়া কিংবা পোশাক দেয়া কিংবা দাস মুক্ত করার সামর্থ্য রাখুক কিংবা না-রাখুক এটি ভুল। বরং যে শপথভঙ্গকারী দশজন মিসকীনকে খাদ্য দেয়ার সামর্থ্য রাখে না, কিংবা সামর্থ্য রাখলেও মিসকীন খুঁজে পায় না; সে ব্যক্তি লাগাতর তিনদিন রোযারাখবে।

শপথভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি তিনদিন রোযা রাখার শ্রেণীভুক্ত হয় সেক্ষেত্রে এ রোযাগুলোর মাধ্যমে শাওয়ালের ছয় রোযার নিয়ত করা জায়েয হবে না। কেননা, এদুইটি স্বতন্ত্র দুটি ইবাদত। একটি দিয়ে অপরটি আদায় হবে না। বরং সে ব্যক্তি শাওয়ালের ছয় রোযা রাখবে। তারপর ছয়দিনের উপর আর তিনটি রোযা অতিরিক্ত রাখবে।

[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব, (৮৪,৮৫)]

এই তিনদিনের রোযা লাগাতর হওয়া শর্ত নয়। ইতিপূর্বে [12700](#) নং ফতোয়াতে আমরা সে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি। সেখানে দেখা যেতে পারে।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

সহিহ মুসলিম, সুনানে নাসাঈ ও সুনানে আবু দাউদেবর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন সোমবারে রোযারাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন তিনি বলেন: "এটি এমন দিন যে দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি..." এ হাদিসের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির জন্য নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে রোযা রাখা জায়েয হবে কি? অনুরূপভাবে নিজের জন্মদিনে রোযা রাখা জায়েয হবে কি? আশা করি বিষয়টি পরিষ্কার করবেন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

এক:

সহিহ মুসলিমে আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোমবারে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: “ এটি এমন দিন যে দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং যেদিন আমার ওপর ওহি নাযিল হয়” ।

ইমাম তিরমিযি (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ প্রতি সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে আমলনামা পেশ করা হয় । তাই আমি পছন্দ করি আমি রোযা রেখেছি এমতাবস্থায় যেন আমার আমলনামা উপস্থাপন করা হয়” [তিরমিযি হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়িত করেছেন । আলবানী ‘সহিহত তিরমিযি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘সহিহ’ আখ্যায়িত করেছেন]

পূর্বোক্ত হাদিস থেকে জানা গেল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার তাঁর জন্মদিন হওয়ার কারণে যেমন রোযা রেখেছেন তেমনি এ দিনটির মর্যাদার কারণেও রোযা রেখেছিলেন । কেননা এ দিনে আল্লাহ তাঁর ওপর ওহী নাযিল করেছেন । এ দিনে তাঁর আমলনামা আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় । তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা থাকা অবস্থায় তাঁর আমলনামা পেশ হওয়া চাইতেন । এজন্য ঐ দিনে রোযা রাখার অনেকগুলো কারণের মধ্যে ঐ দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হওয়াটাও একটি কারণ ।

সূতরাং যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত সোমবারে রোযা রাখতে চান, এর মাধ্যমে ক্ষমার আশা করেন, আল্লাহ তার বান্দাদেরকে যে সবনেয়ামত দিয়েছেন সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করতে চান; যে নেয়ামতগুলোর মধ্যে সেরা নেয়ামত হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম ও তাঁর নবুয়ত এবং সেই দিনে ক্ষমাপ্রার্থীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রত্যাশা করেন— তাহলে এটি একটি ভাল আমল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । তবে, বিশেষ কোন সপ্তাহে এ আমলটি করা অন্য সপ্তাহে না করা এবং বিশেষ কোন মাসে এ আমলটি করা অন্য মাসে না করা— এমনটি যেন না হয় । বরং ব্যক্তি তার সাধ্যানুযায়ী সবসময় এটি করবে ।

আর মিলাদুন্নবী পালনের উদ্দেশ্যে বছরের বিশেষ একটি দিনে এ আমলটি করা— এটি বিদআত ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর খেলাফ । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবারে রোযা রেখেছেন । অথচ মিলাদুন্নবী পালনের নির্দিষ্ট এ দিনটি সোমবারেও পড়তে পারে; আবার সপ্তাহের অন্য কোন দিনও হতে পারে ।

মিলাদুন্নবী পালনের হুকুম ও এ সম্পর্কে জানতে পড়ুন [13810](#) নং ও [70317](#) নং প্রশ্নোত্তর ।

দুই:

বর্তমানে সাধারণ মানুষের মাঝে ‘জন্মদিন’ পালনের নামে বিশেষ দিন উদযাপনের যে প্রথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে— এটি বিদআত ও শরিয়ত বিরোধী । ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ছাড়া মুসলমানদের আর কোন উৎসব (দিন পালন) নেই । ইতিপূর্বে একাধিক প্রশ্নোত্তরে সে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে । পড়ুন [26804](#) নং ও [9485](#) নং প্রশ্নোত্তর ।

এছাড়া যে নবী হচ্ছেন— প্রকৃত নেয়ামত ও সকল মানুষের জন্য রহমত, যাঁর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “ আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি” [সূরা আযিয়া, আয়াত: ১০৭], যিনি হচ্ছেন সকল মানুষের জন্য কল্যাণের পথ উন্মোচনকারী তাঁর জন্মদিন এর সাথে অন্য মানুষের জন্মদিবস বা মৃত্যুদিবসের তুলনা কিভাবে চলে?

তাছাড়া তাঁর সাহাবীগণ ও তাদের পরবর্তী সলফে সালেহীনের কেউ কি এমন কিছু পালন করেছেন?

বরঞ্চ সলফে সালেহীন ও পূর্ববর্তী আলেমদের কেউ এ কথা বলেছেন বলে জানা যায়না যে, সপ্তাহের বিশেষ একটি দিনে, কিংবা মাসের বিশেষ একটি দিনে, কিংবাবছরের বিশেষ একটি দিনে রোযা রাখা কিংবা সে দিনটি উদযাপন করা শরিয়তসম্মত; যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সপ্তাহের যে বারটিতে জন্মগ্রহণকরেছেন সেই বারে অর্থাৎ সোমবারে রোযা রাখতেন। যদি এটা শরিয়তসম্মত আমল হততাহলে পূর্ববর্তী আলেমগণ ও নেকীর কাজে অগ্রগামী ব্যক্তিগণ এ দিনটি পালনকরতেন। যখন তাঁরা সেটা করেননি কাজেই জানা গেল যে, এটি নব-প্রচলিত; এটি পালনকরা যাবে না।

প্রশ্ন

মুহররম মাসের ৯, ১০ ও ১১ তারিখে কোন নারী যদি মাসিকগ্রস্ত থাকেন তাহলে তিনি পবিত্রতার গোসলের পর এ রোযাগুলো কি রাখতে পারবেন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যিনিআশুরার রোযা যথাসময়ে রাখতে পারেননি তিনি এ রোযাগুলোর কাযা পালন করবেন না। কেননা এ রোযা কাযা পালনের বিষয়টি সাব্যস্ত নেই। এবং যেহেতু এ রোযা রাখারপ্রতিদান ১০ ই মুহররম রোযা রাখার সাথে সম্পৃক্ত; সে তারিখ তো পার হয়ে গেছে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

আশুরার দিনে যে নারী হায়েযগ্রস্ত ছিলেন তিনি কিআশুরার রোযাটি পরে কাযা পালন করবেন? কোন্ নফল আমলের কাযা পালন করা যাবে; আর কোন্ নফল আমলের কাযা পালন করা যাবে না — এ বিষয়ক কোন নীতিমালা আছে কি? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

জবাবে তিনি বলেন: নফল আমল দুই প্রকার: বিশেষকোন কারণ কেন্দ্রিক নফল আমল। কোন কারণ বিহীন নফল আমল। সুতরাং যে নফলআমলগুলো বিশেষ কোন কারণের সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোর কারণ শেষ হয়ে গেলে আমলটিরবিধানও শেষ হয়ে যাবে; আমলটি আর কাযা করা যাবে না। যেমন- তাহিয়্যাতুলমাসজিদের নামায। কোন লোক মসজিদে ঢুকে যদি বসে পড়ে এবং দীর্ঘ সময় চলে যায়এরপর তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায পড়তে চায় ঐ নামায আর 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' হবে না। কারণ তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায বিশেষ কারণকেন্দ্রিক ও নির্দিষ্টকারণের সাথে সম্পৃক্ত। সে কারণটি যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে সে আমলের বিধান আরঅটুট থাকে না। যেমন- অগ্রগণ্য মতে, আরাফার দিন ও আশুরার দিনের রোযা। কেউযদি কোন ওজর ছাড়া আরাফার রোযা কিংবা আশুরার রোযা সময়মত না রাখে কোন সন্দেহনেই যে, সে ব্যক্তি এ রোযাটি আর কাযা পালন করতে পারবে না। কাযা পালন করলেওসে উপকার পাবে না। অর্থাৎ এটি যে, আরাফার দিনের রোযা বা আশুরার দিনের রোযাসে উপকার সে পাবে না। আর যদি ব্যক্তির কোন ওজর থাকে যেমন- হায়েয বানিফাসগ্রস্ত নারী, অসুস্থ ব্যক্তি; অগ্রগণ্য মতে, এরাও এ রোযার কাযা পালনকরতে পারবে না। কারণ এ রোযাটি বিশেষ একটি দিনের সাথে খাস; সেই দিনটি অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে রোযা রাখার বিধানও শেষ হয়ে গেছে। [শাইখউছাইমীনের 'মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন' (২০/৪৩)]

তবে, যে ব্যক্তি ওজরগ্রস্ত ছিল যেমন- হায়েয বানিফাসগ্রস্ত নারী, রোগী বা মুসাফির যদি তার অভ্যাস থাকে যে, সে এ দিনটিররোযা রাখে কিংবা তার ঐ দিনটির রোযা রাখার নিয়ত ছিল তাহলে সে তার নিয়তেরভিত্তিতে সওয়াব পাবে। দলিল হচ্ছে সহিহ বুখারীতে (২৯৯৬) আবু মুসা আল-আশআরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলেছেন: " কোন বান্দা যদি অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে তাহলে সেব্যক্তি মুকীম ও সুস্থ থাকা অবস্থায় যে আমলগুলো করত ঐ আমলগুলোর সওয়াব তারআমলনামায় লিখে দেওয়া হবে।"

ইবনে হাজার বলেন: তাঁর কথা: " সে ব্যক্তি মুকীমও সুস্থ থাকা অবস্থায় যে আমলগুলো করত ঐ আমলগুলোর সওয়াব তার আমলনামায় লিখেদেওয়া হবে" এ কথা সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নেক আমল করত; সেটা থেকেবাধাগ্রস্ত হয়েছে। তার নিয়ত হচ্ছে- যদি এ প্রতিবন্ধকতা না থাকত তাহলে সেব্যক্তি আমলের উপর অব্যাহত থাকত।" [সমাণ্ড; ফাতহুল বারী]

আল্লাহই ভাল জানেন

প্রশ্ন

জৈনিক ব্যক্তি ১১ ই যিলহজ্জ ও ১২ ই যিলহজ্জ রোযা রেখেছে। তার এ রোযা পালনের হুকুম কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

যিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে তাশরিকের দিন বলা হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি এ দিনগুলোতে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। শুধুমাত্র তামাত্তু কিংবা ফিরান হজ্জকারীর কোরবানী করার মত সামর্থ্য না থাকলে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে এদিন সমূহে রোযা রাখার ছাড় দেননি। সহিহ মুসলিমে (১১৪১) নুবাইশাআল-হুযালি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ তাশরিকের দিনগুলো হচ্ছে-পানাহারের দিন ও আল্লাহর যিকিরের দিন। ”

মুসনাদে আহমাদে (১৬০৮১) হামযা বিন আমর আল-আসলামি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি দেখলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে মীনাতে একব্যক্তি উটের পিঠে চড়ে মানুষের অবস্থানস্থলে গিয়ে গিয়ে বলছেন: “ আপনারা এ দিনগুলোতে রোযা রাখবেন না; এ দিনগুলো পানাহারের দিন। ” [আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৭৩৫৫) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

উম্মেহানির আযাদকৃত দাস আবু মুররা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আমরের সাথে তার পিতা আমর বিন আসের কাছে যান। তিনি তাদের দুইজনের জন্য খাবার পেশ করেবলেন: খাও। সে বলল: আমি রোযা রেখেছি। আমর বললেন: খাও; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিনগুলোতে আমাদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ করতেন, রোযা না-রাখার নির্দেশ দিতেন। মালেক বলেন: এ দিনগুলো হচ্ছে-তাশরিকের দিন। [মুসনাদে আহমাদ (১৭৩১৪) ও সুনানে আবুদাউদ (২৪১৮) আলবানী সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

সাদ বিন আবু ওয়াস্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেন আমি যেন মীনার দিনগুলোতে ঘোষণা করি: “ এগুলো পানাহারের দিন; এ দিনগুলোতে রোযা নেই। ” অর্থাৎ তাশরিকের দিনগুলোতে। মুসনাদ গ্রন্থের মুহাক্কিক বলেন: ‘ হাদিসটি সহিহলি গাইরিহি। ’

সহিহ বুখারীতে (১৯৯৮) আয়েশা (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেন: যে ব্যক্তি হাদির পশু সংগ্রহ করতে পারে নাই সে ব্যক্তি ছাড়া তাশরিকের দিনগুলোতে অন্য কাউকে রোযা রাখার অবকাশ দেয়া হয়নি।

এ হাদিসগুলোতে ও অন্যান্য আরও কিছু হাদিসে তাশরিকের দিনসমূহে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

একারণে অধিকাংশ আলোমের মতে, এ দিনগুলোতে নফল রোযা রাখা ঠিক নয়। পক্ষান্তরে, রমযানের কাযা রোযা পালন কোন কোন আলোমের মতে, জায়েয। তবে, সঠিক মতানুযায়ী সেটাও নাজায়েয।

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে (৩/৫১) বলেন:

অধিকাংশ আলোমের মতে, এদিনগুলোতে নফল রোযা রাখা বৈধ নয়। তবে, ইবনে যুবাইর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি এদিনগুলোতে রোযা রাখতেন। অনুরূপ কথা ইবনে উমর (রাঃ) ও আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ (রাঃ) সম্পর্কেও বর্ণিত আছে। আবু তালহা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ঈদের দুই দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন রোযা রাখা বাদ দিতেন না। বাহ্যতঃ মনে হচ্ছে যে, তাশরিকের দিনগুলোতে রোযা রাখার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিষেধাজ্ঞার সংবাদ এসাহাবীবর্গের কাছে পৌঁছেনি; যদি পৌঁছত তাহলে তাঁরা সেটা লঙ্ঘন করতেননা।

পক্ষান্তরে, এ দিনগুলোতে ফরয রোযা রাখা সম্পর্কে দুইটি অভিমত আছে:

এক: এদিনগুলোতে ফরয রোযা রাখাও নাজায়েয, কেননা এ দিনগুলোতে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই এ দুটি দিন ঈদের দিনের মত।

দুই: এদিনগুলোতে ফরয রোযা রাখা সঠিক— ইবনে উমর (রাঃ)ও আয়েশা (রাঃ)থেকে বর্ণিত হাদিসের কারণে। তাঁরা বলেন: যেব্যক্তি হাদির পশু সংগ্রহ করতে পারে নাই সে ব্যক্তি ব্যতীত তাশরিকের দিনগুলোতে অন্য কাউকে রোযা রাখার অবকাশ দেয়া হয়নি। অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জকারী যদি হাদির পশু সংগ্রহ করতে না পারে। এহাদিসটি সহিহ। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী। এর উপর অন্য ফরয রোযাকে কিয়াস করা হবে [সমাণ্ড]

হাম্বলি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে-এ দিনগুলোতে রমযানের কাযা রোযা পালন বৈধ হবে না।

[দেখুন: কাশশাফুল ফিনা (২/৩৪২)]

পক্ষান্তরে, তামাত্তু ও ফিরান হজ্জকারী হাদির (কোরবানীর) পশু সংগ্রহ করতে না পারলে তাশরিকের দিনগুলোতে রোযা থাকার বৈধতা ইতিপূর্বে উল্লেখিত আয়েশা (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ)এর হাদিস প্রমাণ করে। এটি মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের অভিমত এবং ইমাম শাফেয়ির প্রাচীন অভিমতও এটাই।

তবে, হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাব মতে, তাশরিকের দিনসমূহে এ রোযাগুলো রাখাও নাজায়েয।

[আল-মাওসুআআল-ফিকহিয়া (৭/৩২৩)]

অগ্রগণ্য অভিমত: প্রথম অভিমতটি। সেটি হচ্ছে- যে ব্যক্তি হাদির (কোরবানীর) পশু সংগ্রহ করতে পারেনি তার জন্য এদিনগুলোতে রোযা রাখা জায়েয।

ইমাম নববী (রহঃ) 'আল-মাজমু (৬/৪৮৬)গ্রন্থে বলেন:

জেনে রাখুন, মাযহাবের আলেমদের নিকট অধিক শুদ্ধ অভিমত হচ্ছে- শাফেয়ির নতুন অভিমতটি অর্থাৎ তাশরিকের দিনগুলোতে কোন রোযা রাখা বৈধ নয়; তামাত্তু হজ্জকারীর জন্যেও নয়, অন্যদের জন্যেও নয়। তবে, দলিল বিশ্লেষণে অধিক অগ্রগণ্য অভিমতটি হচ্ছে- তামাত্তু হজ্জকারীদের জন্য এদিনগুলোতে রোযা রাখা বৈধ। কেননা যে হাদিসে তামাত্তু হজ্জকারীকে রোযা রাখার ছাড় দেয়া হয়েছে সে হাদিস সহিহ; যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এছকুমের ব্যাপারে সে হাদিসটির বক্তব্য সুনির্দিষ্ট; তাই অন্য কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই [সমাণ্ড]

জবাবের সারাংশ: তাশরিকের দিনগুলোতে রোযা রাখা বৈধ নয়; না নফল রোযা, না ফরয রোযা; শুধুমাত্র তামাত্তু হজ্জকারী ও ফিরান হজ্জকারী হাদির (কোরবানীর) পশু সংগ্রহ করতে না পারলে তার জন্য রোযা রাখা বৈধ।

শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন: ১৩ই যিলহজ্জে নফলরোযা কিংবা ফরয রোযা কোনটা রাখা জায়েয নয়। কেননা এ দিনগুলো পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদিনগুলোতে রোযা রাখতে বারণ করেছেন; শুধুমাত্র তামাত্তু হজ্জকারী ও ফিরানহজ্জকারী হাদির (কোরবানীর) পশু সংগ্রহ করতে না পারলে তার জন্য রোযা রাখার ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন [সমাণ্ড]

[মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায (১৫/৩৮১)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

তাশরিকের দিন হচ্ছে-ঈদুল আযহার পরের তিন দিন। এ দিনগুলোকে তাশরিকের দিন বলা হয় যেহেতু এ দিনগুলোতে মানুষ রোদের উত্তাপে গোশত শুকিয়ে থাকে; যাতে করে তারা গোশতগুলো মজুদ করলে নষ্ট না যায়। এ তিন দিনের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: " তাশরিকের দিনগুলো হচ্ছে-পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের দিন"। এ দিনগুলোর ক্ষেত্রে শরিয়তের

উদ্দেশ্য হচ্ছে-পানাহার ও আল্লাহর যিকির করা। তাই এ দিনগুলো রোযা পালনের উপযুক্ত সময় নয়। এ কারণে ইবনে উমর (রাঃ)ও আয়েশা (রাঃ) বলেন: “যে ব্যক্তি হাদির পশু সংগ্রহ করতে পারে নাই সে ব্যক্তি ছাড়া তাশরিকের দিনগুলোতে অন্য কাউকে রোযা রাখার অবকাশ দেয়া হয়নি।” অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জকারী ও কিরান হজ্জকারী হাদির (কোরবানীর) পশু সংগ্রহ করতে না পারলে হজ্জের সময় এ তিনদিন রোযা রাখবে এবং হজ্জ থেকে পরিবারের কাছে ফিরে সাতটি রোযা রাখবে। তাই তামাত্তু ও কিরান হজ্জকারী হাদির পশু না পেলে তার জন্য এ দিনগুলোতে রোযা রাখা জায়েয; যেন রোযা রাখার পূর্বে হজ্জের মৌসুম শেষ হয়ে না যায়। এ ছাড়া অন্য কোন রোযা এ দিনগুলোতে রাখা নাজায়েয। এমনকি কোন ব্যক্তির উপর যদি দুই মাসের লাগাতর রোযা রাখা ফরয হয়ে থাকে সে ব্যক্তিও ঈদের দিন এবং ঈদের পর আরও তিনদিন রোযা রাখবে না। এদিনগুলোর পর পুনরায় লাগাতর রোযা থাকা শুরু করবে।

[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন, ২০/প্রশ্ন নং: ৪১৯]

ইতিপূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে ব্যক্তি তামাত্তু হজ্জকারী কিংবা কিরান হজ্জকারী না হয়েও তাশরিকের দিনগুলোতে রোযা রেখেছে কিংবা তাশরিকের কোন কোন দিনে রোযা রেখেছে তার উপর ফরয হচ্ছে-আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করা। যেহেতু সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে। যদি সে ব্যক্তি রমযানের কাযা রোযা পালন করে থাকেন সেটাও জায়েয হবে না। বরং পুনরায় তাকে কাযা পালন করতে হবে।

আল্লাহই ভাল জানেন

প্রশ্ন

আমাদের এক শাইখ বলেন: আরাফার দিন রোযা রাখা সুন্নত নয়; এ দিন রোযা রাখা নাজায়েয। আশা করি, আপনারা এ প্রশ্নটির জবাব দিবেন। কেননা সে শাইখ এমন কিছু প্রচারপত্র বিলি করছেন যার মাধ্যমে তিনি আরাফার দিন রোযা রাখতে নিষেধ করছেন। আশা করব, আপনারা জবাব দিবেন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যারা হাজী নন তাদের জন্য এই দিন রোযা রাখা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাফার দিনের রোযাসম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: “বিগত ও আগত বছরের পাপ মোছন করে” [সহিহ মুসলিম (১১৬২), সহিহ মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে: আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করছি যে, আগের বছরের ও পরের বছরের গুনাহ মোছন করবে]

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৬/৪২৮) বলেন -যেটি শাফেয়ি মাযহাবেরকিতাব:- “এ মাসযালার হুকুম হচ্ছে- ইমাম শাফেয়ি ও ছাত্ররা বলেন: যারা আরাফায়নেই তাদের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব”।

পক্ষান্তরে, হজ্জপালনকারী যিনি আরাফার ময়দানে হাজির তার ব্যাপারে মুখতাসার গ্রন্থে রয়েছে ইমাম শাফেয়ি ও মাযহাবের অন্য আলেমগণ বলেন: উম্মেফযল এর হাদিসের ভিত্তিতে তার জন্য সেদিন রোযা না-রাখা মুস্তাহাব। আমাদের অন্য একদল আলেম বলেন: হজ্জপালনকারীর জন্য এই দিন রোযা রাখা মাকরুহ। যারা এঅভিমত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন তারা হচ্ছে- দারেমী, বন্দানিজি, মুহামিলি ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে, গ্রন্থকার ‘তানবীহ’ নামক গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলেমগণ [সমাণ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে (৪/৪৪৩) বলেন যেটি হাম্বলিমাযহাবের গ্রন্থ: “এটি একটি মহান ও মর্যাদাপূর্ণ দিন। পবিত্র ঈদের দিন। এর মর্যাদা মহান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এদিনের রোযা দুই বছরের গুনাহ মোছন করে।” [সমাণ্ত]

ইবনে মুফলিহ (রহঃ) ‘আল-ফুরু’ নামক গ্রন্থে (৩/১০৮) বলেন:

“ এটি একটি মহান ও সম্মানিত দিন। পবিত্র ঈদের দিন। এর মর্যাদা অনেক বড়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ হাদিসে এসেছে- এ দিনের রোযা এক বছরের গুনাহ মোছন করে।” [সমাণ্ড]

ইবনে মুফলিহ (রহঃ) ‘আল-ফুরু’ গ্রন্থে (৩/১০৮) বলেন- এটি হাম্বলিমাযহাবের কিতাব-: যিলহজ্জের দশদিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। ৯ তারিখের রোযাটি সবচেয়ে বেশি তাগিদপূর্ণ। এ দিনটি হচ্ছে- আরাফার দিন। ইজমার মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত। [সমাণ্ড]

হানাফি মাযহাবের কিতাব ‘বাদায়েউস সানায়ি’ গ্রন্থে (২/৭৬) গ্রন্থকার ‘কাসানি’ বলেন:

“ যারা হাজী নন তাদের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। এ দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে অনেক হাদিস বর্ণিত হওয়ার কারণে। কারণ অন্যদিনগুলোর উপর এদিনের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। হাজীর জন্যেও এদিনের রোযা রাখা মুস্তাহাব; যদি রোযা রাখার কারণে হাজী দুর্বল হয়ে আরাফায় অবস্থান ওদোয়া করা থেকে বাধাগ্রস্ত না হয়। যেহেতু রোযা রাখার মাধ্যমে এ দুটো নেক কাজ একত্রে আদায় করা যায়। আর যদি রোযা রাখতে গিয়ে হাজী দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে রোযা রাখা মাকরুহ। কারণ এদিনে রোযা রাখার ফযিলত অন্য বছর অর্জন করা সম্ভব; স্বভাবতঃ সম্ভব হয়। কিন্তু, আরাফায় অবস্থান ও দোয়া করার ফযিলত সাধারণতঃ সাধারণ মুসলমানের ক্ষেত্রে জীবনে একবারের বেশি অর্জন করা সম্ভব হয় না। তাইসে ফযিলতটি অর্জনে সচেষ্ট হওয়া উত্তম।”

মালেকী মাযহাবের আলেম খিরাশী কর্তৃক রচিত ‘শারহ মুখতাসার খলিল’ রয়েছে:

“ হজ্জ না করলে আরাফার দিনে রোযা রাখা এবং যিলহজ্জের দশদিন রোযা রাখা” ব্যাখ্যা: গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে- যিনি হাজী নন তার জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। আর হাজীর জন্য রোযা না-রাখা মুস্তাহাব; যাতে করে দোয়া করার জন্য শক্তি থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের সময় রোযা রাখেননি।” [সমাণ্ড]

‘হাশিয়াতুদ দুসুকী’ গ্রন্থে এসেছে-

অতঃপর তাঁর কথা: ‘এবং আরাফার দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব...’ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- আরাফার দিনে রোযা রাখা জোরালো-মুস্তাহাব; নচেৎ রোযা রাখাটাই একটি মুস্তাহাব আমল।”

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: আরাফার দিন হজ্জপালনকারী নন ও হজ্জপালনকারীর জন্য রোযা রাখার হুকুম কি?

উত্তরে তিনি বলেন: যিনি হজ্জপালন করছেন না তার জন্যে আরাফার দিন রোযা রাখা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাফার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: “ আমি আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করছি যে, বিগত বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহ মার্জনা করবে।” অন্য এক রেওয়ামেতে আছে “ গত বছর ও পরের বছরের গুনাহ মার্জনা করবে।”

পক্ষান্তরে, হাজীদের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা সুন্নত নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায়ী হজ্জকালে আরাফার দিন রোযা রাখেননি। সহিহ বুখারীতে মায়মুনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার দিন রোযা রেখেছেন; নাকি রাখেননি এ ব্যাপারে কিছু মানুষ সন্দেহে ছিল। তখন আমি তাঁর জন্য এক পেয়ালা দুধ পাঠালাম; তখন তিনি আরাফার ময়দানে অবস্থান করছিলেন। তিনি দুধ পান করলেন; লোকেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল।” [সমাণ্ড]

[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন, খণ্ড ২০, প্রশ্ন ৪০৪]

তাই হজ্জপালনকারীর জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা মাকরুহ; মুস্তাহাব নয়। অতএব, উল্লেখিত বক্তা যদি হজ্জপালনকারীকে উদ্দেশ্য করে থাকেন তাহলে তাঁর কথা ঠিক। আর যদি তার উদ্দেশ্য হয় যে, যারা হজ্জ পালন করছে না তাদের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা শরিয়তসম্মত নয়; তাহলে এটি সুস্পষ্ট ভুল এবং ইতিপূর্বের আলোচনায় সহিহ সুন্নাতে সাব্যস্ত বিষয়ের বরখেলাফ।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

হজ্জপালনকারীর জন্য যিলহজ্জ মাসের প্রথম আটদিন রোযা রাখার হুকুম কি? উল্লেখ্য, আমি জানি যে, আরাফার দিন রোযা রাখা মাকরুহ।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যিলহজ্জ মাসের প্রথম আটদিনরোযা রাখা হজ্জপালনকারী ও হজ্জপালনকারী নয় সকলের জন্য মুস্তাহাব। দলিলহচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “ অন্য যে কোন সময়ের নেকআমলের চেয়ে এ দশদিনের নেক আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তারা (সাহাবীরা) বলেন: আল্লাহর পথে জিহাদও নয়!! তিনি বলেন: আল্লাহর পথে জিহাদও নয়; তবে কোনলোক যদি তার জানমাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং কোন কিছু নিযেফেরত না আসে সেটা ভিন্ন কথা।” [সহিহ বুখারী (৯৬৯) ও সুনানে তিরমিযি (৭৫৭) তেইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত হাদিস হিসেবে সংকলিত। হাদিসের এভাষাটি তিরমিযির]

‘আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যা’ গ্রন্থে (২৮/৯১) এসেছে- আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আরাফার দিনের পূর্বে যিলহজ্জ মাসের প্রথম আটদিন রোযা রাখামুস্তাহাব...। মালেকি ও শাফেয়ি মাযহাবের আলেমগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন: হজ্জপালনকারীর জন্যেও এ দিনগুলোতে রোযা থাকা সুন্নত। [সমাণ্ড]

‘নিহায়াতুল মুহতাজ’ গ্রন্থে (৩/২০৭) বলেন: আরাফার দিনের পূর্বে আটদিনরোযা রাখা সুন্নত। ‘আর-রাওযা’ গ্রন্থে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, এক্ষেত্রে হজ্জপালনকারী ও অন্যেরা সমান। পক্ষান্তরে, হজ্জপালনকারী সবল হলেও আরাফার দিন রোযা রাখা তার জন্য সুন্নত নয়; বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে এবং দুআ করার জন্য যেন শক্তিশালী থাকার নিমিত্তে রোযা না-রাখা মুস্তাহাব। [কিছুটা পরিমার্জিত ও সমাণ্ড]

আল্লাহই ভাল জানেন

প্রশ্ন

আমরা এ বছরের আশুরার রোজা কিভাবে রাখতে পারি? আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি যিলহজ্জ মাস কি ২৯ দিন; নাকি ৩০ দিন। এমতাবস্থায় আমরা আশুরার দিবস কিভাবে নির্দিষ্ট করব?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

যদি আমরা জানতে না পারি- যিলহজ্জমাস কি পরিপূর্ণ ৩০ দিন নাকি একদিন কম ২৯ দিন এবং মুহররম মাসের চাঁদ কবে দেখা গিয়েছে সে ব্যাপারে যদি আমাদেরকে কেউ অবহিত না করে তাহলে আমরা মূল অবস্থার উপর আমল করব। মূল অবস্থা হচ্ছে- মাসের দিন সংখ্যা ৩০। তাই যিলহজ্জমাস কে আমরা ৩০ দিন ধরব। এরপর আশুরার দিবস ঠিক করে নিব।

তবে কোন মুসলিম ভাই যদি আশুরার রোজা রাখার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে চান যাতে তিনি সুনিশ্চিত হতে পারেন যে, আশুরা পেয়েছেন সে ক্ষেত্রে তিনি পরপর দুইদিন রোজা রাখতে পারেন। হিসাব করে দেখবেন যিলহজ্জ মাস ২৯ দিন হলে আশুরা কবে হয় এবং যিলহজ্জ মাস ৩০ দিন হলে আশুরা কবে হয়। সে হিসাব অনুযায়ী এ দুইদিন রোজা রাখবেন। তখন তিনি সুনিশ্চিতভাবে আশুরা পেয়েছেন বলা যাবে। এ অবস্থায় তাকে হয়তো ৯ তারিখ ও ১০ তারিখ রোজা রাখতে হবে। কিংবা ১০ তারিখ ও ১১ তারিখ রোজা রাখতে হবে। যেটাই করেন না কেন সেটা ভাল। আর যদি তিনি ৯ তারিখে রোজা রাখার ক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করতে চান তাহলে তিনি সে ক্ষেত্রেও দুই দিন রোজা রাখবেন। যে হিসাবের পদ্ধতি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হল সে হিসাব অনুযায়ী ৯ তারিখ এবং ৯ তারিখের আগের দিন রোজা রাখবেন। সে ক্ষেত্রে তার রোজা হবে হয়তবা ৯, ১০ ও ১১ তারিখ। অথবা ৮, ৯ ও ১০ তারিখ। তিনি যেটাই করেন না কেন সে ক্ষেত্রে তিনি ৯ তারিখ ও ১০ তারিখ রোজা রেখেছেন এটা সুনিশ্চিতভাবে বলা যাবে।

কেউ যদি বলেন, আমি চাকুরীর কারণে একদিনের বেশি রোজা রাখতে পারব না। এক্ষেত্রে আমার জন্য কোন দিন রোজা রাখা উত্তম। সে ব্যক্তিকে আমরা বলব:

আপনি যিলহজ্জমাস কে ৩০ দিন ধরে এরপর থেকে দশম দিন হিসাব করে রোজা রাখবেন।

এই উত্তর আমি আমাদের শাইখ বিন বায এর মুখে যা শুনেছি তার সারনির্যাস; তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি এ জবাব দেন।

আর যদি কোন নির্ভরযোগ্য মুসলমানের সূত্রে আমাদের কাছে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছে তাহলে আমরা তার কথা গ্রহণ করব। আর গোটা মুহররম মাস রোজা রাখাও সুন্নত। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা হচ্ছে- মুহররম মাসের রোজা” [সহিহ মুসলিম (১১৬৩)]

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

মুহররম মাসে অধিক রোজা রাখা কি সুন্নত? অন্য মাসের উপর এ মাসের কি কোন বিশেষত্ব আছে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আরবী মাসগুলোর প্রথম মাস হচ্ছে- মুহররম। এটি চারটি হারাম মাসের একটি। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় আল্লাহর নিকট, লওহে মাহফুজে (বছরে) মাসের সংখ্যা বারটি আসমানসমূহ ও পৃথিবীসৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানিত)। এটাই সরল বিধান। সুতরাং এ মাসগুলোতে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না।” [সূরা তওবা, আয়াত:৩৬]

সহিহ বুখারি (৩১৬৭) ও সহিহ মুসলিম (১৬) এ আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টিকালে সময়কে ঠিক যেভাবে সৃষ্টি করেছেন এখন সময় সে অবস্থায় ফিরে এল। বছর হচ্ছে- বার মাস। এর মধ্যে চার মাস- হারাম (নিষিদ্ধ)। চারটির মধ্যে তিনটি ধারাবাহিক: যুলক্বদ, যুলহজ্জ ও মুহররম। আর হচ্ছে- (মুদার গোত্রের) রজব মাস; যেটি জুমাদাল আখেরা ও শাবান মাস এরমধ্যবর্তী।”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা হচ্ছে মুহররম মাসের রোজা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা হচ্ছে- আল্লাহর মাস ‘মুহররম’ এর রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামায হচ্ছে- রাত্রিকালীন নামায।” [সহিহ মুসলিম (১১৬৩)]

হাদিসে: ‘আল্লাহর মাস’ বলে মাসকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধিত করা হয়েছে মাসটির মর্যাদা তুলে ধরতে। আল-কারী বলেন: হাদিস থেকে বাহ্যতঃ মনে হচ্ছে-গোটা মুহররম মাস (রোজা রাখা) উদ্দেশ্য। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি রমজান ছাড়া আর কোন মাসের গোটা সময়রোজা রাখেননি। তাই এ হাদিসের এ অর্থ গ্রহণ করতে হবে যে, মুহররম মাসে অধিকরোজা রাখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে; গোটা মাস রোজা রাখা নয়।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

সুনির্দিষ্ট নফল রোজার নিয়ত কখন থেকে শুরু করতে হবে? সাধারণ নফল রোজা নয়।

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

সাধারণ নফল রোজার নিয়ত রাত থেকে করা শর্ত নয়; বরং দিনের যে কোন সময়ে কেউ যদি নিয়ত করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করে সেটা জায়েয হবে। তবে শর্ত হচ্ছে ফজর শুরু হওয়ার পর থেকে রোজাভঙ্গকারী কোন কিছুতে লিপ্ত না হওয়া।

আর সুনির্দিষ্ট নফল রোজার নিয়ত রাত থেকে (ফজরের পূর্ব) করা শর্ত। শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

শাওয়াল মাসের ছয় রোজা ও আরাফার দিনের রোজার হুকুম কি ফরজ রোজার মত অর্থাৎ এরোজাগুলোর জন্য কি রাত থেকে নিয়ত করা শর্ত? নাকি এরোজাগুলোর হুকুম নফল রোজার হুকুমের মত যে কোন লোকের জন্য দিনের মধ্যভাগ থেকেও রোজার নিয়ত করা জায়েয? যে ব্যক্তি দিনের মধ্যভাগ থেকে রোজা রাখার নিয়ত করেছে সে কি ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব পাবে যে ব্যক্তি সেহেরী থেকে দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রোজা পালন করেছে।

উত্তরে তিনি বলেন:

হ্যাঁ; নফল রোজার ক্ষেত্রে দিনের বেলায় নিয়ত করলেও জায়েয হবে। এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে-নিয়ত করার আগে রোজাভঙ্গকারী কোনকিছুতে লিপ্ত হতে পারবে না। যেমন- কোন লোক যদি ফজরের পর খাওয়া দাওয়া করে ফেলে এরপর দিনের বেলায় রোজা রাখার নিয়ত করে তাকে আমরা বলব: আপনার রোজা শুদ্ধ নয়। কারণ তিনি আহার করেছেন। তবে তিনি যদি ফজর থেকে না খেয়ে থাকেন এবং অন্য কোন রোজা ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত না হন এরপর দিনের বেলায় রোজা রাখার নিয়ত করেন এবং সে রোজাটি নফল রোজা হয় তাহলে আমরা বলব: এটি জায়েয। কারণ এ ধরণের রোজার অনুমোদন হাদিসে এসেছে। তবে তিনি যখন থেকে নিয়ত করেছেন তখন থেকে সওয়াব পাবেন। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমল নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে”। সুতরাং নিয়তের আগে যে আমল এর সওয়াব লেখা হবে না। আর নিয়তের পরের আমলের সওয়াব লেখা হবে।

সওয়াবের প্রতিশ্রুতি যদি গোটা একদিন রোজা রাখার উপর দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এব্যক্তি গোটা একদিন রোজা রাখেনি; বরং দিনের কিছু অংশ রোজা রেখেছে। এর ভিত্তিতে বলা যায়: কেউ যদি ফজরের পর থেকে কোন কিছু না খায় এবং দিনের মধ্যভাগে এসে রোজা রাখার নিয়ত করে এবং সে দিনটি যদি শাওয়ালের ছয়রোজার কোন একটি দিন হয় এরপর সে ব্যক্তি আরও পাঁচদিন রোজা রাখে এতে করে সে সাড়ে পাঁচ দিন রোজা রাখল। যদি সে ব্যক্তি দিনের একচতুর্থাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর রোজা রাখে তাহলে সে পৌনে ছয়দিন রোজা রাখল। কারণ আমলের হিসাব হবে নিয়ত অনুযায়ী। হাদিসে এসেছে- “যে ব্যক্তি রমজানমাস রোজা রাখল এরপর শাওয়াল মাসের আরও ছয়দিন রোজা রাখল...”।

অতএব আমরা এ ভাইকে বলব যে, আপনি ছয়দিন রোজা রাখার সওয়াব পাবেন না। কারণ আপনি তো পরিপূর্ণ ছয়দিন রোজা রাখেননি। একই রকম কথা বলা হবে: আরাফার দিনের রোজার ব্যাপারে। পক্ষান্তরে রোজাটি যদি সাধারণ নফল রোজা হয় তাহলে রোজাটি শুদ্ধ হবে এবং নিয়ত করার সময় থেকে রোজাদার ব্যক্তি সওয়াব পাবেন। [লিকাউলবাব আল-মাফতুহ (২১/৫৫) থেকে সমাপ্ত]

অনুরূপভাবে যদি বিশেষ কোনদিন রোজা রাখার ভিত্তিতে সওয়াব দেওয়ার বর্ণনা আসে যেমন- সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা, চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা, প্রতিমাসে তিনদিন রোজা রাখা। এখন কেউ যদি দিনের মাঝখান থেকে রোজা রাখার নিয়ত করে তাহলে সে ব্যক্তি গোটা দিনের রোজা রাখার সওয়াব পাবে না।

উদাহরণত: কেউ সোমবারে রোজা রাখল, নিয়ত করল দিনের মাঝখান থেকে। সে ব্যক্তি ঐব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব পাবে না যে ব্যক্তি সোমবারের শুরু থেকে রোজা রেখেছে। কারণ সে ব্যক্তিগোটা সোমবার রোজা রেখেছেন এ কথা তো বলা চলে না।

অনুরূপভাবে কেউ যদি বে-রোজাদার হিসেবে ভোর করে এরপর তাকে বলা হয় যে, আজ তো মাসের ১৩তারিখ; এ কথা শুনে সে ব্যক্তি বলে তাহলে আমি রোজা রাখলাম; সে ব্যক্তি পূর্ণিমার দিনগুলোতে রোজা রাখার সওয়াব পাবেনা। কারণ সে তো গোটা দিন রোজা রাখেনি। [আল-শারহুলমুমতি (৬/৩৬০) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

আমি একবার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম এবং মানত করেছিলাম যে, সুস্থ হলে আল্লাহর জন্য ১৫টি রোজা রাখব; আমি কোন সময় নির্ধারণকরিনি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি সুস্থ হয়েছি এবং রজব মাস থেকে রোজা রাখা শুরু করেছি। পাঁচদিন রোজা রেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এরপর শাবান মাসে আরও পাঁচদিনরোজা রেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এরপর রমজান শুরু হলে রমজানের রোজা রেখেছি। এখন আমরা শাওয়াল মাসে আছি। এমতাবস্থায় আমার জন্য কি শাওয়ালের ছয় রোজা রাখা উত্তম; নাকি মানতের বাকী পাঁচদিনের রোজা পরিপূর্ণ করা উত্তম? দয়া করে জানাবেন, আল্লাহ আপনাকে মোবারকময় করুন।

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আগে মানতের অবশিষ্ট রোজাগুলো শেষ করা আপনার কর্তব্য। এরপর সম্ভব হলে শাওয়ালের ছয় রোজা রাখবেন। যদি ছয় রোজা নাও রাখতে পারেন কোন অসুবিধা নেই। কারণ শাওয়ালের ছয়রোজা রাখা মুস্তাহাব; ফরজ নয়। পক্ষান্তরে মানতের রোজা রাখা ফরজ। তাই আপনার কর্তব্য হচ্ছে- নফলের আগে ফরজ রোজা রাখা। আপনি যদি লাগাতরভাবে ১৫টি রোজা রাখার নিয়ত করে থাকেন তাহলে আপনাকে লাগাতরভাবে ১৫টি রোজা রাখতে হবে। আলাদা আলাদা ভাবে রাখলে চলবে না; বরং লাগাতরভাবে রাখতে হবে। আর পূর্বের রোজা গুলো বাতিল হয়ে যাবে।

আর যদি আপনি লাগাতরভাবে রাখার নিয়ত না করে থাকেন তাহলে বাকী ৫টি রোজা রাখলে ইনশাআল্লাহ আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে।

আর পরবর্তীতে কখনও মানত করবেন না; মানত করা সমীচীন নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা মানত করো না; কারণ মানত তাকদীর পরিবর্তন করেনা। মানতের মাধ্যমে কুপনের সম্পদ খরচ করানো হয়।”

এ কারণে মানত করা ঠিকনা। অসুস্থ ব্যক্তির জন্যেও না; অসুস্থ নয় এমন ব্যক্তির জন্যেও না। তবে কেউ যদি আল্লাহর কোন একটি আনুগত্য পালন করার মানত করে যেমন- নামায, রোজা তাহলে সে মানত পূর্ণকরা ফরজ। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করেছে তার উচিত সে আনুগত্য পূর্ণ করা। আরযে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার মানত করেছে সে আল্লাহর অবাধ্য হবেনা।” [সহিহ বুখারি]

অতএব কোন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট কিছুদিন রোজা রাখার অথবা দুই রাকাত নামায পড়ার অথবা বিশেষ সম্পদ সদকা করার মানত করে থাকে তার উচিত সে আনুগত্যের কাজ পালন করা। কেননা আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন: “তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে যেদিনের অনিষ্ট সম্প্রসারিত।” [সূরাআল-ইনসান, আয়াত: ৭] এবং কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বোক্ত হাদিসে মানত পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং মানত রোগ মুক্তির কারণ নয়; প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার কারণ নয়। তাই মানতের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষ নিজের উপর সেটা অনিবার্য করে নেয়। এর মাধ্যমে কুপনের সম্পদ খরচ করানো হয়। পরবর্তীতে মানতকারী আফসোস করে, কষ্টে পড়ে এবং প্রত্যাশাকরে সে যদি মানত না করত। আলহামদুলিল্লাহ ইসলামি শরিয়ত এমন বিধান জারী করেছে যা মানুষের জন্য কল্যাণকর ও সহজতর। সেটা হচ্ছে- মানত করা থেকে নিষেধাজ্ঞা।

প্রশ্ন

স্ত্রী শাওয়াল মাসের ছয় রোজা পালনকালে বে-রোজদার স্বামী তার সাথে সহবাস করেছে; এর লুকুম কি?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

নফল রোজাপালনকারী নিজের উপর কর্তৃত্বশীল। তার জন্য রোজা পূর্ণ করা বা ভেঙ্গে ফেলার অবকাশ রয়েছে। তবে রোজাপূর্ণ করাটা উত্তম। ইমাম আহমাদ (হাদিস নং ২৬৩৫৩) উম্মে হানি (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনযে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে

প্রবেশ করে কোন পানীয় চাইলেন এবং নিজে পান করলেন। এরপর উম্মে হানিকে দিলেন; তিনি ও পান করলেন। এরপর উম্মেহানি বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো রোজাদার ছিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “নফল রোজা পালনকারী নিজের উপর কর্তৃত্বশীল। চাইলে রোজাপূর্ণ করতে পারে; আর চাইলে ভেঙ্গে ফেলতে পারে।” [আলবানি হাদিসটিকে সহিছল জামেগ্রহে (3854) সহিহ বলেছেন]

সুতরাং যে ব্যক্তি শাওয়ালের ছয়রোজা রেখেছে সে যদি রোজাটি ভেঙ্গে ফেলতে চায় ভেঙ্গে ফেলতে পারে। ভেঙ্গে ফেলাটা আহ্বার করার মাধ্যমে হতে পারে; সহবাসের মাধ্যমেও হতে পারে; অন্যকোন ভাবেও হতে পারে।

এ নারী যদি স্বামীর বিনা অনুমতিতে রোজা রেখে থাকেন তাহলে স্বামীর অধিকার রয়েছে তাকে বিছানায় ডাকার এবং স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়া তার উপর অনিবার্য। আর যদি স্ত্রী অনুমতি নিয়ে রোজা রেখে থাকে তাহলে স্ত্রীর রোজা নষ্ট করার অধিকার স্বামীর নেই। তবে স্বামী যদি সেটা চান তাহলে স্ত্রীর জন্য উত্তম হলো স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেয়া।

শাইখ উছাইমীন বলেন: যদি কোন নারী স্বামীর অনুমতি নিয়ে রোজা রাখে তাহলে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর রোজা নষ্ট করা জায়েয হবে না। কারণ সে-ই তো রোজা রাখার অনুমতি দিয়েছে। তবে স্ত্রী যখন স্বামীর অনুমতি নিয়ে নফল রোজা রাখে এরপর স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে এমতাবস্থায় স্ত্রীর জন্য কোনটা উত্তম: রোজা পালন করা; নাকি স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়া? দ্বিতীয়টি অর্থাৎ স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়া উত্তম। কারণ স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়া মূলতঃ ফরজ পর্যায়ের আমল। আর নফল রোজাপালন করা মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল। তাছাড়া স্বামীর তীব্র ইচ্ছাসত্ত্বেও স্ত্রী যদি এতে সাড়া না দেয় তাহলে তাদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে। [শাইখ উছাইমীনের ফতোয়াসমগ্র (২১/১৭৪)]

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

নফল রোজা রাখতে গিয়ে কষ্ট হলে রোজা পূর্ণ করা উত্তম; নাকি ভেঙ্গে ফেলা?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

নফল রোজাপালনকারীর জন্যে রোজাপূর্ণ করা অথবা ভেঙ্গে ফেলা উভয় সুযোগ রয়েছে। তবে কষ্টকর না হলে রোজা পূর্ণকরাই উত্তম। আর কষ্টকর হলে শরিয়তের সহজতা গ্রহণকরে ভেঙ্গে ফেলা উত্তম।

আল্লাহই তাওফিক দাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারপরিজন ও সাহাবীবর্গের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

ফতোয়া ওগবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ আব্দুল আযিয আলে শাইখ, শাইখ সালেহ আল-ফাওয়ান, শাইখ বকর আবুযায়েদ।

প্রশ্ন

জৈনিক ব্যক্তি শাওয়াল মাসের ছয়রোজা রাখতে চান। একদিন তিনি রোজা রাখার নিয়ত করলেন; কিন্তু কোন ওজর ছাড়াই রোজাটি ভেঙ্গে ফেলেন; রোজাটি পূর্ণ করেনি। যে দিনের রোজাটি তিনি ভেঙ্গেছেন সে দিনের রোজাটি কি ছয় রোজা রাখা শেষে কাযা করতে হবে? এতে করে তার সর্বমোট সাতদিন রোজা রাখা হবে? নাকি শাওয়াল মাসের শুধু ছয়দিন রোজা রাখলেই চলবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

নফল রোজা শুরু করলে সেটা পরিপূর্ণ করা কি ফরজ; নাকি ফরজ নয়—এ ব্যাপারে আলেমগণের দুটো অভিমত রয়েছে:

প্রথম অভিমত:

নফল রোজা সমাপ্ত করা অনিবার্য নয় । এটি শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের অভিমত । তাঁদের দলিল হচ্ছে-

১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “ একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে এসে বললেন: কোন খাবার আছে? আমি বললাম: না । তিনি বললেন: তাহলে আমি রোজাদার । পরবর্তীতে অন্য একদিন তিনি আমার ঘরে আসলেন; তখন আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে ‘হাইস’ (খেজুর ও পনিরের মিশ্রণে তৈরী খাবার) হাদিয়া দেয়া হয়েছে । তিনি বললেন: আমাকে দেখাও তো; আমি তো রোজা রেখে ভোর করেছি । অতঃপর তিনি খেয়েছেন ।” [সহিহ মুসলিম (১১৫৪)]

২. আবু জুহাইফা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “... আবু দারদা এলেন এবং তাঁর জন্য অর্থাৎ সালমানের জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন । এরপর বললেন: আমি রোজা রেখেছি; আপনি খান । সালমান বললেন: আপনি না খেলে আমি খাব না । বর্ণনাকারী বলেন: অবশেষে তিনি খেলেন । এরপর সালমান বললেন: আপনার উপর আপনার প্রভুর অধিকার রয়েছে, আপনার আত্মার অধিকার রয়েছে এবং আপনার পরিবারের অধিকার রয়েছে । সুতরাং প্রত্যেক প্রাপককে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করুন । এরপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে ঘটনাটি তাঁকে বললেন; তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সালমান সঠিক বলেছে ।” [সহিহ বুখারি (১৯৬৮)]

৩. আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “ আমিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খাবার তৈরী করলাম । খাবার যখন সামনে পেশ করা হলো তখন উপস্থিত একজন বলল: আমি রোজা রেখেছি । তখন রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমার ভাই তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছে, কষ্ট করে খাবার তৈরী করেছে, তাই তুমি রোজাটি ভেঙ্গে ফেল এবং চাইলে এর বদলে অন্য একটি রোজা রেখে নিও ।” [দারাকুতনি (২৪); ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৪/২১০) ইবনে হাজার হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]

দ্বিতীয় অভিমত:

নফল রোজা সমাপ্ত করা তার উপর অনিবার্য । যদি সেনফল রোজা নষ্ট করে; তাহলে তাকে সে রোজা কাযা করতে হবে । এটি হানাফি মাযহাবের অভিমত । কাযা করা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে তারা নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন:

১. আয়েশা (রাঃ) বলেন: আমাকে ও হাফসাকে কিছু খাবার হাদিয়া পাঠানো হল; সেদিন আমরা দুইজন রোজা রেখেছিলাম । তবে হাদিয়া পেয়ে আমরা রোজা ভেঙ্গে ফেললাম । এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে আসলে আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কাছে কিছু হাদিয়া পাঠানো হয়েছিল; সেটা খাওয়ার জন্য আমাদের তীব্র আগ্রহ হল বিধায় আমরা রোজা ভেঙ্গে ফেললাম । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: উচিত হয়নি; তোমাদেরকে এ দিনের বদলে অন্য একদিন রোজা রাখতে হবে । সুনানে আবু দাউদ (২৪৫৭), সুনানে তিরমিযি (৭৩৫), হাদিসটির সনদে যামিল নামে এক রাবী আছে । ‘তাকরিব’ গ্রন্থে বলা হয়েছে- তিনি অঙাতি পরিচয় । আল-মাজমু গ্রন্থে (৩৯৬) ইমাম নববী, যাদুল মাআদ গ্রন্থে ইবনুল কাইয়েম তাকে দুর্বল বলেছেন এবং আলবানি হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন ।

২. ইমাম মুসলিম কর্তৃক সংকলিত পূর্বোক্ত আয়েশা (রাঃ) এর হাদিসের বর্ণনায় কেউ কেউ বাড়তি বর্ণনা করেন যে, “ আমি তো রোজাদার হিসেবে ভোর করেছি; এরপর তিনি খেয়েছেন এবং বলেছেন: আমি এদিনের পরিবর্তে অন্যদিন রোজা রাখব” ।

এর জবাবে বলা হয় যে, ইমাম নাসাঈ এ বাড়তি অংশকে দুর্বল বলেছেন । তিনি আরও বলেন: এটি ভুল । অনুরূপভাবে দারাকুতনি ও বাইহাকী এ বাড়তি অংশকে দুর্বল বলেছেন ।

দলিল-প্রমাণের বলিষ্ঠতার কারণে প্রথম অভিমতটি অগ্রগণ্য। উম্মে হানির বর্ণিত রেওয়াজে তও প্রথম অভিমতটির সমর্থন যোগায়। সেরেওয়াজে এসেছে- “ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি রোজা রেখেছিলাম; কিন্তু রোজাটি ভেঙে ফেলেছি। তিনি তাকে বললেন: তুমি কি কাযা রোজা রাখছিলে? উম্মে হানি বললেন: না। তিনি বললেন: যদি নফল রোজা হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। সুনানে আবুদাউদ (২৪৫৬), আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “ যদি কোন লোক রোজা রাখা, এরপর এমন কিছু হয় যাতে করে তার রোজা ভাঙাটা পরিস্থিতির দাবী হয়; তাহলে সে রোজা ভেঙে ফেলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল থেকে এটি জানা যায়। একবার তিনি মুমিনদের মা আয়েশা (রাঃ) এর কাছে এসে বললেন: তোমাদের কাছে কোন খাবার আছে? আয়েশা (রাঃ) বললেন: আমাদেরকে হাইস (একজাতীয় খাবার) হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন: ‘আমাকে দেখাও তো; আমি তো রোজা রেখেভোর করেছি’। এরপর তিনি খেয়েছেন। এটি নফল রোজার ক্ষেত্রে; ফরজ রোজার ক্ষেত্রে নয়।” [ফতোয়াসমগ্র, পৃষ্ঠা-২০]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যে দিনের রোজা আপনি ভেঙেছেন সেদিনের রোজা আপনাকে কাযা করতে হবে না। কারণ নফল রোজাপালনকারী নিজের কর্তৃত্বশীল। তাকে শাওয়ালের ছয় রোজা পরিপূর্ণ করতে হবে।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

জৈনিক নারী শাওয়ালের চারটি রোজা রাখার পর মাসের শেষদিকে তার হায়েয শুরু হয়ে গেছে। তাই তিনি ছয় রোজা শেষ করতে পারেননি; দুইদিন বাকী ছিল। শাওয়াল মাস চলে যাওয়ার পর তিনি কি এ রোজাগুলো রাখতে পারবেন?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

ইমাম মুসলিম আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ যে ব্যক্তি রমজান মাস রোজা রাখারপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখবে সে যেন সারা বছর রোজা রাখল।” এ হাদিসের আপাত অর্থ হচ্ছে- যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে ছয় রোজা রাখবে সে এ সওয়াব পাবে।

যে ব্যক্তি কোন ওজরের কারণে কিংবা ওজর ছাড়া ‘শাওয়াল’ ছাড়া অন্য মাসে ছয়রোজা রেখেছে সে কি শাওয়াল মাসে রোজা রাখার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে- এ ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন:

প্রথম মত:

মালেকি মাযহাবের একদল আলেম ও কতিপয় হাম্বলি আলেমের অভিমত হচ্ছে- যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে অথবা শাওয়ালের পর (যে কোন সময়) ছয়টি রোজা রাখবে সে এসওয়াব পাবে। হাদিসে শাওয়াল মাসের কথা এসেছে- মুকাল্লাফ (শরিয়াদায়িত্বপ্রাপ্ত) এর জন্য সহজীকরণার্থে; যেহেতু রমজানের পরপর শাওয়ালমাসে রোজা রাখা তৎপরবর্তী মাসে রোজা রাখার চেয়ে সহজতর।

আল-আদাবি তাঁর রচিত “ শারহুল খারশি” এর ‘পাদটীকা’ (২/২৪৩) তে বলেন: শরিয়তপ্রণেতা শাওয়াল মাসের এর কথা উল্লেখ করেছেন রোজা রাখা সহজীকরণার্থে; রোজা রাখার হুকুমকে এ সময়ের সাথে খাস করে দেয়ার জন্য নহে। অতএব, যে ব্যক্তি যিলহজ্জের দশদিনে এ রোজাগুলো রাখল তার কোন গুনাহ হবে না; বরঞ্চ যিলহজ্জের এদিনগুলোতে রোজা রাখার ব্যাপারে ফজিলতের কথা এসেছে। তাই এ দিনগুলোর ফজিলতও যদি পাওয়া যায় এবং উদ্দেশ্যও যদি হাছিল হয় সেটা আরও ভাল। বরঞ্চ যিলক্বদ মাসেরোজাগুলো রাখাও ভাল। মূলকথা: দিন যত পেরিয়ে যাবে কষ্ট বেশি হওয়ার কারণে সওয়াব তত বাড়বে। সমাণ্ড

মক্কাতে মালেকি মাযহাবের মুফতি মুহাম্মদ বিন আলি বিন হুসাইন এর 'তাহযিবুফুরুকি কারাফি' নামক গ্রন্থে (ফুরুক গ্রন্থের সাথে ছাপাকৃত ২/১৯১) ইবনুলআরাবি মালেকি থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "শাওয়াল মাসে" কথাটি এসেছে- উদাহরণস্বরূপ। উদ্দেশ্য হচ্ছে-রমজান মাসের রোজা দশমাস রোজা রাখার সমতুল্য; আর ছয় রোজা দুইমাস রোজা রাখার সমতুল্য। এটাই মাযহাবের অভিমত (অর্থাৎ মালেকি মাযহাবের অভিমত)। তাই যদি এরোজাগুলো শাওয়াল ছাড়া অন্য মাসে রাখা হয় হুকুম অভিন্ন। তিনি বলেন: এটিসূক্ষ্ম দৃষ্টির নির্যাস; সুতরাং তোমরা তা জেনে রেখো। সমাপ্ত

ইবনুল মুফলিহ (রহঃ) 'আল-ফুরু' নামক গ্রন্থে বলেন: কিছু কিছু আলেমের মতানুযায়ী শাওয়াল ছাড়া অন্য মাসে রোজা রাখলেও এ ফজিলত পাওয়া যাবে- এমন একটি সম্ভাবনা রয়েছে। কুরতুবী এ মতটি উল্লেখ করেছেন। কারণ রোজার ফজিলত হচ্ছে-এর সওয়াব দশগুণ বৃদ্ধি পাওয়া। যেমনটি সাওবান এর হাদিস থেকে জানা যায়। আর শাওয়াল মাসে এ রোজাগুলো রাখার জন্য শর্ত করা হয়েছে- রুখসত (সহজীকরণ) হিসেবে। শরিয়তের রুখসত বা সহজটা গ্রহণ করা উত্তম।

'আল-ইনসাফ' গ্রন্থ প্রণেতা এ মতটি উল্লেখ করে এর সমালোচনা করে বলেন: আমিবলব: এটি দুর্বল অভিমত; হাদিসের খেলাফ। এ রোজাগুলোকে রমজানের ফজিলতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যেহেতু এ রোজাগুলো রমজানের সীমানার সন্নিকটে; এ কারণে নয় যে, এ রোজাগুলোর প্রতিদান দশগুণ। তাছাড়া যেহেতু এ রোজাগুলো রাখা রমজানের ফরজ রোজা রাখার সমান ফজিলতপূর্ণ। [আল-ইনসাফ (৩/৩৪৪) থেকে সমাপ্ত]

দ্বিতীয় মত:

শাফেয়ী মাযহাবের একদল আলেমের মতে, যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে রোজাগুলো রাখতে পারেনি সে যিলকদ মাসে রোজাগুলো কাযা করবে। তবে সে ব্যক্তি ঐব্যক্তির চেয়ে কম সওয়াব পাবে যিনি শাওয়াল মাসে রোজাগুলো পালন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি রমজানের সিয়াম পালন করার পর শাওয়াল মাসে ছয়রোজা পালন করলে সে গোটা বছর ফরজ রোজা পালন করার সওয়াব পাবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি রমজানমাস সিয়াম পালন করল ও শাওয়াল ছাড়া অন্য মাসে ছয় রোজা রাখল সে রমজান মাসেরোজা রাখার ও ছয়দিন নফল রোজা রাখার সওয়াব পাবে।

ইবনে হাজার মক্কি 'তুহফাতুল মুহতাজ' নামক গ্রন্থে (৩/৪৫৬) বলেন: "যেব্যক্তি প্রতি বছর রমজানের সাথে রোজাগুলো রাখবে সে যেন আজীবন ফরজ রোজা রাখল; সওয়াব কয়েকগুণ বাড়বে না। আর যে ব্যক্তি শাওয়াল ছাড়া অন্য মাসে ছয়টি রোজা রাখবে সে ব্যক্তি আজীবন নফল রোজা রাখার সওয়াব পাবে; সওয়াব কয়েকগুণ বাড়বে না।

আল্লাহই ভাল জানেন।" সমাপ্ত

তৃতীয় মত:

এ ফজিলত শাওয়াল মাসে রোজাগুলো রাখা ছাড়া অর্জিত হবে না। এটি হাম্বলি মাযহাবের অভিমত।

কাশশাফুল ফিনা (২/৩৩৮) গ্রন্থে বলেছেন: "হাদিসের প্রকাশ্য ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, শাওয়াল মাসে রোজাগুলো রাখা ছাড়া এ ফজিলত পাওয়া যাবে না।" সমাপ্ত

কেউ যদি কিছু রোজা রাখে; কিন্তু কোন ওজরের কারণে সবগুলো রোজা রাখতে না পারে আশা করা যায় সে সওয়াব পাবে ও ফজিলত অর্জন করবে।

শাইখ বিন বায বলেন: শাওয়াল মাসে শেষ হয়ে যাওয়ার পর এ রোজাগুলো কাযা করার কোন বিধান নেই। কারণ এটি সন্নত এবং এ সন্নত পালন করার সময় পার হয়ে গেছে; হোক না সে ব্যক্তি কোন ওজরের কারণে কিংবা ওজর ছাড়া রোজাগুলো রাখেনি।

যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসের চারদিন রোজা রাখতে পেরেছে; বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ছয়দিন পূর্ণ করতে পারেনি তার ব্যাপারে বলেন: শাওয়াল মাসের ছয়দিন রোজা রাখা একটি মুস্তাহাব আমল; ফরজ আমল নয়। সুতরাং আপনি যে কয়দিন রোজা রেখেছেন সে কয়দিনের সওয়াব পাবেন এবং যদি শরিয়ত অনুমোদিত কোন ওজরের কারণে রোজাগুলো রাখতে না পারেন সে ক্ষেত্রে আশা করা যায় আপনি পূর্ণ সওয়াব পাবেন। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে এসেছে- "যখন কোনবান্দা অসুস্থ হয় কিংবা

সফরে থাকে তখন আল্লাহ তার জন্য সে আমলগুলোর সওয়াবলিখে দেন যে আমলগুলো সে মুকীম বা সুস্থ থাকাবস্থায় পালন করত।" [সহিহ বুখারি] আপনি যে রোজাগুলো রাখতে পারেননি সেগুলো কাযা করতে হবে না। আল্লাহই তাওফিকদাতা। [বিন বাযের ফতোয়াসমগ্র থেকে (১৫/৩৮৯, ৩৯৫) সমাপ্ত]

সারকথা হচ্ছে-

হয় রোজা শাওয়াল মাস ছাড়া অন্য মাসে রাখলে আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন এ রোজাগুলো শাওয়াল মাসে রাখার মতই। আবার কোন কোন আলেম সে রোজাগুলোর ফজিলত সাব্যস্ত করলেও বলেন যে, এর ফজিলত শাওয়াল মাসে রাখার চেয়ে কম। আর কোনকোন আলেমের মতে, যদি ওজরের কারণে কেউ রোজাগুলো রাখতে না পারে তাহলে সেপূর্ণ সওয়াব পাবে। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রশস্ত। আল্লাহর দানের কোন সীমা নেই। সুতরাং এ বোনটি যদি শাওয়ালের দুইদিনের পরিবর্তে যিলকদ মাসে দুইদিন রোজা রাখা সেটা ভাল। ইনশাআল্লাহ; তিনি আল্লাহর কাছে সওয়াব পাবেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন

আমি শুনেছি আশুরার রোজা নাকি বিগত বছরের গুনাহ মোচন করে দেয়- এটা কি সঠিক? সব গুনাহ কি মোচন করে; কবিরাগুনাহও? এ দিনের এত বড় মর্যাদার কারণ কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আশুরার রোজা বিগত বছরের গুনাহ মোচন করে। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: "আমি আল্লাহর নিকট প্রতিদান প্রত্যাশা করছি আরাফার রোজা বিগত বছর ও আগত বছরের গুনাহ মার্জনা করবে। আরও প্রত্যাশা করছি আশুরার রোজা বিগত বছরের গুনাহ মার্জনা করবে।" [সহিহ মুসলিম (১১৬২)] এটি আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ একদিনের রোজার মাধ্যমে বিগত বছরের সবগুনাহ মার্জনা হয়ে যাবে নিশ্চয় আল্লাহ মহান অনুগ্রহকারী।

আশুরার রোজার মহান মর্যাদার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি এ রোজার ব্যাপারে খুব আগ্রহী থাকতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "ফজিলতপূর্ণ দিন হিসেবে আশুরার রোজা ও এ মাসের রোজা অর্থাৎ রমজানের রোজার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যত বেশি আগ্রহী দেখেছি অন্য রোজার ব্যাপারে তদ্রূপ দেখিনি।" [সহিহ বুখারি (১৮৬৭)] হাদিসে رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "سوايا يومئذ لا رجة الا في يومئذ" - সওয়াব প্রাপ্তি ও আগ্রহের কারণে তিনি এ রোজার প্রতীক্ষায় থাকতেন।

দুই:

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আশুরার রোজা রাখা ও এব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামকে উদ্বুদ্ধ করার কারণ হচ্ছে বুখারির বর্ণিত হাদিস (১৮৬৫) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় এলেন তখন দেখলেন ইহুদিরা আশুরার দিন রোজা রাখে। তখন তিনি বললেন: কেন তোমরা রোজা রাখ? তারা বলল: এটি উত্তম দিন। এদিনে আল্লাহ বনি ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করেছেন; তাই মুসা আলাইহিস সালাম এদিনে রোজা রাখতেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমাদের চেয়ে আমি মুসার অধিক নিকটবর্তী। ফলে তিনি এ দিন রোজা রাখলেন এবং অন্যদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।"

হাদিসের উদ্ধৃতি: “ এটি উত্তম দিন” মুসলিমের রেওয়াজেতে এসেছে- “ এটি মহানদিন । এদিনে আল্লাহ মুসাকে ও তাঁর কওমকে মুক্ত করেছেন এবং ফেরাউন ও তারকওমকে ডুবিয়ে মেরেছেন ।” হাদিসের উদ্ধৃতি: “ তাই মুসা আলাইহিস সালাম এদিনেরোজা রাখতেন” সহিহ মুসলিমে আরেকটু বেশি আছে যে “ ...আল্লাহর প্রতিকৃতজ্ঞতাস্বরূপ; তাই আমরা এ দিনে রোজা রাখি” । বুখারির অন্য রেওয়াজেতে এসেছে- “ এ দিনের মহান মর্যাদার কারণে আমরা রোজা রাখি” । হাদিসের উদ্ধৃতি: “ অন্যদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন” বুখারির অন্য রেওয়াজেতে এসেছে- “ তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন: তোমরা তাদের চেয়ে মুসার অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং তোমরা রোজা রাখ” । তিন:

আশুরার রোজা দ্বারা শুধু সগিরা গুনাহ মার্জনা হবে । কবিরার গুনাহ বিশেষতওবা ছাড়া মোচন হয় না । ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: আশুরার রোজা সকল সগিরা গুনাহমোচন করে । হাদিসের বাণীর মর্ম রূপ হচ্ছে- কবিরার গুনাহ ছাড়া সকল গুনাহমোচনকরে দেয় । এরপর তিনি আরও বলেন: আরাফার রোজা দুই বছরের গুনাহ মোচন করে । আরআশুরার রোজা এক বছরের গুনাহ মোচন করে । মুক্তাদির আমীন বলা যদি ফেরেশতাদেরআমীন বলার সাথে মিলে যায় তাহলে পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়... উল্লেখিত আমলগুলোর মাধ্যমে পাপ মোচন হয় । যদি বান্দার সগিরা গুনাহ থাকে তাহলে সগিরা গুনাহ মোচন করে । যদি সগিরা বা কবিরার কোন গুনাহ না থাকে তাহলেতার আমলনামায় নেকি লেখা হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় । ... যদি কবিরাগুনাহ থাকে, সগিরা গুনাহ না থাকে তাহলে কবিরার গুনাহকে কিছুটা হালকা করারআশা করতে পারি । [আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, খণ্ড-৬]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: পবিত্রতা অর্জন, নামায আদায়, রমজানের রোজা রাখা, আরাফার দিন রোজা রাখা, আশুরার দিন রোজা রাখা ইত্যাদিরমাধ্যমে শুধু সগিরা গুনাহ মোচন হয় । [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খণ্ড-৫]

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আল্লাহ আমাকে মাফ করুন । আমি ধূমপান ত্যাগ করেরজব মাসের ৭ তারিখ থেকে শাবান মাসের শেষ পর্যন্ত একাধারে সিয়াম পালন করেছি । শাবান ও রমজানের মাঝখানে কোন বিরতি দেই নি । কারণ এই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্নরকম ফতোয়া পাওয়া গেছে ।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আপনাকে এই হারাম (অভ্যাস) ছেড়ে দেওয়ার তাওফিক দিয়েছেন । আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য ও আপনার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফিক প্রার্থনা করছি । আপনি শাবান ও রমজান এর মাঝে বিরতি না দিয়ে যে সিয়াম পালন করেছেন সেটা জামেয় । আপনার এই আমল রাসূলের সুন্নাহ মোতাবেক হয়েছে ।

প্রশ্ন

চন্দ্রমাসের তিন দিনের রোজা ও আরাফা দিনের রোজার নিয়ত কি একত্রে করা যাবে? আমরা কি দুটোরই সওয়াব পাব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

ইবাদতগুলোর একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করা দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার:

অশুদ্ধ প্রকার: (১) যেসমস্ত ইবাদত স্বতন্ত্রভাবে উদ্দিষ্ট অথবা (২) যেসমস্ত ইবাদত অন্য কোন ইবাদতের অনুবর্তী সে সব ইবাদতের একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করবেনা। যেমন কোন ব্যক্তির যদি ফজরের সূন্নত নামাজ ছুটে যায়; এমনকি সূর্য উঠে সালাতুত দোহা এর সময় উপনীত হয় সেক্ষেত্রে সালাতুত দোহা এর বদলে ফজরের সূন্নত যথেষ্ট হবেনা অথবা ফজরের সূন্নত এর বদলে সালাতুত দোহাও যথেষ্ট হবেনা এবং এ দুই নামাজকে এক নিয়্যতেও আদায় করা যাবেনা। কারণ ফজরের সূন্নত স্বতন্ত্র একটি ইবাদত এবং সালাতুত দোহা স্বতন্ত্র আরেকটি ইবাদত। একটির পরিবর্তে অন্যটি যথেষ্ট হবেনা।

একই ভাবে যদি কোন একটি ইবাদত তার আগের ইবাদতের অনুবর্তী হয় সেক্ষেত্রেও এই ইবাদতগুলোর একটি অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করা শুদ্ধ নয়। যদি কোন ব্যক্তি একথা বলে যে আমি ফজরের সালাতের নিয়্যতে ফরজ ও সূন্নত দুটো একসাথে আদায় করতে চাই, তবে আমরা বলব সেটা শুদ্ধ হবেনা। কারণ ফজরের সূন্নত সালাত ফজরের ফরজ সালাতের অধীন তাই এটা ওটার পরিবর্তে যথেষ্ট হবেনা।

দ্বিতীয় প্রকার:

যে ইবাদতের দলীল দ্বারাস্ব-জাতীয় যে কোন ইবাদত পালন উদ্দেশ্য; স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ কোন ইবাদত পালন উদ্দিষ্ট নয় এমন ইবাদতগুলোর একটি অপরটির মাঝে প্রবেশ করতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি মসজিদে ঢুকে লোকদেরকে সালাতুল ফজর আদায়রত অবস্থায় পেলেন। মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকাত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) সালাত আদায় নাকরে বসা যায় না- এবিধান সবাই জানে। এখন এ ব্যক্তি যদি ইমামের সাথে ফরজ নামাজের জামাতে যোগদান করেন তবুও তিনি সেই দুইরাকাত (তাহিয়্যাতুলমসজিদ) নামাজের সওয়াব পেয়ে যাবেন। কেন? কারণ তাহিয়্যাতুল মসজিদের উদ্দেশ্য মসজিদে প্রবেশের পর যে কোন প্রকারের দুই রাকাত সালাত আদায় করা। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি সালাতুত দোহার সময় মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত সালাত আদায়করে এবং এর দ্বারা সালাতুত দোহার নিয়্যত করে তবে তা তাহিয়্যাতুল মসজিদ এর স্থলেও যথেষ্ট হবে। আর যদি সে উভয় নামাজ (তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও সালাতুত দোহা) এর নিয়্যতকরে তবে তা অধিক পরিপূর্ণ।

এটি হল ইবাদতসমূহের একটি অপরটির মাঝে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে মূলনীতি। একই নীতিরোজার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন: আরাফার দিনের রোজা। এখানে উদ্দেশ্য হল- এইদিনটি সিয়ামপালনেরত অবস্থায় কাটানো। তা প্রতি মাসের তিনদিন রোজা পালনের নিয়্যতেই হোক অথবা আরাফার দিনের রোজার নিয়্যতেই হোক। তবে আপনি যদি শুধু আরাফার দিনের জন্য নিয়্যত করে থাকেন, তবে তা সেই তিনদিনের সিয়ামের জন্য যথেষ্ট হবেনা। আর যদি (আরাফার দিনে) সেই তিন দিনের কোন একদিনের নিয়্যতে সিয়াম পালনকরে থাকেন, তবে তা আরাফার দিনের জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি উভয় প্রকার রোজার নিয়্যত করেন তবে তা বেশী ভালো।

যে দিনগুলোতে রোজা রাখা নিষিদ্ধ

শাওয়াল মাসের দ্বিতীয় দিন রোযা রাখা জায়েয

প্রশ্ন

ঈদের দ্বিতীয় দিন কিংবা তৃতীয় দিন কাযা রোযা রাখা কি জায়েয আছে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ঈদুল ফিতর শুধু একদিন। সে দিনটি হলো- শাওয়াল মাসের প্রথম দিন। পক্ষান্তরে, মানুষের মাঝে যে ধারণা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, 'ঈদুল ফিতর তিনদিন' এটি শুধুমাত্র সামাজিক প্রথা ছাড়া আর কিছু নয়; এর উপরে কোন শরয়ি হুকুম বর্তায় না।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন:

“ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা শীর্ষক পরিচ্ছেদ”

এরপর তিনি আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন (হাদিস নং-১৯৯২) যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

এ দলিলের ভিত্তিতে ঈদুল ফিতর শুধু একদিন মাত্র; যেদিন রোযা রাখা হারাম। তাই শাওয়াল মাসের দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিন রোযা রাখা হারাম নয়। তাই সে দুটি দিনে রমযানের কাযা রোযা রাখা কিংবা নফল রোযা রাখা জায়েয।

আল্লাহই ভাল জানেন।

মাস শুরু হওয়ার একদিন বা দুইদিন আগে থেকে রমযানের রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞা

প্রশ্ন

আমি শুনেছি যে, রমযানের আগে রোযা রাখা জায়েয নয়; এ কথা কি সঠিক?

উত্তর

সংশ্লিষ্ট

আলহামদু লিল্লাহ।

শাবান মাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশে রোযা রাখা নিষেধ মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে। তবে দুই অবস্থা ব্যতীত:

এক. যে ব্যক্তির রোযা রাখার বিশেষ কোন অভ্যাস আছে। যেমন— যে ব্যক্তির অভ্যাস হচ্ছে প্রতি সোমবার ও প্রতি বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা; সে ব্যক্তি এ দুইদিন রোযা রাখতে পারবেন; এমনকি সেটা যদি শাবান মাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশে পড়ে তবুও।

দুই. যদি কেউ শাবান মাসের প্রথম অংশের সাথে দ্বিতীয় অংশেও লাগাতরভাবে রোযা রাখে। সেটা এভাবে যে, শাবান মাসের প্রথমার্ধে রোযা শুরু করে রমযান শুরু হওয়া পর্যন্ত রোযা অব্যাহত রাখা। এটি জায়েয। আরও জানতে দেখুন [13726](#) নং প্রশ্নোত্তর।

এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা রমযানের একদিন কিংবা দু’দিন আগে থেকে রোযা রাখা শুরু করবে না। তবে কারো যদি রোযা রাখার বিশেষ কোন অভ্যাস থাকে তাহলে সে সেদিন রোযা রাখুক।” [সহিহ বুখারী (১৯১৪) ও সহিহ মুসলিম (১০৮২)]
- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন শাবান মাসের অর্ধেক পার হয়ে যায় তখন তোমরা আর রোযা রেখ না।” [সুনানে আবু দাউদ (৩২৩৭), সুনানে তিরমিযি (৭৩৮) ও ইবনে মাজাহ (১৬৫১) এবং আলবানী ‘সহিহত তিরমিযি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

ইমাম নববী বলেন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তোমরা রমযানের একদিন কিংবা দু’দিন আগে থেকে রোযা রাখা শুরু করবে না। তবে কারো যদি রোযা রাখার বিশেষ কোন অভ্যাস থাকে তাহলে সে সেদিন রোযা রাখুক।” —র মধ্যে রমযানের একদিন বা দু’দিন আগে থেকে রোযা শুরু করার ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে, ঐ ব্যক্তির জন্য নয়— যার বিশেষ অভ্যাসগত রোযা এ দিনের মধ্যে পড়বে কিংবা এর আগে থেকে সে লাগাতরভাবে রোযা রেখে আসবে। যদি কেউ এর আগে থেকে রোযা রেখে না আসে কিংবা তার বিশেষ অভ্যাসগত রোযাও না হয় তাহলে এ সময়ে রোযা রাখা হারাম [সমাণ্ড]

- আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) বলেন: “যে ব্যক্তি এমন দিনে রোযা রাখল যে দিনটি নিয়ে মানুষ সন্দেহে রয়েছে সে আবুল কাসেমের (নবীর) অবাধ্য হল।” [সুনানে তিরমিযি (৬৮৬), সুনানে নাসাঈ (২১৮৮)] আরও জানতে দেখুন: [13711](#) নং প্রশ্নোত্তর।

হাফেয ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে বলেন:

এ উক্তিটি দিয়ে সন্দেহের দিন রোযা রাখা হারাম হওয়ার পক্ষে দলিল দেওয়া হয়। কেননা এমন কথা সাহাবী নিজ অভিমত থেকে বলতে পারেন না। [সমাগু]

সন্দেহের দিন হল— শাবান মাসের ৩০ তারিখ; যেইদিন আকাশে মেঘ থাকার কারণে চাঁদ দেখা যায়নি। এ দিনটিকে সন্দেহের দিন বলার কারণ হল, এ দিনটি কি শাবান মাসের ৩০ তারিখ; নাকি রমযান মাসের ১ তারিখ সেটা নিয়ে সন্দেহ হওয়া।

তাই সেই দিন রোযা রাখা হারাম। তবে, কারো অভ্যাসগত রোযা এ দিনে পড়ে গেলে তার জন্যে হারাম নয়।

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে (৬/৪০০) সন্দেহের দিন রোযা রাখার হুকুম সম্পর্কে বলেন:

আর যদি কেউ এই দিন নফল রোযা রাখে: যদি এ নফল রোযার বিশেষ কোন কারণ থাকে; যেমন—কারো অভ্যাস হল সারা বছর রোযা রাখা কিংবা কারো অভ্যাস হল একদিন রোযা রাখা, একদিন রোযা না-রাখা কিংবা কারো অভ্যাস হল সোমবারের মত নির্দিষ্ট কোন দিনে রোযা রাখা; আর সন্দেহের দিনে তার রোযার দিনটি পড়ে তাহলে তার জন্যে রোযা রাখা জায়েয হবে। এ ব্যাপারে আমাদের মাযহাবের আলেমগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই...। এর সপক্ষে দলিল হল আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস: "তোমরা রমযানের একদিন কিংবা দু'দিন আগে থেকে রোযা রাখা শুরু করবে না। তবে কারো যদি রোযা রাখার বিশেষ কোন অভ্যাস থাকে তাহলে সে সেদিন রোযা রাখুক।" আর যদি তার রোযা রাখার বিশেষ কোন কারণ না থাকে তাহলে সেই দিন রোযা রাখা হারাম। [পরিমার্জিত ও সমাগু]

শাইখ উছাইমীন "তোমরা রমযানের একদিন কিংবা দু'দিন আগে থেকে রোযা রাখা শুরু করবে না।" হাদিসটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: আলেমগণ এ নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে, এটি কি হারামসূচক নিষেধাজ্ঞা; নাকি মাকরুহসূচক নিষেধাজ্ঞা? সঠিক অভিমত হচ্ছে—এটি হারামসূচক নিষেধাজ্ঞা। বিশেষ করে সন্দেহের দিনের ব্যাপারে। [সমাগু] [শারহু রিয়াদুস সালাহীন (৩/৩৯৪)]

পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে শাবান মাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশের রোযা দুই প্রকার:

১। শাবান মাসের ১৬ তারিখ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রোযা রাখা। এটি মাকরুহ; তবে যে ব্যক্তির বিশেষ কোন অভ্যাস আছে সে ব্যক্তি ব্যতীত।

২। সন্দেহের দিনে রোযা রাখা কিংবা রমযানের একদিন বা দুইদিন আগে রোযা রাখা। এটি হারাম; তবে যে ব্যক্তির বিশেষ কোন অভ্যাস আছে সে ব্যক্তি ব্যতীত।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

তাশরিকের দিনগুলোতে রোযা রাখার বিধান

প্রশ্ন

আমি প্রতি বৃহস্পতিবার রোযা রাখি। ঘটনাক্রমে ১২ ই যিলহজ্জ বৃহস্পতিবার পড়েছে এবং সেদিন আমি রোযা রেখেছি। আমি জুমার দিন শুনেছি যে, তাশরিকের দিনগুলোতে রোযা রাখা নাজায়েয। বৃহস্পতিবার ছিল তাশরিকের তৃতীয় দিন। আমি যে, রোযা রেখেছি সে কারণে আমার উপরে কি কোন কিছু বর্তাবে? সত্যিকার-ই কি তাশরিকের দিনগুলোতে রোযা রাখা নাজায়েয; নাকি শুধু ঈদের প্রথম দিন আমরা রোযা রাখব না?

উত্তর

সংশ্লিষ্ট

আলহামদু লিল্লাহ।

দুই ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। দলিল হচ্ছে আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) এর হাদিস; তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখতে বারণ করেছেন” [সহিহ বুখারী (১৯৯২) ও সহিহ মুসলিম (৮২৭)]। আলেমগণ ইজমা করেছেন যে, ‘এ দুইদিন রোযা রাখা হারাম’।

অনুরূপভাবে তাশরিকের দিনগুলোতে রোযা রাখাও হারাম। তাশরিকের দিনগুলো হচ্ছে- ঈদুল আযহার পরের তিনদিন (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ)। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তাশরিকের দিনগুলো হচ্ছে- পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন” [সহিহ মুসলিম (১১৪১)]

উম্মে হানির আযাদকৃত দাস আবু মুররা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আমরের সাথে তার পিতা আমর বিন আসের কাছে যান। তিনি তাদের দুইজনের জন্য খাবার পেশ করে বলেন: খাও। সে বলল: আমি রোযা রেখেছি। তখন আমর (রাঃ) বললেন: খাও; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিনগুলোতে আমাদেরকে রোযা না-রাখার নির্দেশ দিতেন এবং রোযা রাখতে নিষেধ করতেন। ইমাম মালেক বলেন: এ দিনগুলো হচ্ছে- তাশরিকের দিন [সুনানে আবু দাউদ (২৪১৮), আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

তবে যে হাজীসাহেব কোরবানীর পশু সংগ্রহ করতে পারেননি তার জন্যে এ দিনগুলোতে রোযা রাখা জায়েয। আয়েশা (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: “যে ব্যক্তি হাদির পশু সংগ্রহ করতে পারে নাই সে ব্যক্তি ছাড়া তাশরিকের দিনগুলোতে অন্য কাউকে রোযা রাখার অবকাশ দেয়া হয়নি” [সহিহ বুখারী (১৯৯৮)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “তামাত্তু ও ফিরান হজ্জকারী হাদির পশু না পেলে তার জন্যে এই তিনদিন রোযা রাখা জায়েয; যাতে করে রোযা রাখার পূর্বে হজ্জের মৌসুম শেষ হয়ে না যায়। এ ছাড়া অন্য কোন রোযা এ দিনগুলোতে রাখা নাজায়েয। এমনকি কোন ব্যক্তির উপর যদি দুই মাসের লাগাতর রোযা রাখা ফরয হয়ে থাকে সে ব্যক্তিও ঈদের দিন এবং ঈদের পর আরও তিনদিন রোযা রাখবে না। এ দিনগুলোর পর পুনরায় লাগাতর রোযা থাকা শুরু করবে” [ফাতাওয়া রমাদান, পৃষ্ঠা-৭২৭]

আরও জানতে দেখুন: [21049](#) ও [36950](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জানেন।

ঈদের দিনসহ যিলহজ্জ মাসের দশদিন রোযা রাখা কি মুস্তাহাব

প্রশ্ন

আমি আপনাদের ওয়েব সাইটে আরাফার দিন রোযা রাখার ফযিলত সম্পর্কে পড়েছি। কিন্তু, আমি যিলহজ্জ মাসের দশদিন রোযা রাখার ফযিলত সম্পর্কেও পড়েছি; এটা কি সঠিক? যদি এটা সঠিক হয়ে থাকে তাহলে আপনি যদি আমাকে নিশ্চিত করতেন যে আমরা কি ৯ দিন রোযা রাখব; নাকি দশদিন। কেননা ১০ তম দিন ঈদের দিন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যিলহজ্জ মাসের ৯ দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। এর সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিসে: “অন্য যে কোন সময়ের নেক আমলের চেয়ে আল্লাহর কাছে এ দিনগুলোর নেক আমল অধিক প্রিয়। তারা (সাহাবীরা) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? তিনি বলেন: আল্লাহর পথে জিহাদও নয়; তবে কোন লোক যদি তার জানমাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং কোন কিছু নিয়ে ফেরত না আসে সে ব্যতীত।” [সহিহ বুখারী (৯৬৯)] হুнайদা বিন খালেদ তার স্ত্রী থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন একজন স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৯ই যিলহজ্জ, আশুরার দিন এবং প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখতেন: মাসের প্রথম সোমবার ও যে কোন দুই বৃহস্পতিবার [মুসনাদে আহমাদ (২১৮২৯), সুনানে আবু দাউদ (২৪৩৭), ‘নাসবুর রায়াহ’ গ্রন্থে (২/১৮০) হাদিসটিকে দুর্বল বলা হয়েছে; আলবানী সহিহ বলেছেন]

আর ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) এর মারফু হাদিস: “ঈদুল ফিতরের দিন ও কোরবানির দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন” [সহিহ বুখারী (১৯৯২) ও সহিহ মুসলিম (৮২৭)]। এ দুইদিন রোযা রাখা ‘হারাম’ হওয়া মর্মে আলেমগণ ইজমা (ঐক্যমত) করেছেন।

এ দশদিনে নেক আমল করা অন্য যে কোন দিন নেক আমল করার চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ। তবে, রোযা রাখা যাবে শুধু ৯ দিন। ১০ ই যিলহজ্জ ঈদের দিন। ঈদের দিনে রোযা রাখা হারাম।

এ আলোচনার আলোকে ‘যিলহজ্জের দশদিন রোযা রাখার ফযিলত’ এমন শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- শুধু ৯ দিন রোযা রাখা। ৯ দিনকে ১০ দিন বলা হয়েছে তাগলিবের ভিত্তিতে (অর্থাৎ দশকের ভগ্নাংশকে দশক হিসেবে উল্লেখ করার ভিত্তিতে)। [দেখুন: ইমাম নববী কৃত সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ; হাদিস নং- (১১৭৬)]

সন্দেহের দিন রোজা রাখা

প্রশ্ন

আমরা ৩০ ই শাবানের রাত্রিতে চাঁদ দেখার জন্য বের হই। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখা যাইনি। এমতাবস্থায় আমরা কি ৩০ শে শাবান রোজা রাখব? যেহেতু এটি সন্দেহপূর্ণ দিন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এ দিনটিকে সন্দেহের দিন বলা হয় (যেহেতু এ দিনটি নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়- এটি কি শাবানের শেষ দিন; নাকি রমজানের প্রথম দিন)। এ দিনে রোজা রাখা হারাম। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখবে এবং চাঁদ দেখে রোজা ছাড়বে। আর যদি তোমাদের দৃষ্টি থেকে চাঁদ লুকাইত থাকে তাহলে শাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করবে।” [সহিহ বুখারি (১৯০৯)]

আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) বলেন: যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন রোজা রাখবে সে আবুল কাসেম (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপনাম) এর অবাধ্য হল। [হাদিসটি তিরমিযি বর্ণনা করেছেন এবং আলবানি সহিহ তিরমিযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন (৫৫৩)]

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

এ বাণীটি দিয়ে সন্দেহের দিন রোজা রাখা হারাম হওয়ার পক্ষে দলিল দেয়া হয়। কারণ সাহাবী নিজের মন থেকে এমন বক্তব্য দিতে পারেন না। বরং এটি রাসূলের হাদিসের পর্যায়ভুক্ত।

সন্দেহের দিন রোজা রাখার ব্যাপারে স্থায়ী কমিটির আলেমগণ বলেন:

“হাদিসের দলিলের ভিত্তিতে এই দিন রোজা রাখা হারাম।” [ফাতাওয়াল লাজনা (১০/১১৭)]

শাইখ মুহাম্মদ বিন উছাইমীন সন্দেহের দিন রোজা রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত উল্লেখ করার পর বলেন: “এ অভিমতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে- এ দিন রোজা রাখা হারাম। কিন্তু খলিফার নিকট যদি এই দিন রোজা রাখা ফরজ সাব্যস্ত হয় এবং তিনি মানুষকে এই দিন রোজা রাখার নির্দেশ প্রদান করেন তাহলে তার সাথে দ্বিমত করা যাবে না। দ্বিমত না করার অর্থ হচ্ছে- রোজা পালন না-করার বিষয়টি গোপন রাখবে; প্রকাশ করবে না। [আল-শারহুল মুমতি (৬/৩১৮)]

শাবান থেকে রমজান পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে সিয়াম পালন করা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। আমি ধূমপান ত্যাগ করে রজব মাসের ৭ তারিখ থেকে শাবান মাসের শেষ পর্যন্ত একাধারে সিয়াম পালন করেছি। শাবান ও রমজানের মাঝখানে কোন বিরতি দেই নি। কারণ এই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন রকম ফতোয়া পাওয়া গেছে।

উত্তর

সংশ্লিষ্ট

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আপনাকে এ ইহারাম(অভ্যাস) ছেড়ে দেওয়ার তাওফিক দিয়েছেন। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য ও আপনার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফিক প্রার্থনা করছি। আপনি শাবান ও রমজান এর মাঝে বিরতি না দিয়ে যে সিয়াম পালন করেছেন সেটা জায়েয। আপনার এই আমল রাসূলের সুন্নাহ মোতাবেক হয়েছে। আরও জানতে পড়ুন প্রশ্ননং(13726)।

ইতিকাফ

ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া কি জায়েয?

প্রশ্ন

রমযানের শেষ দশদিন মসজিদে ইতিকাফ করা সম্পর্কে আমি জানতে চাই। উল্লেখ্য, আমি চাকুরী করি। আমার চাকুরীর ডিউটি শেষ হয় দুপুর ২টা বাজে। আমাকে কি সার্বক্ষণিক মসজিদে থাকতে হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইতিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হওয়া ইতিকাফকে বাতিল করে দেয়। কেননা ইতিকাফ হলো: মসজিদে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য অবস্থান করা।

তবে যদি এমন কোন কাজে বের হয় যার জন্য বের না হলে নয়; যেমন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে, ওয়ু ও গোসলের জন্য, খাবার আনার জন্য; যদি খাবার দিয়ে যাওয়ার কেউ না থাকে ইত্যাদি যে কাজগুলো না হলে নয় এবং যে কাজগুলো মসজিদে করার সুযোগ নেই; সেক্ষেত্রে ইতিকাফ নষ্ট হবে না।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিকাফে থাকা অবস্থায় মানবিক প্রয়োজন ছাড়া বাসাতে প্রবেশ করতেন না। [সহিহ বুখারী (২০৯২) ও সহিহ মুসলিম (২৯৭)]

ইবনে কুদামা 'আল-মুগনী' গ্রন্থে (৪/৪৬৬) বলেন:

মানবিক প্রয়োজন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: পেশাব ও পায়খানা। মানবিক প্রয়োজন বলে ইঙ্গিতে এ দুটোতে বুঝানো হয়েছে। কেননা প্রত্যেক মানুষেরই এ দুটো কাজ করার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনের মধ্যে খাবার ও পানীয়ও অধিভুক্ত। যদি তার জন্য তার প্রয়োজনগুলো নিয়ে আসার কেউ না থাকে তাহলে যখনই প্রয়োজন হবে তখনই এর জন্য বের হতে পারবে। এতে করে তার ইতিকাফ বাতিল হবে না; যদি এই শর্তে বের হয় এবং দেরী না করে। [সমাণ্ড]

ইতিকাফকারীর চাকুরীর জন্য বের হওয়া এটি ইতিকাফের সাথে সাংঘর্ষিক।

স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

ইতিকাফকারীর জন্য কোন রোগীকে দেখতে যাওয়া, কোন নিমন্ত্রণে হাযির হওয়া, পরিবারের প্রয়োজন পূরণে, জানাযার নামায পড়তে কিংবা মসজিদের বাহিরে কোন কাজে যাওয়া কি জায়েয?

তারা জবাব দেন:

সুন্নাহ হলো: ইতিকাফকারী ইতিকাফকালে কোন রোগীকে দেখতে না যাওয়া, নিমন্ত্রণে না যাওয়া, পরিবারের প্রয়োজন পূরণে বের না হওয়া, জানাযায় হাযির না হওয়া, মসজিদের বাহিরে কোন কাজে না যাওয়া। যেহেতু আয়েশা (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “ সুন্নাহ হলো ইতিকাফকারী কোন রোগীকে দেখতে না যাওয়া, জানাযায় হাযির না হওয়া, কোন নারীকে স্পর্শ না করা, শৃঙ্গার না করা, কোন প্রয়োজনে বের না হওয়া; একান্ত যে প্রয়োজনে বের না হলেই নয় সেটা ছাড়া। [সুনানে আবু দাউদ (২৪৭৩)]

ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমা (১০/৪১০)

কোন পুরুষ বা নারীর মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ইতিকাফ করা সহিহ নয়

প্রশ্ন

কোন নারী কি নিজ ঘরে ইতিকাফ করতে পারেন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলেমগণ এই মর্মে একমত যে, কোন পুরুষের জন্য মসজিদ ছাড়া ইতিকাফ করা সহিহ নয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “*আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফে থাকা অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে যৌনকর্ম করো না।*” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭] আয়াতে ইতিকাফকে মসজিদের সাথে খাস করা হয়েছে। [দেখুন: আল-মুগনী (৪/৪৬১)]

পক্ষান্তরে, নারীর ইতিকাফের ব্যাপারে জমহূর আলেমের অভিমত হচ্ছে: পুরুষের মত নারীর জন্যও মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ইতিকাফ করা সহিহ নয়; পূর্বোক্ত আয়াতের কারণে: “*আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফে থাকা অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে যৌনকর্ম করো না।*” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

এবং কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁর কাছে মসজিদে ইতিকাফ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরেও তাঁরা মসজিদে ইতিকাফ করেছেন।

যদি নারীর জন্য নিজ ঘরে ইতিকাফ করা জায়েয হত তাহলে তিনি তাদেরকে সেই দিক- নির্দেশনায় দিতেন। কেননা নারীর জন্য মসজিদের চেয়ে নিজের ঘর পর্দায় থাকার জন্য অধিক উপযোগী।

কিছু কিছু আলেমের মতে, নারীর জন্য তার ঘরের মসজিদে ইতিকাফ করা সহিহ। সেটি হলো এমন স্থান যে স্থানকে নারী তার নামায আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন।

জমহূর আলেম এর থেকে বারণ করেন। তারা বলেন: নারীর ঘরের মসজিদকে মসজিদ বলা হয় ছাড় দিয়ে; প্রকৃতপক্ষে সেটি মসজিদ নয়। সুতরাং সে স্থানটির ক্ষেত্রে মসজিদের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে না। এ কারণে জুনুবী (যার ওপর গোসল ফরয) ও হায়েযগ্রস্তের জন্য সেই স্থানে অবস্থান করা জায়েয। [দেখুন: আল-মুগনী (৪/৪৬৪)]

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৬/৫০৫) বলেন:

“ কোন পুরুষ বা নারীর মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ইতিকার করা সহিহ হবে না । অনুরূপভাবে কোন নারীর জন্য তার নিজ ঘরের মসজিদে কিংবা কোন পুরুষের জন্য তার নিজ ঘরের মসজিদে ইতিকার করা সহিহ হবে না । ঘরের মসজিদ হলো: নামাযের জন্য আলাদাকৃত ও প্রস্তুতকৃত স্থান ।” [সমাণ্ড]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল (মাজমুউল ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা- ২০/২৬৪): কোন নারী যদি ইতিকার করতে চান তাহলে কোথায় করবেন?

তিনি জবাব দেন: যদি কোন নারী ইতিকার করতে চান তাহলে তিনি মসজিদে করবেন; যদি এতে শরয়ী সতর্কীকরণের কিছু না থাকে । আর যদি এতে শরয়ী সতর্কীকরণের কিছু থাকে তাহলে ইতিকার করবে না । [সমাণ্ড]

আল-মাওসুআ’ ‘আল-ফিকহিয়া’-তে (৫/২১২) এসেছে:

“ তারা নারীর ইতিকারের স্থানের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন: জমহুর আলেমের মতে, পুরুষের মত নারীর জন্যেও মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ইতিকার করা সহিহ নয় । অতএব, কোন নারীর তার ঘরের মসজিদে ইতিকার করা সহিহ নয় । যেহেতু ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে এমন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যিনি তার নিজ ঘরের মসজিদে ইতিকার করার শপথ করেছিলেন । তখন তিনি বললেন: বিদাত । আর আল্লাহর কাছে সর্বাধিক অপছন্দীয় আমল হচ্ছে— বিদাত । সুতরাং যে মসজিদে নামাযগুলো অনুষ্ঠিত হয় এমন মসজিদ ছাড়া অন্যত্র কোন ইতিকার নেই । কেননা ঘরের মসজিদ প্রকৃত অর্থে কিংবা বিধানগত অর্থে মসজিদ নয় । তাই তো সেই মসজিদকে পরিবর্তন করা ও এর মধ্যে জুনুবী ব্যক্তির ঘূমানো জায়েয । অনুরূপভাবে এটি যদি জায়েয হত তাহলে রাসূলের স্ত্রীগণ সেটি করতেন; এমন কি জায়েয বর্ণনার জন্য একবার হলেও করতেন ।” [সমাণ্ড]

যে কোন মসজিদে ইতিকার করা কি সহিহ?

প্রশ্ন

যে কোন মসজিদে ইতিকার করা কি সহিহ?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

যে ধরণের মসজিদে ইতিকার করা জায়েয সে মসজিদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন । কোন কোন আলেমের অভিমত হল: যে কোন মসজিদে ইতিকার করা সহিহ । এমনকি সে মসজিদে যদি জামাতের সাথে নামায কায়েম না থাকে তবুও । এ অভিমতের ভিত্তি হল আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর উপর আমল: “মসজিদে ইতিকারত অবস্থায় তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করো না ।” [সূরা বাক্বারা, ২:২৮৭]

ইমাম আহমাদের অভিমত হচ্ছে ঐ মসজিদের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে সেখানে জামাতের সাথে নামায কায়েম থাকা । এর সপক্ষে তিনি নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন:

১। আয়েশা (রাঃ) এর বাণী: “জামাতে নামায পড়া হয় এমন মসজিদ ছাড়া ইতিকার হয় না” [বাইহাকীর বর্ণিত; আলবানী “কিয়ামু রামাযান” পুস্তিকাতে সহিহ বলেছেন]

২। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বাণী: “যে মসজিদে নামায কায়েম হয় এমন মসজিদ ছাড়া কোন ইতিকার হয় না ।” [আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়া (৫/২১২)]

৩। তাছাড়া যে মসজিদে জামাতের সাথে নামায হয় না সে মসজিদে ইতিকার করলে দুটো বিষয়ের কোন একটি ঘটতে পারে:

ক) হয়তোবা জামাতের সাথে নামায পড়া বাদ যাবে; আর ওজর ছাড়া কোন ব্যক্তির জন্য জামাতের সাথে নামায ত্যাগ করা জায়েয নয় ।

খ) কিংবা অন্য মসজিদে নামায আদায় করার জন্য মসজিদ থেকে বেশি বেশি বের হতে হবে; যা ইতিকারের সাথে সাংঘর্ষিক ।

[দেখুন: আল-মুগনী (৪/৪৬১)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) "আল-শারহুল মুমতি" গ্রন্থে (৬/৩১২) বলেন:

"যে মসজিদে জমায়েত ঘটে সে মসজিদ ছাড়া সহিহ নয়" (অর্থাৎ ইতিকারফ সহিহ নয়)। এখানে জমায়েত দ্বারা কি যে মসজিদে জুমার নামায হয় সে মসজিদ উদ্দেশ্য; নাকি যে মসজিদে জামাতে নামায হয় সে মসজিদ উদ্দেশ্য?

উত্তর: যে মসজিদে জামাতের সাথে নামায হয় সে মসজিদ। জুমার নামায অনুষ্ঠিত হওয়া শর্ত নয়। কেননা যে মসজিদে জামাতের সাথে নামায হয় না সঠিক অর্থে সেটার ক্ষেত্রে "মসজিদ" শব্দ ব্যবহার করা যায় না। যেমন যে মসজিদ পরিত্যক্ত ও এলাকাবাসী যেখান থেকে অন্যত্র চলে গেছেন [সমাণ্ড]

সূতরাং ইতিকারফের মসজিদে জুমার নামায অনুষ্ঠিত হওয়া শর্ত নয়। কেননা জুমার নামায বারবার অনুষ্ঠিত হয় না। তাই জুমার নামায পড়তে বের হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্তের নামায এর বিপরীত। কেননা পাঁচ ওয়াক্তের নামায দিবারাতে কয়েকবারে অনুষ্ঠিত হয়।

এ শর্তটি (অর্থাৎ এমন মসজিদ হওয়া যেখানে জামাতে নামায আদায় হয়) ইতিকারফকারী যদি পুরুষ হয় তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যদি ইতিকারফকারী মহিলা হয় তার জন্য যে কোন স্থানে ইতিকারফ করা সহিহ; এমন কি সে মসজিদে যদি জামাতের সাথে নামায আদায় না হয় তবুও। কেননা জামাতের সাথে নামায আদায় করা নারীর উপর ওয়াজিব নয়।

ইবনে কুদামা "আল-মুগনী" গ্রন্থে বলেন:

নারী যে কোন মসজিদে ইতিকারফ করতে পারেন; সে মসজিদে জামাতে নামায আদায় হওয়া শর্ত নয়। কেননা জামাতের সাথে নামায আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ি এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন [সমাণ্ড]

শাইখ বিন উছাইমীন (রহঃ) 'আল-শারহুল মুমতি' গ্রন্থে (৬/৩১৩) বলেন:

যদি কোন নারী এমন কোন মসজিদে ইতিকারফ করেন যেখানে জামাতের সাথে নামায আদায় হয় না তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা তার উপর জামাতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজিব নয় [সমাণ্ড]

ইতিকারফের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ

প্রশ্ন

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকারফ করার আদর্শ জানতে চাই।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইতিকারফ করার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ হচ্ছে অধিক পরিপূর্ণ ও অধিকতর সহজ।

তিনি লাইলাতুল কুদরের সন্ধানে— একবার প্রথম দশদিন ইতিকারফ করেছেন; তারপর মাঝের দশদিন ইতিকারফ করেছেন; এরপর তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, লাইলাতুল কুদর শেষ দশকে। এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি শেষ দশকে ইতিকারফ করে গেছেন। একবার তিনি শেষ দশকে ইতিকারফ করতে পারেননি। তাই শাওয়াল মাসে সেটার কাযা পালন করেছেন। শাওয়াল মাসের প্রথম দশকে তিনি ইতিকারফ করেছেন [সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

যে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু হয়েছে সে বছর তিনি ২০ দিন ইতিকারফ করেছেন [সহিহ বুখারী (২০৪০)]

এর কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আয়ু শেষ হয়ে আসার বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন; তাই তিনি নেকীর কাজ বেশি করতে চেয়েছেন। যাতে করে তাঁর উম্মতের কাছে এ বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন যে, যখন তারা শেষ বয়সে

পৌঁছবে তখন তারা যেন আমলের ক্ষেত্রে পরিশ্রমী হয়; যাতে করে তারা তাদের সর্বোত্তম অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে।

অন্য মতে, এর কারণ হল প্রত্যেক রমযান মাসে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে একবার কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন সে বছর দুইবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাই তিনি যতটুকু সময় ইতিকাফ করতেন তার দ্বিগুণ সময় ইতিকাফ করেছেন।

তবে সবচেয়ে মজবুত অভিমত হলো— তিনি সেই বছর বিশদিন ইতিকাফ করেছেন। কারণ আগের বছর তিনি মুসাফির ছিলেন। এর সপক্ষে প্রমাণ করে নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনে হিবনে হিবনে প্রমুখ কর্তৃক সংকলিত উবাই বিন কাব (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস; হাদিসটির ভাষ্য আবু দাউদের: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। একবছর তিনি সফরে থাকায় ইতিকাফ করেননি। তাই পরের বছর তিনি বিশদিন ইতিকাফ করেছেন।" [ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট আকৃতির তাবু পাতার নির্দেশ দিতেন। মসজিদে তার জন্য এটি পাতা হত। তিনি তাতে অবস্থান করতেন এবং মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে তাঁর রবের অভিমুখী হতেন। যাতে করে নির্জনতার বাস্তব রূপ পূর্ণ হয়।

একবার তিনি তুর্কি তাবু (ছোট তাবু)-তে ইতিকাফ করেছেন এবং তাবুর মুখে একটা ছাটাই দিয়ে রেখেছিলেন। [সহিহ মুসলিম (১১৬৭)]

ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) যাদুল মাআদ গ্রন্থে (২/৯০) বলেছেন:

"এ সবকিছু করেছেন যাতে করে ইতিকাফের উদ্দেশ্য ও প্রাণ হাছিল হয়। এটি ছিল অজ্ঞ লোকেরা যা করে তথা ইতিকাফকে মেলামেশা ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাক্ষাৎস্থল হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদের মাঝে খোশ আলাপ জুড়ে দেয়া— এ সবার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ধরনের ইতিকাফের এক রঙ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকাফের আরেক রঙ।" [সমাপ্ত]

তিনি সারাক্ষণ মসজিদে অবস্থান করতেন। শুধু প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হতেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন: "যখন তিনি ইতিকাফে থাকতেন তখন প্রয়োজন ছাড়া বাসায় আসতেন না।" [সহিহ বুখারী (২০২৯) ও সহিহ মুসলিম (২৯৭)] মুসলিমের অপর এক রেওয়াজেতে আছে: "মানবিক প্রয়োজন ছাড়া।" ইমাম যুহরী এর ব্যাখ্যা করেছেন: পেশাব ও পায়খানার প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে চলতেন। তিনি আয়েশা (রাঃ) এর কামরার দিকে মাথা ঢুকিয়ে দিতেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁর মাথা ধুয়ে চিরুনি করে দিতেন।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে ইতিকাফে থাকারস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা ঢুকিয়ে দিতেন। আমি হায়েয অবস্থা নিয়ে তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম [সহিহ বুখারী (২০২৮) ও সহিহ মুসলিম (২৯৮)] সহিহ বুখারী ও মুসলিমের অপর রেওয়াজেতে আছে: "আমি তাঁর মাথা ধুয়ে দিতাম"।

হাফেয ইবনে হাজার বলেন:

"এ হাদিসে মাথা আঁচড়ানোর অধিভুক্ত হিসেবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুগন্ধি ব্যবহার, গোসল করা, মাথা মুগুন করা, পরিপাটি হওয়া ইত্যাদি জায়েয হওয়ার পক্ষে প্রমাণ রয়েছে। জমহুর আলেমের অভিমত হচ্ছে— মসজিদে যা কিছু করা মাকরুহ কেবল সে সব ছাড়া ইতিকাফ অবস্থায় অন্যসব কিছু করা মাকরুহ নয় [সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ছিল তিনি ইতিকাফে থাকারস্থায় কোন রোগী দেখতে যেতেন না, কোন জানাযার নামাযে শরীক হতেন না। যাতে করে আল্লাহ তাআলার আরাধনায় পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারেন এবং ইতিকাফের গৃঢ় রহস্য বাস্তবায়ন করতে পারেন। আর তা হল: মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ অভিমুখী হওয়া।

আয়েশা (রাঃ) বলেন: "ইতিকাফকারীর জন্য সুন্নত হল— রোগী দেখতে না যাওয়া, জানাযার নামাযে না যাওয়া, কোন নারীকে স্পর্শ না করা ও শৃঙ্গার না করা এবং একান্ত যে প্রয়োজনে বের না হলে নয়; এমন প্রয়োজন ছাড়া বের না হওয়া।" [সুনানে আবু দাউদ (২৪৭৩), আলবানী হাদিসটিকে সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে সহিহ বলেছেন]

"কোন নারীকে স্পর্শ না করা ও শৃঙ্গার না করা" এর দ্বারা আয়েশা (রাঃ) সহবাস বুঝাতে চেয়েছেন— শাওকানী নাইলুল আওতার গ্রন্থে এ কথা বলেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিকাহে থাকাবস্থায় তাঁর কোন এক স্ত্রী তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। যখন তাঁর স্ত্রী চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন তখন তিনিও তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। এটি ছিল রাতের বেলায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী সাফিয়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশকে মসজিদে ইতিকাহ করাকালে তিনি তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি কিছু সময় তাঁর সাথে কথা বলেন। এরপর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তা সাথে উঠে দাঁড়ান। [সহিহ বুখারী (২০৩৫) ও সহিহ মুসলিম (২১৭৫)]

সারকথা হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকাহের বৈশিষ্ট্য ছিল সহজতা ও কাঠিন্যবিহীন। গোটা সময় ছিল আল্লাহর যিকির, তাঁর ইবাদত ও লাইলাতুল রুদরের সন্ধানে মশগুল।

[দেখুন: ইবনুল কাইয়্যেম-এর 'যাদুল মাআদ' (২/৯০), ড. আব্দুল লতিফ বালতু-এর 'আল-ইতিকাহ: নাযরা তারবাওয়িয়াহ']

যে ব্যক্তি শুধু বেজোড় রাতগুলো ইতিকাহ করতে চায়

প্রশ্ন

আমার জন্য শুধু রমযানের বেজোড় রাতগুলোতে ইতিকাহ করা কি জায়েয হবে? কেননা আমি গোটা দশ দিন ইতিকাহ করতে পারব না। কারণ আমি নব বিবাহিত। আমার স্ত্রী একা একা বাসায় থাকতে হবে, যদিও আমি আমার ফ্যামিলির পাশে থাকি।

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

একজন মুসলিমের জন্য উত্তম হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে রমযানের শেষভাগের গোটা দশদিন ইতিকাহ করা। সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাহ করেছেন। [সহিহ বুখারী (২০২৫) ও সহিহ মুসলিম (১১৭১)]

যদি কারো পক্ষে গোটা দশদিন ইতিকাহ করা সম্ভবপর না হয় তিনি কিছু দিন বা কিছু রাত্রি ইতিকাহ করেন তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু ইমাম বুখারী উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মসজিদে হারাম একরাত ইতিকাহ করার মানত করেছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার মানত পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। [সহিহ বুখারী (১৬৫৬)] এ হাদিসে দলিল রয়েছে যে, একরাত ইতিকাহ করাও শুদ্ধ।

ইতিপূর্বে **38037** নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইতিকাহের সবনিম্ন কোন সময় নেই। এ ব্যাপারে আমরা বিন বায (রহঃ) এর ফতোয়া উল্লেখ করেছি।

কর্তব্য হচ্ছে- এ দশরাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকা এবং সাধ্যানুযায়ী ইবাদতের সম্বল অর্জন করার চেষ্টা করা।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

ইতিকাহের সওয়াব

প্রশ্ন

ইতিকাহের কী সওয়াব?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

ইতিকার একটি শরয়ি আমল। এটি আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করা যায় এমন নেক আমল। আরও জানতে দেখুন: [48999](#) নং প্রশ্নোত্তর।

এটা যখন সাব্যস্ত হল, জেনে রাখুন আল্লাহর নৈকট্যশীল নফল আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসগুলোর সাধারণ হুকুমের অধীনে সকল ইবাদত অর্ন্তভুক্ত হয়; যার মধ্যে ইতিকারও রয়েছে।

এ ধরনের হাদিসের মধ্যে রয়েছে: হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলার বাণী “ আমি আমার বান্দার প্রতি যা ফরয করেছি তা দ্বারাই সে আমার অধিক নৈকট্য হাছিল করে। আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে উপর্যুপরি আমার নৈকট্য হাছিল করতে থাকে। এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালবাসি। যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কণ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চক্ষু হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যে পা দিয়ে সে চলাফেরা করে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে আমি তাকে তা প্রদান করি। সে যদি আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে আশ্রয় দেই। [সহিহ বুখারী (৬৫০২)]

দুই:

ইতিকারের ফযিলত সম্পর্কেও কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু সে হাদিসগুলো দুর্বল কিংবা বানোয়াট:

আবু দাউদ বলেন: আমি আহমাদকে (অর্থাৎ আহমাদ বিন হাম্বলকে) বললাম: আপনি কি ইতিকারের ফযিলত বিষয়ে কিছু জানেন? তিনি বলেন: না; দুর্বল কিছু ব্যতীত। [সমাণ্ড]মাসায়েলু আবি দাউদ, পৃষ্ঠা-৯৬]

এ ধরনের হাদিসগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিকারকারীর ব্যাপারে বলেছেন: “ ইতিকারকারী গুনাহকে প্রতিরোধ করেন। ইতিকারকারীকে সকল নেক আমলকারীর ন্যায় নেকী দেয়া হবে।” [শাইখ আলবানি ‘যয়িফু ইবনে মাজাহ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে যয়িফ (দুর্বল) বলেছেন]

২। তাবারানী, হাকিম ও বায়হাকী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন ইতিকার করে আল্লাহ তার মাঝে ও জাহান্নামের আগুনের মাঝে তিনটি পরিখার দূরত্ব সৃষ্টি করে দেন; যা পূর্ব-পশ্চিমের চেয়েও বেশি দূরত্ব”। [বাইহাকী হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন]

৩। দাইলামি আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় ইতিকার করবে তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” [আলবানি ‘যয়িফুল জামে’ গ্রন্থে (৫৪৪২) হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন]

৪। ইমাম বাইহাকী হাসান বিন আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ যে ব্যক্তি রমযান মাসে দশদিন ইতিকার করবে এর সওয়াব দুইটি হজ্জ ও দুইটি উমরার সমান।” [শাইখ আলবানি ‘আল-সিলসিলাতুয যয়িফা’ গ্রন্থে (৫১৮) হাদিসটি সংকলন করে বলেছেন: মাওযু (বানোয়াট)]

ইতিকারের হুকুম ও ইতিকার শরয়ি বিধান হওয়ার পক্ষে দলিল

প্রশ্ন

ইতিকারের হুকুম কী?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার দলিলের ভিত্তিতে ইতিকার শরয়ি বিধান।

কুরআনের দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, ইতিকারকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১২৫]

এবং আল্লাহর বাণী: “আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকার অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে যৌনকর্ম করো না।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

হাদিসের দলিল: এ সংক্রান্ত অনেক হাদিস রয়েছে। যেমন আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমযান মাসের শেষ দশদিন ইতিকার করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকার করেছেন।” [সহিহ বুখারী (২০২৬) ও সহিহ মুসলিম (১১৭২)]

ইজমা: একাধিক আলেম ইতিকার শরয়ি বিধান হওয়ার পক্ষে ইজমা উদ্ধৃত করেছেন; যেমন- ইমাম নববী, ইবনে কুদামা ও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ। [দেখুন: আল-মাজমু (৬/৪০৪), আল-মুগনি (৪/৪৫৬), শারহুল উমদা (২/৭১১)।

শাইখ বিন বায (রহঃ) ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ গ্রন্থে (১৫/৪৩৭) বলেন:

“কোন সন্দেহ নেই ইতিকার আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের একটি মাধ্যম। ইতিকার রমযান মাসে পালন করা অন্য সময়ে পালন করার চেয়ে উত্তম...। এটি রমযান মাসে ও অন্য সময়ে পালন করা শরিয়তসম্মত।” [সংক্ষেপিত]

দুই:

ইতিকারের হুকুম: ইতিকারের মূল বিধান হচ্ছে- এটি সন্নত; ওয়াজিব নয়। তবে, কেউ মানত করলে তার উপর ওয়াজিব হবে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন আনুগত্য পালন করার মানত করে সে যেন সেই আনুগত্য আদায় করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার মানত করে সে যেন আল্লাহর অবাধ্য না হয়।” [সহিহ বুখারী (৬৬৯৬)]

এবং যেহেতু উমর (রাঃ) বলেছেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জাহেলি যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত ইতিকার করার মানত করেছি। তিনি বললেন: “তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর।” [৬৬৯৭]

ইবনুল মুনিযির তাঁর ‘আল-ইজমা’ নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৫৩) বলেন:

আলেমগণ ইজমা করেছেন যে, ইতিকার সন্নত; ফরয নয়। তবে কেউ যদি মানত করে নিজের উপর ফরয করে নেয় তাহলে ফরয হয়। [সমাণ্ড]

দেখুন: ড. খালেদ আল-মুশাইকিহ এর ‘ফিকহুল ইতিকার’ পৃষ্ঠা- ৩১

ইতিকার কোন দিনে করতে হবে?

প্রশ্ন

রমযানের শেষ দশদিন ব্যতিরেকে অন্য কোন সময় ইতিকার করা কি জায়েয?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

হ্যাঁ, যে কোন সময় ইতিকার করা জায়েয। সবচেয়ে উত্তম ইতিকার হচ্ছে- রমযান মাসের শেষ দশদিনের ইতিকার। কারণ এতে রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গের অনুসরণ। সহিহ হাদিসে এটাও সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক বছর শাওয়াল মাসে ইতিকার করেছেন।

আল্লাহ তাওফিক দাতা।

তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ইতিকার নেই

প্রশ্ন

আমি একটি হাদিস শুনেছি যে, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা ছাড়া অন্য কোথাও ইতিকার করা শুদ্ধ নয়; এ হাদিসটি কি সহিহ?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

প্রশ্নকারী যে হাদিসটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন সে হাদিসটি ইমাম বায়হাকী (৪/৩১৫) হুয়াইফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে বলেন: আমি আপনার ঘরে ও আবু মূসার ঘরে (অর্থাৎ মসজিদে) কিছু লোককে ইতিকারত পেয়েছি। অথচ আমি জেনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তিন মসজিদ ছাড়া কোন ইতিকার নেই: মসজিদে হারাম”। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: সম্ভবত: আপনি ভুলে গেছেন; তাদের মুখস্থ আছে। আপনি ভুল করছেন; তাদেরটা ঠিক। [আলবানী সিলসিলাতুল আহাদিস আস-সহিহা (২৮৭৮) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

দুই:

এ মাসয়ালার হুকুম হচ্ছে- জমহুর আলেমের মতে, ইতিকার এ তিনটি মসজিদের কোন একটিতে হওয়া শর্ত নয়। এ মতের পক্ষে তারা দলিল দেন এ আয়াতের ভিত্তিতে, “তোমরা মসজিদসমূহে ইতিকারত অবস্থায় তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে না।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

আয়াতে কারীমাতে “মসজিদসমূহ” শব্দটি আম বা সাধারণ। তাই এ শব্দটি সকল মসজিদকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যদি অন্য কোন দলিল বিশেষ কোন মসজিদ বাদ দেয় সে মসজিদ ছাড়া; যেমন- যে মসজিদে জামাতে নামায আদায় করা হয় না; যদি ইতিকারকারীর উপর জামাতের সাথে নামায আদায় করা ফরজ হয়। দেখুন ৪৮৯৮৫ নং প্রশ্নোত্তর।

ইমাম বুখারী আয়াতের এ ব্যাপকতার দলিলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন:

“শেষ দশদিনে ও সকল মসজিদে ইতিকার করা শীর্ষক পরিচ্ছেদ”। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “তোমরা মসজিদসমূহে ইতিকারত অবস্থায় তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে না। এগুলো হচ্ছে- আল্লাহর সীমারেখা। অতএব, এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতির জন্য নিজের আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন; যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭] সমাপ্ত।

মুসলমানেরা তাদের স্থানীয় মসজিদে ইতিকার করে আসছেন যেমনটি উল্লেখ করেছেন ত্বাহাবী তাঁর রচিত ‘মুশকিলুল আসার’ গ্রন্থে (৪/২০৫)।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসায় ইতিকার করার হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল; আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

জবাবে তিনি বলেন:

“মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা এ তিন মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদগুলোতে ইতিকারের সময় ইতিকার করা শরিয়তসম্মত। ইতিকার শুধুমাত্র এ তিন মসজিদের সাথে খাস নয়; বরং এ তিন মসজিদেও ইতিকার করা যায়, অন্য মসজিদেও ইতিকার করা যায়। এটি অনুসরণযোগ্য মাযহাবগুলোর আলেমদের অভিমত, যেমন- ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “তোমরা মসজিদসমূহে ইতিকারের অবস্থায় তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে না। এগুলো হচ্ছে- আল্লাহর সীমারেখা। অতএব, এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতির জন্য নিজের আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন; যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭] এখানে ‘মসজিদসমূহ’ শব্দটি আমভাবে পৃথিবীর সকল মসজিদকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ বাক্যটি রোযার বিধান সংক্রান্ত আয়াতের শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে; আর রোযার বিধান পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলিম উম্মাহকে শামিলকারী। সুতরাং যাদেরকে রোযার ক্ষেত্রে সম্বোধন করা হয়েছে তাদের সকলকে এ বাক্যের মাধ্যমেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাইতো প্রাসঙ্গিকতা ও সম্বোধনের ক্ষেত্রে অভিন্ন বিধানগুলোর আলোচনা শেষ করা হয়েছে এ কথা দিয়ে “এগুলো হচ্ছে- আল্লাহর সীমারেখা। অতএব, এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতির জন্য নিজের আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন; যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।”। আল্লাহ তাআলা এমন কোন সম্বোধন করা খুবই দূরবর্তী যে সম্বোধনটি উম্মতের একেবারেই অল্প কিছু মানুষ ছাড়া আর কাউকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

পক্ষান্তরে, হুযাইফা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত “তিন মসজিদ ছাড়া ইতিকার নেই” এ হাদিসটি যদি শুদ্ধতার বিচারে উত্তীর্ণ হয় সেক্ষেত্রে এটি ইতিকারের পূর্ণতার গুণকে নাকচ করবে। অর্থাৎ পূর্ণতার ইতিকার হচ্ছে- এ তিন মসজিদে যে ইতিকার করা হয় সে ইতিকার। অন্য মসজিদের উপর এ তিন মসজিদের ফজিলত ও মর্যাদার কারণে। এ ধরনের বাক্যব্যঞ্জনা প্রচুর পাওয়া যায়। অর্থাৎ না-বোধক বাক্য দ্বারা পূর্ণতার গুণকে নাকচ করা; মূল বিষয়টি কিংবা বিষয়টির শুদ্ধতাকে নাকচ করা নয়। উদাহরণত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “খাবার হাজির হলে নামায নেই” ও এ ধরনের অন্যান্য হাদিস। তবে নিঃসন্দেহে নেতিবাচক বাক্য দ্বারা সাধারণত শরিয় হাকীকত কিংবা ইন্দিয়াগ্রাহ্য হাকীকতকে নাকচ করা হয়। কিন্তু, যদি এমন কোন দলিল পাওয়া যায় যে দলিল শরিয় হাকীকত কিংবা ইন্দিয়াগ্রাহ্য হাকীকতকে গ্রহণে বাধা দেয় তাহলে পূর্ণতার গুণকে নাকচ করাটা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়; যেমনটি আমরা হুযাইফা (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে দেখতে পাই। হাদিসটি শুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ধরে নিলে এ ব্যাখ্যা। আল্লাহই ভাল জানেন। সমাপ্ত

[ফাতাওয়াস সিয়াম, পৃষ্ঠা-৪৯৩]

বিন বায (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: “তিন মসজিদ ছাড়া ইতিকার নেই” এ হাদিসটি কি সহিহ? যদি সহিহ হয়; তাহলে তিন মসজিদ ছাড়া অন্যান্য মসজিদে কি ইতিকার করা যাবে না?

জবাবে তিনি বলেন: তিন মসজিদ ছাড়াও অন্য যে কোন মসজিদে ইতিকার করা সহিহ। তবে; শর্ত হচ্ছে- সে মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায অনুষ্ঠিত হতে হবে। যদি সে মসজিদে নামাযের জামাত না হয় তাহলে সেখানে ইতিকার করা সহিহ হবে না। তবে, কেউ যদি এ তিন মসজিদে ইতিকারের মানত করে থাকে তাহলে তাকে সে মানত পূর্ণ করতে হবে। [সমাণ্ড]

[মাজমু ফাতাওয়া বিন বায (১৫/৪৪৪)]

রমযান মাসে ও অন্য যে কোন মাসে ইতিকার করা যেতে পার

প্রশ্ন

ইতিকার কি যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে; নাকি রমযান ছাড়া ইতিকার করা যায় না?

উত্তর

সংক্ষিপ্ত

আলহামদু লিল্লাহ।

বছরের যে কোন সময় ইতিকার করা সুন্নত; সেটা রমযানের মধ্যে হোক অথবা রমযানের বাইরে হোক। এর পক্ষে দলিল পাওয়া যায়, ইতিকার সংক্রান্ত সাধারণ দলিলগুলো থেকে; যেগুলো রমযান মাস ও অন্য যে কোন মাসকে শামিল করে। দেখুন [48999](#) নং ফতোয়া।

ইমাম নববী আল-মাজমু গ্রন্থে (৬/৫০১) বলেন:

ইতিকারফ একটি সুলত ইবাদত। যা ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, শুধুমাত্র মান্নতের কারণে ইতিকারফ ফরজ হতে পারে। বেশি বেশি ইতিকারফ করা মুস্তাহাব। রমযানের শেষ দশদিন ইতিকারফ করা মুস্তাহাব; এ সময়ে এর মুস্তাহাব হওয়াটা আরও জোরদার হয়।

তিনি আরও (৬/৫১৪) বলেন:

সর্বোত্তম ইতিকারফ হলো- রোযার সাথে যে ইতিকারফ; রমযান মাসের ইতিকারফ; রমযানের শেষ দশদিনের ইতিকারফ। সমাপ্ত

আলবানি তাঁর 'কিয়ামু রমযান' গ্রন্থে বলেন:

ইতিকারফ রমযানে ও রমযানের বাইরে বছরের যে কোন সময় পালন করা সুলত। এ বিষয়ে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “যখন তোমরা মসজিদে ইতিকারফরত থাক”। এছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকারফের ব্যাপারে সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে এবং সলফে সালেহীনদের থেকে মুতাওয়াতির রেওয়াজে এসেছে।

উমর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন, জাহেলী যুগে আমি মান্নত করেছিলাম যে, মসজিদে হারামে এক রাত্রি ইতিকারফ করব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সুতরাং তোমার মান্নত পূর্ণ কর। ফলে তিনি এক রাত ইতিকারফ করলেন। [বুখারি ও মুসলিম]

আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসের ভিত্তিতে রমযানে ইতিকারফ পালনের বিধান জোরদার হয়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমযান মাসে দশদিন ইতিকারফ করতেন। যে বছর তিনি মারা যান সে বছর বিশদিন ইতিকারফ করেন। [সহিহ বুখারি]

রমযানের শেষ দশদিন ইতিকারফ করা সর্বোত্তম ইতিকারফ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যু অবধি রমযানের শেষ দশদিন ইতিকারফ করেছেন। [সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম, সংক্ষেপিত ও সংকলিত]

শাইখ বিন বায তাঁর ফতোয়াসমগ্র (১৫/৪৩৭) তে বলেন:

সন্দেহ নেই যে, মসজিদে ইতিকারফ করা একটি ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। রমযানে এ ইবাদত পালন করা অন্য সময় পালন করার চেয়ে উত্তম। এটি রমযানে ও রমযানের বাইরে পালন করা যেতে পারে। [সংক্ষেপিত]

দেখুন: ড. খালেদ আল-মুশাইকিহ এর ফিকহুল ইতিকারফ, পৃষ্ঠা-৪১।

যে ব্যক্তি রমযানের শেষ দশদিন ইতিকারফ করতে চান তিনি কখন মসজিদে প্রবেশ করবেন এবং কখন বের হতে পারবেন

প্রশ্ন

আমি রমযানের শেষ দশদিন ইতিকারফ করতে চাই। আমি জানতে চাই আমি কখন মসজিদে প্রবেশ করব এবং কখন মসজিদ থেকে বের হতে পারব?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

ইতিকারফকারীর মসজিদে প্রবেশের ব্যাপারে জমহুর আলেম (চার ইমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি, আহমাদ) এর অভিমত হচ্ছে- ২১ রমযানের রাত শুরু হওয়ার আগে সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবেন। এ মতের পক্ষে তারা নিম্নোক্ত দলিল দেন:

১- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি রমযানের শেষ দশরাত্রি ইতিকারফ করতেন। [বুখারি ও মুসলিম]

এ হাদিসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি রাত্রিতে ইতিকার করতেন; দিনে নয়। কারণ العشر শব্দটি الليالي শব্দের تمييز। আল্লাহ তাআলা বলেন: “দশরাত্রির শপথ” [সূরা আল-ফজর, আয়াত: ২]

শেষ দশরাত্রি ২১ তম রাত থেকে শুরু হয়।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ২১ তম রাত্রির সূর্যাস্তের পূর্বেই মসজিদে প্রবেশ করবেন।

২- তারা আরও বলেন: ইতিকারকারী যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিকার করেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- লাইলাতুল কুদর প্রাপ্তি। রমযানের ২১তম রাত্রি শেষদশকের একটি বেজোড় রাত্রি; তাই এ রাতটি লাইলাতুল কুদর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য এ রাতে ইতিকার করাটা বাঞ্ছনীয়। [এ কথাটি ইমাম সিন্দি রচিত নাসাঈর হাশিয়াতে রয়েছে; দেখুন: আল-মুগনি ৪/৪৮৯]

তবে সহিহ বুখারি (২০৪১) ও সহিহ মুসলিম (১১৭৩) কর্তৃক আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ইতিকার করতে চাইতেন তিনি ফজরের নামায পড়ে তাঁর ইতিকারের স্থানে ঢুকে যেতেন।

এ হাদিসের বাহ্যিক অর্থের পক্ষে অভিমত দিয়ে বেশ কিছু সলফে সালেহীন বলেন: ফজরের নামাযের পর ইতিকারস্থলে ঢুকতে হবে। এ মতটি সৌদি ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গ্রহণ করেছেন (১০/৪১১) এবং বিন বাযও গ্রহণ করেছেন (১৫/৪৪২)।

তবে জমহুর আলেম এ দলিলের বিপক্ষে দুইটি জবাব দিয়ে থাকেন:

এক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ডোবার আগে থেকেই ইতিকার শুরু করেছেন। তবে তিনি ইতিকারের জন্য মসজিদের সুনির্দিষ্ট স্থানে ফজরের নামাযের আগে প্রবেশ করেননি।

ইমাম নববী বলেন:

“যদি ইতিকার করতে চাইতেন তাহলে তিনি ফজরের নামায পড়ে ইতিকারস্থলে ঢুকে যেতেন” এ হাদিসাংশ দিয়ে সেসব আলেম দলিল দেন যারা মনে করেন: দিনের শুরু থেকে ইতিকার শুরু হয়। আওয়ালি, ছাওরি, এক বর্ণনামতে লাইছ এ মতের প্রবক্তা। আর ইমাম মালেক, আবু হানিফা, শাফেয়ি ও আহমাদের মতে, যদি গোটা মাস অথবা দশদিন ইতিকার করতে চায় তাহলে সূর্যাস্তের পূর্বে ইতিকারস্থলে প্রবেশ করবে। যারা এ মতের প্রবক্তা তারা উল্লেখিত হাদিসটির অর্থ করেন এভাবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ একাকিত্ব গ্রহণ করে ইতিকারের বিশেষ স্থানে প্রবেশ করেছেন ফজরের নামাযের পর। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি ফজরের নামাযের পর ইতিকার শুরু করেছেন। বরং মাগরিবের আগেই তিনি ইতিকার শুরু করে মসজিদে অবস্থান নিয়েছেন; আর ফজরের নামাযের পর নির্জনতা গ্রহণ করেছেন। সমাপ্ত

দুই:

হাম্বলি মাযহাবের আলেম কাযী আবু ইয়লা আয়েশা (রাঃ) এর হাদিসের একটি জবাব দেন সেটি হচ্ছে- এ হাদিসকে এ অর্থে গ্রহণ করা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২০ রমযান ফজরের নামাযের পর ইতিকারস্থলে প্রবেশ করতেন। সিন্দি বলেন: কিয়াসের মাধ্যমে এ জবাবটি জানা যায়। এ জবাবটি অধিক উত্তম এবং অধিক নির্ভরযোগ্য। সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল (ফাতাওয়াস সিয়াম পৃষ্ঠা-৫০১): কখন ইতিকার শুরু করা হবে?

জবাবে তিনি বলেন: জমহুর আলেমের মতে, ইতিকারের শুরু হচ্ছে- ২১ রমযান রাত থেকে; ২১ রমযান ফজর থেকে নয়। যদিও কোন কোন আলেম বুখারি কর্তৃক সংকলিত আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস “যখন ফজরের নামায পড়লেন তখন তিনি তাঁর ইতিকারস্থলে প্রবেশ করলেন” দিয়ে দলিল দিয়ে বলেন: ২১ রমযান ফজর থেকে ইতিকার শুরু হবে। তবে জমহুর আলেম এর প্রত্যুত্তর দেন এভাবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভোর থেকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতা গ্রহণ করেন; তবে ইতিকারের নিয়ত করেছেন রাতের প্রারম্ভ থেকে। কারণ শেষ দশক শুরু হয় ২০ তারিখ সূর্যাস্ত থেকে। সমাপ্ত

তিনি আরও বলেন (পৃষ্ঠা-৫০৩):

ইতিকাকারী সূর্যাস্তের পর ২১ রমযান রাত থেকে মসজিদে প্রবেশ করবে। কারণ এটি হচ্ছে- শেষ দশকের শুরু। আর এটি আয়েশা (রাঃ) এর হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ সে হাদিসের শব্দাবলি বিভিন্ন। সুতরাং সে হাদিসের যে শব্দ আভিধানিক অর্থের অধিক নিকটবর্তী সে শব্দটি গ্রহণ করতে হবে। সেটি ইমাম বুখারি কর্তৃক আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে (২০৪১) তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক রমযানে ইতিকাকারী করতেন। যখন ফজরের নামায পড়া শেষ হত তখন তিনি যে স্থানে ইতিকাকারী করেছেন সে স্থানে প্রবেশ করতেন।

তঁার বাণী: “যখন ফজরের নামায পড়া শেষ হত তখন তিনি যে স্থানে ইতিকাকারী করেছেন সে স্থানে প্রবেশ করতেন” এ বাণীর দাবী হচ্ছে- এ প্রবেশের পূর্বেই তিনি অবস্থান করেছেন। অর্থাৎ তিনি ইতিকাকারীর সুনির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশের পূর্বে মসজিদে অবস্থান নিয়েছেন। আর তঁার বাণী: “তিনি ইতিকাকারী করেছেন” এটি অতীত কালের ক্রিয়া। অতীত কালের ক্রিয়ার মূল রূপ হচ্ছে- এর আসল অর্থে ব্যবহার করা। সমাপ্ত

দুই: পক্ষান্তরে ইতিকাকারী থেকে বের হওয়ার সময়:

রমযানের সর্বশেষ দিনের সূর্যাস্তের পর মসজিদ থেকে বের হতে হয়।

শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: ইতিকাকারী কি ঈদ-রাত্রির সূর্যাস্তের পর ইতিকাকারী থেকে বের হবে; নাকি ঈদের দিন ফজরের পর বের হবে?

উত্তরে তিনি বলেন:

রমযান মাস শেষ হওয়ার পর ইতিকাকারী ইতিকাকারী থেকে বের হবে। ঈদের রাত্রির সূর্যাস্তের মাধ্যমে রমযান শেষ হয়ে যাবে। ফাতাওয়াস সিয়াম (পৃষ্ঠা-৫০২) সমাপ্ত

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রতে (১০/৪১১) এসেছে-

রমযানের দশদিনের ইতিকাকারী রমযানের শেষদিনের সূর্যাস্তের মাধ্যমে শেষ হবে। [সমাপ্ত]

আর যদি ফজর পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করে ইতিকাকারী থেকে সরাসরি ঈদের নামাযে যেতে চান এতেও কোন অসুবিধা নেই। কিছু কিছু সলফে সালেহীন এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন।

ইমাম মালেক বলেন: তিনি কিছু কিছু আলেমকে দেখেছেন তঁারা রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাকারী করলে মানুষের সাথে ঈদের নামায পড়ে তারপর তাদের পরিবারের নিকট ফিরে আসতেন। মালেক বলেন: পূর্ববর্তী মর্যাদাবান আলেমদের থেকে এটি বর্ণিত আছে। এ মাসয়ালায় এটি আমার নিকট অধিক প্রিয়।

ইমাম নববী ;আল-মাজমু' গ্রন্থে বলেন:

ইমাম শাফেয়ি ও তঁার ছাত্রগণ বলেন: যে ব্যক্তি রমযানের শেষ দশদিনের ইতিকাকারীর ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করতে চায় তার উচিত সূর্যাস্তের আগে ২১ রমযান রাতে মসজিদে প্রবেশ করা। যাতে করে, শেষ দশদিনের কোন অংশ তার ছুটে না যায়। ঈদের রাত্রির সূর্যাস্ত যাওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হবে। এক্ষেত্রে রমযান মাস পূর্ণ ৩০ দিন হোক অথবা অপূর্ণ হোক। উত্তম হচ্ছে- ঈদের রাত্রিতে মসজিদে অবস্থান করা; যাতে করে ঈদের নামায সেখানে পড়তে পারে অথবা মসজিদ থেকে সরাসরি ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায আদায় করে আসতে পারে। সমাপ্ত

যদি ইতিকাকারী থেকে সরাসরি ঈদের নামাযে বের হয় তাহলে নামাযে যাওয়ার আগে গোসল করে নেয়া ও পরিপাটি হওয়া মুস্তাহাব। কারণ এটি ঈদের সুন্নত। এ বিষয়টি বিস্তারিত জানতে [36442](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

ইতিকাহের শর্তাবলি

প্রশ্ন

ইতিকাহের শর্তগুলো কি কি? ইতিকাহের জন্য কি রোজা থাকা শর্ত? ইতিকাহকারীর জন্য কোন রোগী দেখতে যাওয়া, নিমন্ত্রণে সাড়া দেয়া, পরিবারের প্রয়োজনে বের হওয়া, জানাযার নামাযে শরিক হওয়া অথবা চাকুরীতে যাওয়া কি জায়েয?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

যে মসজিদে জুমার নামায হয় সে মসজিদে ইতিকাহ করা শরিয়তসম্মত । যদি ইতিকাহকারী ব্যক্তির উপর জুমার নামায ফরয হয় এবং ইতিকাহের সময়ের মধ্যে জুমাবার থাকে এমনক্ষেত্রে জুমা মসজিদে (জামে মসজিদে) ইতিকাহ করা উত্তম । ইতিকাহের জন্য রোজা থাকা শর্ত নয় । সুন্নত হচ্ছে- ইতিকাহকালে কোন রোগীকে দেখতে না যাওয়া; নিমন্ত্রণে না যাওয়া, পরিবারের প্রয়োজনপূরণে সাড়া না দেয়া, জানাযার নামাযে না যাওয়া, মসজিদের বাইরে কোন কাজে না যাওয়া । এর সপক্ষে দলিল হচ্ছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন: “ ইতিকাহকারীর জন্য সুন্নত হচ্ছে- রোগী দেখতে না যাওয়া, জানাযায় শরিক না হওয়া, নারী সহবাস বা নারীকে বাহুবন্ধনে না নেয়া, যে প্রয়োজন পূরণ না করলে নয় এমন প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন কারণে মসজিদ থেকে বের না হওয়া [আবু দাউদ (২৪৭৩)]

যিনি ইতিকাহ করতে চান, কিন্তু ডাক্তারের সাথে তার এপয়েন্টমেন্ট আছে

প্রশ্ন

আমি ইতিকাহে বসতে চাই । কিন্তু ডাক্তারের সাথে আমার গুরুত্বপূর্ণ এপয়েন্টমেন্ট আছে । আমি কি ইতিকাহ অবস্থায় ডাক্তারের কাছে যেতে পারব? নাকি আমার জন্য ইতিকাহ করা ওয়াজিব নয় ?

উত্তর

সংশ্লিষ্ট

আলহামদু লিল্লাহ ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

ইতিকাহ মানে হচ্ছে-অনবরত মসজিদে অবস্থান করা, মসজিদ ছেড়ে না যাওয়া । ইতিকাহ একটি মুস্তাহাব সুন্নত; বিশেষত রমজানের শেষ ১০ দিনের ইতিকাহ । এটি ওয়াজিব নয়; যদি না কোন মুসলিম মান্নতের মাধ্যমে ইতিকাহকে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয় । মান্নত ছাড়া ইতিকাহ ওয়াজিব হয় না । দেখুন (48999) নং প্রশ্নের উত্তর । এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে- মসজিদে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় এমন কোনো প্রয়োজন ছাড়া ইতিকাহকারী মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না । যেমন অজু, গোসল, প্রাকৃতিক প্রয়োজনপূরণ ইত্যাদি । এর দলীল হচ্ছে-আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হাদিস:নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইতিকাহ করতেন তখন মানবীয় প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া নিজ গৃহে ফিরতেন না [সহীহ মুসলিম (২৯৭)] আপনার যদি ডাক্তারের কাছে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হয় এবং সে এপয়েন্টমেন্ট রমজানের পরে নেয়ার কোন সুযোগ না থাকে তবে আমার নিকট যা অগ্রগণ্য হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে সেটা হলো —মসজিদ থেকে বের হয়ে ডাক্তারের সাথে দেখা করে পুনরায় মসজিদে ফিরে আসলে ইতিকাহের কোন ক্ষতি হবে না । ইমাম নববী রাহিমাল্লাহু তাঁর লিখিত ‘আলমাজমু’ (৬/৫৪৫) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ইতিকাহকারী অসুস্থ এবং অসুস্থতার কারণে মসজিদে অবস্থান করা তার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে; যেহেতু তার আলাদা বিছানা, খাদেম ও বারবার ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগে ইত্যাদি; তার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ । “সমাণ্ড শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাল্লাহু তাঁর ‘জালাসাত রামাদানিয়াহ’ (রমজানের আসর) (১৪১১ হিজরির সপ্তম আসর, পৃষ্ঠা-১৪৪) তে বলেছেন: “আর যার (ইতিকাহকারীর) ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে সে মসজিদ থেকে বের হতে পারবে । এছাড়া সে মসজিদে অবস্থান করবে ।” সমাণ্ড আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন ।

নারীদের জন্য নিজ ঘরে ইতিকাহ করা শুদ্ধ নয়

প্রশ্ন

নারীর জন্য তার নিজ ঘরে ইতিকাহ করা কি জায়েয আছে? যদি জায়েয হয় সেক্ষেত্রে তার যদি রান্নাবান্না করার প্রয়োজন পড়ে, তখন কি করবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

মসজিদের বাইরে ইতিকারফ করলে সেটা শুদ্ধ হবে না । কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “ আর তোমরা মসজিদে ইতিকারফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়োনা ।” [২ আল-বাক্বারাহ:১৮৭] এই হুকুম পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য ।

ইবনে কুদামাহ’ আল-মুগনী’ গ্রন্থে (৪/৪৬৪) বলেছেন:

“ একজন নারী যে কোন প্রকারের মসজিদে ইতিকারফ করতে পারেন । সেটা পাঞ্জগানা মসজিদ তথা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাত হয় এমন মসজিদ হওয়া শর্তনয় । কারণ জামাতে নামায আদায় করা নারীর জন্য বাধ্যতামূলক নয় ।” ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)ও এই অভিমত পোষণ করেছেন ।

নারীর জন্য তার নিজ ঘরে ইতিকারফ করার কোন বিধান নেই । কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “ আর তোমরা মসজিদে ইতিকারফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়োনা ।” [২ আল-বাক্বারাহ :১৮৭]

এছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁর কাছে মসজিদে ইতিকারফ করার অনুমতি চান এবং তিনি তাঁদেরকে অনুমতি দেন । সমাপ্ত

“ আল মাজমু” (৬/৪৮০) গ্রন্থে ইমাম নববী বলেছেন:

“ নর-নারী কারো জন্য মসজিদের বাইরে ইতিকারফ করা শুদ্ধ নয় ।” সমাপ্ত

“ আশ-শারহ আল-মুমতি” (৬/৫১৩) গ্রন্থে এটাই হচ্ছে শাইখ উছাইমীনের নির্বাচিত অভিমত ।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন ।

ইতিকারফের সবনিম্ন সময়কাল

প্রশ্ন

ইতিকারফের সবনিম্ন সময় কতটুকু? আমি কি অল্প কিছু সময়ের জন্য ইতিকারফ করতে পারি? নাকি একসাথে কয়েকদিনের জন্য ইতিকারফ করতে হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

ইতিকারফের সবনিম্ন সময়ের ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে । অধিকাংশ আলেমের মতে ইতিকারফের সবনিম্ন সময় এক মুহূর্তের জন্যও হতে পারে । এটি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমাদের মাযহাব । দেখুন: আদদুরুল মুখতার (১/৪৪৫), আলমাজমু (৬/৪৮৯), আলইনস্বাফ (৭/৫৬৬) ।

ইমাম নববী আল মাজমু (৬/৫১৪) গ্রন্থে বলেছেন:

“ আর ইতিকারফের সবনিম্ন সময় সম্পর্কে অধিকাংশ আলেম দৃঢ়তার সাথে যে মত ব্যক্ত করেছেন সেটাই সঠিক মত । তা হচ্ছে- ইতিকারফের জন্য মসজিদে অবস্থান করা শর্ত । সেটা বেশি সময়ের জন্য হতে পারে, কম সময়ের জন্যেও হতে পারে । এমনকি সামান্য সময় বা এক মুহূর্তের জন্যেও হতে পারে ।” সমাপ্ত ও সংক্ষেপিত ।

এ মতের পক্ষে তাঁরা কয়েকটি দলীল পেশ করেছেন :

১. ইতিকারফ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- অবস্থান করা । এটি দীর্ঘ সময়ের জন্যেও হতে পারে, অল্প সময়ের জন্যেও হতে পারে । শরিয়তের এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না যা নির্দিষ্ট কোন সময়সীমার মধ্যে ইতিকারফকে সীমাবদ্ধ করে দিবে ।

ইবনে হাযম বলেছেন:

“আরবী ভাষায় ইতিকাকফ শব্দের অর্থ-অবস্থান করা। তাই আল্লাহর মসজিদে তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় যে কোন অবস্থানই হল ইতিকাকফ। সেটা কম সময়ের জন্যে হোক অথবা বেশি সময়ের জন্যে হোক। যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বা সময় নির্ধারণ করেনি” সমাপ্ত। [আল-মুহাজ্জা (৫/১৭৯)]

২. ইবনে আবু শাইবাহ ইয়ালা ইবনে উমাইয়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন: “আমি মসজিদে অল্প কিছু সময় অবস্থান করলেও সেটা আমি ইতিকাকফের নিয়তে অবস্থান করি।” ইবনে হাযম ‘আল-মুহাজ্জা’ গ্রন্থে (৫/১৭৯) এই রেওয়াজে দিয়ে দলীল পেশ করেছেন এবং হাফেজ ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে তা উদ্ধৃত করেছেন; কিন্তু কোন মন্তব্য করেননি। রেওয়াজেটটিতে الساعة(ঘন্টা) দ্বারা বর্তমান পরিভাষায় যা বুঝি ৬০ মিনিট সেটা উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- কিছু সময়।

কিছু কিছু আলেমের মতে ইতিকাকফের সবিন্দু সময় একদিন। ইমাম আবু হানিফা থেকে ও মালেকি মাযহাবের কোন কোন আলেম থেকে এ ধরনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

শাইখ ইবনে বায ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ গ্রন্থে (১৫/৪৪১) বলেছেন: “ইতিকাকফ হলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করা, সময় কম হোক অথবা বেশি হোক। কারণ আমার জানা মতে এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যা একদিন, দুইদিন বা এর চেয়ে বেশী দিনের জন্য ইতিকাকফ করাকে নির্দিষ্ট করবে। ইতিকাকফ শরিয়তসম্মত ইবাদত। তবে কেউ যদি মান্নত করে তখন মান্নতের কারণে তার উপর ইতিকাকফ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। ইতিকাকফের বিধান নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।”

ইতিকাকফের মূল উদ্দেশ্য এবং মুসলমানেরা এই সুন্নতটি ছেড়ে দেয়ার কারণ

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত হওয়া সত্ত্বেও কেন মুসলমানেরা ইতিকাকফ করা ছেড়ে দিয়েছে? ইতিকাকফের মূল উদ্দেশ্যই বা কি?

উত্তর

সংশ্লিষ্ট

আলহামদু লিল্লাহ।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক: ইতিকাকফ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সুন্নত নিয়মিত পালন করতেন। ইতিকাকফ শরয়ি বিধান হওয়ার পক্ষেরদলীলগুলো দেখুন (48999) নংপ্রশ্নের উত্তরে। এই সুন্নতটি মুসলিম জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। আল্লাহর খাস রহমতপ্রাপ্ত গুটি কতক মানুষ ব্যতীত আর কেউ তা পালন করে না। যে সুন্নতগুলো মুসলমানেরা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে বা ছেড়ে দেয়ার উপক্রম হয়েছে- ইতিকাকফ তার একটি। মুসলমানেরা ইতিকাকফ ছেড়ে দেয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ: ১. একটা বড় সংখ্যক মুসলমানের ‘ঈমানী দুর্বলতা। ২. দুনিয়ার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ বিলাসের প্রতি অতি মাত্রায় ঝুঁক পড়া। যার ফলে তারা অল্প সময়ের জন্য হলেও এসব ভোগবিলাস থেকে দূরে থাকতে সক্ষম নয়। ৩. অনেক মানুষের মনে জান্নাত লাভের প্রেরণা নেই। তারা অতিমাত্রায় আরাম-আয়েশের দিকে ঝুঁকি আছে। তাই তারা ইতিকাকফের সামান্য কষ্টও সহ্য করতে চায় না। যদিও তা আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হোক না কেন।

কারণ যে ব্যক্তি জান্নাতের মহান মর্যাদা ও এর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে জানে, সেতার জান, তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কোরবান করে হলেও তা লাভের চেষ্টা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর সামগ্রী অতি মূল্যবান। জেনে রাখো, আল্লাহর সামগ্রী হচ্ছে- জান্নাত।” [জামে তিরমিযি; আলবানী হাদিসটিকেসহীহ বলেছেন (২৪৫০)]

৪. অনেক মানুষের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসা শুধু মুখে সীমাবদ্ধ। বাস্তব কাজে ভালবাসা নেই। বাস্তব ভালবাসা তো হচ্ছে- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নানাবিধ সুন্নত পালন করা। এ রকম একটি সুন্নত হচ্ছে-ইতিকাকফ।

আল্লাহ বলেছেন: “নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাঝে আছে উত্তম আদর্শ। তাদের জন্যযারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।” [৩৩ আল-আহযাব : ২১] ইবনে কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: (৩/৭৫৬)

“ এই মহান আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিটি কথা, কাজ ও প্রতিটি মুহূর্ত অনুসরণের ব্যাপারে একটি মহান মূলনীতি। ” সমাণ্ড

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত ইতিকার করা সত্ত্বেও মানুষদের ইতিকার ছেড়ে দেয়া দেখে জনৈক সলফে সালেহীন বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ইবনে শিহাব যুহরী বলেন: “ এটি খুবই আশ্চর্যজনক যে মুসলমানেরা ইতিকার করছে না। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনাতে আসার পর থেকে আল্লাহ তাঁকে মৃত্যুদান করা পর্যন্ত তিনি ইতিকার বাদ দেননি। ” দুই: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ দিকে রমজান মাসের শেষ দশদিন নিয়মিত ইতিকার পালন করতেন। সত্যিকার অর্থে ইতিকারের এই কয়টি দিন একটি শিক্ষামূলক ইনটেনসিভ কোর্স তুল্য। এর ইতিবাচক ফলাফল মানুষের জীবনে তাৎক্ষণিকভাবে, এমনকি ইতিকারের দিনগুলোতে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া পরবর্তী রমজান পর্যন্ত অনাগত দিনগুলোর উপরেও এর ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। তাই মুসলমানদের মাঝে এই সুন্নতকে পুনর্জীবিত করা কতই না জরুরী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর সাহাবীগণ যে আমলের উপর অটল ছিলেন তা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা কতই না প্রয়োজন। মানুষের এই গাফিলতি ও উম্মতের এই দুর্দশার সময় যারা সুন্নতকে আঁকড়ে ধরে আছে তাদের পুরস্কার কতই না মহান হবে! তিন: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকারের মূল লক্ষ্য ছিল- লাইলাতুল কদর পাওয়া। ইমাম মুসলিম (১১৬৭) আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: “ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের প্রথম দশ দিন ইতিকার করেছেন। এরপর তিনি মাঝের দশদিন তুর্কী কুব্বাতে (এক ধরণের ছোট তাঁবুতে) ইতিকার করেছেন। যে তাবুরদরজার উপর একটি কাপেট ঝুলানো ছিল। রাবী বলেন: তিনি তাঁর হাত দিয়ে কাপেটটিকে কুব্বার এক পাশে সরিয়ে দিলেন। এরপর তাঁর মাথা বের করে লোকদের সাথে কথা বললেন। লোকেরা তাঁর কাছে আসল। অতঃপর তিনি বললেন, “ আমি প্রথম দশদিন ইতিকার করেছি- এই রাতের (লাইলাতুল কদরের) খোঁজে, এরপর মাঝের দশ দিন ইতিকার করেছি। এরপর আমাকে বলা হল: লাইলাতুল কদর শেষ দশকে। সুতরাং আপনাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হয় তিনি ইতিকার করুন। তখন লোকেরা তাঁর সাথে ইতিকার চালিয়ে গেল। ”

এই হাদিসের কিছু শিক্ষণীয় দিক নিম্নরূপ:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভাগ্য রজনীসন্ধান করা এবং সেই রাতে নামায আদায় ও ইবাদতের মাধ্যমে কাটানোর জন্য প্রস্তুত হওয়া। যেহেতু ভাগ্য রজনীর সুমহান ফজিলত রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন: “ লাইলাতুল কদর (ভাগ্য রজনী) হাজার মাস থেকেও উত্তম। ” [৯৭ সূরা আল-কাদর, আয়াত ৩] ২. এই রাতের অবস্থান জানার আগে সেটাকে পাওয়ার জন্য তিনি তাঁর সবটুকু চেষ্টা উৎসর্গ করেছেন। তাই তো তিনি প্রথম দশদিন থেকে ইতিকার করা শুরু করেন, এরপর মাঝের দশ দিনেও ইতিকার করেন, এভাবে মাসের শেষ পর্যন্ত ইতিকার চালিয়ে যান। এক পর্যায়ে তাঁকে জানানো হয় যে, লাইলাতুল কদর শেষ দশকে রয়েছে। এটি ছিল লাইলাতুল কদরকে পাওয়ার জন্য তাঁর চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। ৩. সাহাবীগণ কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ। তাই তো তাঁরাও তাঁর সাথে মাসের শেষ পর্যন্ত ইতিকার চালিয়ে যান। এর মাধ্যমে সাহাবীগণ কর্তৃক তাঁকে অনুসরণের পরাকাষ্ঠা ফুটে উঠে। ৪. সাহাবীগণের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও দয়া। ইতিকার করতে কষ্ট আছে সেটা তাঁর জানা ছিল বিধায় তিনি সাহাবীদেরকে ইতিকার চালিয়ে যাওয়া অথবা ইতিকার থেকে বের হয়ে যাওয়ার দুটো এখতিয়ার দিয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন: “ সুতরাং আপনাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হয় তিনি ইতিকার করুন। ” এছাড়াও ইতিকারের আরো কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে, যেমন : ১. মানুষ থেকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর ঘনিষ্ঠতায় থাকা। ২. সর্বাত্মকরণে আল্লাহ অভিমুখী হয়ে আত্মশুদ্ধি করা। ৩. অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু নিরেট ইবাদত যেমন নামায, দুআ, যিকির ও কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল হওয়া। ৪. রোজার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এমন সবকিছু থেকে রোজাকে হেফযত করা। যেমন আত্মার কু প্রবৃত্তি ও যৌন কামনা বাসনা। ৫. দুনিয়ার বৈধ বিষয়গুলো ভোগ করা কমিয়ে আনা এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এগুলো ভোগের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতা অবলম্বন করা। দেখুন আব্দুললত্বিফ বালতুব কর্তৃক রচিত ‘ইতিকার নাযরা তারাবিয়া’ (ইতিকার: প্রশিক্ষণ মূলক দৃষ্টিকোণ)।

নারীদের মসজিদে ইতিকার

প্রশ্ন

নারীদের জন্য রমজানের শেষ দশদিন মসজিদে ইতিকার করা জায়েয কি না?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য । হ্যাঁ, নারীদের জন্য রমজানের শেষ দশদিন মসজিদে ইতিকার করা জায়েয ।

বরং ইতিকার নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর জন্য একটি সুন্নত ইবাদত । মুমিনদের মাতাগণ তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীবর্গ তাঁর জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর পরে মসজিদে ইতিকার করেছেন ।

সহীহ বুখারী (২০২৬) ও সহীহ মুসলিম (১১৭২) এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা মৃত্যু দানের আগ পর্যন্ত তিনি রমজানের শেষ দশদিন ইতিকার পালন করতেন । তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণ ইতিকার পালন করেছেন ।”

“আউনুল মাবুদ” গ্রন্থে বলা আছে-

“এ হাদিসে দলীল পাওয়া যায় যে ইতিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান ।”

শাইখ আবদুল আযীয ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

“ইতিকার নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সুন্নত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি রমজানে ইতিকার পালন করতেন । সবশেষে তাঁর ইতিকার রমজানের শেষ দশদিনে স্থির হয় এবং তাঁর কয়েকজন স্ত্রীও তাঁর সাথে ইতিকার পালন করতেন । তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁরা ইতিকার পালন করেছেন । ইতিকারের স্থান হচ্ছে- এমন মসজিদ যেখানে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা হয় ।” সমাপ্ত

ইন্টারনেটে শাইখ ইবনে বাযের ওয়েবসাইট থেকে নেয়া হয়েছে সংগৃহীত ।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন ।

কাফফারা

যে রোগীর লাগাতরভাবে ঔষধ গ্রহণের প্রয়োজন হয়

প্রশ্ন

এক ব্যক্তি হার্টের রোগে আক্রান্ত । লাগাতরভাবে তার ঔষধ গ্রহণের প্রয়োজন হয় । অর্থাৎ প্রত্যেক আট ঘন্টা বা ছয় ঘন্টায় । এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি সিয়ামের বিধান মওকুফ হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

হ্যাঁ । তার ক্ষেত্রে রোযা রাখার বিধান মওকুফ হবে এবং তিনি প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবেন । তিনি চাইলে মিসকীনদেরকে খাদ্য দিয়েও দিতে পারেন । প্রত্যেক মিসকীনকে এক চতুর্থাংশ সা' চাল দিবেন । যদি চালের সাথে গোশতও দেন তাহলে সেটা ভাল । তিনি চাইলে রমযানের শেষ রাতে তাদেরকে রাতের খাবার খাওয়াতে পারেন । কিংবা রমযানের পরে কোন একদিন তাদেরকে দুপুরের খাবার খাওয়াতে পারেন । এর যে কোনটি করা জায়েয । [শাইখ ইবনে উছাইমীনের ফতোয়াসমগ্র (১২৬) থেকে সমাপ্ত]

যে ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলায় সহবাস করেছে তার কাফ্ফারা ও খাদ্য দানের পরিমাণ

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলায় সহবাস করেছে তার কাফ্ফারা কী? এবং খাদ্য দানের পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

“ যদি কোন ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলায় স্ত্রী-সহবাস করে তাহলে তাদের প্রত্যেকের উপর কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব । কাফ্ফারা হল: একজন মুমিন দাস মুক্ত করা । যদি তারা তা করতে অক্ষম হয় তাহলে তাদের প্রত্যেকের উপর লাগাতরভাবে দুইমাস রোযা রাখা ওয়াজিব । যদি তারা লাগাতরভাবে দুই মাস রোযা রাখতে অক্ষম হয় তাহলে তাদের উপর ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো ওয়াজিব । দাস মুক্ত করা ও সিয়াম পালনে অক্ষম হলে তাদের উপর ষাটজন মিসকীনকে দেশীয় খাদ্য খাওয়ানো ওয়াজিব হবে; তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে ত্রিশ সা’ দেশীয় খাদ্য দিতে হবে । প্রত্যেক মিসকীনকে এক সা’ । অর্ধ সা’ স্বামীর পক্ষ থেকে; অর্ধ সা’ স্ত্রীর পক্ষ থেকে । এবং যেই দিন সহবাস সংঘটিত হয়েছে সেই দিনের রোযাটি কাযা পালন করতে হবে । এর সাথে আল্লাহর কাছে তাওবা করা, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, অনুশোচিত হওয়া, গুনাহটি ছেড়ে দেয়া ও ইস্তিগফার করা তাদের উপর ওয়াজিব হবে । কেননা রমযানের দিনের বেলায় সহবাস করা মহা অন্যায । যাদের উপর রোযা রাখা আবশ্যিক তাদের জন্য এ মহা অন্যায়ে লিগু হওয়া নাজায়েয ।” [শাইখ বিন বাযের ফতোয়াসমগ্র (১৫/৩০২)]

এর ভিত্তিতে: গরীব মানুষকে প্রদেয় খাদ্যের পরিমাণ অর্ধ সা’ চাল বা অন্য কিছু । অর্থাৎ প্রায় দেড় কিলোগ্রাম ।

হায়েযের কারণে কাফ্ফারা রোযার ধারাবাহিকতা কর্তিত হয় না

প্রশ্ন

জৈনিক নারী তার কোন এক গুনাহর কাফ্ফারা হিসেবে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোযা পালন করছেন । তিনি জিজ্ঞেস করছেন যে, মাসিকের কারণে যে দিনগুলোতে তিনি রোযা রাখতে পারবেন না তিনি দুই মাস শেষ হওয়ার পর সেই দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করবেন? কিংবা কী করবেন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

যে নারীর উপর দুই মাস লাগাতরভাবে রোযা রাখা আবশ্যিক হয়েছে হায়েয শুরু হলে তিনি রোযা রাখবেন না । হায়েয শেষ হলে তিনি রোযাগুলো পূর্ণ করবেন এবং হায়েযের দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করবেন । এটি আলেমদের ইজমা ।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: “ আলেমগণ এই মর্মে ইজমা করেছেন যে, লাগাতরভাবে রোযা রাখা যে নারীর উপর আবশ্যিক হয়েছে তিনি রোযাগুলো পরিপূর্ণ করার আগে তার হায়েয শুরু হলে তিনি পবিত্র হওয়ার পর সে রোযাগুলো কাযা পালন করবেন এবং বাকী রোযাগুলো রাখবেন । কেননা দুই মাসের মধ্যে হায়েয এড়ানো সম্ভবপর নয়; যদি না হায়েয বন্ধ হয়ে যাওয়ার বয়স পর্যন্ত বিলম্ব করা না হয় । এমনটি করলে রোযাকে বিপদেরসম্মুখীন করা হয় ।” [আল-মুগনী (৮/২১)]

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ ।

যে নারী রোযা ভেঙেছে কিন্তু লজ্জায় আর রোযা রাখেনি

প্রশ্ন

আমার বয়স যখন ১৩ বছর ছিল তখন আমি রমযানের রোযা রেখেছি । কিন্তু হায়েযের কারণে চারদিনের রোযা রাখিনি । কিন্তু আমি লজ্জায় কাউকে কিছু বলিনি । এখন আট বছর পার হয়ে গেছে । আমার করণীয় কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

আপনি এ দীর্ঘ সময় রোযার কাযা পালন না করে ভুল করেছেন । এটি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে মেয়েদের উপর নির্ধারিত বিষয় । দ্বীনি ক্ষেত্রে শরমের কিছু নেই । আপনার উপর আবশ্যিক হল এ চার দিনের রোযা কাযা পালন করা এবং কাফ্ফারা পরিশোধ করা । কাফ্ফারা হচ্ছে— প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো । প্রত্যেক মিসকীন বা মিসকীনদের জন্য স্থানীয় খাদ্যের দুই সা' পরিমাণ ।

যে ব্যক্তি রোযা রাখেনি তার কী করণীয়

প্রশ্ন

আমি একজন যুবতী । আমার বয়স ২৫ বছর । ছোট বেলা থেকে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত আমি রোযা রাখিনি । আমি অলসতা করে রোযা রাখিনি । আমার পিতা আমাকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন । কিন্তু আমি পাত্তা দিইনি । আমার উপর কী করা আবশ্যিকীয়? উল্লেখ্য, আল্লাহ্ আমাকে হেদায়েত দিয়েছেন । আমি এখন রোযা রাখি এবং পূর্বের গুনাহর ব্যাপারে অনুতপ্ত ।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

তাওবা পূর্বে কৃত সব গুনাহকে ধ্বংস করে দেয় । আপনার উপর আবশ্যিক হচ্ছে অনুশোচনা করা, গুনাহ ত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প করা, ইবাদতে একনিষ্ঠ হওয়া, দিবারাত্রি বেশি বেশি নফল ইবাদত করা, নফল রোযা রাখা, যিকির করা, কুরআন তেলাওয়াত করা ও দোয়া করা । আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং অনেক পাপ ক্ষমা করে দেন ।

সব ফিদিয়া একজন মিসকীনকে দিতে কোন বাধা নেই

প্রশ্ন

রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তি কি একজন মিসকীনকে ত্রিশদিন খাওয়ানো; নাকি ত্রিশজন মিসকীনকে একদিন খাওয়ানো?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

যে ব্যক্তির রোযা রাখার অক্ষমতা চলমান সে ব্যক্তির উপর প্রতিটি রোযার বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো আবশ্যিক । যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা

বলেছেন: “*আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়া তথা একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা*।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৪] ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: “এ আয়াতটি রহিত নয় । বরং এমন ব্যক্তি হচ্ছে- বয়োবৃদ্ধ পুরুষ ও নারী; যারা রোযা রাখতে পারে না । সেক্ষেত্রে তারা প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো ।” [সহিহ বুখারী (৪৫০৫)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“খাদ্য খাওয়ানোর পদ্ধতি দুটো:

এক. খাদ্য প্রস্তুত করে ভাংতি রোযার দিনসংখ্যক মিসকীনকে দাওয়াত করে খাওয়ানো; যেমনটি আনাস (রাঃ) বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর করেছিলেন ।

দুই. রান্না না করে খাদ্যসামগ্রী দিয়ে দেয়া ।” [আশ্শারহুল মুমতি' (৬/৩৩৫) থেকে সমাণ্ড]

আরও জানতে দেখুন: [49944](#) নং প্রশ্নোত্তর ।

আর একজন মিসকীনকে ত্রিশদিন খাওয়ানোর প্রসঙ্গে অনেক আলেম দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তা জায়েয। এটি শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাব এবং একদল মালেকী আলেমের অভিমত।

আল-ইনসাফ গ্রন্থে (৩/২৯১) বলেছেন:

“ একজন মিসকীনকে একবারে খাদ্য দিয়ে দেয়াও জায়েয।” [সমাণ্ড]

দেখুন: তুহফাতুল মুহতাজ (৩/৪৪৬), কাশশাফুল ক্বিনা (২/৩১৩)

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রতে (১০/১৯৮) এসেছে:

“ যদি ডাক্তারগণ বলেন যে, যেই রোগে আপনি ভুগছেন এই রোগ থেকে সুস্থতার আশা নেই এবং এর কারণে আপনি রোযা রাখতে পারবেন না— তাহলে আপনার উপর আবশ্যিক হল প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে অর্ধ ‘সা’ স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা; সেটি খেজুর হতে পারে কিংবা অন্য কিছু হতে পারে।” [সমাণ্ড]

এর মাধ্যমে আপনি জানলেন যে, একজন মিসকীনকে ত্রিশদিন খাওয়ানো কিংবা ত্রিশজন মিসকীন একদিন খাওয়ানো উভয়টি জায়েয।

আল্লাহুই সর্বত্ত্ব।

যে নারী অনাদায়কৃত রোযাগুলোর কাযা পালন করেনি

প্রশ্ন

মাসিকের কারণে আমার যে রোযাগুলো ছুটে গেছে আমি সেগুলোর কাযা পালন করিনি। আমি হিসাব করতে পারছি না। এখন আমি কী করব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুসলিম বোন, আপনার উচিত রোযার সংখ্যা নির্ধারণে সচেষ্টি হওয়া। প্রবল ধারণা অনুযায়ী আপনি যতটি রোযা রাখেননি সে সংখ্যক রোযা রাখা এবং আল্লাহর কাছে তাওফিক চেয়ে দোয়া করা। আল্লাহুতাআলা

বলেন: “আল্লাহ কাউকে তার সাথের বাইরে দায়িত্বারোপ করেন না।” [সূরা বাক্বারা, ২:২৮৬] আপনি সচেষ্টি হোন, নিজের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করুন; যাতে করে আপনার কাছে যে সংখ্যার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয় যে, আপনি এ রোযাগুলো রাখেননি সে রোযাগুলো রাখুন এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করুন।

আল্লাহুই তাওফিক দাতা।

রোযার ফিদিয়া পরিশোধ করার পদ্ধতি

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখেন না তিনি কি প্রতিদিনের ফিদিয়া প্রতিদিন দিবেন; নাকি রমযানের শেষে একবারে দিবেন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তি এমন কোন ওজরের কারণে রমযানের রোযা রাখেন না; যে ওজরটি দূরীভূত হওয়ার আশা নাই যেমন বার্ধক্যজনিত ওজর— সে ব্যক্তি প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানবেন। এ খাদ্য খাওয়ানোর ক্ষেত্রে তার জন্য এই এখতিয়ার থাকবে যে,

তিনি চাইলে প্রতিদিনের বদলে প্রতিদিন খাদ্য খাওয়াতে পারেন। কিংবা মাস শেষে মাসের দিন সংখ্যা অনুপাতে মিসকীনদেরকে খাদ্য খাওয়াতে পারেন।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) আশ্শারহুল মুমতি' গ্রন্থে (৬/৩৩৫) বলেন:

এর সময় (অর্থাৎ খাদ্য খাওয়ানোর সময়) —এর ক্ষেত্রে এখতিয়ার রয়েছে। তিনি চাইলে প্রতিদিনের খাদ্য প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন এবং চাইলে মাসের শেষদিন পর্যন্ত বিলম্ব করতে পারেন; যেহেতু এভাবে আনাস (রাঃ) এর আমল রয়েছে [সমাপ্ত]

যে ব্যক্তি কাযা পালন করতে ভুলে গেছে এবং আরেক রমযান চলে এসেছে

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি কাযা পালন করতে ভুলে গেছে এবং আরেক রমযান চলে এসেছে তার হুকুম কী?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ফিকাহবিদগণ এই মর্মে একমত যে, ভুলে যাওয়া একটি ওজর; যে ওজরের কারণে সব ধরণের সীমালঙ্ঘনের পাপ ও শাস্তি মওকুফ করা হয়— এ সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহর অনেক দলিলের কারণে। তবে তারা এ নিয়ে মতভেদ করেছেন যে, ভুলে যাওয়া ব্যক্তির উপর ফিদিয়া দেয়া বা এ জাতীয় কিছু কি বর্তাবে?

রমযানের রোযা কাযা পালনের কথা এমনভাবে ভুলে যাওয়া যে, অন্য রমযান চলে আসা সংক্রান্ত সবিশেষ এ মাসয়ালায় আলেমগণ একমত যে, পরবর্তী রমযানের পর কাযা পালন করা তার উপর ওয়াজিব। ভুলে যাওয়ার কারণে সেটি মওকুফ হবে না। তবে কাযা পালনের সাথে ফিদিয়া দেয়া (মিসকীন খাওয়ানো) ওয়াজিব কিনা এ ব্যাপারে তারা দ্বিমত করেছেন। এক অভিমত মতে: তার উপর ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব নয়। কেননা ভুলে যাওয়া এমন ওজর যার কারণে গুনাহ ও ফিদিয়া প্রদান মওকুফ হয়। শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ আলেম ও মালেকি মাযহাবের কিছু কিছু আলেমের অভিমত এটি।

দেখুন: ইবনে হাজার হাইতামি-র 'তুহফাতুল মুহতাজ' (৩/৪৪৫), নিহায়াতুল মুহতাজ (৩/১৯৬), মিনাহুল জালিল (২/১৫৪), এবং শারহ মুখতাছারি খলিল (২/২৬৩)।

দ্বিতীয় অভিমত: তার উপর ফিদিয়া প্রদান ওয়াজিব। ভুলে যাওয়া এমন একটি ওজর যার কারণে কেবল গুনাহ মওকুফ হয়। এটি শাফেয়ী মাযহাবের আলেম খতবী শারবানী এর অভিমত। তিনি 'মুগনিল মুহতাজ' গ্রন্থে (২/১৭৬) বলেন: "তিনি বলেন: বাহ্যতঃ এর মাধ্যমে তার পাপ মওকুফ হবে; ফিদিয়া নয়"। কিছু মালেকী আলেম এটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

দেখুন: মাওয়াহিবুল জালিল শারহ মুখতাছারি খলিল (২/৪৫০)।

অগ্রগণ্য অভিমত: ইনশা আল্লাহ্‌প্রথম অভিমত। নিম্নোক্ত দলিলের কারণে:

এক. ভুলে যাওয়া ব্যক্তির শাস্তি মওকুফ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসসমূহের সার্বিকতা। যেমন আল্লাহর

বাণী: "হে আমাদের প্রভু, যদি আমরা ভুল যাই কিংবা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না।" [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬]

দুই. মূল অবস্থা হল ব্যক্তির দায় মুক্ততা। তাই কোন দলিল ছাড়া তার উপর কাফফারা কিংবা ফিদিয়ার দায় বর্তানো জায়েয নয়। কিন্তু এই মাসয়ালাতে এমন কোন শক্তিশালী দলিল নেই।

তিন. মূলতঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কাযা পালনে বিলম্ব করেছে তার উপরই এই ফিদিয়া ওয়াজিব কিনা সেট মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়। হানাফী মাযহাব ও জাহেরী মাযহাবের মতে এটি ওয়াজিব নয়। শাইখ উছাইমীন ফিদিয়া দেয়া মুস্তাহাব হওয়ার মতকে নির্বাচন করেছেন। কারণ এই ফিদিয়ার বিধান সাব্যস্তের ক্ষেত্রে কেবল কিছু কিছু সাহাবীর আমল ছাড়া অন্য কোন দলিল উদ্ধৃত হয়নি। আর এ

দলিলটি দিয়ে মানুষকে ফিদিয়া দিতে বাধ্য করার মত শক্তি এতে নেই; তাহলে ওজরগ্রস্ত ব্যক্তিকে কিভাবে এই দলিল দিয়ে ফিদিয়া দিতে বাধ্য করা হবে; যে ওজরটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এমন ওজরের ক্ষেত্রে।

দেখুন: [26865](#) নং প্রশ্নোত্তর।

জবাবের সারসংক্ষেপ: তার উপর শুধু কাযা পালন ওয়াজিব। তাকে খাদ্য খাওয়াতে হবে না। বর্তমান রমযানের পর সে রোযাগুলো কাযা পালন করবে।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

কাফফারা হিসেবে শিশুদেরকে খাওয়ালে কি আদায় হবে?

প্রশ্ন

শপথ ভঙ্গের কাফফারার ক্ষেত্রে শিশুরা কি মিসকীন হিসেবে গণ্য হবে? খাবার খাওয়ানোর ক্ষেত্রে কি নির্দিষ্ট কোন খাবার আছে; নাকি যে কোন খাবার হলে চলবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যিনি শিশুদের লালন-পালন করেন তিনি যদি শরিয়তের দৃষ্টিতে গরীব হন এবং শিশুদের এমন কোন সম্পদ না থাকে যা থেকে তাদের খরচ চালানো যাবে তাহলে এমন শিশুরা কাফফারার হকদার মিসকীনদের অধীনে পড়বে।

দুই:

কাফফারা ক্ষেত্রে ধর্তব্য হল—মধ্যম মানের যে খাবার কাফফারা আদায়কারী সাধারণত নিজে খান বা নিজের পরিবার-পরিজনকে খাওয়ান; যেমন—খেজুর, গম, ভুট্টা বা চাল ইত্যাদি।

আল্লাহুই তাওফিকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারপরিজন ও তাঁর সাথীবর্গের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

ফতোয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন গুদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন কুয়ুদ।

ফাতাওয়াল লাজনাহ আদদায়িম (৯/২১৯)

যে ব্যক্তি লাগাতর দুই মাসের রোযা রাখা শুরু করেছে এর মধ্যে রমযান মাস চুকে গেছে এতে করে কি তার 'লাগাতর' এর বিষয়টি ভঙ্গ হয়ে যাবে

প্রশ্ন

আমি জানি, যে ব্যক্তি রমযান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করেছে তার জন্য কাফফারা হচ্ছে- দুই মাস রোযা রাখা কিংবা ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানো। এই দুই মাস রোযা কি লাগাতরভাবে রাখতে হবে? যে ব্যক্তি এ রোযাগুলো রাখা শুরু করেছে; এর মধ্যে রমযান মাস শুরু হয়ে গেছে সে কি রমযানের পর যে পর্যন্ত রোযা রেখেছিল এর পর থেকে শুরু করবে নাকি তাকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে? ষাটজন মিসকীন খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সকলকে কি একই সময়ে খাওয়াতে হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

আলহামদুলিল্লাহ ।

এক:

যে ব্যক্তি রমযান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করল সে গুনাহর কাজ করল; তার উপর কাফফারা আদায় করা ফরয । কাফফারা হচ্ছে- একজন ক্রীতদাস আযাদ করা; যদি ক্রীতদাস না পায়, তাহলে লাগাতরভাবে দুইমাস রোযা রাখা; যদি সেটাও না পারে, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানো । যে ব্যক্তি রোযা রাখতে সক্ষম তার জন্য মিসকীন খাওয়ানো জায়েয নেই ।

সহবাসের কারণে কাফফারা ফরয হওয়ার দলিল হচ্ছে- সহিহ বুখারী (১৯৩৬) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপবিষ্ট ছিলাম । হঠাৎ করে এক লোক এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়েছি । তিনি বললেন: তোমার কি হয়েছে? লোকটি বলল: রোযা রেখে আমি স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি কি একটি ক্রীতদাস আযাদ করতে পারবে? লোকটি বলল: না । তিনি বললেন: তুমি কি লাগাতর দুইমাস রোযা রাখতে পারবে? লোকটি বলল: না । তিনি বললেন: তাহলে তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে?...[আল-হাদিস]

এ হাদিসটি প্রমাণ করছে যে, দুইমাসের রোযা লাগাতরভাবে রাখতে হবে । যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ তুমি কি লাগাতর দুইমাস রোযা রাখতে পারবে?”

যে ব্যক্তি এই রোযা রাখা শুরু করেছে; এর মধ্যে রমযান এসে গেছে তখন সে রমযানের রোযা রাখবে, ঈদের দিন রোযা রাখবে না । এরপর আবার দুই মাসের অবশিষ্ট রোযাগুলো রাখবে । নতুনভাবে শুরু করতে হবে না । কারণ রমযানের রোযা রাখার কারণে তার ‘লাগাতর’ এর বিষয়টি ভঙ্গ হবে না ।

ইবনে কুদামা বলেন:

যে ব্যক্তি শাবান মাসের শুরু থেকে যিহার এর রোযা শুরু করেছে সে ঈদের দিন রোযা রাখবে না; এরপর অবশিষ্ট রোযাগুলো পূর্ণ করবে । অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জিলহজ্জ মাসের এক তারিখ থেকে রোজা রাখা শুরু করেছে সে কোরবানীর ঈদের দিন ও তাশরিকের দিনগুলো রোযা রাখবে না । এর অবশিষ্ট রোযাগুলো পূর্ণ করবে ।

সারকথা হচ্ছে-

যিহারের রোযা রাখার মাঝখানে যদি এমন কোন সময় এসে পড়ে যে সময়ে কাফফারার রোযা রাখা সহিহ নয় যেমন একব্যক্তি শাবানের এক তারিখ থেকে রোযা রাখা শুরু করল এর মাঝখানে রমযান মাস ও ঈদুল ফিতর পড়ল কিংবা জিলহজ্জের এক তারিখ থেকে রোযা রাখা শুরু করল এর মাঝখানে কোরবানীর ঈদ ও তাশরিকের দিনগুলো পড়ল এতে করে ঐ ব্যক্তির ‘লাগাতর’ এর বিষয়টি ভঙ্গ হবে না । সে এরপর অবশিষ্ট রোযাগুলো পূর্ণ করবে ।[মুগনি থেকে সমাণ্ড (৮/২৯)]

দুই:

ষাটজন মিসকীনকে এক সময়ে খাওয়ানো ফরয নয় । বরং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গ্রুপে গ্রুপে সে ব্যক্তি খাওয়াতে পারেন । যাতে সংখ্যা ষাটজন পূর্ণ হয় ।

আরও জানতে [1672](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন ।

আল্লাহই ভাল জানেন ।

ষাটজন মিসকীনকে একসাথে খাওয়ানো কি ওয়াজিব? নিজ পরিবারকে কি কাফফারা হতে খাওয়ানো যায়?

প্রশ্ন

আমি স্বেচ্ছায় রমজান মাসে একদিন রোযা ভেঙ্গে ফেলেছিলাম। এখন ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর নিয়তে করেছি। প্রশ্ন হচ্ছে- মিসকীনদেরকে কি একবারেই খাওয়ানো শর্ত, নাকি আমি প্রতিদিন তিন বা চারজন করে মিসকীন খাওয়াতে পারি? আমার পরিবারের সদস্যরা (যেমন আমার বাবা, মা ও ভাইয়েরা) যদি মিসকীন হয়ে থাকে আমি কি তাদেরকে খাওয়াতে পারি।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

সহবাস ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে যদি রমজানের রোযা ভঙ্গ করা হয়ে থাকে, তবে সঠিক মতানুযায়ী এর কোন কাফফারা নেই। তবে এক্ষেত্রে ওয়াজিব হল তওবা করা এবং সেই দিনের রোযা কাযা করা। আর যদি সহবাসের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করা হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে তওবা করতে হবে, সেই দিনের রোযা কাযা করতে হবে এবং কাফফারা আদায় করতে হবে। রোযার কাফফারা হলো একজন মুমিন দাসমুক্ত করা। যদি তা না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে লাগাতর দুইমাস সিয়াম পালন করতে হবে। আর সেটাও যদি তার পক্ষে সম্ভবপর নাহয় তবে সে ব্যক্তি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে।

যদি সে ব্যক্তি পূর্বে উল্লেখিত দাসমুক্তি ও সিয়াম পালনে অক্ষমতার কারণে মিসকীন খাওয়ায় তবে তাঁর জন্য মিসকীনদেরকে একসাথে খাওয়ানো জায়েয। অথবা সাধ্যমত কয়েকবারে খাওয়ানোও জায়েয। তবে মিসকীনদের সংখ্যা অবশ্যই ষাট পূর্ণ করতে হবে। এই কাফফারার খাবার বংশমূল যেমন- বাবা, মা, দাদা, দাদী, নানা, নানী এদেরকে প্রদান করা জায়েয নয়। একইভাবে যারা বংশধর (শাখা) যেমন ছেলেমেয়ে, ছেলেমেয়েদের ছেলেমেয়ে তাদেরকেও প্রদান করা জায়েয নয়।

আল্লাহই তাওফিক দাতা। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের প্রতিরহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।” সমাপ্ত।

গবেষণা ও ফতোয়াবিষয়ক স্থায়ী কমিটি

আশ-শাইখ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল 'আযীয বিন বায, আশ-শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে গুদাইইয়ান, আশ-শাইখ সালেহ আল ফাওয়ান, আশ-শাইখ আবদুল 'আযীয আল আশ-শাইখ, আশ-শাইখ বাকর আবু যাইদ।

সিয়ামের আয়াতে উল্লেখিত ফিদিয়া এর পরিমাণ

প্রশ্ন

সিয়ামের আয়াতে উল্লেখিত ফিদিয়া এর পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক :

যে ব্যক্তি রমজান মাস পেলেন কিন্তু তিনি সিয়াম পালনে সক্ষম নয়- অতিশয় বৃদ্ধ হওয়ার কারণে অথবা এমন অসুস্থ হওয়ার কারণে যার আরোগ্য লাভের আশা করা যায় না, তার উপর সিয়াম পালনফরজ নয়। তিনি রোযা ভঙ্গ করবেন এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة:-/

“ হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদিয়া তথা একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সংকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। [সূরা বাক্বারাহ, ২: ১৮৩-১৮৪]

ইমাম বুখারী (৪৫০৫) ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: “ এ আয়াতটি মানসুখ (রহিত) নয়, বরং আয়াতটি অতি বৃদ্ধ নর ও নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- যারা রোযা পালনে অক্ষম। তারা প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন।”

ইবনে কুদামাহ “আলমুগনী” গ্রন্থে (৪/৩৯৬) বলেছেন:

“ অতিশয় বৃদ্ধ নর ও নারীর জন্য রোযা পালন যদি কঠিন ও কষ্টসাধ্য হয় তবে তাঁরা রোযা পালন না করে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন। তাঁরা যদি মিসকীন খাওয়াতেও অক্ষম হন তবে তাদের উপর কোন কিছুবর্তাবে না।

[لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا] (البقرة:)

“ আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।” [সূরা বাক্বারাহ, ২: ২৮৬]

আর যে রোগীর আরোগ্য লাভের আশা করা যায় না, সেও রোযা ভঙ্গ করবে এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। কারণ সে রোগীও বৃদ্ধ লোকের পর্যাভুক্ত।” সংক্ষিপ্তসার সমাপ্ত।

“আলমাওসুআহ আলফিক্বহিয়াহ” (৫/১১৭)তে বলা হয়েছে:

“ হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাজহাবের আলমগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, ফিদিয়া তখনই আদায় করা যাবে, যখন কাযা আদায় করতে পারার ব্যাপারে নিরাশা দেখা দিবে। এই নিরাশা হতে পারে বার্ধক্যের কারণে, যার ফলে ব্যক্তি রোযা রাখার সক্ষমতা রাখেন না। অথবা এমন কোন রোগের কারণে যে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা দুরূহ। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسْكِينٍ) (البقرة:)

“আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদিয়া তথা একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।” [সূরা বাক্বারাহ, ২: ১৮৪] এর অর্থ হচ্ছে- যাদের জন্য সিয়াম পালন কষ্টসাধ্য।” সমাপ্ত।

আর শাইখ ইবনে উছাইমীন “ফাতাওয়াস্ সিয়াম” গ্রন্থে (পৃঃ ১১১) বলেছেন : “আমাদের জানা উচিত যে রোগী দুই প্রকার :

প্রথম প্রকার :

এমন রোগী যার রোগমুক্তির আশা করা যায়। যেমন-সাময়িক রোগ যা থেকে আরোগ্য লাভের আশা করা যায়। এ শ্রেণীর রোগীর হুকুম হল যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)

“ তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে।” [সূরা বাক্বারাহ, ২: ১৮৪] এ শ্রেণীর রোগী সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করবে। এরপর রোযা পালন করবে। যদি এমন হয় যে তার রোগ থেকেই যায় এবং সুস্থ না

হয়ে সে মারা যায়, তবে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা তার উপর অন্য দিনগুলোতে রোযার কাযা আদায় করা ফরজ করেছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়ার আগেই সে মারা গেছে। এক্ষেত্রে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি রমজান আসার আগেই শা'বান মাসে মারা গেল, তার পক্ষ থেকে কাযা আদায় করতে হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার :

এমন রোগী যার রোগ স্থায়ী। যেমন-ক্যান্সারের রোগ (আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই), কিডনি রোগ, ডায়াবেটিকস বা এ ধরনের স্থায়ী রোগ যা থেকে রোগীর আরোগ্য লাভ আশা করা যায় না। এ শ্রেণীর রোগী রমজান মাসে সিয়াম পালন বর্জন করতে পারবে এবং প্রতিদিনের রোযার বদলে একজন মিসকীন খাওয়ানো তার উপর আবশ্যিক হবে। ঠিক যেমন অতিশয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যারা সিয়াম পালনে সক্ষম নয় তারা করে থাকেন- রোযা না রেখে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়ান। এর সপক্ষে কুরআনের দলীল হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলার বাণী:

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)

“আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদিয়া তথা একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।” [২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪] উদ্ধৃতির সমাপ্তি

দুই :

ইত্ব'আম বা খাওয়ানোর পদ্ধতি হল প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধেক স্বা' (প্রায় ১.৫ কিলোগ্রাম) খাবার যেমন-চাল বা অন্যকিছু প্রদান করা। অথবা খাবার বানিয়ে মিসকীনদেরকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো।

ইমাম বুখারী বলেছেন :

“আর যে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি রোযা পালনে সক্ষম নন তিনি মিসকীন খাওয়ান। যেমন আনাস (রাঃ) বৃদ্ধ হওয়ার পর একবছর কি দুইবছর প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে রুটি ও গোশত খাইয়েছেন; নিজে সিয়াম পালন করেননি।” উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

শাইখ ইবনে বাযকে একজন অতিশয় বৃদ্ধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল (যিনি রোযা পালনে সক্ষম নন) তিনি কী করবেন?

তিনি উত্তরে বলেন:

“তাকে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে অর্ধ স্বা' স্থানীয় খাবার খাওয়াতে হবে। যেমন-খেজুর, চাল বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য। ওজন হিসেবে এর পরিমাণ হল প্রায়দেড় (১.৫) কিলোগ্রাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একদল সাহাবী এই মর্মে ফতোয়া দিয়েছেন, যাঁদের মাঝে ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আছেন। আর যদি তিনি হতদরিদ্র হন অর্থাৎ মিসকীন খাওয়াতে সক্ষম না হন, তবে তার উপর অন্যকিছু বর্তাবে না। উল্লেখিত এই কাফফারা একজন মিসকীনকেও দেওয়া যেতে পারে, একাধিক মিসকীনকে দেওয়া যেতে পারে। মাসের শুরুতেও দেয়া যেতে পারে, মাঝখানেও দেয়া যেতে পারে, শেষেও দেয়া যেতে পারে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।” সমাপ্ত

[মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে বায (বিন বাযের ফতোয়া সংকলন), পৃষ্ঠা-১৫/২০৩]

শাইখ ইবনে 'উছাইমীন ফাতাওয়াস্ সিয়াম (পৃঃ-১১১) এ বলেছেন : “তাই স্থায়ী রোগে আক্রান্ত রোগী, অতিশয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের মধ্যে যারা রোযা পালনে অক্ষম তাদের উপর প্রতিদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজিব। সেটা খাদ্য দান করার মাধ্যমে হোক অথবা রমজান মাসের দিনের সমান সংখ্যক মিসকীনকে দাওয়াত করে খাওয়ানোর মাধ্যমে হোক। ঠিক যেমনটি আনাস বিন মালেক (রাঃ) বৃদ্ধ হওয়ার পর করতেন। তিনি ৩০ জন মিসকীনকে একত্রে দাওয়াত করে খাওয়াতেন। এতে তার একমাসের রোযার কাফফারা হয়ে যেত।”

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে (১১/১৬৪) একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল রমজানের রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে মিসকীন খাওয়ানোর ব্যাপারে। যেমন-বার্ধক্যের কারণে অক্ষম বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এবং সুস্থতার আশা নেই এমন রোগী।

তাঁরা উত্তরে বলেন :

“ বারধকের কারণে যে ব্যক্তি রমজানের রোযা পালনে অক্ষম যেমন-অশীতিপর বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অথবা রোযা পালন যার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য তার জন্য রোযানা-রাখার ব্যাপারে ছাড় (রোখসত) আছে। তার জন্য প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজিব। খাদ্যের পরিমাণ হবে- অর্ধ স্কা গম, খেজুর, চাল বা এ জাতীয় অন্য কোন খাবার। যে খাবার তিনি নিজ পরিবারকে খাদ্য হিসেবে খাইয়ে থাকেন। একই বিধান প্রযোজ্য এমন অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও, যিনি রোযা পালনে অক্ষম বা রোযা পালন করা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং তার রোগমুক্তির কোন আশা নেই।” এর দলীল হলো আল্লাহ তা’আলার বাণী:

[لا يُكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا] (البقرة :)

“ আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।” [সূরা বাক্বারাহ, ২:২৮৬] এবং আরও এসেছে :

[وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] (الحج :)

“ আর তিনি ধ্বিনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কাঠিন্য রাখেননি।” [সূরা হাজ্জ, ২২: ৭৮]

এবং তাঁর বাণী :

[وَأَعْلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ] (البقرة :)

“ আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদিয়া তথা একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।” [সূরা বাক্বারাহ, ২ : ১৮৪] উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

মদিনাতে তার যে বাড়িটি রয়েছে তিনি সফরের দূরত্ব ভ্রমণ করে সেখানে পৌঁছেছেন এবং রমজানে দিনের বেলা বীর্ষপাত না করে স্ত্রী সহবাস করেছেন

প্রশ্ন

আমি ছুটি কাটাছিলাম। ছুটিকালীন সময়ে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা নগরী সফর করি। মক্কা থেকে মদিনা মুনাওয়ারাতে যাই। সেখানে আমি রমজানের দিনের বেলায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি; কিন্তু কোন বীর্ষপাত হয়নি। প্রশ্ন হলো- এজন্য আমার উপর কি কোন কিছু আবশ্যিক হবে? যদি আমার উপর কিছু আবশ্যিক হয়ে থাকে আমার জানা মতে সেটা এই ক্রমধারায় আবশ্যিক হয়- একজন দাসমুক্তি; আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় এটা পালন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অথবা একাধারে দুই মাস সিয়াম পালন; আমার ফিস্ত ওয়াকর্ধমী চাকুরী ও গ্রীষ্মের তীব্র গরমের কারণে এটা পালন করাও আমার জন্য কঠিন। তবে কি আমি ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো? আমার স্ত্রীর উপরও কি একই জরিমানা আবশ্যিক হবে, যদি সে সহবাসের প্রস্তাবে রাজি থাকে? এখানে উল্লেখ্য যে, আমি রিয়াদের অধিবাসী। কিন্তু মদিনাতে আমার একটি বাড়ি আছে। ছুটি কাটাতে আমি মদিনাতে যাই।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

নিজ এলাকায় অবস্থানরত রোযা পালনকারী (মুকীম) রমজানে দিনের বেলা সহবাস করলে তার উপর কঠিন কাফফারা আবশ্যিক হয়। আর তা হল একজন দাস মুক্ত করা। কেউ যদি তা না পারেন তবে দুই মাস একাধারে সিয়াম পালন। কেউ যদি তা না পারেন তবে ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো এবং সেই সাথে তার উপর তওবা করা এবং সেই দিনের কাযা করাও আবশ্যিক।

সেই স্ত্রীর ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য; যদি তিনিসহবাসের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে বীর্ষপাত না হওয়ার কারণে হুকুমের কোন পার্থক্য হবে না। কারণসঙ্গমতথা একটি অঙ্গ অপর একটি অঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করানো সংঘটিত হয়েছে। এটাই রোযার কাফফারা ফরজ করে দেয়।

আর যদি তারা উভয়ে সফররত অবস্থায় থাকেন তবে তাদের কোন গুনাহ হবে না। তাদেরকে কোন কাফফারা দিতে হবে না এবং দিনের বাকি অংশ মুফাতিরাতে (রোযা ভঙ্গ কারী বিষয়সমূহ) থেকে বিরত থাকতে হবে না। বরং তাদের উভয়কে শুধু সেই দিনের রোযা কাযা করতে হবে। কারণ (সফররত অবস্থায়)তাদের উভয়ের জন্য রোযা পালন আবশ্যিক নয়।

আপনি যদি রিয়াদের অধিবাসী হয়ে থাকেন এবং মদিনাতে আপনার আরেকটি বাড়ি থাকে যেখানে আপনি ছুটির দিনগুলোতে যান, তবে মদিনাতে গেলেও আপনি নিজ এলাকায় বসবাসকারী 'মুক্কীম' হিসেবে গণ্য হবেন। আপনার উপর সালাত ও রোযা সম্পন্ন করা আবশ্যিক হবে, সহবাস বা অন্য কোন মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করা হারাম হবে এবং সহবাসের কারণে আপনার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি আপনি মক্কায় সফর করেন তবে আপনি নিজ এলাকায় বসবাসকারী 'মুক্কীম' হিসেবে গণ্য হবেন না; যদি আপনি সেখানে চার দিনের বেশি থাকার নিয়ত না করেন। যদি এর কম সময় থাকার নিয়ত করেন তবে আপনার ক্ষেত্রে মুসাফিরের হুকুম প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ আপনি মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: "একজন লোক এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফর করেছে এবং যে দেশে সফর করেছে সেখানে তার একটি বাড়ি আছে। সে কী সেখানে পুরো সালাত আদায় করবে, নাকি ক্বসর (সংক্ষিপ্ত) করবে?"

শাইখ: কিন্তু তিনি কি সেই বাড়িতে দুই, তিন মাস অবস্থান করেন? আর অন্য বাড়িতেও দুই, তিন মাস অবস্থান করেন? নাকি কেমন?

প্রশ্নকারী: তিনি গ্রীষ্মের ছুটিতে সেখানে অবস্থান করেন।

শাইখ: তিনি কি গ্রীষ্মের মৌসুমে সেখানে যান?

প্রশ্নকারী: হ্যাঁ।

শাইখ: তবে তিনি ক্বসর (সালাত সংক্ষিপ্ত) করবেন না। কারণ প্রকৃতপক্ষে তার দুটি বাড়ি আছে।" সমাপ্ত [লিকাউল বাবিল মাফতুহ (২৫/১৬২)]

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, আপনি যদি মদিনাতে প্রবেশের আগে রোযা ভঙ্গ করে থাকেন তবে আপনি যা করেছেন তাতে কোন সমস্যা নেই। এক্ষেত্রে আপনাকে শুধু সেই দিনের রোযাটি কাযা করতে হবে। কারণ আপনি সফরের কারণে রোযা ভঙ্গ করেছেন। আর আপনি যদি মদিনাতে প্রবেশের পর রোযা ভঙ্গ করে থাকেন তবে আপনার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। আপনার জন্য উপদেশ হলো- আপনি শীতের মৌসুমে অথবা নাতিশীতোষ্ণ মৌসুমে দুই মাস একাধারে সিয়াম পালন করার চেষ্টা করবেন; যখন দিনের দৈর্ঘ্য ছোট হয় এবং কষ্ট কম হয়। অথবা অফিস থেকে প্রাপ্ত বাৎসরিক ছুটির দিনগুলোতে অথবা এ জাতীয় অন্য কোন সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আপনি রোযা রাখার চেষ্টা করবেন যাতে আপনার উপর যা ওয়াজিব হয়েছে তা পালন করতে পারেন।

আর যদি সত্যি সত্যিই আপনি সিয়াম পালনে অপারগ হয়ে থাকেন, তবে আপনার জন্য শুধু তখন ৬০ জন মিসকীন খাওয়ানো জায়েয হবে। এক্ষেত্রে আপনি ৬০ জনকে একসাথেও খাওয়াতে পারেন। অথবা বিভিন্ন সময়ে খাওয়ানোর মাধ্যমে ৬০ জনের সংখ্যা পূর্ণ করতে পারেন।

আপনার স্ত্রীর উপরও সিয়াম পালন আবশ্যিক। আর যদি তিনি তা না পারেন তবে ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো। আরো দেখুন(106532) নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রমজানে দিনের বেলায় সহবাসের কারণে ফরজ হওয়া কাফফারা অনাদায় রেখে যিনি মারা গেছেন, তার সন্তানদের কী করণীয়

প্রশ্ন

আমার বাবা মারা গেছেন (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন)। তিনি কিছু সম্পদ রেখে গেছেন। সে সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর মা আমাকে জানিয়েছেন যে, ২৫ কি ৩০ বছর আগে বাবা একবার রমজান মাসে তাঁর সাথে সহবাস করেছিলেন; যে ব্যাপারে আমার মা অসম্মত ছিলেন। আমার মা যতটুকু স্মরণ করতে পারছেন, সে সময় আমার মায়ের একটা অপারেশন করার পর তিনি হসপিটাল থেকে রিলিজ পেয়েছিলেন। তিনি আরো জানান যে, তিনি সে সময় বাবাকে বুঝিয়েছিলেন যে, এটি জায়েয নয় এবং এ ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞেস করা উচিত। কিন্তু বাবা মাকে বুঝিয়েছেন যে, তিনি তওবা করেছেন এবং আল্লাহ মহা-ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আমার মা আরো জানিয়েছেন যে, তিনি লজ্জার কারণে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে বা আমাদেরকে জানাতে পারেননি। এখন আমার মা চাচ্ছেন- তিনি দুই মাস রোযা পালন করে এর কাফফারা আদায় করবেন। আমি তাকে বলেছি যে, যা হয়েছে তাতে তাঁর কোন হাত ছিল না। তাই তাঁকে কিছু করতে হবে না। তাছাড়া তাঁর শারীরিক অবস্থাও এর জন্য প্রস্তুত নয়। এখন আমাদের মৃত পিতার ব্যাপারে আমাদের কী করণীয়? আর আমার মার উপর কী করণীয়?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।

এক :

যদি আপনার মা তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও রমজানে দিনের বেলায় তাঁর স্বামী কর্তৃক বাধ্য হয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন, তবে তার উপর কোন কাফফারা নেই। এর দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী :

"إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ (. رواه ابن ماجة () وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة (

" নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের অজ্ঞতাজনিত ভুল, স্মৃতিভ্রমজনিত ভুল ও জোরজবরদস্তির শিকার হয়ে কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। " [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে মাজাহ্ (২০৪৩)। শাইখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ ইবনে মাজাহ্' তে সহীহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

আর যদি এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর স্বামীর আনুগত্য করে থাকেন তবে তাকে কাযা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলোচনাগণকে রমজান মাসে দিনের বেলায় সহবাসকারীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা বলেন:

" এ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল একজন দাস মুক্ত করা। যদি তিনি তা করতে না পারেন, তবে এক নাগাড়ে দুই মাস রোযা পালন করতে হবে। আর যদি তাও না করতে পারেন তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ান। প্রতি মিসকীনের জন্য এক মুদ্দ (এক অঞ্জলি) গম এবং তাকে সেই দিনের পরিবর্তে কাযা রোযা আদায় করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি স্বামীর অনুগত হয়ে থাকে তবে স্ত্রীর হুকুমও স্বামীর হুকুমের ন্যায় (অর্থাৎ কাযা ও কাফফারা আদায় করতে হবে)। আর যদি স্ত্রীকে বাধ্য করা হয়ে থাকে তবে তাকে শুধু কাযা আদায় করতে হবে। " সমাণ্ড

[ফাতাওয়াল্ লাজনাৎ দায়িমা (১০/৩০২)]

অতএব, আপনার মায়ের উপর যদি কাফফারা ওয়াজিব হয়ে থাকে, তবে আপনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একাধারে দুই মাস সিয়াম পালনে সক্ষম নন তাহলে এক্ষেত্রে তার জন্য ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো যথেষ্ট হবে।

রমজানে দিনের বেলায় শারীরিক মিলনের কারণে ফরজ হওয়া কাফফারাসম্পর্কে জানতেদেখুন (1672)নং প্রশ্নের উত্তর।

দুই :

আপনার বাবার ক্ষেত্রে উপর ফরজ ছিল পরপর দুই মাস একাধারে রোযা পালন করা এবং শারীরিক মিলনের দ্বারা যেই দিন রোযা ভঙ্গ করেছেন, সেই দিনের কাযা রোযা আদায় করা। কিন্তুযেহেতু তিনি তা না করেই মারা গেছেন তাই যে কোন এক ব্যক্তি তাঁর পক্ষ থেকে এ সিয়ামগুলো পালন করবেন। সিয়াম পালনকারীকে একাধারে দুইমাস রোযা রাখতে হবে। এর দলীল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী:

(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواه مسلم ()

“ যে তার জিম্মায়রোযা রেখে মারা গেছে তার পক্ষ থেকে তার ওলি (আত্মীয়-পরিজন) রোযা পালন করবে।” [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম (১১৪৭)]

দুই মাস রোযা পালনকে একাধিক ব্যক্তির মাঝে ভাগ করা নেয়া জায়েয হবে না। বরং একজন ব্যক্তিকেই তা পালন করতে হবে। যাতে সাব্যস্ত হয় যে, তিনি একাধারে দুই মাস রোযা পালন করেছেন। অথবা তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাল্লাহু বলেছেন: “ যদি কোন মৃতব্যক্তির উপর একাধারে দুই মাসের রোযা বাকি থাকে, তবে তার ওয়ারিশদের মধ্য থেকে কেউ একজন নফল দায়িত্ব হিসেবে ঐ রোযাগুলো পালন করবে অথবা প্রতিদিনের রোযার বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে।” সমাণ্ডা’আশ-শারহুল মুমতি’ (৬/৪৫৩)

তিনি আরও বলেছেন:

“ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রমজানের ফরজ রোযা বা মান্নতের রোযা অথবা কাফফারার রোযা অনাদায় রেখে মারা গেছে তার আত্মীয়স্বজন চাইলে তার পক্ষ থেকে সে রোযাগুলো পালন করতে পারে।” [ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দার্ব (২০/১৯৯)]

শাইখ সা’দী রাহিমাল্লাহু বলেছেন:

“ যে ব্যক্তি রমজানের কাযা রোযা বাকি রেখে মারা গেল, সে সুস্থ হওয়ার পরও সেই রোযা পালন করেনি; সক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের রোযার বদলে একজন মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজিব। যে কয়দিন রোযা ভেঙ্গেছেন সম সংখ্যক দিন।”

ইবনে তাইমিয়াহ এর মতে:

“ তার পক্ষ থেকে রোযা পালন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং এটি একটি শক্তিশালী গ্রহণযোগ্য অভিমত।” সমাণ্ডা’ইরশাদু উলিল বাস্বা’ইরি ওয়াল আলবাব, পৃ: ৭৯]

মৃতব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ হতে এই খাদ্য খাওয়ানো ফরজ। আর কেউ যদি নফল দায়িত্ব হিসেবে এই খরচ বহন করে তাতেও কোন বাধা নেই।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে রোযা পালনে অক্ষম ব্যক্তির ফিদিয়ার পরিমাণ

প্রশ্ন :

আমার বাবা বার্ধক্য ও অসুস্থতার কারণে অক্ষম হয়ে গোটা রমজান মাসে রোযা রাখতে পারেননি। এই রোযাগুলোর কাযা পালন করার আগেই বাবা মারা গেছেন। দরিদ্রদেরকে অর্থ দানের মাধ্যমে আমরা তাঁর রোযার কাফফারা আদায় করেছি। পরবর্তীতে জানতে পারলাম যে, অর্থ দিয়ে কাফফারা দেয়ায় সেটা আদায় হবে না, খাদ্য দিয়ে কাফফারা আদায় করতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- আমরা কি তাহলে পুনরায় কাফফারা আদায় করব? এবং সেটার পরিমাণ কত?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

এক :

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাজহাবের জমহুর (অধিকাংশ) আলেমের মতানুযায়ী অর্থদানের মাধ্যমে রোযার ফিদিয়া আদায় যথেষ্ট নয় । বরং ওয়াজিব হল খাদ্যদানের মাধ্যমে রোযার ফিদিয়া আদায় করা । যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর যাদের জন্য তা (সিয়াম পালন) কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদিয়া তথা একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা ।" [সূরা বাক্বারাহ, ২ : ১৮৪] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ আয়াতের তাফসিরে বলেছেন: "আয়াতে উদ্দেশ্য হচ্ছে- অশীতিপর বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাযারা রোযা পালনে অক্ষম । তাঁরাউভয়ে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবেন ।" [এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি (৪৫০৫)]

ফাতাওয়াল লাজনাদা দায়িমা (১০/১৯৮) তে এসেছে: "যখন ডাক্তারগণ এই সিদ্ধান্ত দেন যে আক্রান্ত রোগের কারণে আপনি রোযা পালন করতে পারবেন না এবং এ রোগ থেকে সুস্থতাও আশা করা যায় না তখন আপনাকে বিগত ও আগত মাসগুলোর প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়াতে হবে, যার পরিমাণ হল দেশীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন খেজুর বা অন্য কোন খাদ্যের অর্ধ স্কা' । আপনি যদি ছুটে যাওয়া দিনগুলোর সম সংখ্যক দিন একজন মিসকীনকে রাতের বা দুপুরের খাবার খাইয়ে থাকেন তবে তা যথেষ্ট হবে । কিন্তু অর্থদানের মাধ্যমে ফিদিয়া দিলে সেটা যথেষ্ট হবে না ।" সমাপ্ত ।

অতএব বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি অথবা এমন রোগী যার সুস্থতা আশা করা যায় না তারা প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়াবেন । এর পরিমাণ স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন গম, খেজুর, অথবা চাল ইত্যাদি এর অর্ধ স্কা' । অর্ধ স্কা' প্রায় ১.৫ কিঃগ্রাঃ এর সমান । [দেখুন- ফাতাওয়া রমজান, পৃষ্ঠা- ৫৪৫]

তিনি চাইলে পুরো মাসের ফিদিয়া মাস শেষে একসাথেও আদায় করতে পারেন । যেমন ধরুন একমাসের ফিদিয়া হবে- ৪৫ কিলোগ্রাম চাল । তিনি যদি রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে মিসকীনদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ান সেটা আরো ভাল । কারণ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনটি করতেন ।

দুই: আপনারা যদি কোন আলেমের ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে অর্থের দ্বারা ফিদিয়া আদায় করে থাকেন তবে এ ফিদিয়া পুনরায় আদায় করতে হবে না । আর যদি আপনারা কাউকে জিজ্ঞেস না করে নিজেরাই তা করে থাকেন তবে সে ক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে পুনরায় খাদ্যের মাধ্যমে ফিদিয়া আদায় করা । এটি অধিকতর সতকর্তা অবলম্বিত ফতোয়া এবং আপনাদের বাবার দায়মুক্তির ক্ষেত্রে অধিক নিরাপদ । আল্লাহ আপনাদের বাবাকে রহম করুন ও তাঁকে ক্ষমা করে দিন ।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন ।

রোযার ফিদিয়া কি অমুসলিমকে খাওয়ানো যাবে?

প্রশ্ন :

একজন অসুস্থ ব্যক্তির উপর রোযার ফিদিয়া ওয়াজিব হয়েছে । এই ফিদিয়ার খাদ্য কি অমুসলিমদের প্রদান করা জায়েয হবে? কারণ সে ব্যক্তি একটি অমুসলিম দেশে বাস করে ।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

" যদি অমুসলিম দেশে বসবাসকারী কারো উপর রোযার ফিদিয়া ওয়াজিব হয় এবং সে দেশে ফিদিয়া গ্রহণের হকদার কোন মুসলিম পাওয়া যায় তিনি তাদেরকে ফিদিয়ার খাদ্য খাওয়াবেন । আর যদি সে দেশে এ রকম কাউকে পাওয়া না যায় তাহলে অন্য মুসলিম দেশে দান করবেন; যে দেশের মুসলমানদের এই খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে । আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন ।" সমাপ্ত । [মাজমূফাতাওয়াইবনে উছাইমীন (ইবনে উছাইমীনের ফতোয়া সংকলন), ফাতাওয়াস্ সিয়াম (১১২)]

তারাৱী নামায ও লাইলাতুল কদর

তারাৱীর নামায দীর্ঘ করা

প্রশ্ন

এক মসজিদের ইমাম তারাৱী পড়ান। তিনি প্রত্যেক রাকাতে এক পৃষ্ঠা তেলাওয়াত করেন। অর্থাৎ প্রায় ১৫ আয়াতের সমান। কিন্তু কিছু মানুষ বলে যে, তিনি দীর্ঘ তেলাওয়াত করেন। আবার কিছু মানুষ এর উল্টোটাও বলে। তারাৱীর নামাযের ক্ষেত্রে সুন্নত পদ্ধতি কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত উদ্ধৃতির মাধ্যমে দীর্ঘ করা বা না-করার কি কোন সীমারেখা জানা যায়?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

“সহিহ হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের নামায ১১ রাকাত পড়তেন— রমযানে এবং রমযান ছাড়া অন্য সময়ে। কিন্তু তিনি ক্বিরাত ও নামাযের রুকনগুলো দীর্ঘ করতেন। এমনকি একবার তিনি এক রাকাতে তারতীলের সাথে, ধীরস্থিরে পাঁচ পারার চেয়ে বেশি পড়েছেন।

আরও সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি মধ্য রাত থেকে কিংবা এর কিছু আগে থেকে কিংবা এর কিছু পর থেকে কিয়ামুল লাইল শুরু করতেন। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত নামায পড়া অব্যাহত রাখতেন। অর্থাৎ তিনি ১৩ রাকাত নামায প্রায় পাঁচ ঘন্টাব্যাপী পড়তেন। এর দাবী হচ্ছে তিনি ক্বিরাত ও রুকনগুলো দীর্ঘ করতেন।

আরও সাব্যস্ত হয়েছে যে, উমর (রাঃ) যখন তারাৱীর নামাযের জন্য সাহাবায়ে কেলামকে একত্রিত করলেন তখন তারা বিশ রাকাত নামায পড়তেন। তারা এক রাকাতে সূরা বাক্বারার প্রায় ৩০ আয়াত তেলাওয়াত করতেন। যা চার পৃষ্ঠা বা পাঁচ পৃষ্ঠার সমান। তারা গোটা সূরা বাক্বারা দিয়ে আট রাকাত নামায পড়তেন। যদি সূরা বাক্বারা দিয়ে ১২ রাকাত নামায পড়তেন তাহলে তারা মনে করতেন যে, কিছুটা কম পড়া হয়েছে।

তারাৱীর নামাযের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে সুন্নাহ। তাই কেউ যদি ক্বিরাত সংক্ষিপ্ত করে তাহলে তিনি রাকাতের সংখ্যা ৪১ রাকাত পর্যন্ত বাড়াবেন; যা কোন কোন ইমামের অভিমত। আর যদি ১১ রাকাত বা ১৩ রাকাত পড়তে পছন্দ করেন তাহলে ক্বিরাত ও রুকনে দীর্ঘ করবেন। তারাৱীর নামাযের নির্দিষ্ট কোন রাকাত সংখ্যা নাই। বরঞ্চ এতটুকু সময় নামায পড়া উচিত যতটুকু সময়ে ধীরস্থিরে নামায আদায় করা যায়। যা এক ঘন্টা বা তদ্রূপ সময়ের চেয়ে কম হওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি মনে করে যে, এটা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে তিনি উদ্ধৃতিগুলোর বরখেলাফ করছেন। তার দিকে ঞ্ক্ষিপ্ত করার দরকার নেই।” [সমাণ্ড]

ফাযিলাতুশ শাইখ ইবনে জিবরীন

ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/১৫৭ ও ১৫৮)

বাসা থেকে ইমামের সাথে ইকতিদা করার হুকুম

প্রশ্ন

বাসা থেকে ইমামের পিছনে নামায পড়ার হুকুম কি? মসজিদের মিনারা বাসার ছাদের পার্শ্ববর্তী।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বাসা থেকে মসজিদের ইমামের পিছনে নামায পড়া শুদ্ধ নয়।

মসজিদের ইমামের সাথে বাসা থেকে নামায পড়া শুদ্ধ হবে না; যদি না মুক্তাদি মসজিদের ভেতরে না থাকে কিংবা মসজিদের বাহিরে থাকলেও কাতার সংযুক্ত থাকে। যেমন যদি মসজিদ মুসল্লিতে ভরে যায়; তখন কেউ কেউ মসজিদের বাহিরে নামায পড়ে; তাহলে তাদের নামায সহিহ হবে।

পক্ষান্তরে মসজিদের ভেতরে জায়গা থাকা সত্ত্বেও মসজিদের বাহিরে নামায পড়লে সেই নামায সহিহ হবে না।

স্থায়ী কমিটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তি নিজের বাসায় জামাত করে নামায পড়েছে মসজিদের মাইক থেকে সাউন্ড শুনার মাধ্যমে। ইমাম ও মুক্তাদির মাঝে কোন সংযোগ ছিল না; যেমনটি মওসুমের সময় মক্কা ও মদিনাতে ঘটে থাকে?

জবাবে তারা বলেন:

“নামায সঠিক হবে না। এটি শাফেয়ি মাযহাবের অভিমত এবং ইমাম আহমাদও এটি বলেছেন। তবে যদি কাতারগুলো তার বাসার সাথে সংযোগ হয়ে যায় এবং ইমামকে দেখা ও ইমামের কথা শুনার মাধ্যমে তিনি ইমামের ইকতিদা করতে পারেন; তাহলে সঠিক হবে। কেননা মুসলিমের ওপর ওয়াজিব হলো আল্লাহর ঘরসমূহে অন্য মুসলিম ভাইদের সাথে জামাতের সাথে নামায আদায় করা। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি আযান শুনেও (মসজিদে) আসেনি; তার কোন নামায নাই। তবে কোন ওজর থাকলে ভিন্ন কথা।” [সুনানে ইবনে মাজাহ ও মুস্তাদরাকে হাকেম] হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন: হাদিসটির সনদ ইমাম মুসলিমের শর্তে উন্নীত। এবং অন্ধ লোকটি যখন নিজ ঘরে নামায পড়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রার্থনা করলেন তখন তিনি বললেন: “তুমি কি নামাযের আযান শুনে? লোকটি বলল: হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: তাহলে সাড়া দাও” [সহিহ মুসলিম] আল্লাহই তাওফিকের মালিক।

ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমা (৮/৩২)

দোয়ায় কুনুত পড়া কি ওয়াজিব? মুখস্থ না থাকলে কি পড়বে

প্রশ্ন

বিভিন্ন দোয়া মুখস্থ করতে আমার খুব কষ্ট হয়; যেমন বিতিরের নামাযের দোয়ায় কুনুত। এ কারণে আমি এ দোয়ার জায়গায় একটি সূরা পড়তাম। যখন আমি জানতে পারলাম যে, এ দোয়া পড়া ফরজ; তখন দোয়াটি মুখস্থ করার চেষ্টা করতে থাকি। আমি নামাযের মধ্যে একটি বই থেকে দেখে দেখে দোয়াটি পড়ি। বইটিকে আমার পাশে একটি টেবিলের উপরে রাখি। আমি কিবলামুখী থেকেই বই থেকে দোয়াটি পড়ি। আমার এ আমলটি কি জায়েয?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

১. বিতিরের নামাযে কোন একটি কাগজ কিংবা পুস্তিকা থেকে দেখে দেখে দোয়ায় কুনুত পড়তে কোন অসুবিধা নেই; যাতে করে আপনি দোয়াটি মুখস্থ করে নিতে পারেন। মুখস্থ হয়ে গেলে আর বই দেখা লাগবে না; আপনি মুখস্থ থেকে দোয়া করতে পারবেন; যেমন যে ব্যক্তির কুরআনের বেশি কিছু মুখস্থ নেই নফল নামাযে তার জন্য কুরআন শরিফ দেখে পড়া জায়েয আছে।

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: তারাবীর নামাযে কুরআন শরিফ দেখে পড়ার হুকুম কি? এবং এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর দলিল কি?

উত্তরে তিনি বলেন: রমযানে কিয়ামুল লাইলের নামাযে কুরআন শরিফ দেখে পড়তে কোন বাধা নেই। কারণ এতে করে মুসল্লিদেরকে সম্পূর্ণ কুরআন শরিফ শুনানো যেতে পারে। এবং যেহেতু কুরআন-সুন্নাহর দলিলের মাধ্যমে নামাযে কুরআন তেলাওয়াতের বিধান সাব্যস্ত হয়েছে; যা মুসহাফ (কুরআনগ্রন্থ) দেখে পড়া ও মুখস্থ থেকে পড়া উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আয়েশা (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি তাঁর আযাদকৃত দাস যাকওয়ানকে কিয়ামে রমযানে তাঁর ইমামতি করার নির্দেশ দিতেন এবং সে মুসহাফ দেখে দেখে কুরআন পড়ত। [ইমাম বুখারি তাঁর সহিহ গ্রন্থে এ উক্তিটি নিশ্চয়তাজ্জাপক ভাষায় সংকলন করেছেন]

[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/১৫৫)]

২. বিতিরের নামাযে দোয়ায় কুনুত হুবহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত শব্দে হওয়া ওয়াজিব নয়। বরং মুসল্লি অন্য কোন দোয়াও করতে পারেন এবং হাদিসের শব্দের বাইরে কিছু বাড়তেও পারেন। এমনকি যদি কুরআনের যেসব আয়াতে দোয়া আছে এমন কিছু আয়াত পড়েন সেটাও জায়েয আছে। ইমাম নববী বলেন: জেনে রাখুন, অগ্রগণ্য মাযহাব মতে, কুনুতের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দোয়া নেই। তাই যে কোন দোয়া পড়লে এর দ্বারা কুনুত হয়ে যাবে; এমনকি দোয়া সম্বলিত এক বা একাধিক কুরআনের আয়াত পড়লেও কুনুতের উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে যাবে। তবে, হাদিসে যে দোয়া এসেছে সেটা পড়া উত্তম [ইমাম নববীর 'আল-আযকার, পৃষ্ঠা-৫০]

৩. প্রশ্নকারী ভাই যা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দোয়ায় কুনুতের পরিবর্তে কুরআন পড়তেন নিঃসন্দেহে এটা করা ঠিক হয়নি। কারণ কুনুতের উদ্দেশ্য হচ্ছে- দোয়া করা। তাই যেসব আয়াতে দোয়া আছে সেসব আয়াত পড়া ও সেগুলো দিয়ে কুনুত করা জায়েয হবে। যেমন ধরুন আল্লাহ তাআলার বাণী:

[آل عمران:] رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

(অনুবাদ:হে আমাদের রব! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের অন্তরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা।) [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮]

৪. প্রশ্নকারী ভাই উল্লেখ করেছেন যে, দোয়ায় কুনুত পড়া ফরয; এ কথা সহিহ নয়। বরং দোয়ায় কুনুত পড়া সুন্নত। তাই মুসল্লি যদি দোয়ায় কুনুত নাও পড়েন নামায সহিহ হবে।

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, রমযান মাসে বিতিরের নামাযে দোয়ায় কুনুত পড়ার হুকুম কি? দোয়ায় কুনুত বাদ দেয়া কি জায়েয?

জবাবে তিনি বলেন: বিতির নামাযে দোয়ায় কুনুত পড়া সুন্নত। যদি কখনও কখনও বাদ দেয় এতে কোন অসুবিধা নেই।

তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করা হয়: যে ব্যক্তি প্রতি রাতে বিতিরের নামাযে দোয়ায় কুনুত পড়ে; এ আমল কি সলফে সালেহীন থেকে বর্ণিত আছে?

উত্তরে তিনি বলেন: এতে কোন অসুবিধা নেই। বরং এটি পালন করা সুন্নত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুসাইন বিন আলী (রাঃ) কে বিতিরের নামাযের 'দোয়ায় কুনুত' শিখাতেন। তিনি দোয়ায় কুনুত কখনও কখনও বাদ দেয়া কিংবা নিয়মিত পড়া কোন নির্দেশ দেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, উভয়টি করা জায়েয। উবাই বিন কাব (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি যখন মসজিদে নববীতে সাহাবীদের ইমামতি করতেন তখন তিনি কোন কোন রাতে দোয়ায় কুনুত পড়তেন না; সম্ভবত তিনি এটা এ জন্য করতেন যাতে করে মানুষ জানতে পারে যে, দোয়ায় কুনুত পড়া ওয়াজিব নয়।

আল্লাহই তাওফিকদাতা।

[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/১৫৯)]

আমরা লাইলাতুল কদরে কী কী ইবাদত পালন করতে পারি এবং সেটি কোন রাত

প্রশ্ন

লাইলাতুল কদর কিভাবে পালন করা উচিত? সেটা কি নামায, কুরআন তেলাওয়াত, সিরাত আলোচনা, ওয়াজ নসিহত, দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য এবং এর জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে উদযাপন করতে হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমজানের শেষ দশকে নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মধ্যে এত বেশী সময় দিতেন যা অন্য সময়ে দিতেন না। আয়েশা (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, রমজানের শেষ দশরাত্রি শুরু হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত জেগে ইবাদত করতেন তাঁর পরিবারবর্গকে জাগিয়ে তুলতেন এবং স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকতেন। ইমাম আহমাদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে: **“তিনি রমজানের শেষ দশকে এত বেশী ইবাদত করতেন যা অন্য সময়ে করতেন না।”**

দুই:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের সাথে ও সওয়াব পাওয়ার আশায় রাত জেগে নামায আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে লাইলাতুল ক্বদরে (ভাগ্য রজনীতে) নামায আদায় করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”**[সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম] এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ভাগ্য রজনীতে কিয়ামুল লাইল (রাত্রীকালীন নামায) আদায় করা শরয়ি বিধান।

তিন:

লাইলাতুল ক্বদরে (ভাগ্য রজনীতে) পঠিতব্য সবচেয়ে ভালো দোয়া হচ্ছে- যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা (রাঃ) কে শিক্ষা দিয়েছেন। যেটি তিরমিযি আয়েশা (রাঃ) থেকে সংকলন করেছেন এবং সহীহ আখ্যায়িত করেছেন: তিনি বলেন: আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি জানতে পারি কোন রাতটি লাইলাতুল ক্বদর (ভাগ্য রজনী) তবে সে রাতে আমি কী পড়ব? তিনি বললেন, তুমি বলবে:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُورٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

“আল্লাহুম্মা ইম্মাকা ‘আফুউউন তুহিবুবল ‘আফওয়া ফা ‘ফুউ ‘আন্নী (অর্থ: হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে আপনি ভালবাসেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন।)

চার:

রমজানের বিশেষ কোন একটি রাত্রিকে ভাগ্য রজনী হিসেবে সুনির্দিষ্ট করতে হলে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দলীলের প্রয়োজন। কিন্তু শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে ভাগ্য রজনী হওয়া অন্য রাতগুলোতে ভাগ্য রজনী হওয়ার চেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় এবং রমজানের সাতাশতম রাত ভাগ্য রজনী হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলো আমরা যা উল্লেখ করেছি সেটাই প্রমাণ করে।

পাঁচ:

কস্মিনকালেও বিদ'আত (দ্বীনের মধ্যে নতুন প্রবর্তিত বিষয়) করা জায়েয নেই। রমজানের মধ্যেও না, রমজানের বাইরেও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: **“যে ব্যক্তি আমাদের এই শরিয়তে এমন কিছু প্রবর্তন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।”** অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, **“যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।”**

রমজানের নির্দিষ্ট কিছু রাতে অনুষ্ঠান উদযাপনের কোন ভিত্তি আমাদের জানা নেই। উত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে- বিদ'আত (নতুন প্রবর্তিত বিষয়সমূহ)।

আল্লাহই তাওফিকদাতা।

আগে উমরার তাওয়াফ করবে; নাকি তারাবী পড়বে?

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি এশার আযানের কয়েক মিনিট আগে উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কার হারামে প্রবেশ করেছে সে কি জামাতের সাথে তারাবীর নামায আদায় করার পর উমরা পালন করতে পারবে; যাতে করে সে ইমামের সাথে কিয়ামুল লাইল আদায় করার সওয়াব থেকে বঞ্চিত না হয়; যতক্ষণ না ইমাম সমাপ্ত করে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ হচ্ছে সবকিছুর আগে তাওয়াফ শুরু করা; যেমনটি দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেছেন ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর 'মানসাক'-এ । তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করার পর তাওয়াফ দিয়ে শুরু করেন । তাওয়াফের আগে তিনি তাহিয়াতুল মসজিদও পড়েননি । বরং মসজিদে হারামের তাহিয়া হচ্ছে তাওয়াফ ।

উরওয়া (রহঃ) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আগমন করলেন তখন প্রথম তিনি যা করলেন সেটা হল ওয়ু করে তাওয়াফ করা ।"[সহিহ বুখারী (১৬১৪) ও সহিহ মুসলিম (১২৩৫)]

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

এই হাদিসে দলিল রয়েছে যে, আগন্তকের জন্য তাওয়াফ দিয়ে শুরু করা মুস্তাহাব । কেননা সেটাই হচ্ছে মসজিদে হারামের তাহিয়া বা সম্ভাষণ । কোন কোন শাফেয়ি আলেম ও তার সাথে একমত পোষণকারীগণ এই হুকুম থেকে সুন্দরী ও সম্মান্ত নারীকে বাদ রেখেছেন, যে নারী পুরুষের মাঝে বের হয় না । এমন নারী যদি দিনের বেলায় আগমন করেন তাহলে তার জন্য বিলম্বে রাতে তাওয়াফ করা মুস্তাহাব ।

অনুরূপভাবে কেউ যদি ফরয নামায কিংবা ফরয জামাত কিংবা মুয়াক্কাদা জামাত কিংবা কাযা নামাযের জামাত ছুটে যাওয়ার আশংকা করেন তবে এ সব আমলকে তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ)-এর উপর প্রাধান্য দিবে ।"[ফাতহুল বারী (৩/৪৭৯) থেকে সমাপ্ত]

এর থেকে জানা যায় যে, জামাতের সাথে নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা হলেও সেটাকে তাওয়াফের উপরে প্রাধান্য দেওয়া হবে ।

ইবনে কুদামা বলেন:

"মসজিদে প্রবেশ করার পর যদি কোন ফরয নামাযের কথা কিংবা কাযা নামাযের কথা স্মরণে আসে কিংবা ফরয নামাযের ইকামত হয়ে যায় তাহলে তাওয়াফের উপর এগুলোকে অগ্রাধিকার দিবে । যেহেতু নামায হচ্ছে ফরয; আর তাওয়াফ হচ্ছে তাহিয়া । এবং যেহেতু তাওয়াফের মাঝে যদি ইকামত হয়ে যায় তাহলে নামাযের জন্য তাওয়াফ কর্তন করতে হয় । তাই নামায দিয়ে শুরু করা যুক্তিযুক্ত । আর যদি ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামায কিংবা বিতির নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা করে কিংবা লাশ হাযির থাকে সেক্ষেত্রে এ আমলগুলোকে প্রাধান্য দিবে । যেহেতু এগুলো এমন সুন্নত আমল যেগুলো ছুটে যাবে; কিন্তু তাওয়াফ তো আর ছুটে যাবে না ।"[আল-মুগনী (৩/৩৩৭) সমাপ্ত]

এ কারণ দর্শানো থেকে গ্রহণ করা যায় যে, ইমামের সাথে তারাবীর নামায পড়াকে তাওয়াফের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে । যেহেতু সেটা এমন সুন্নত যা ছুটে যাওয়ার ভয় আছে ।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: হজ্জকারী ও উমরাকারীর উপর নামাযের জন্য তাওয়াফ বা সাযী স্থগিত করা কি আবশ্যিক?

জবাবে তিনি বলেন: "যদি ফরয নামায হয় তাহলে নামায পড়ার জন্য তাওয়াফ বা সাযী স্থগিত করা আবশ্যিক । কেননা জামাতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজিব । এর জন্য সাযী স্থগিত করার রুখসত বা অবকাশ দেওয়া হয়েছে । তাই তার সাযী বা তাওয়াফ থেকে বের হওয়াটা হবে বৈধ বের হওয়া । আর জামাতে প্রবেশ করাটা হবে ওয়াজিব প্রবেশকরণ ।

পক্ষান্তরে যদি নফল নামায হয়; যেমন রমযানের তারাবীর নামায; তাহলে সেজন্য সায়ী ও তাওয়াফ স্থগিত করবে না।

তবে, উত্তম হচ্ছে এভাবে চেষ্টা করা যাতে করে তাওয়াফ তারাবীর পরে পড়ে; যেন জামাতের সাথে তারাবীর নামায আদায় করার ফযিলত থেকে নিজেকে বঞ্চিত না করে।" [মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলিস শাইখ ইবনে উছাইমীন (২২/৩৪৯-৩৫০)]

পূর্বোল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে:

যে ব্যক্তি উমরা করার উদ্দেশ্যে এশার আযানের কয়েক মিনিট আগে মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছে সে ব্যক্তি ইমামের সাথে তারাবীর নামায আদায় করে তারপর উমরা আদায় করবেন; যাতে করে তিনি মর্যাদাপূর্ণ উভয় আমল পালন করতে পারেন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

দেশভেদে লাইলাতুল রুদর কি একাধিক হতে পারে?

প্রশ্ন

লাইলাতুল রুদর কি প্রত্যেক মুসলিমের জন্য একই রাত্রি? নাকি দেশভেদে এটি আলাদা আলাদা হতে পারে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

লাইলাতুল রুদর একটি রাত্রি। যদিও দেশভেদে এটি প্রবেশের সময় ফারাক হতে পারে। যেমন আরব দেশগুলোতে এটি প্রবেশ করবে তাদের দেশের দিনের বেলায় সূর্য ডোবার মাধ্যমে। আফ্রিকার দেশ ও অন্যান্য দেশগুলোতে প্রবেশ করবে তাদের দেশের দিনের বেলায় সূর্য ডোবার মাধ্যমে। তাই যেই দেশে সূর্য ডুবেছে সেই দেশে লাইলাতুল রুদর প্রবেশ করেছে; এমনকি সেটা যদি ২০ ঘন্টার চেয়ে বেশি সময় লাগে তবুও। এ সকল ব্যক্তিদের জন্য তাদের রাতকে হিসাব করা হবে। ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য তাদের রাতকে হিসাব কর হবে। এতেও কোন বাধা নেই যে, ফেরেশতারা এদের নিকটেও অবতীর্ণ হবে এবং ওদের নিকটেও অবতীর্ণ হবে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

যে ব্যক্তি তারাবীর নামায শুরু করেছেন তার উপর সম্পূর্ণ তারাবী নামায পড়া কি আবশ্যিক?

প্রশ্ন

কোন মুসলিম যদি তারাবীর নামায পড়া শুরু করেন তাহলে সম্পূর্ণ তারাবীর নামায পড়া কি তার উপর আবশ্যিক? নাকি যতটুকু ইচ্ছা পড়ে চলে যেতে পারেন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নিঃসন্দেহে তারাবীর নামায সুন্নত এবং সেটি নফল। তারাবীর নামাযই হচ্ছে— রমযানের কিয়ামুল লাইল। অনুরূপভাবে সালাতুল লাইল (তাহাজ্জুদের নামায), সালাতুদ দোহা (চাশতের নামায), ফরয নামাযগুলোর শেষের সুন্নত নামায এগুলো সবই সুন্নত ও নফল নামায। যে নামাযগুলো ব্যক্তি চাইলে পড়তে পারেন; না চাইলে বাদ দিতে পারেন। তবে পড়াটা উত্তম।

তাই কেউ যদি ইমামের সাথে তারাবী পড়া শুরু করে এবং ইমাম সমাপ্ত করার পূর্বে সে ব্যক্তি চলে যেতে চায় এতে কোন অসুবিধা নাই। তবে ইমাম সমাপ্ত করার আগ পর্যন্ত ইমামের সাথে থাকাটাই উত্তম। ইমামের সাথে থাকলে তার জন্য গোটা রাত নামায পড়ার সওয়াব লেখা হবে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে কিয়াম পালন করবে যতক্ষণ না ইমাম নামায সমাপ্ত করেন আল্লাহ্ তার জন্য গোটা রাত নামায পড়ার সওয়াব লিখে দিবেন।" তাই কেউ যদি ইমাম সম্পূর্ণ নামায শেষ করা পর্যন্ত ইমামের সাথে অবস্থান করে সে গোটা রাত কিয়ামুল লাইল পালন করার সওয়াব পাবে। আর যদি কয়েক রাকাত পড়ার পর চলে যায় এতেও কোন অসুবিধা নাই, কোন গুনাহ নাই। যেহেতু এটি নফল নামায।

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহঃ)

ফাতাওয়া নুরন্ন আলাদ দারব (২/৯০১)

তারাবীর নামায কি একাকী পড়বে; নাকি জামাতের সাথে? রমযান মাসে কুরআন খতম করা কি বিদাত?

প্রশ্ন

আমি শুনেছি যে, তারাবীর নামায একাকী পড়াই মুস্তাহাব; যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী পড়েছেন; কেবল ৩ বার ছাড়া। এ কথা কি সঠিক? আমি আরও শুনেছি যে, রমযান মাসে তারাবীর নামাযে গোটা কুরআন খতম করা বিদাত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করেননি। এ কথাও কি সঠিক?

উত্তর

সংশ্লিষ্ট

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রমযান মাসে তারাবীর নামায জামাতের সাথে আদায় করা শরিয়তসম্মত। একাকী পড়াও শরিয়তসম্মত। তবে একাকী পড়ার চেয়ে জামাতের সাথে পড়া উত্তম। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে কয়েক রাতে জামাতের সাথে পড়েছেন।

সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে কয়েক রাতে নামায পড়েছেন। তৃতীয় রাতে কিংবা চতুর্থ রাতে তিনি আর বের হননি। ভোরবেলায় তিনি বলেন: "অন্য কোন কারণ আমাকে বের হতে বাধা দেয়নি; তবে আমি তোমাদের উপর ফরয করে দেয়ার আশংকা করছি।" [সহিহ বুখারী (১১২৯)] সহিহ মুসলিমের (৭৬১) ভাষ্যে এসেছে "কিন্তু আমি আশংকা করেছি তোমাদের উপর কিয়ামুল লাইল ফরয করে দেয়ার। এমনটি হলে পরে তোমরা তা আদায় করতে পারবে না।"

তাই তারাবীর নামায জামাতের সাথে আদায় করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও উল্লেখ করেছেন যে, জামাতের সাথে নামায পড়া অব্যাহত না রাখার কারণ হল: ফরয করে দেয়ার আশংকা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে এ আশংকা দূর হয়ে গেছে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে ওহী আসা বন্ধ হয়ে যায়। তাই ফরয হওয়ার আশংকা নাই। যেহেতু ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে কারণটি দূরে হয়ে গেছে; কারণটি হল ফরয হওয়ার ভয়; সেহেতু জামাতের সাথে তারাবী আদায় করার সুন্নতটি বলবৎ হবে। [শাইখ উছাইমীন রচিত 'আল-শারহুল মুমতি' (৪/৭৮)]

ইমাম ইবনে আব্দুল বারর (রহঃ) বলেন:

"এ হাদিসে রয়েছে যে: রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল পালন করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ, মুস্তাহাব ও কাম্য। উমর (রাঃ) নতুন কোন সুন্নত জারী করেননি; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ভালবেসেছেন ও পছন্দ করেছেন সেটাকে পুনর্জীবিত করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরবচ্ছিন্নভাবে সেটা পালন করে যাননি তাঁর উম্মতের উপর ফরয করে দেয়ার আশংকা থেকে। তিনি ছিলেন মুমিনদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু। উমর (রাঃ) যেহেতু এ কারণটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জেনেছেন এবং তিনি জানেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর ফরয ইবাদত বাড়ান বা কমার সুযোগ নাই: তাই তিনি এ সুন্নতটি বাস্তবায়ন করা শুরু করলেন, এটিকে পুনর্জীবিত করলেন এবং মানুষকেও নির্দেশ দিলেন। এটা ছিল হিজরি ১৪ সালে। এটি এমন একটি আমল যা আল্লাহ তার জন্য মজুত করে রেখেছিলেন এবং এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।" [আত-তামহীদ (৮/১০৮, ১০৯)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কেরাম এ নামাযটি দলবদ্ধভাবে ও বিচ্ছিন্নভাবে আদায় করেছেন। এক পর্যায়ে উমর (রাঃ) তাদেরকে এক ইমামের পেছনে একত্রিত করেন।

আব্দুর রহমান বিন আব্দ আল-ক্বারী বলেন: "একবার রমযানের একরাত্রিতে আমি উমর (রাঃ) এর সঙ্গে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। এসে দেখলাম লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করছে। কেউ একাকী নামায পড়ছে। আবার কেউ একজন নামায পড়ছেন; আর তার পিছনে একদল লোক নামায পড়ছে। তখন উমর (রাঃ) বললেন: আমি মনে করি আমি যদি এদের সবাইকে একজন ক্বারীর পেছনে একত্রিত করি সেটা উত্তম। এরপর তিনি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সবাইকে উবাই বিন কা'ব (রাঃ) এর পেছনে একত্রিত করলেন। এরপর অন্য এক রাতে আমি তাঁর সাথে বের হলাম। গিয়ে দেখলাম লোকেরা তাদের ক্বারীর পেছনে নামায পড়ছে। তখন উমর (রাঃ) বলেন: এটি কতই না ভাল বিদাত! তারা যে সময়টায় ঘুমিয়ে থাকে সে সময়টা এখন যে সময়ে নামায পড়ছে সে সময়ের চেয়ে উত্তম (তিনি শেষ রাতের কথা বুঝাতে চেয়েছেন)। লোকেরা প্রথম রাত্রিতে নামায পড়ত।" [সহিহ বুখারী (১৯০৬)]

উমর (রাঃ) এর এ উক্তি "এটি কতইনা ভাল বিদাত" দিয়ে যারা বিদাত জায়েয হওয়ার পক্ষে দলিল দেন তাদের প্রত্যুত্তরে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: "রমযান মাসে তারাবীর নামায পড়ার সুন্নত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাঁর উম্মতের জন্য জারী করেছেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে কয়েক রাত তারাবীর নামায আদায় করেছেন। তাঁর যামানায় লোকেরা দলবদ্ধভাবে ও বিচ্ছিন্নভাবে তারাবীর নামায আদায় করত। কিন্তু তারা এক জামাতে তারাবী আদায় করাটা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যায়নি; যাতে করে তাদের উপর ফরয করে দেয়া না হয়। অতপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেলেন শরিয়ত (ইসলামী বিধি-বিধান) স্থিতিশীল হয়ে গেল। তখন উমর (রাঃ) তাদেরকে এক ইমামের পেছনে একত্রিত করলেন। তিনি ছিলেন উবাই বিন কাব (রাঃ)। উমর (রাঃ) এর নির্দেশে উবাই (রাঃ) মানুষকে তারাবী পড়ার জন্য একত্রিত করলেন। উমর (রাঃ) হচ্ছেন খোলাফায়ে রাশেদীনের একজন। যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে: "তোমাদের উপর আবশ্যিক আমার সুন্নত (আদর্শ) অনুসরণ করা এবং আমার পরবর্তীতে সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন এর সুন্নত (আদর্শ) অনুসরণ করা। তোমরা মাড়ির দাঁত দিয়ে সুন্নতকে আঁকড়ে ধর।" যেহেতু মাড়ির দাঁত অধিক শক্তিশালী। উমর (রাঃ) যা করেছেন সেটা সুন্নত; বিদাত নয়। কিন্তু তিনি যে বলেছেন: "এটি কতইনা ভাল বিদাত" যেহেতু আভিধানিক অর্থে এটি বিদাত। যেহেতু তারা এমন কিছু করছেন যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় করেনি। অর্থাৎ এ ধরণের ইবাদতের জন্য জমায়েত হওয়া। এটি ইসলামী শরিয়তের একটি সুন্নত।" [মাজমুউল ফাতাওয়া (২২/২৩৪, ২৩৫)]

আরও জানতে দেখুন: [45781](#) নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

রমযান মাসে নামাযে কিংবা নামাযের বাইরে কুরআন খতম করা প্রশংসনীয়। প্রতি রমযানে জিব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গোটা কুরআন অধ্যয়ন করতেন। যে বছর তিনি মারা যান সে বছর দুইবার অধ্যয়ন করেন।

ইতিপূর্বে ৬৬৫০৪ নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

রমযান মাসের কিয়ামুল লাইলের ফযিলত পাওয়ার জন্য রমযানের সব রাতে কিয়ামুল লাইল আদায় করা কি শর্ত?

প্রশ্ন

আমার কাছে রমযানের কিয়ামুল লাইল সম্পর্কে একটি প্রশ্ন আছে। "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে রমযান মাসে কিয়াম পালন করবে..." এ হাদিসের অর্থ কি গোটা রমযান মাসের প্রতি রাতে কিয়ামুল লাইল আদায় করতে হবে? যদি ত্রিশরাতের মধ্যে একটি রাত কেউ বাদ দেয় হাদিসে বর্ণিত পুরস্কার ও ক্ষমা কি সে পাবে না? কিয়ামুল লাইল এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা কোনটি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

এক:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল আদায় করবে তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" [সহিহ বুখারী (২০০৯) ও সহিহ মুসলিম (৭৫৯)]

রমযান মাস ব্যবহার করায় কথাটি রমযানের সকল রাতকে অন্তর্ভুক্ত করছে। তাই হাদিসের প্রত্যক্ষ মর্ম হচ্ছে— মাসের সকল রাতে কিয়াম পালন করার সাথে উল্লেখিত সওয়াবটি সম্পৃক্ত। আস-সানআনী (রহঃ) বলেন: "হাদিসের এমন একটি অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি মাসের সকল রাতে কিয়ামুল লাইল আদায় করাকে উদ্দেশ্য করেছেন। যে ব্যক্তি কিছু রাত কিয়ামুল লাইল পালন করবে সে ব্যক্তির জন্য উল্লেখিত ক্ষমা হাছিল হবে না। এটাই হাদিসের প্রত্যক্ষ অর্থ।" [সুবুলুস সালাম (৪/১৮২) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন: "যে ব্যক্তি রমযানে কিয়াম আদায় করবে" অর্থাৎ রমযান মাসে। এ কথাটি গোটা মাসকে শামিল করছে; মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।" [শারহ বুলুগুল মারাম (৩/২৯০)]

যে ব্যক্তি মাসের কিছু রাতে বিশেষ কোন ওজরের কারণে কিয়াম পালন করতে পারেনি তার ব্যাপারে আশা করা যায় যে, হাদিসে উল্লেখিত সওয়াব তার জন্যে অর্জিত হবে।

আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যদি কোন বান্দা অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে তার জন্য সে মুকীম (গৃহ অবস্থানকারী) থাকা অবস্থায় কিংবা সুস্থ থাকাবস্থায় যে আমলগুলো করত সেগুলো লিখে দেয়া হবে।" [সহিহ বুখারী (২৯৯৬)]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "কোন ব্যক্তির যদি রাতের নামাযের অভ্যাস থাকে; কিন্তু কোনদিন যদি তাকে ঘুমে কাবু করে ফেলে; তাহলে তার জন্য নামায পড়ার সওয়াব লিখে দেয়া হবে। আর তার ঘুম হবে তার জন্য সদকা।" [সুনানে আবু দাউদ (১৩১৪); আলবানী ইরওয়াউল গালিল গ্রন্থে (২/২০৪) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

আর যদি অলসতা করে কিছু রাতের নামায না পড়ে তাহলে হাদিসের প্রত্যক্ষ মর্ম হচ্ছে সে ব্যক্তি উল্লেখিত সওয়াব পাবে না।

দুই:

রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা: শরিয়ত কিয়ামুল লাইলের নির্দিষ্ট কোন রাকাত সংখ্যা উল্লেখ করেনি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: "রমযানের কিয়াম: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন সংখ্যা নির্ধারণ করেননি..."।

যে ব্যক্তি মনে করছে যে, রমযান মাসে কিয়ামুল লাইলের নির্ধারিত সংখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত; এ সংখ্যার মধ্যে বাড়ানো বা কমানো যাবে না— সে ব্যক্তি ভুলের মধ্যে আছেন...। কখনও কখনও কেউ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলে তার ক্ষেত্রে ইবাদত দীর্ঘ করা উত্তম। আবার কখনও কখনও কেউ যদি কর্মচঞ্চলতা না পায় তখন তার ক্ষেত্রে ইবাদতকে সংক্ষিপ্ত করা উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি যদি কিয়াম (দাঁড়ানো) কে দীর্ঘ করতেন তাহলে রুকু-সেজদাও দীর্ঘ করতেন। আর যদি কিয়াম (দাঁড়ানো) কে সংক্ষিপ্ত করতেন তখন রুকু-সেজদাও সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি ফরয নামায, কিয়ামুল লাইল কিংবা কুসুফ (সূর্য গ্রহণ)-এর নামায ইত্যাদি সবক্ষেত্রে এভাবে করতেন।" [মাজমুউল ফাতাওয়া (২২/২৭২-২৭৩)]

সারকথা: কিয়ামুল লাইলের সর্বোচ্চ কোন সীমারেখা নাই। একজন মুসলিম যত রাকাত ইচ্ছা পড়বেন।

পক্ষান্তরে, একজন মুসলিমের কিয়ামুল লাইলের সবনিম্ন সীমা: এক রাকাত বিতিরের নামায।

এর মাধ্যমে রমযানের কিয়ামুল লাইল পড়া অর্জিত হওয়া জানা যায় সুস্পষ্ট কিয়ামুলের ভিত্তিতে। যেহেতু শরিয়ত রমযান মাসে বিশেষ কিয়ামুল লাইলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে যেটি বছরের অন্য রাত্রিগুলোর কিয়ামুল লাইলের চেয়ে তাগিদপূর্ণ। এটাই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সলফে সালেহীনের অবস্থা। এমনকি এক পর্যায়ে নির্ধারিত ইমামের পেছনে মসজিদে কিয়ামুল লাইল আদায় করার বিধান আসে; অন্য নামাযের ক্ষেত্রে যে বিধান আসেনি। ইমাম সম্পূর্ণ নামায সমাপ্ত করা পর্যন্ত ধৈর্য ধরার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় যদি কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে ইমাম নামায শেষ করা পর্যন্ত নামায পড়ে তাহলে তার জন্য গোটা রাত কিয়ামুল লাইল আদায় করার সওয়াব হিসাব করা হবে।" [সুনানে আবু দাউদ (১৩৭২), সুনানে তিরমিযি (৮০৬); তিরমিযি বলেন: এটি একটি হাসান সহীহ হাদিস]

আরও জানতে দেখুন: [153247](#) নং প্রশ্নোত্তর।

পক্ষান্তরে, কেউ যদি একাকী কিয়ামুল লাইল আদায় করে তার ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে আদায় করতেন সেভাবে মনোযোগের সাথে ১১ রাকাত আদায় করা; যাতে করে সে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়ালের আশায় নামায পড়া বাস্তবায়ন করতে পারেন।

আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত তিনি আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেন: রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায পড়া কেমন ছিল? তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে ও রমযান ছাড়া ১১ রাকাতের বেশি নামায আদায় করতেন না। তিনি চার রাকাত নামায আদায় করতেন; এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। এরপর তিনি আরও চার রাকাত নামায পড়তেন এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। এরপর তিনি তিন রাকাত নামায পড়তেন। [সহিহ বুখারী (১১৪৭) ও সহিহ মুসলিম (৭৩৮)]

যদি কেউ এর চেয়ে বাড়ায় তাতেও কোন অসুবিধা নাই। আরও জানতে দেখুন: [9036](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

তারাবীর নামাযে প্রারম্ভিক দোয়া (সানা) পড়া

প্রশ্ন

আমরা কি তারাবীর নামাযের প্রত্যেক রাকাতদ্বয়ের প্রথম রাকাতে প্রারম্ভিক দোয়া (সানা) পড়ব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ; তারাবী নামায ও অন্যান্য নফল নামাযের প্রত্যেক রাকাতদ্বয়ের প্রথম রাকাতে প্রারম্ভিক দোয়া পড়া শরিয়তের বিধান। যেহেতু এ সংক্রান্ত দলিলগুলোর বিধান সাধারণ:

কিয়ামুল লাইল এর নামাযে প্রারম্ভিক দোয়া হিসেবে পড়ার জন্য যে দোয়াগুলো উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

اللَّهُ إِلَّا إِلَهُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (তিনবার), اللَّهُ أَكْبَرُ (আল্লাহ আকবার) (তিনবার)

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

(উচ্চারণ: আল্লাহ আকবার কাবিরা, ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাবিরা, ওয়া সুবহানালাহি বুকরাতান ওয়া আসিলা) (অনুবাদ: আল্লাহ সবচেয়ে বড়, অতীব বড়। আল্লাহর জন্যই অনেক ও অজস্র প্রশংসা। সকালে ও বিকালে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।)

এ দোয়া পড়ে জনৈক সাহাবী নামায শুরু করলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "আমি বিস্ময়াভূত হয়ে গেছি। এ দোয়ার কারণে আসমানের দরজাগুলো খুলে গেছে।"

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

(উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান ত্বায়্যিবান মুবা-রাকান ফীহি)

(অনুবাদ: আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা; অটেল, পবিত্র ও বরকত রয়েছে এমন প্রশংসা।) আরেক ব্যক্তি এ দোয়ার মাধ্যমে নামায শুরু করলে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "আমি দেখেছি যে, বারজন ফেরেশতা এটাকে গ্রহণ করে কে আগে এটাকে উপরে নিয়ে যাবে সে জন্য তাড়াহুড়া করছে।"

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ أَمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، أَنْتَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَاعْفُزْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আনতা নুরুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়ামান ফীহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু আনতা ক্বায়্যিমুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়ামান ফীহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু আনতা মালিকুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়ামান ফীহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু, আনতাল হাক্কু, ওয়া ওয়া'দুক হাক্কুন, ওয়া ক্বাওলুক হাক্কুন, ওয়া লিক্বা-উকা হাক্কুন, ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন, ওয়ান না-রু হাক্কুন, ওয়াসসা'আতু হাক্কুন, ওয়ান নাবিয়্যিনা হাক্কুন, ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্কুন। আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু, ওয়াবিকা আ--মানতু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খা-সামতু, ওয়া ইলাইকা হা-কামতু। আনতা রাব্বানা, ওয়া ইলাইকাল মাছির। ফাগফির লী মা কাদ্দামতু, ওয়ামা আখখারতু, ওয়ামা আসরারতু, ওয়ামা আ'লানতু, ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহি মিন্নি, আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুআখখিরু, লা ইলা-হা ইল্লা আনতা। আনতা ইলা-হী, লা ইলা-হা ইল্লা আস্তা। ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিকা)।

(অনুবাদ: হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার জন্য। আসমানসমূহ, যমীন এবং এ দুটোর মাঝে যা কিছু আছে আপনিই সেগুলোকে আলোকিতকারী। আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আসমানসমূহ, যমীন এবং এ দুটোর মাঝে যা কিছু আছে আপনিই সে সবের পরিচালক। আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আপনিই হক্কু। আপনার ওয়াদা সত্য। আপনার বাণী সত্য। আপনার সাক্ষাৎ লাভ সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত সত্য। নবীগণ সত্য। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য। হে আল্লাহ! আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করি। আপনার ওপরই ভরসা করি। আপনার প্রতি ঈমান রাখি। আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। আপনার সাহায্যেই বা আপনার জন্যই শত্রুর সাথে বিবাদে লিপ্ত হই। আপনার কাছেই বিচার পেশ করি। আপনি আমাদের রব্ব। আপনার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতএব আমার পূর্বাপর গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন। আমি গোপনে বা প্রকাশ্যে যা করেছি ক্ষমা করে দিন এবং সে সব গুনাহও ক্ষমা করে দিন যা সম্পর্কে আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন। আপনিই অগ্রগামীকারী ও পশ্চাদগামীকারী। আপনিই আমার উপাস্য। আপনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। আপনার সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারো নেই।)

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা রব্বা জিব্রাঈলা, ওয়া মীকাঈলা, ওয়া ইস্রাফীলা, ফা-তিরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি, 'আ-লিমাল গাইবি ওয়াশশাহা-দাতি। আনতা তাহকুমু বাইনা ইবা-দিকা ফীমা কা-নু ফীহি ইয়াখতালিফুন। ইহদিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বিইয়নিকা ইল্লাকা তাহ্দী তাশা-উ ইলা-সিরা-তিম মুস্তাকীম)।

(অনুবাদ: হে আল্লাহ! জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব্ব। আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। গায়েব ও প্রকাশ্য সববিষয়ে জ্ঞানবান। আপনার বান্দাগণ যে সব বিষয়ে মতভেদ করত আপনিই তার মীমাংসা করবেন। সত্য কোনটি তা নিয়ে যেসব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে আপনার ইচ্ছায় আমাকে সুপথে পরিচালিত করুন। নিশ্চয় আপনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশবার তাকবীর দিতেন। দশবার আলহামদু লিল্লাহ্ উচ্চারণ করতেন। দশবার সুবহানাল্লাহ্ পড়তেন। দশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়তেন এবং দশবার আসতাগফিরুল্লাহ্ পড়তেন।

তিনি দশবার বলতেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগ ফিরলি, ওয়াহদিনি, ওয়ারযুকনি, ওয়া আফিনি)

(অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমাকে সুপথে পরিচালিত করুন। আমাকে রিযিক দিন। আমাকে নিরাপত্তা দান করুন।)

তিনি আরও বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّيْقِ يَوْمَ الْحِسَابِ

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনায যিক্কী ইয়ামাল হিসাব)

(অনুবাদ: হে আল্লাহ্! হিসাবের দিনের সংকট থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই।)

তিনি তিনবার তাকবীর বলে বলতেন:

ثُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظْمَةِ

(উচ্চারণ: থুল মালাকুতি, ওয়াল জাবারুতি, ওয়াল কিবরিয়া, ওয়াল আযামা)

(অর্থ: যিনি মহা প্রতাপ, বিশাল সাম্রাজ্য, মহা গৌরব-গরিমা এবং অতুলনীয় মহত্বের অধিকারী।)

দেখুন: সিফাতু সালাতিন নাবিয়্য (পৃষ্ঠা-৯৪, ৯৫)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে কিংবা অন্য সময়ে ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না

প্রশ্ন

একজন বলল যে, আয়েশা (রাঃ) এর যে বর্ণনাতে ১১ রাকাত নামায পড়ার কথা উল্লেখ আছে সেটি তাহাজ্জুদের নামায কিংবা বিতিরের নামাযের ব্যাপারে; তারাবীর নামাযের ব্যাপারে নয়। এ ব্যাপারে আপনাদের মন্তব্য কী?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তাহাজ্জুদের নামায, বিতিরের নামায ও তারাবীর নামায এ সবগুলো নামাযকে একত্রে কিয়ামুল লাইল বা তারাবীর নামায বলা যায়। তবে তারাবীর নামায রমযান মাসের সাথে খাস।

আয়েশা (রাঃ) এর উক্তিটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাত্রিকালীন নামায সম্পর্কে। তাই তিনি রাতের বেলায় যে যে নামায পড়তেন সবগুলো এ উক্তির অধীনে পড়বে।

সহিহ বুখারী (৩৫৬৯) ও সহিহ মুসলিমে (৭৩৮) আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রমযান মাসের নামায কেমন ছিল? আয়েশা (রাঃ) বলেন: তিনি রমযানে কিংবা রমযান ছাড়া অন্য সময়ে এগার রাকাতের বেশি নামায পড়তেন না। তিনি চার রাকাত নামায পড়তেন। এ চার রাকাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এরপর তিনি আরও চার রাকাত নামায পড়তেন। এ চার রাকাতেরও সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এরপর তিনি তিন রাকাত নামায পড়তেন। একবার আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বিতির পড়ার আগে ঘুমিয়ে যাচ্ছেন? তিনি বলেন: আমার চোখ ঘুমায়। কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

ইমাম নববী বলেন:

আয়েশা (রাঃ) থেকে সহিহ বুখারীতে এসেছে যে, তাঁর রাতের নামায ছিল ৭ রাকাত বা ৯ রাকাত। বুখারী ও মুসলিম এ হাদিসের পর ইবনে আব্বাস (রাঃ)- এর হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের বেলার নামায ছিল ১৩ রাকাত এবং সুবহে সাদিক হওয়ার পর ফজরের দুই রাকাত সুনত পড়তেন। য়ায়েদ বিন খালিদ এর হাদিসে রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালকাভাবে দুই রাকাত নামায পড়েছেন। এরপর দুই রাকাত দীর্ঘ নামায পড়েছেন। এরপর হাদিসের বাকী অংশ উল্লেখ করেন। হাদিসের শেষাংশে বলেন: এই হল: তের রাকাত। কাযী ইয়ায বলেন: এ হাদিসসমূহে ইবনে আব্বাস (রাঃ), য়ায়েদ (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) বাস্তবে যা দেখেছেন সেটা জানিয়েছেন।

উল্লেখিত সাহাবীদের প্রত্যেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলায় সর্বমোট কত রাকাত নামায পড়তেন সেটা উল্লেখ করেছেন; এর মধ্যে তাহাজ্জুদের নামাযও রয়েছে অন্য নামাযও রয়েছে।

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, আয়েশা (রাঃ) এর উক্তি: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামায ছিল সাত রাকাত বা নয় রাকাত।" এর দ্বারা আয়েশা (রাঃ) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যা ঘটেছে। আর আয়েশা (রাঃ) এর উক্তি: "তিনি রমযানে কিংবা রমযান ছাড়া অন্য সময়ে এগার রাকাতের বেশি নামায পড়তেন না।" এটাই ছিল রাতের বেলায় তাঁর আদায়কৃত নামাযের সর্বাধিক সংখ্যা। তিনি এর চেয়ে বাড়াতেন না।

আর আয়েশার উক্তি: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৩ রাকাত নামায পড়েছেন": এ প্রসঙ্গে হাফেয ইবনে হাজার দুটো সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। হতে পারে আয়েশা (রাঃ) রাতের নামাযের সাথে এশার দুই রাকাত সুনতকেও যোগ করেছেন; যেহেতু এ রাকাতদ্বয়ও রাতের বেলায় আদায় করা হয়। আরেকটি সম্ভাবনা হল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের নামাযের শুরুতে খুবই হালকাভাবে যে দুই রাকাত নামায পড়তেন তিনি সে দুই রাকাত নামাযকেও যোগ করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার বলেন: আমার দৃষ্টিতে এটাই অগ্রগণ্য... ||ফাতহুল বারী||

এর মাধ্যমে ফুটে উঠল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলায় সর্বমোট কত রাকাত নামায পড়তেন আয়েশা (রাঃ) সেটাই উদ্দেশ্য করেছেন। তার হাদিস থেকে আলেমগণ এটাই বুঝেছেন।

আরও জানতে পড়ুন: [9036](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

তারাবীর নামায বিদআত নয় এবং তারাবীর নামাযের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই

প্রশ্ন

পবিত্র রমযান মাস এলে মানুষ তারাবীর নামায অভিমুখী হয়। আমার প্রশ্ন হল: কিছু মানুষ এশার নামাযের পরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে ১১ রাকাত নামায পড়েন। আর কিছু মানুষ ২১ রাকাত নামায পড়েন; দশ রাকাত এশার পর, আর দশ রাকাত ফজরের আগে; এরপর বিতির (বেজোড়) নামায পড়েন। এ পদ্ধতির শরয়ি হুকুম কী? উল্লেখ্য, কেউ কেউ মনে করেন: ফজরের নামাযের আগে কিয়ামুল লাইল (রাত্রিকালীন নামায) আদায় বিদআত।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

তারাবীর নামায সুলত মর্মে মুসলমানদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে । যেমনটি ইমাম নববী "আল-মাজমু" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নামায আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন । এ ধরণের হাদিসের মধ্যে রয়েছে: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে রমযান মাসে কিয়াম পালন করবে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে ।"[সহিহ বুখারী (৩৭) ও সহিহ মুসলিম (৭৬০)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্বুদ্ধকরণ এবং এ নামায মুস্তাহাব হওয়ার সপক্ষে মুসলমানদের ইজমা সংঘটিত হওয়ার পরেও কিভাবে এটি বিদআত হয়?!

খুব সম্ভব যিনি বিদআত বলেছেন তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তারাবীর নামায পড়ার জন্য মসজিদে মসজিদে একত্রিত হওয়া বিদআত ।

এ কথাও সঠিক নয় । কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে একাধিক রাতে এ নামায আদায় করেছেন । এরপর মুসলমানদের ওপর এ নামায ফরয করে দেওয়ার ভয় থেকে তিনি তা ত্যাগ করেছেন । পরবর্তীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারা গেলেন এবং ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল তখন এ ভয় কেটে যায় । কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর তো আর ফরয হওয়া সম্ভব নয় । তখন উমর (রাঃ) এ নামায আদায় করার জন্য মুসলমানদেরকে একত্রিত করলেন । আরও জানতে দেখুন: ২১৭৪০ নং প্রশ্নোত্তর ।

তারাবীর নামাযের সময় এশার নামাযের পর থেকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত । আরও জানতে দেখুন: ৩৭৭৬৮ নং প্রশ্নোত্তর ।

তারাবীর নামাযের বিশেষ কোন রাকাত সংখ্যা নেই । বরং সংখ্যায় কম বেশি হওয়া জায়েয । প্রশ্নকারী যে দুটো সংখ্যার কথা জিজ্ঞেস করেছেন উভয়টি জায়েয ।

প্রত্যেক মসজিদের মুসল্লিরা যেটাকে তাদের জন্য উপযুক্ত মনে করেন সেটা গ্রহণ করতে পারেন ।

উত্তম হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেটা সাব্যস্ত সেটার উপর আমল করা । তিনি কিয়ামুল লাইল (রাতে নামায) ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না; রমযানেও না, অন্য সময়েও না ।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) তারাবীর নামাযের রাকাত সংখ্যা উল্লেখ করার পর বলেন:

এ বিষয়টিতে প্রশস্ততা রয়েছে । সুতরাং যে ব্যক্তি ১১ রাকাত পড়ে তাকেও বাধা দেওয়া যাবে না এবং যে ব্যক্তি ২৩ রাকাত পড়ে তাকেও বাধা দেওয়া যাবে না । বরং এক্ষেত্রে প্রশস্ততা রয়েছে; আলহামদু লিল্লাহ ।[ফাতাওয়াস শাইখ ইবনে উছাইমীন (১/৪০৭)]

দেখুন: **9036** নং প্রশ্নোত্তর ।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ ।

রমযান মাসে তারাবীর নামায কখন শুরু হবে; প্রথম রাত্রিতে নাকি দ্বিতীয় রাত্রিতে?

প্রশ্ন

আমরা কখন তারাবীর নামাযের কিয়াম শুরু করব? রমযানের প্রথম রাত্রিতে (যে রাতে চাঁদ দেখা যায় কিংবা মাস পূর্ণ হয়); নাকি রমযান মাসের প্রথম দিনের এশার নামাযের পর?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

রমযান মাসের প্রথম রাত্রির এশার নামাযের পর মুসলমানের জন্য তারাবীর নামায পড়া শরয়ি বিধান । প্রথম রাত্রি হল যে রাতে চাঁদ দেখা যায় কিংবা মুসলমানেরা শাবান মাসের ত্রিশদিন পূর্ণ করে ।

অনুরূপ বিধান রমযান মাসের শেষের ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ ঈদেদে চাঁদ দেখার মাধ্যমে কিংবা রমযান মাসের ত্রিশদিন পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে রমযান মাস শেষ হওয়া সাব্যস্ত হলে আর তারাবীর নামায পড়া হবে না।

এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, তারাবীর নামায রমযানের দিনের বেলায় রোযা রাখার সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং মাস শুরু হওয়ার মাধ্যমে রাত থেকে শুরু করতে হয় এবং রমযানের শেষ রাতে শেষ হয়।

এমন কথা বলা উচিত হবে না যে, তারাবীর নামায সাধারণ নফল নামায; যে কোন রাত্রিতে যে কোন সমাবেশে আদায় করা জায়েয। কেননা তারাবীর নামায রমযানেই উদ্দিষ্ট। তারাবীর নামায আদায়কারী রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল পালনের সওয়াবের প্রত্যাশা করেন।

তারাবীর নামায জামাতের সাথে আদায় করার হুকুম অন্য নামায জামাতের সাথে আদায় করার মত নয়। রমযানের কিয়ামুল লাইল ঘোষণা দিয়ে, উদ্বুদ্ধ করে জামাতের সাথে আদায় করা জায়েয। পক্ষান্তরে, অন্য মাসে কিয়ামুল লাইল এভাবে আদায় করা সুন্নতসম্মত হয়; তবে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া কিংবা উৎসাহ ও শিক্ষামূলক হলে হতে পারে। তাই কখনও কখনও এভাবে করা সুন্নত হতে পারে; সবসময় নয়।

শাইখ মুহাম্মদ আল-সালেহ আল-উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

রমযান ছাড়া অন্য মাসে তারাবীর নামায পড়া বিদআত। তাই রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে যদি লোকেরা কিয়ামুল লাইল জামাতের সাথে আদায় করার জন্য মসজিদে একত্রিত হয় তাহলে সেটা বিদআত হবে।

তবে রমযান ছাড়া অন্য সময়ে কেউ তার নিজ বাসাতে কখনও কখনও জামাতের সাথে নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল আছে: একবার তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে নিয়ে নামায পড়েছেন। একবার ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে নিয়ে নামায পড়েছেন। একবার হুযাইফা বিন ইয়ামানকে নিয়ে তাঁর বাসায় নামায পড়েছেন। কিন্তু তিনি সেটাকে রেগুলার সুন্নত হিসেবে গ্রহণ করেননি। এবং সেটা মসজিদে করতেন না। [আল-শারহুল মুমতি (৪/৬০, ৬১)]

অতএব, যে ব্যক্তি রমযান মাস শুরু হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার আগে তারাবীর নামায আদায় করেছে সে ঐ ব্যক্তির মত যিনি অসময়ে নামায পড়ল। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করে সে গুনাহ থেকে রেহাই পেলেও তার জন্য সওয়াব লেখা হবে না।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

রমযান মাস ৩০ দিনের হোক কিংবা ২৯ দিনের হোক ২১ শে রমযানের রাত থেকে শেষ দশক শুরু হয়

প্রশ্ন

আমার এক বন্ধু রমযানের শেষ দশক সম্পর্কে আমার মনে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি করেছেন। আমার বন্ধু বলেন: যদি রমযান মাস ২৯ দিনের হয় তাহলে ১৯-২৯ তারিখ পর্যন্ত শেষ দশক হবে। শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলো আমি কিভাবে জানতে পারি? এ ব্যাপারে আপনাদের কী প্রত্যুত্তর?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

রমযানের শেষ দশক ২১ শে রমযানের রাত থেকে শুরু হয়। চাই ৩০দিনে মাস হোক কিংবা ২৯ দিনে। এটি প্রমাণ করে সহিহ বুখারী (৮১৩) ও সহিহ মুসলিমের (১১৬৭) হাদিস: আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: " রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের প্রথম দশ দিন ইতিকাফ করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে ইতিকাফ করলাম। তখন জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন: 'আপনি যা তালাশ করছেন সেটা সামনে'। এরপর তিনি মধ্যবর্তী দশ দিন ইতিকাফ করলেন, আমরাও তাঁর সাথে ইতিকাফ করলাম। তখন পুনরায় জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন: 'আপনি যা তালাশ করছেন সেটা সামনে'। এরপর রমযানের বিশ তারিখ সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন: 'যারা আল্লাহর নবীর সঙ্গে ইতিকাফ করতে চান তারা যেন ফিরে আসেন (আবার ইতিকাফ করেন)। কেননা আমাকে স্বপ্নে লাইলাতুল কদর অবগত করানো হয়েছে। তবে আমাকে তা নির্ধারিত

তারিখটি) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে তা শেষ দশ দিনের কোন এক বেজোড় তারিখে। স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি কাদা ও পানির উপর সিজদা করছি। তখন মসজিদের ছাদ খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত ছিল। আমরা আকাশে কোন কিছুই (মেঘ) দেখিনি। হঠাৎ করে পাতলা একটি মেঘ আসল এবং আমাদের উপর বৃষ্টি নামল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এমন কি আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপাল ও নাকের অগ্রভাগে পানি ও কাঁদার চিহ্ন দেখতে পেলাম। এভাবেই তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো।”

সহিহ বুখারীর অপর এর রেওয়াজেতে (২০২৭) এসেছে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের মধ্যম দশকে ইতিকারফ করতেন। এক বছর তিনি ইতিকারফ করলেন। যখন একুশের রাত এল, যে রাতের সকালে তিনি তাঁর ইতিকারফ হতে বের হতেন, তখন তিনি বললেন: যারা আমার সংগে ইতিকারফ করেছে তারা যেন শেষ দশকও ইতিকারফ করে। আমাকে স্বপ্নে এই রাত (লাইলাতুল কদর) দেখানো হয়েছিল, পরে আমাকে তা (সঠিক তারিখ) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি যে, ঐ রাতের সকালে আমি কাদা-পানির মাঝে সিজদা করছি। তোমরা তা শেষ দশকে তালাশ কর এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তালাশ কর। পরে এই রাতে আকাশ হতে বৃষ্টি হল। মসজিদ ছিল ছাদবিহীন। তাই মসজিদে বৃষ্টির ফোটা পড়ল। একুশের রাতের সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপালে কাদা-পানির চিহ্ন আমার এ দু’চোখ দেখতে পায়।”

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

“এটা সুস্পষ্ট যে, খোতবাটি ছিল বিশ তারিখ ভোরে। আর বৃষ্টি নেমেছে ২১ তারিখ রাতে।” [ফাতহুল বারী (৪/২৫৭) থেকে সমাপ্ত]

সহিহ বুখারী (২০১৭) ও সহিহ মুসলিম (১১৬৭)এর অপর এক রেওয়াজেতে এসেছে যে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের মাঝের দশকে ইতিকারফ করতেন। বিশ তারিখ গত হয়ে যখন সন্ধ্যা হত এবং একুশ তারিখ শুরু হত তখন তিনি ঘরে ফিরে আসতেন। এবং তাঁর সঙ্গে যারা ইতিকারফ করেছিলেন সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে আসতেন।” এর থেকেও বুঝা যায় যে, শেষ দশক ২১ শে রমযানের রাত থেকে শুরু হয়।

এ কারণে সংখ্যা গরিষ্ঠ আলেমগণের মায়হাব (এদের মধ্যে চার মায়হাবের ইমামগণও রয়েছেন) হচ্ছে: যে ব্যক্তি শেষ দশ দিন ইতিকারফ করতে চায় সে যেন একুশের রাত শুরু হওয়ার আগে সূর্যাস্তের পূর্বেই মসজিদে প্রবেশ করে।

আরও জানতে দেখুন: [14046](#) নং প্রশ্নোত্তর।

শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলো হচ্ছে- একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ ও ঊনত্রিশ এর রাত।

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

লাইলাতুল কদর রমযানের মধ্যেই রয়েছে। এ রাত রমযানের শেষ দশকেই রয়েছে। শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতেই রয়েছে। বেজোড় রাতগুলোর সুনির্দিষ্ট কোন রাতে নেই। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলোর সম্মিলিত নির্দেশনা এটাই প্রমাণ করে [ফাতহুল বারী (৪/২৬০) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তারাবীর নামাযে দুর্বল, বয়োবৃদ্ধ ও এদের পর্যায়ভুক্ত অন্যদের অবস্থা বিবেচনায় রাখা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: তারাবীর নামাযে দুর্বল, বয়োবৃদ্ধ ও এদের পর্যায়ভুক্ত অন্যদের অবস্থা বিবেচনায় রাখা কি ইমাম সাহেবের কর্তব্য?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

তারাবী কিংবা ফরয নামায সকল নামাযের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উচিত। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ যখন লোকদের ইমামতি করে তখন সে যেন হালকাভাবে নামায আদায় করে। কেননা তাদের মধ্যে রয়েছে দুর্বল, শিশু ও প্রয়োজনগ্রস্ত লোক।” তাই ইমাম মুক্তাদিদের অবস্থা বিবেচনায় রাখবে। রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল

আদায়কালে এবং শেষ দশকে তাদের প্রতি কোমলপ্রাণ হবে। মানুষ সবাই সমান নয়। মানুষের মধ্যে রয়েছে নানা শ্রেণী। তাই ইমামের উচিত তাদের অবস্থা বিবেচনায় রাখা। তাদেরকে মসজিদে আসা ও নামাযে হাযির থাকার উদ্বুদ্ধ করা। ইমাম যদি নামায দীর্ঘ করে তাহলে তাদের কষ্ট হবে, এটা তাদেরকে নামাযে হাযির থাকতে নিরুৎসাহিত করবে। তাই ইমামের উচিত তাদেরকে হাযির হওয়ার প্রতি উৎসাহ দেয়া, নামাযের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। এর জন্য নামায সৎক্ষিপ্ত করে, দীর্ঘ না করে হলেও। কেননা যে নামাযের মধ্যে খুশু (আল্লাহর ভীতি) থাকে ও ইতমিনান (যীরস্থিরতা) থাকে সেটা অল্প হলেও এমন নামাযের চেয়ে উত্তম যে নামাযে খুশু থাকে না, বিরক্তি ও অলসতা এসে যায়।” [শাইখ বিন বাযের ফতোয়াসমগ্র (১১/৩৩৬) থেকে সমাপ্ত]

রুদরের রাত জাগরণ করা ও উদযাপন করা

প্রশ্ন

রুদরের রাত জাগরণের ধরণ কেমন হবে? নামাযের মাধ্যমে নাকি কুরআন তেলাওয়াত, সিরাতে নববী, ওয়াজ-মাহফিল এবং এ উপলক্ষ্যে মসজিদে অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশকে নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়াতে মশগুল থেকে এত বেশি পরিশ্রম করতেন অন্য সময় যা করতেন না। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে: “যখন (রমযানের) শেষ দশক শুরু হত, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত জাগতেন, নিজ পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন এবং (এর জন্য) তিনি কোমর বেঁধে নিতেন।” মুসনাদে আহমাদ ও সহিহ মুসলিমে আরও এসেছে যে, “তিনি শেষ দশকে এত বেশি পরিশ্রম করতেন যা অন্য কোন সময় করতেন না।”

দুই:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুদরের রাতে ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে কিয়ামুল লাইল আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে রুদরের রাতে কিয়ামুল লাইল পালন করবে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।” [একদল হাদিস গ্রন্থাকার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; ইবনে মাজাহ ছাড়া। এ হাদিসটি নামাযের মাধ্যমে রুদরের রাত জাগরণ করার বিষয়টি প্রমাণ করছে।]

তিন:

রুদরের রাতে যে দোয়াটি পড়া উত্তম সেটি হচ্ছে ঐ দোয়া যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা (রাঃ)কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ইমাম তিরমিযি আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কি অভিমত, যদি আমি জানতে পারি যে, কোন রাতটি লাইলাতুল রুদর তখন আমি কি বলব? তিনি বললেন: তুমি বলবে: আল্লাহুমা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া, ফা'ফু আন্নি (অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমা করাটা আপনি পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।) [তিরমিযি হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত বলেছেন]

চার:

রমযান মাসের কোন একটি রাতকে রুদরের রাত হিসেবে নির্দিষ্ট করতে হলে- অপর সব রাতকে বাদ দিয়ে- নির্দিষ্টকারক দলিল প্রয়োজন। কিন্তু শেষ দশদিনের বেজোড় রাতগুলো অন্য রাতগুলোর চেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়। এবং বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে সাতাশতম রাত লাইলাতুল রুদর হওয়ার বেশি সম্ভাবনাময়। এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর কারণে।

পাঁচ:

বিদাত করা কখনই জায়েয নয়; না রমযানে, আর না রমযানের বাহিরে অন্য কোন সময়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি আমাদের শরিয়তে নতুন কিছু প্রবর্তন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়; তা প্রত্যাখ্যাত।” অপর এক বর্ণনায় এসেছে, “যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের শরিয়তে নেই; তা প্রত্যাখ্যাত।”।

রমযানের কিছু কিছু রাতে যে অনুষ্ঠানাদি করা হয়ে থাকে এসব কাজের কোন (দালিলিক) ভিত্তি আমাদের জানা নেই। সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে— মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে (দ্বীনের মধ্যে) নতুন প্রবর্তিত বিষয়সমূহ।

আল্লাহই তাওফিকদাতা।

নারীদের তারাবী নামায পড়ার বিধান

প্রশ্ন

নারীদের উপরে কি তারাবীর নামায আছে? তাদের জন্যে তারাবীর নামায বাসায় পড়া উত্তম? নাকি মসজিদে গিয়ে পড়া?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তারাবীর নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা। নারীদের জন্যে কিয়ামুল লাইল (রাতের নামায) ঘরে পড়া উত্তম। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নারীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিও না। তবে, তাদের জন্য ঘরই উত্তম।” হাদিসটি আবু দাউদ তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে, ‘নারীদের মসজিদে যাওয়া’ শীর্ষক পরিচ্ছেদ ও ‘এ বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে সংকলন করেছেন। হাদিসটি ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৭৪৫৮) সংকলিত হয়েছে।

নারীর নামাযের স্থান যতবেশী নির্জনে হবে, যতবেশী ব্যক্তিগত হবে সেটাই উত্তম। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মহিলাদের জন্য শোয়ার ঘরে নামায আদায় করা বৈঠকখানায় নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। তাদের জন্য গোপন প্রকোষ্ঠে নামায করা শোয়ার ঘরে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম।” [আবু দাউদ তাঁর ‘সুনান’ নামক গ্রন্থের, ‘কিতাবুস সালাত’ অধ্যায়ের ‘মহিলাদের মসজিদে যাওয়া’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে হাদিসটি সংকলন করেছেন। হাদিসটি ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৩৮৩৩) রয়েছে।]

আবু হুমাইদ আল-সায়েদি এর স্ত্রী উম্মে হুমাইদ থেকে বর্ণিত তিনি একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সাথে নামায আদায় করতে পছন্দ করি। তখন তিনি বললেন: আমি জেনেছি আপনি আমার সাথে নামায পড়া পছন্দ করেন। কিন্তু, আপনি আপনার শোয়ার ঘরে নামায আদায় করা বৈঠক ঘরে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। আপনি আপনার বৈঠক ঘরে নামায আদায় করা বাড়ীর উঠোনে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। আপনি আপনার বাড়ীর উঠোনে নামায আদায় করা গোত্রীয় মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। আপনি আপনার গোত্রীয় মসজিদে নামায আদায় করা আমার মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। বর্ণনাকারী বলেন: ফলে তিনি তার ঘরের একেবারে ভিতরে অন্ধকার স্থানে তার জন্য নামাযের জায়গা বানানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সে জায়গায় নামায আদায় করেছেন। [মুসনাদে আহমাদ, হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য]

তবে উল্লেখিত ফযিলত নারীদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। যেমনটি আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) কর্তৃক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: যদি নারীরা তোমাদের কাছে মসজিদে যেতে অনুমতি চায় তাহলে তোমরা তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিও না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন বিলাল বিন আব্দুল্লাহ (বিন উমর) বলল: আল্লাহর শপথ, অবশ্যই আমরা তাদেরকে বাধা দিব। বর্ণনাকারী বলেন: তখন আব্দুল্লাহ তার দিকে এগিয়ে এসে তাকে তীব্র গালমন্দ করলেন; আমি তাঁর কাছ থেকে এমন কথা আর কখনও শুনিনি। এবং তিনি বললেন: আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস জানাচ্ছি। আর তুমি বল: আল্লাহর শপথ, অবশ্যই আমরা তাদেরকে বাধা দিব। [সহিহ মুসলিম (৬৬৭)]

কিন্তু, কোন নারী মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্ত রয়েছে:

১। পরিপূর্ণ হিজাব থাকতে হবে।

২। সুগন্ধি লাগিয়ে যাবে না।

৩। স্বামীর অনুমতি লাগবে।

এবং এ বের হওয়ার ক্ষেত্রে অন্য আরেকটি হারাম যেন সংঘটিত না হয়; যেমন একাকী ড্রাইভারের সাথে বের হওয়া।

যদি কোন নারী উল্লেখিত শর্তগুলোর কোনটি ভঙ্গ করে সেক্ষেত্রে নারীর স্বামী কিংবা অভিভাবক তাকে মসজিদে যেতে বাধা দিতে পারবেন; বরং বাধা দেওয়া আবশ্যিক হবে।

আমাদের শাইখ আব্দুল আযিযকে জনৈক নারী তারাবীর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, নারীর জন্য কি তারাবীর নামায মসজিদে গিয়ে পড়া উত্তম? তিনি না-সূচক জবাব দেন। কারণ মহিলাদের ঘরে নামায পড়া সংক্রান্ত হাদিসগুলো সাধারণ; যা তারাবী নামাযসহ অন্য সকল নামাযকে শামিল করবে। আল্লাহুই ভাল জানেন।

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য ও সকল মুসলিম ভাইদের জন্য ইখলাস ও কবুলিয়তের প্রার্থনা করছি। তিনি যেন, আমাদের আমলগুলো তাঁর পছন্দ ও সন্তুষ্টি মোতাবেক সম্পন্ন করান। আমাদের নবী মুহাম্মদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল এর ফযিলত

প্রশ্ন

রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল এর ফযিলত কি?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল পালন করার ফযিলত:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল পালন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন; তবে দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দিতেন না। এরপর তিনি বলতেন: যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে রমযান মাসে কিয়াম করবে (রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে নামায পড়বে) তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেলেন এবং এ বিষয়টি এভাবেই রয়ে গেল (অর্থাৎ তারাবী নামায জামাতে পড়া হত না)। আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফতকালেও এভাবেই থাকল এবং উমর (রাঃ) এর খিলাফতের শুরুর দিকেও এভাবেই থাকল।

আমর বিন মুররা আল-জুহানী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুযাআ' গোত্রের এক লোক এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কী অভিমত, আমি যদি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহু ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং আপনি, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল (বার্তাবাহক), পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, একমাস রোযা রাখি, রমযান মাসে কিয়াম পালন করি এবং যাকাত প্রদান করি? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যাবে সে তো সিদ্দিকীন ও শুহাদাদের অন্তর্ভুক্ত (ঈমানদারদের সর্বোচ্চ দু'টি স্তর)।"।

লাইলাতুল রুদরকে নির্দিষ্টকরণ:

২। রমযান মাসের সর্বোত্তম রাত্রি হল- লাইলাতুল রুদর। দলিল হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: " যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে লাইলাতুল রুদরে কিয়াম পালন করবে (ফলে তাকে তাওফিক দেয়া হবে) তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"

৩। এ রাতটি হচ্ছে- অগ্রগণ্য মতানুযায়ী ২৭ শে রমযানের রাত। অধিকাংশ হাদিস থেকে এ অভিমতটির পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন- যিরর বিন ছবাইশ (রাঃ) এর হাদিস। তিনি বলেন, আমি উবাই বিন কাব (রাঃ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, তাকে বলা হল: 'আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সারা বছর কিয়ামুল লাইল পড়বে সে লাইলাতুল রুদর পাবেই! তখন উবাই (রাঃ) বললেন: আব্দুল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে করে মানুষ এক অভিমতের উপর নির্ভর করে বসে না থাকে। ঐ সত্তার শপথ যিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, নিশ্চয় লাইলাতুল রুদর রমযান মাসে। আব্দুল্লাহ্ শপথ, আমি জানি এটি কোন রাত্রি। এটি সেই রাত্রি যে রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কিয়াম পালন করার আদেশ দিয়েছিলেন। সে রাতটি ছিল (রমযানের) ২৭ তম রজনী। আর সে রাত্রির আলামত হচ্ছে, সেদিন সকাল বেলা সূর্য শুভ্র হয়ে উদিত হবে; সূর্যের কোন আলোক রশ্মি থাকবে না। [কোন এক রেওয়াজেতে এ বর্ণনাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 'মারফু' হাদিস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য হাদিস সংকলক এটি বর্ণনা করেছেন]

কিয়ামুল লাইল এর নামায জামাতের সাথে আদায় করার শরয়ি অনুমোদন:

৪। রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল এর নামায জামাতের সাথে আদায় করা শরিয়ত সম্মত; বরং সেটা একাকী আদায় করার চেয়ে উত্তম। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামুল লাইল এর নামায জামাতের সাথে আদায় করার কারণে এবং তিনি জামাতের সাথে কিয়ামুল লাইল এর নামায আদায় করার ফযিলত বর্ণনা করার কারণে। যেমনটি আবু যার (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন: " আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রমযানের রোযা রাখলাম। তিনি গোটা মাস আমাদের নিয়ে কিয়ামুল লাইল পড়েননি। তবে, মাসের সাতদিন বাকী থাকতে (২৩ তম রজনীতে) তিনি আমাদের নিয়ে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ কিয়ামুল লাইল আদায় করলেন। যে রাত্রিতে মাসের আর ছয়দিন বাকী ছিল সে রাতে (২৪ তম রজনীতে) কিয়াম করলেন। মাসের আর পাঁচদিন বাকী থাকতে (২৫ তম রজনীতে) আবার অর্ধরাত্রি পর্যন্ত কিয়াম করলেন। আমি বললাম: হে আব্দুল্লাহ্ রাসূল! যদি আজকের গোটা রাতটা আমাদেরকে নিয়ে নফল নামায পড়তেন। তখন তিনি বললেন: যদি কেউ ইমাম যতক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ইমামের সাথে নামায পড়ে; তাহলে তার জন্য গোটা রাত কিয়াম পালন করার সওয়াব হিসাব করা হবে। এরপর যখন মাসের আর চারদিন বাকী ছিল সে রাতে তিনি কিয়াম করলেন। যখন আর তিনদিন বাকী ছিল সে রাতে (২৭ তম রজনীতে) তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকলকে জাগিয়ে দেন। সে রাতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়তেই থাকলেন পড়তেই থাকলেন। এক পর্যায়ে আমাদের আশংকা হল যে, আমাদের 'ফালাহ্' ছুটে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'ফালাহ্' কী? তিনি বললেন: সেহেরী। এরপর তিনি মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আর কিয়ামুল লাইল পালন করলেন।" [হাদিসটি সহিহ; সুনান গ্রন্থাকারগণ হাদিসটি সংকলন করেছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাতের সাথে 'কিয়ামুল লাইল' পালন করা অব্যাহত না রাখার কারণ:

৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসের অবশিষ্টাংশ জামাতের সাথে কিয়ামুল পালন না করার কারণ হচ্ছে, এই আশংকা যে, না-জানি রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল পালন করা তাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়। তখন তারা সেটা পালন করতে সক্ষম হবে না। যেমনটি এসেছে আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে, যা সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক ইসলামী শরিয়তকে পরিপূর্ণ করে দেয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে এ আশংকাটি দূর হয়ে গেছে। অতএব, আশংকার কারণে গৃহীত পদক্ষেপ তথা কিয়ামুল লাইলে জামাত বর্জন করাও দূরীভূত হয়ে গেল এবং পূর্বের হুকুম বহাল থাকল; সেটা হচ্ছে জামাতের সাথে কিয়ামুল লাইল আদায় করার অনুমোদন। এ কারণে উমর (রাঃ) এ বিধানটিকে পূর্ণজীবিত করেছেন; যেমনটি সহিহ বুখারী ও অন্যান্যদের বর্ণনাতে এসেছে।

মহিলাদের জামাতের সাথে কিয়ামুল লাইল পালনের অনুমোদন:

৬। যেমনটি পূর্বোক্ত আবু যার (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে যে, মহিলাদের জন্য জামাতে হাযির হওয়া শরিয়তসম্মত। বরং মহিলাদের জন্য পুরুষদের ইমামের পরিবর্তে আলাদা ইমাম নির্ধারণ করাও জায়েয। কেননা, উমর (রাঃ) যখন জামাতের সাথে কিয়ামুল লাইল আদায় করার জন্য লোকদেরকে সমবেত করলেন তখন পুরুষদের জন্য উবাই বিন কা'ব (রাঃ) কে এবং মহিলাদের জন্য সূলাইমান বিন আবু হাছমা (রাঃ) কে ইমাম নিযুক্ত করলেন। আরফাজা আল-ছাকাফি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: " আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) রমযান মাসে লোকদেরকে কিয়ামুল লাইল আদায় করার নির্দেশ দিতেন। তিনি পুরুষদের জন্য একজন ইমাম ও মহিলাদের জন্য অন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করতেন। তিনি বলেন: আমি ছিলাম মহিলাদের ইমাম।"

আমি বলব: এটা সেক্ষেত্রে হতে পারে যদি মসজিদ প্রশস্ত হয় এবং ইমামদ্বয়ের একজনের পড়া অপর জনের অসুবিধা না-করে সেক্ষেত্রে।

কিয়ামুল লাইল এর রাকাত সংখ্যা:

৭। কিয়ামুল লাইল এর নামায ১১ রাকাত। এক্ষেত্রে আমাদের মনোনীত অভিমত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে এর চেয়ে বেশি রাকাত না বাড়ানো। কেননা তিনি মৃত্যু অবধি কিয়ামুল লাইল নামাযের রাকাত সংখ্যা এর চেয়ে বেশি বাড়াননি। আয়েশা (রাঃ) কে রমযান মাসে তাঁর কিয়ামুল লাইল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানে কিংবা রমযান ছাড়া অন্য সময়ে ১১ রাকাতের বেশি নামায পড়তেন না। তিনি চার রাকাত নামায পড়তেন এ চার রাকাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না! এরপর আরও চার রাকাত নামায পড়তেন এ চার রাকাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না। এরপর তিন রাকাত নামায পড়তেন। [সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

৮। তবে কেউ ইচ্ছা করলে এর চেয়ে কম সংখ্যক বিতিরের নামায পড়তে পারেন। এমনকি এক রাকাত বিতিরও পড়তে পারেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম ও কথার দলিলের ভিত্তিতে।

কর্মের দলিল: আয়েশা (রাঃ) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয় রাকাত বিতির নামায পড়তেন? তিনি বলেন: চার রাকাত পড়ে তিন রাকাত বিতির পড়তেন। ছয় রাকাত পড়ে তিন রাকাত বিতির পড়তেন। দশ রাকাত পড়ে তিন রাকাত বিতির পড়তেন। তিনি সাত রাকাতের চেয়ে কম কিংবা তের রাকাতের বেশি বিতির নামায আদায় করেননি। [সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদন ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থ]

আর তাঁর কথার দলিল হচ্ছে: “ বিতির সত্য। কেউ চাইলে সে পাঁচ রাকাত বিতির পড়তে পারে। কেউ তিন রাকাত পড়তে পারে। কেউ এক রাকাত বিতির পড়তে পারে। ”।

কিয়ামুল লাইল এর নামাযে কুরআন তেলাওয়াত:

রমযানে কিংবা অন্য সময়ে কিয়ামুল লাইলে কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্ট কোন সীমা নির্ধারণ করেননি যে, সে সীমার চেয়ে বাড়ানো বা কমানো যাবে না। বরং নামাযের দীর্ঘতা কিংবা সংক্ষিপ্ততার পরিপ্রেক্ষিতে কেরাতও দীর্ঘ কিংবা সংক্ষিপ্ত হত। তিনি কখনও এক রাকাত নামাযে *يا أيها المزمّل* (ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যামিল) পড়তেন। এ সূরার আয়াত সংখ্যা ২০। কখনও ৫০ আয়াত পড়তেন। তিনি বলতেন: “ যে ব্যক্তি এক রাতে ১০০ আয়াত দিয়ে কিয়াম পালন করবে তাকে গাফেলদের মধ্যে লেখা হবে না। ”। অন্য এক হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি দুইশ আয়াত দিয়ে কিয়াম পালন করবে তাকে ‘ক্বানিতীন মুখলিসীন’ দের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগাক্রান্ত শরীরেও এক রাতে সাতটি লম্বা সূরা পড়েছেন। সে সূরাগুলো হচ্ছে, সূরা বাক্বারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়িদা, সূরা আনআম, সূরা আরাফ ও সূরা তাওবা।

হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে নামায পড়ার ঘটনায় এসেছে যে, তিনি এক রাকাতে সূরা বাক্বারা, এরপর সূরা নিসা, এরপর সূরা আলে-ইমরান ধীরস্থিরভাবে তেলাওয়াত করেছেন।

সহিহ সনদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, উমর (রাঃ) যখন রমযান মাসে উবাই বিন কাব (রাঃ) কে লোকদের ইমাম হয়ে ১১ রাকাত নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন তখন উবাই (রাঃ) একশত আয়াত সম্বলিত সূরাগুলো দিয়ে তেলাওয়াত করতেন। তাঁর পেছনে যারা নামায পড়ত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে তাদেরকে লাঠির ওপর ভর করতে হত। তারা ফজরের কাছাকাছি সময়ে নামায শেষ করতেন।

উমর (রাঃ) থেকে সহিহ সনদে আরও এসেছে যে, তিনি রমযান মাসে ক্বারীদেরকে ডাকালেন। যে ক্বারী দ্রুত তেলাওয়াত করেন তিনি তাকে ৩০ আয়াত পড়ার নির্দেশ দিলেন। যে ক্বারী মধ্যম গতিতে তেলাওয়াত করেন তাকে ২৫ আয়াত তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিলেন। আর যে ক্বারী ধীরে তেলাওয়াত করেন তাকে ২০ আয়াত পড়ার নির্দেশ দিলেন।

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, যে ব্যক্তি একাকী নামায আদায় করে সে যতটুকু ইচ্ছা দীর্ঘ করতে পারেন। অনুরূপভাবে, মুক্তাদিরা যদি একমত থাকে সে ক্ষেত্রেও। যত দীর্ঘ করা যায় তত উত্তম। তবে এ ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করবে। তাই এত লম্বা করবে না যে, গোটা রাত নামাযে কাটিয়ে দিবে; খুব বিরল ক্ষেত্রে ছাড়া। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদের আদর্শ। ” আর যদি ইমাম হিসেবে নামায আদায় করেন তাহলে তিনি এ পরিমাণ দীর্ঘ করতে পারেন যাতে করে পেছনে যারা আছে তাদের জন্য কষ্টকর না হয়। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

“তোমাদের কেউ যখন অন্যদের নিয়ে নামায আদায় করে তখন সে যেন হালকাভাবে নামায পড়ে। কেননা মুসল্লিদের মধ্যে অল্পবয়স্ক, বৃদ্ধ, দুর্বল, অসুস্থ কিংবা ব্যস্ত লোক থাকতে পারে। আর যদি কেউ একাকী নামায পড়ে তখন যতক্ষণ খুশি নামায দীর্ঘ করতে পারে।”

কিয়ামুল লাইল এর সময়কাল:

১০। কিয়ামুল লাইল এর সময় এশার নামাযের পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত পর্যন্ত। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে অতিরিক্ত একটি নামায দিয়েছেন, সে নামাযটি হচ্ছে বিতিরের নামায। তোমরা এশার নামায ও ফজরের নামায মাঝখানে সে নামাযটি আদায় কর।”

১১। যার পক্ষে সম্ভব তার জন্য রাত্রির শেষ প্রহরে নামায আদায় করা উত্তম। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি আশংকা করে যে, সে শেষ রাতে উঠতে পারবে না তবে সে যেন প্রথম রাত্রিতে বিতিরের নামায আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠার আকাঙ্ক্ষা করে সে যেন শেষ রাতে বিতিরের নামায আদায় করে। কারণ শেষ রাতের নামাযে (ফেরেশতারা) হাযির থাকে। তাই সেটি উত্তম।”

১২। যদি ব্যাপারটি এ রকম হয় যে, প্রথম রাতে নামায পড়লে জামাতের সাথে পড়া যাবে। আর শেষ রাতে পড়লে একাকী পড়তে হবে; সেক্ষেত্রে জামাতের সাথে নামায পড়াই উত্তম। কেননা জামাতের সাথে পড়লে সেটাকে সমস্ত রাত নামায পড়া হিসেবে গণ্য করা হয়।

উমর (রাঃ) এর যামানায় এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের আমল। আব্দুর রহমান বিন উবাইদ আল-কারী বলেন: একবার রমযানের একরাত্রিতে আমি উমর (রাঃ) এর সঙ্গে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। এসে দেখলাম লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করছে। কেউ একাকী নামায পড়ছে। কারো পেছনে একদল লোক নামায পড়ছে। তখন তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ, আমি মনে করি আমি যদি এদের সবাইকে একজন ক্বারীর পেছনে একত্রিত করি সেটা উত্তম। এরপর তিনি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সবাইকে উবাই বিন কা'ব (রাঃ) এর পেছনে একত্রিত করলেন। তিনি বলেন: এরপর অন্য এক রাতে আমি তাঁর সাথে বের হলাম; গিয়ে দেখলাম লোকেরা তাদের ক্বারীর পেছনে নামায পড়ছে। তখন উমর (রাঃ) বলেন: এটি কতই না ভাল বিদাত! তারা যে সময়টায় ঘুমিয়ে থাকে সে সময়টা যে সময়টা নামায পড়ে সে সময়ের চেয়ে উত্তম (তিনি শেষ রাতের কথা বুঝাতে চেয়েছেন)। লোকেরা প্রথম রাত্রিতে নামায পড়তেন।”

যায়েদ বিন ওয়াহব বলেন: “রমযান মাসে আব্দুল্লাহ্ আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন এবং অনেক রাতে নামায শেষ করতেন।”

১৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম যখন তিন রাকাত বিতিরের নামায পড়তে নিষেধ করেন এবং এ নিষেধাজ্ঞার কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেন: “যেন তোমরা মাগরিবের নামাযের সাথে সাদৃশ্য না কর” সে জন্য মাগরিবের নামাযের সাথে সাদৃশ্য থেকে বের হওয়ার দুইটি পদ্ধতি হতে পারে:

ক. জোড় ও বেজোড় রাকাতের মাঝখানে সালাম ফিরিয়ে ফেলা (অর্থাৎ দুই রাকাতের পর সালাম ফিরিয়ে ফেলা)। এই অভিমতটি অধিক শক্তিশালী ও উত্তম।

খ. জোড় ও বেজোড় রাকাতের মাঝখানে না বসা। আল্লাহুই ভাল জানেন।

বিতিরের তিন রাকাত নামাযে কেরাত পড়ার পদ্ধতি:

১৪। তিন রাকাত বিশিষ্ট বিতিরের নামাযের প্রথম রাকাতে **سبح اسم ربك الأعلى** (সূরা আ'লা) পড়া সুন্নত। দ্বিতীয় রাকাতে **قل يا أيها الكافرون** (সূরা কাফিরুন) পড়া সুন্নত। তৃতীয় রাকাতে **قل هو الله أحد** (সূরা ইখলাস) পড়া সুন্নত। কখনও কখনও এর সাথে **قل أعوذ برب الفلق** (সূরা ফালাক) ও **قل أعوذ برب الناس** (সূরা নাস) মিলাবে।

সহিহ হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতিরের এক রাকাত নামাযে সূরা নিসার ১০০ আয়াত তেলাওয়াত করেছেন।

দোয়ায় কুনুত:

১৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দৌহিত্র হাসান বিন আলী (রাঃ) কে যে দোয়াটি শিখিয়েছেন সে দোয়াটি দিয়ে দোয়ায় কুনুত পড়া। সে দোয়াটি হচ্ছে, (اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ،) وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، لا اर्थ- (منجا منك إلا إليك) " हे आल्लाह! आपनि यादरके हेदायेत दियेछेन तादेर साथे आमाकेओ हेदायेत दिन । आपनि यादरके निरापदे रेखेछेन तादेर साथे आमाकेओ निरापदे राखुन । आपनि यादेर अतिभावकत्तु ग्रहण करेछेन तादेर साथे आमार अतिभावकत्तुओ ग्रहण करुन । आपनि आमाके या दियेछेन ताते वरकत दिन (प्रवृद्धि दिन) । आपनि ये अमङ्गल निर्धारण करे रेखेछेन ता हते आमाके रक्षा करुन । केनना, आपनिहै भाग्येर सिद्धान्त देन; आपनार ओपरे सिद्धान्त देयार केउ नेहै । आपनि यार अतिभावकत्तु ग्रहण करेन से कोनदिन लाञ्छित हवे ना । आर आपनि यार साथे शक्रता करेन से कोनदिन सम्मानित हते पावे ना । हे आमादेर प्रभु! आपनि वरकतपूर्ण ओ सुमहान । आपनार थेके मुक्तिर उपाय आपनार काछे फिरे आसा ।"

माके माके नबी सल्लल्लाह् आलाइहि ओया सल्लामेर उपर दरुद पड़वे; सामने ये दलिल उल्लेख करा हवे तार भित्तिते । उल्लेखित दोयार साथे शरियत अनुमोदित अन्य ये कोन दोया, सठिक ओ भाल अर्थबाधक दोया युक्त करते कोन बाधा नेहै ।

१६। ये व्यक्ति रूकुर परे दोयाय कनुत पड़ेन ताते कोन असुविधा नेहै ।

उल्लेखित दोयाय कनुतेर उपर बाड़ति दोया येमन, रमयानेर द्वितीय अर्धांशे काफेरदेर ओपर लानत करा, नबी सल्लल्लाह् आलाइहि ओया सल्लामेर उपर दरुद पड़ा ओ मुसलमानदेर जन्य दोया करते कोन असुविधा नेहै । केनना उमर (राः) एर समयकालेर इमामदेर आमल थेके एणुलो साव्युत आछे । इतिपूर्वे उल्लेखित आबुदुर रहमान बिन उबाइद आल-कारी एर हादिसेर शेयांशे एसेछे, " तारा शेष अर्धांशे काफेरदेर उपर लानत करे बलतेन: हे आल्लाह! आपनि सेसव काफेरदेर उपर लानत करुन; यारा आल्लाह् पथे बाधा दिछे, आपनार रासूलके मिथ्या प्रतिपन्न करछे, आपनार प्रतिश्रुतिर प्रति तादेर विश्वास नेहै । तादेर एकताके भेङ्गे दिन । तादेर अन्तरणुलोते भीति चूकिये दिन । तादेर उपर आपनार आयाव-गजब नायिल करुन । ओगो, सत्य उपासा! । एरपर नबी सल्लल्लाह् आलाइहि ओया सल्लामेर उपर दरुद पड़वे । साध्यानुयायी मुसलिम उम्माह् कल्याणेर जन्य दोया करवे । अतःपर मुमिनदेर जन्य इस्तिगफार करवे ।

तिनि बलेन: तिनि यखन काफेरदेरके लानत करा, नबी सल्लल्लाह् आलाइहि ओया सल्लामेर उपर दरुद पड़ा, मुमिन नर-नारीर जन्य
اللهم إني أعوذ برضائك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لأحصي ثناء عليك، أنت
نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاد يتملق

(अर्थ- हे आल्लाह! आमा एकात्र आपनारहै इबादत करि । आपनार जन्यहै नामाय पड़ि । आपनाकेहै सिजदा करि । आपनार दिकेहै धावित हहै । आपनारहै आनुगत्य करि । हे आमादेर प्रभु! आमा आपनार करुणा प्रत्याशा करि एवं आपनार सुनिश्चित शास्तिके भय करि । निश्चय आपनार शास्ति आपनार शक्रदेरके बेष्टन करवेहै ।" एरपर तकवीर दिये सेजदाय लूटिये पड़वे ।

बितिर नामायेर शेयांशे की बलवे:

१७। बितिरेर नामायेर शेष दिके (सालाम फिरानोर आगे किंवा परे) या बला सुन्नत:

اللهم إني أعوذ برضائك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لأحصي ثناء عليك، أنت
كما اثبتت على نفسك

(अर्थ- " हे आल्लाह! आमा आपनार असन्नुष्टि हते आश्रय चाहै आपनार सन्नुष्टिर माध्यमे । आपनार शास्ति हते आश्रय चाहै आपनार स्फमार माध्यमे । आपनार थेके आपनार काछेहै आश्रय चाहै । आपनार प्रशंसा करे आमा शेष करते पारव ना । आपनि सेहै प्रशंसार योग्य निजेर प्रशंसा आपनि निजे येभावे करेछेन ।" ।

१८। यखन बितिरेर नामायेर सालाम फिरावे तखन बलवे:

سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس

(সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস, সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস, সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস। অর্থ- 'কতই না পবিত্র ও মহান বাদশাহ') টেনে টেনে তিনবার বলবে এবং তৃতীয়বারে উচ্চস্বরে বলবে।

বিত্তিরের পর দুই রাকাত নামায পড়া:

১৯। যদি কেউ ইচ্ছা করেন তাহলে বিত্তিরের পর দুই রাকাত নামায পড়তে পারেন। যেহেতু এই আমল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। বরং তিনি বলেছেন: "নিশ্চয় এই সফর কষ্টকর ও কঠিন। অতএব, তোমাদের কেউ বিত্তিরের নামায পড়ার পর যেন দুই রাকাত নামায পড়ে নেয়। যদি সে জাগতে পারে ভাল; আর না পারলে এই দুই রাকাত তার জন্য যথেষ্ট।"

২০। এই দুই রাকাত নামাযে إِذْ لَزَلْنَا لَأَرْضَ (সূরা যিলযাল) ও قَلِيًّا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (সূরা কাফিরুন) পড়া সুন্নাহ।

তারাবীর নামায শেষে সম্মিলিত মুনাযাত

প্রশ্ন:

তারাবীর নামায সংক্রান্ত সহিহ সুন্নাহ, এ সংক্রান্ত নব-প্রচলিত বিদাত এবং তারাবীর নামায শেষে সম্মিলিত মুনাযাত সম্পর্কে আমি জানতে চাই।

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্নের প্রথমাংশের জবাব জানার জন্য এ ওয়েব সাইটের 'রোযা অধ্যায়' এর অধীনে 'তারাবী নামায ও লাইলাতুল কুদর' পরিচ্ছেদ পড়া যেতে পারে।

আর তারাবী নামাযের শেষে সম্মিলিত দোয়া: এটি একটি বিদাত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যা আমাদের শরিয়তে নেই সেটা প্রত্যাখ্যাত।" [সহিহ মুসলিম (৩২৪৩)]

তারাবী নামাযের শেষে পড়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে 'সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস' তিনবার বলা। তৃতীয়বারে উচ্চস্বরে বলা। উবাই বিন কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **سَبَّحَ** **اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى** (সূরা আ'লা), **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** (সূরা কাফিরুন) ও **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** (সূরা ইখলাস) দিয়ে বিত্তিরের নামায আদায় করতেন। যখন সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন, **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ** ('সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস', 'সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস', 'সুবহানালা মালিকিল কুদ্দুস') এবং তাঁর স্বর উঠু করতেন। [মুসনাদে আহমাদ (১৪৯২৯), সুন্নাহে আবু দাউদ (১৪৩০), সুন্নাহে নাসাঈ (১৬৯৯), আলবানী 'সহিহুন নাসাঈ' গ্রন্থে (১৬৫৩) হাদিসটিকে 'সহিহ' আখ্যায়িত করেছেন]

তাছাড়া বিত্তিরের নামাযে ইমাম তো দোয়ায় কুনুত পড়বেন এবং ইমামের পিছনে মুসল্লিরা 'আমীন' বলবে; ঠিক যেভাবে উমর (রাঃ) এর যামানায় উবাই বিন কাব (রাঃ) যখন লোকদের নিয়ে তারাবী নামায আদায় করতেন তখন করতেন। সুতরাং সম্মিলিত মুনাযাতের বিদআতের পরিবর্তে এটাই তো যথেষ্ট। জটনক কবি ঠিকই বলেছেন:

সালাফদের অনুসরণেই প্রভুত কল্যাণ, আর পরবর্তীদের নতুনত্বেই যত অকল্যাণ

আল্লাহুই ভাল জানেন।

তারাবীর নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইমামের অনুসরণ করা

প্রশ্ন

অগ্রগণ্য মতানুযায়ী তারাবী নামায যদি ১১ রাকাত হয়; কিন্তু আমি এক মসজিদে নামায পড়েছি সেখানে ২১ রাকাত তারাবী পড়া হয়। এমতাবস্থায়, আমি কি ১০ রাকাত পড়ে মসজিদ ত্যাগ করতে পারি; নাকি আমার জন্য তাদের সাথে ২১ রাকাত নামায পড়াই উত্তম?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

উত্তম হচ্ছে ইমামের সাথে সম্পূর্ণ নামায আদায় করা, যতক্ষণ না ইমাম নামায শেষ করেন; এমনকি ইমাম যদি ২১ রাকাতের বেশি পড়েন সেক্ষেত্রেও। কেননা বেশি পড়া জায়েয আছে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে ব্যাপকতা রয়েছে। তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইমামের সাথে কিয়ামুল লাইল (রাতের নামায) আদায় করে যতক্ষণ না ইমাম নামায শেষ করেন; আল্লাহ তার জন্য গোটা রাত নামায আদায় করার সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন।” [সুনানে নাসাঈ, ও অন্যান্য: নাসাঈর ‘রমযানের কিয়াম অধ্যায়’] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে আরও এসেছে, “রাতের নামায দুই রাকাত, দুই রাকাত। যদি তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা কর তাহলে এক রাকাত বিতির নামায (বেজোড় নামায) পড়ে নাও।” [সাতজন গ্রন্থাকার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; আর এটি নাসাঈর ভাষ্য]

নিঃসন্দেহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত সুন্নাহু ধরে রাখাই উত্তম, অধিক সওয়াবের সম্ভাবনাময়; নামায দীর্ঘ করা ও সুন্দর করার মাধ্যমে। কিন্তু, যদি ব্যাপারটি এমন হয় যে, রাকাত সংখ্যার কারণে হয়তো ইমামকে রেখে চলে যেতে হবে কিংবা বাড়তি সংখ্যায় ইমামের সাথে থাকতে হবে; সেক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে পূর্বেক্ত হাদিসগুলোর কারণে ইমামের সাথে থাকা। তবে ইমামকে সুন্নাহু অনুসরণের তাগিদ দিতে হবে।

জুমার রাত যদি বেজোড় তারিখে পড়ে- তাহলে কি সেটা কদরের রাত?

প্রশ্ন:

এ বছরের সাতাশে রমযান জুমাবারে হবে। ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: “রমযানের শেষ দশকের বেজোড় কোন রাত যদি জুমাবারে পড়ে তাহলে সে রাত্রি লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক” — এ কথা কি সঠিক?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

উল্লেখিত উক্তিটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর উক্তি হিসেবে আমরা পাইনি। বরং ইবনে রজব আল-হাম্বলি (রহঃ) এ উক্তিটি ইবনে হুবাইরা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: “যদি রমযানের শেষ দশকের কোন এক বেজোড় রাত শুক্রবারের রাত হয় তাহলে সেটি লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক” [ইবনে রজব লিখিত ‘লাতয়েফুলা মাআরিফ’ পৃষ্ঠা-২০৩]

এ উক্তিটির প্রবক্তা এ ভিত্তিতে কথাটি বলেছেন যে, শুক্রবারের রাত হচ্ছে- সপ্তাহের সবচেয়ে উত্তম রাত। তাই রমযানের শেষ দশকের বেজোড় কোন রাত যদি শুক্রবার রাতে পড়ে তাহলে সেটি লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে, এ অভিমতটির পক্ষে আমরা কোন হাদিস কিংবা সাহাবীদের কোন বক্তব্য পাইনি। হাদিস থেকে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে, লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ দশদিনের মধ্যে ঘুরতে থাকে। শেষ দশদিনের বেজোড় রাতগুলো লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর এ রাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় রাত হচ্ছে- সাতাশে রমযান; তবে সুনিশ্চিত করার সুযোগ নেই যে, এটাই লাইলাতুল কদর।

মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে শেষ দশদিনের প্রতিরাতে লাইলাতুল কদর অন্বেষণে সচেষ্ট হওয়া।

শাইখ সুলাইমান আল-মাজেদ (হাফিয়াহুল্লাহ) বলেন: “ শরিয়তের এমন কোন দলিল আমাদের জানা নেই যে, শুক্রবার রাত বেজোড় রাত হলে সেটি লাইলাতুল ক্বদর হবে। অতএব, এ ধরনের কোন নিশ্চয়তা দেয়া কিংবা এ অভিমতের শুদ্ধতায় বিশ্বাস করা— ঠিক হবে না। বরং শরিয়তের বিধান হচ্ছে— শেষ দশরাত্বে লাইলাতুল ক্বদর অল্পে সচেষ্টিত থাকা। যে ব্যক্তি শেষ দশরাতের প্রতিটি রাতে আমল করবে এটা নিশ্চিত যে, সে লাইলাতুল ক্বদর পাবে। আল্লাহই ভাল জানেন।” [সমাণ্ড]

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: “ লাইলাতুল ক্বদর রমযানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরপর রমযানের শেষ দশদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আবার শেষ দশদিনের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ; সুনির্দিষ্ট কোন রাতের মধ্যে নয়। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলো সম্মিলিতভাবে এ অর্থই প্রমাণ করে।” [ফাতহুল বারী (৪/২৬০) থেকে সমাণ্ড]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: “ উবাই বিন কাব (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে যে, তিনি হলফ করে বলতেন: লাইলাতুল ক্বদর হচ্ছে— সাতাশে রমযান”। এ মাসয়ালার অনেক অভিমতের মধ্যে এটিও একটি। তবে, অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে— এটি রমযানের শেষ দশরাতের অজ্ঞাত কোন এক রাত। এ দশরাতের মধ্যে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক হচ্ছে— বেজোড় রাতগুলো। বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে অধিক আশাব্যঞ্জক হচ্ছে— ২৭ রমযান, ২৩ রমযান ও ২১ রমযান। অধিকাংশ আলেমের মতে, এটি নির্দিষ্ট কোন একটি রাত; আবর্তিত হয় না। কিন্তু, সুস্বদর্শী আলেমদের মতে, লাইলাতুল ক্বদর আবর্তিত হয়। কোন বছর ২৭ শে রমযান, কোন বছর ২৩ রমযান এবং কোন বছর ২১ শে রমযান কিংবা অন্য কোন রাত। এ মতটির মাধ্যমে বিপরীতমুখী সবগুলো হাদিসের মাঝে সমন্বয় করা যায়।”

[ইমাম নববীর ‘শারহু সহিহ মুসলিম’ (৬/৪৫) থেকে সমাণ্ড]

আরও জানতে নং **50693** প্রশ্নোত্তর দেখা যেতে পারে।

আল্লাহই ভাল জানেন।

বিতরের নামায কি সালাতুল লাইল (রাতের নামায) থেকে আলাদা কিছু

প্রশ্ন

বিতরের নামায ও রাতের নামাযের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বিতরের নামাযও এক প্রকার রাতের নামায। তবে, তারপরেও রাতের নামাযের সাথে বিতরের নামাযের কিছু পার্থক্য রয়েছে।

শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন:

বিতরের নামায একপ্রকার রাতের নামায, এটি আদায় করা সুন্নত এবং এটি রাতের নামাযের সর্বশেষ নামায। বিতরের নামায এক রাকাত; যে একরাকাত নামায দিয়ে রাতের নামাযের সমাপ্তি টানা হয়। এটি রাতের শেষাংশে কিংবা মধ্যরাতে কিংবা এশার পর রাতের প্রথমাংশে আদায় করা হয়। যত রাকাত ইচ্ছা রাতের নামায পড়ার পর এক রাকাত বিতরের নামায দিয়ে শেষ করা হয়। [সমাণ্ড]

[ফাতাওয়া বিন বায (১১/৩০৯)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

সুন্নত হচ্ছে- কোন কথা কিংবা কাজের মাধ্যমে রাতের নামায থেকে বিতরের নামাযকে আলাদা করা। অনুরূপভাবে আলেমগণ হুকুম ও পদ্ধতির দিক থেকে এ দুই নামাযের মধ্যে পার্থক্য করেছেন:

কোন কথার মাধ্যমে এ দুই নামাযের মধ্যে পার্থক্য করার দলিল হচ্ছে- ইবনে উমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, একলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ রাতে নামাযের পদ্ধতি কী? তিনি বললেন: দুই রাকাত, দুই রাকাত। যদি তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা কর, তাহলে এক রাকাত বিতির পড়ে নাও [সহিহ বুখারী, দেখুন: ফাতহুল বারী (৩/২০)]

কোন কাজের মাধ্যমে এ দুই নামাযের মধ্যে পার্থক্য করার দলিল হচ্ছে- আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়তেন; আর আমি বিছানাতে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন বিতিরের নামায পড়তে চাইতেন তখন আমাকে জাগিয়ে দিতেন; তখন আমিও বিতিরের নামায পড়ে নিতাম [সহিহ বুখারী, দেখুন: ফাতহুল বারী (২/৪৮৭), সহিহ মুসলিম (১/৫১) এর ভাষ্য হচ্ছে- “তিনি রাতে নামায পড়তে থাকতেন এবং আমি তাঁর সামনে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। যখন বিতির বাকী থাকত তখন তিনি আয়েশাকে জাগিয়ে দিতেন এবং আমিও বিতির নামায পড়ে নিতাম।” আরেকটি বর্ণনা (১/৫০৮) এর ভাষ্য হচ্ছে- “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তের রাকাত রাতে নামায আদায় করতেন। এর মধ্যে পাঁচ রাকাত হচ্ছে- বিতিরের নামায। এ পাঁচ রাকাতের মধ্যে বসতেন না; শুধু শেষ রাকাতে বসতেন।” আয়েশা (রাঃ) থেকে অপর বর্ণনায় (১/৫১৩) এসেছে- যখন সাদ বিন হিশাম বিন আমের তাঁকে বললেন: আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিতিরের নামায সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন তিনি বলেন: “তিনি নয় রাকাত বিতির নামায পড়তেন। অষ্টম রাকাতে গিয়ে তিনি বসতেন এবং যিকির আযকার পড়তেন, আল্লাহর প্রশংসা করতেন, দোয়া পড়তেন, এরপর সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। এরপর নবম রাকাত পড়তেন। অতঃপর যখন বসতেন তখন যিকির-আযকার পড়তেন, আল্লাহর প্রশংসা করতেন, দোয়া পড়তেন। এরপর আমাদেরকে শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন।”

আলেমগণ কর্তৃক বিতিরের নামায ও রাতে নামাযের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য করা: আলেমগণ বিতিরের নামায ওয়াজিব কি, ওয়াজিব না— এ নিয়ে মতপার্থক্য করেছেন। ইমাম আবু হানিফার মতে, ওয়াজিব। এটি ইমাম আহমাদ থেকেও বর্ণিত আছে; যা ‘আল-ইনসাফ’ ও ‘আল-ফুরূ’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আহমাদ বলেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিতিরের নামায ত্যাগ করে সে মন্দ লোক; তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা উচিত।

তবে, হাম্বলি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, বিতিরের নামায সুন্নত। ইমাম মালেক ও ইমাম শায়েফিও এই অভিমত।

পক্ষান্তরে, রাতে নামায নিয়ে এসব মতানৈক্য নেই। ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৩/২৭) এসেছে: রাতে নামায ওয়াজিব হওয়া মর্মে অন্য কারো কথা নয়; কিছু তাবেয়ীদের উক্তি উল্লেখ করছি। ইবনে আব্দুল বারর বলেন: “কোন কোন তাবেয়ী ছাগলের দুধ দোহনের মত সামান্য সময়ের জন্যে হলেও রাতে নামায পড়া ওয়াজিব হওয়া মর্মে বিরল অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে, আলেমসমাজ রাতে নামাযকে মুস্তাহাব মনে করেন [সমাণ্ড]

তবে, বিতিরের নামায ও রাতে নামাযের মধ্যে পদ্ধতিগত প্রার্থকের ব্যাপারে আমাদের হাম্বলি মাযহাবের আলেমগণ স্পষ্টভাবে প্রার্থকের কথা বলেন: তারা বলেন: রাতে নামায হচ্ছে- দুই রাকাত, দুই রাকাত। তাঁরা বিতিরের নামাযের ক্ষেত্রে বলেন: যদি কেউ পাঁচ রাকাত কিংবা সাত রাকাত বিতির নামায পড়ে তাহলে শুধু শেষ রাকাতে বসবে। আর যদি নয় রাকাত বিতির পড়ে তাহলে অষ্টম রাকাত শেষে বসবে, তাশাহুদ পড়বে, এরপর সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং নবম রাকাত পড়বে। তারপর তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। ‘যাদুল মুসকাতিন’ গ্রন্থকার এ কথা বলেছেন [সমাণ্ড]

মাজমু ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৩/২৬২-২৬৪)

এতে করে জানা গেল যে, বিতিরের নামাযও রাতে নামায। কিন্তু, বিতিরের নামাযের সাথে রাতে নামাযের কিছু পার্থক্য আছে। যেমন- পদ্ধতিগত পার্থক্য।

আল্লাহই ভাল জানেন।

একই রাতে কি দুইবার বিতির নামায পড়া যাবে; যদি কেউ ইমামের সাথে বিতির নামায পড়ার পর আবার নামায পড়ে

প্রশ্ন:

পর সমাচার আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, তারাবির নামাযের শেষে আমরা জোড় সংখ্যক ও বিতির (বেজোড় সংখ্যক) নামায আদায় করি। আমি শুনেছি যে, আমাদের সর্বশেষ নামায বিতির বা বেজোড় সংখ্যা হওয়া আবশ্যিক। এর মানে এটা যে, আমরা যদি রাতে আরও নামায পড়ি তখন জোড়ের সাথে বিতির (বেজোড়) নামায আবার পড়ব? নাকি বিতির নামায প্রথমে আদায় না করে পরে একবার মাত্র পড়তে হবে?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

কোন মুসলিম যদি বিতির নামায পড়ে ফেলার পর রাতের বেলায় আরও নামায পড়তে চায় তাহলে তিনি দুই রাকাতদুই রাকাত করে নামায আদায় করবেন। বিতির নামাযের পুনরাবৃত্তি করবেন না। রাতের সর্বশেষ নামায যেন হয় বিতির বা বেজোড় এ সংক্রান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশটি মুস্তাহাব বা উত্তমতা সাব্যস্তকারী নির্দেশ; ফরযিয়ত বা আবশ্যিকতা সাব্যস্তকারী নির্দেশ নয়। দেখুন ৩৭৭২৯ নং প্রশ্নোত্তর।

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

আমি যদি রাতের প্রথমভাগে বিতির নামায পড়ে ফেলি; এরপর রাতের শেষভাগে কিয়ামুল লাইল পড়ি সেক্ষেত্রে আমি কি পদ্ধতিতে নামায পড়ব? উত্তরে তিনি বলেন: যদি আপনি বিতির নামায পড়ে ফেলেন এরপর রাতের শেষভাগে আল্লাহ আপনাকে কিয়ামুল লাইল পড়ার তাওফিক দেন তাহলে আপনি জোড় সংখ্যক অর্থাৎ দুই রাকাত দুই রাকাত করে নামায আদায় করবেন; বিতির বা বেজোড় সংখ্যক নয়। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী “ এক রাতে দুইবার বিতির নেই”।

আয়েশা (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতির নামায পড়ে ফেলার পর বসে বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। এ দুই রাকাত নামায আদায় করার হেকমত হলো – আল্লাহই ভাল জানেন- উম্মতকে এ বিষয়ে অবহিত করা যে, বিতির নামাযের পর নামায পড়া জায়েয আছে। সমাপ্ত

বিন বাযের ফতোয়াসমগ্র (১১/৩১১)

আল্লাহই ভাল জানেন।

যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছে তিনি লাইলাতুল কদরে কী কী ইবাদত করতে পারবেন?

প্রশ্ন

যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছে তিনি লাইলাতুল কদরে কী করবেন? তিনি কি ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হয়ে তার সওয়াব বাড়তে পারবেন? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে এই রাতে তিনি কী কী ইবাদত করতে পারবেন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছে তিনি শুধুনামায, রোজা, বায়তুল্লাহ তওয়াফ ও মসজিদে ইতিকাফ ব্যতীত বাকী সমস্ত ইবাদত করতে পারেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি রমজানের শেষ দশকে রাত জাগতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত: “ শেষ দশক প্রবেশ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকোমর বেঁধে নামতেন। তিনি নিজে রাত জাগতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকে জাগিয়েদিতেন।” [সহীহ বুখারী (২০২৪) ও সহীহ মুসলিম (১১৭৪)]

ইহইয়াউল লাইল বা রাত জাগা শুধু নামাযের জন্য বিশিষ্ট নয়, বরং তা সকল ইবাদতের মাধ্যমে হতে পারে। আলেমগণ الخياء اللیل কথাটিকে এই অর্থব্যখ্যা করেছেন।

ইবনে হাজার বলেছেন: “أحباً ليله” অর্থ-তিনি ইবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে রাত জাগতেন। “নববীরাহিমাছল্লাহ বলেছেন: “অর্থাৎ তিনি সালাত ও অন্য ইবাদতের মাধ্যমে গোটা রাত কাটিয়ে দিতেন।”

আউনুল মাবুদগ্রন্থেবলাহয়েছে: “ অর্থাৎনামায, যিকির-আযকারওকুরআনতिलाওয়াতেরমাধ্যমে (রাত কাটিয়ে দেয়া)।”

লাইলাতুল কদরেবান্দা যে যে ইবাদত করতে পারেন তার মধ্যে কিয়ামুল লাইল (রাতের নামায) সর্বোত্তম। এজন্য নবীসাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে বা ভাগ্য রজনীতেনামায আদায় করবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।” [সহীহ বুখারী (১৯০১)ও সহীহ মুসলিম (৭৬০)]

যেহেতু যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছেতার জন্য নামায আদায় করা নিষিদ্ধ তাই তিনিনামাযব্যতীত অন্য সব ইবাদত করার জন্য রাত জাগতে পারেন। যেমন:

১। কুরআন তেলাওয়াত করা, দেখুন (2564) নং প্রশ্নের উত্তর।

২। যিকির করা। যেমন: সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল হামদু লিল্লাহ ইত্যাদি জপা। সুতরাং যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছে তিনি বেশী বেশীসুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি ওয়া সুবহানাল্লাহিল আযিম ইত্যাদি জপতে পারেন।

৩। ইস্তিগফার করা: তিনি বেশী বেশী ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’(আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি) পাঠ করতে পারেন।

৪। দোয়া করা: তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে বেশী করে দোয়া করতে পারেন এবং তাঁর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করতে পারেন। দোয়া হল সর্বোত্তম ইবাদতগুলোর অন্যতম। এটা এতবেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন: “ দোয়া ইহল-ইবাদত।” [জামে তিরমিযী (২৮৯৫), আলবানী’ সহীহআত-তিরমিযী’ গ্রন্থে হাদিসটিকেসহীহবলেউল্লেখকরেছেন (২৩৭০)]

যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছে তিনি লাইলাতুল কদরেউল্লেখিত ইবাদতগুলোসহ অন্যান্য ইবাদত পালন করতে পারেন।

আমরা আল্লাহ তা’আলার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যা পছন্দ করেন ও যাতে সন্তুষ্ট হনআমাদেরকে যেন তা পালন করারতাওফিক দেন এবং আমাদের নেক আমলগুলো কবুল করে নেন।

তারাবীর নামায ও কিয়ামুল লাইল কি এক জিনিশ

প্রশ্ন

আমি কিয়ামুল লাইল ও তারাবীর নামাযের মধ্যে পার্থক্য জানতে চাই।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তারাবীর নামাযকিয়ামুল লাইলের অন্তর্ভুক্ত। এ দুইটি পৃথক কোন সালাত নয়, যেমনটিঅনেক সাধারণ মানুষ ধারণা করে থাকেন। বরং রমজান মাসে যে ‘কিয়ামুল লাইল’ করা হয় সেটাকে সালাতুত তারাবী’ বা বিরতিপূর্ণ নামায বলা হয়। কারণসলফে সালেহীন (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণের প্রজন্ম)যখন এই সালাত আদায় করতেন তখন তাঁরা প্রতি দুই রাকাত বা চার রাকাত অন্তর বিরতি নিতেন। কেননা তাঁরা মহান মৌসুমকে কাজে লাগাতে ও রাসূলের হাদিস“ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজান মাসে কিয়ামুল লাইল পালন করে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়” [বুখারী (৩৬)] এ বর্ণিত সওয়াব পাওয়ার আশায় নামাযকে দীর্ঘ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন।

আল্লাহ তা’আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

যিনি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতে চান তিনি কি ইমামের সাথে বিতিরের নামায পড়বেন?

প্রশ্ন:

আমি একজন মুসলিম নারী। আমি নিয়মিত তারাভী সালাত আদায় করি। আমি যদি সালাত আদায় করতে মসজিদে না যাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার ছোট ভাই সেও মসজিদে যায় না। মসজিদে গেলে আমরা ইমামের সাথে বিতিরের সালাত আদায় করি। আমি শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলেছি। তবে বিতিরের সালাত আদায় করার পর তো আর তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে পারি না। এখন আমার ক্ষেত্রে কোনটি বেশি ভাল? তারাভীর সালাত আদায় করতে মসজিদে যাওয়া যাতে আমার ভাই মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারে। নাকি বাসায় থেকে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা। এই দুইটির মধ্যে কোনটিতে বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আপনার মসজিদে যাওয়া, তারাভী নামাযের জামাতে উপস্থিত হওয়া, মুসলিম বোনদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা ইত্যাদি সবই ভাল আমল; আলহামদুলিল্লাহ। এবং আপনার ভাইকে ভাল কাজে সহায়তা করা এটা আরো একটি ভাল আমল। আপনার এই আমলগুলো পালন করা ও শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার মাঝে তো কোন সংঘর্ষ নেই। আপনার পক্ষে এ ফজিলতপূর্ণ কাজগুলোর মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব।

এ ক্ষেত্রে দুটো পদ্ধতি হতে পারে:

প্রথমত : আপনি ইমামের সাথে বিতিরের নামায আদায় করে ফেলবেন। তারপর দুই রাকাত রাকাত করে আপনার সুবিধামত যত রাকাত সম্ভব তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে নিবেন। তবে বিতিরের সালাত পুনরায় পড়বেন না। কারণ এক রাতে দুইবার বিতির পড়া যায় না।

দ্বিতীয়ত : আপনি বিতিরের নামায শেষ রাতের জন্য রেখে দিবেন। অর্থাৎ ইমাম যখন বিতিরের সালাত আদায় শেষে সালাম ফিরাবেন তখন আপনি সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং অতিরিক্ত এক রাকাত যোগ করবেন যাতে শেষ রাতে আপনি বিতির আদায় করতে পারেন।

শাইখ ইবনে বাযরাহিমাছুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: ইমাম বিতিরের সালাত আদায় শেষ করলে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে যায় এবং অতিরিক্ত এক রাকাত যোগ করে যাতে শেষ রাতে তিনি বিতির পড়তে পারেন। এই আমলের হুকুম কি? এতে কি তিনি "ইমামের সাথে সালাত সম্পন্ন করেছেন" ধরা যাবে? তিনি উত্তরে বলেন: "আমরা এতে কোন দোষ দেখি না। আলেমগণ এটা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। তিনি এটা করেন যেন বিতির (বেজোড়) নামাযটা শেষ রাতেই আদায় করতে পারেন। তাঁর ক্ষেত্রে এ কথা বলাও সত্য হবে যে, "ইমাম শেষ করা পর্যন্ত তিনি ইমামের সাথে নামায আদায় করেছেন"। কারণ ইমাম নামায শেষ করা পর্যন্ত তিনি তো ইমামের সাথে ক্রিয়াম করেছেন এবং এরপর তিনি এক রাকাত যোগ করেছেন অন্য একটি শরয়ি কল্যাণের কারণে। সেটা হলো-বিতির (বেজোড়) নামাযটা যাতে শেষ রাতে আদায় করা যায়। তাই এতে কোন সমস্যা নেই। অতিরিক্ত এক রাকাতের কারণে এ ব্যক্তি 'যারা ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত নামায পড়েছেন' তাদের দল থেকে বের হয়ে যাবে না। বরং তিনি তো ইমামের সাথে সম্পূর্ণ নামায আদায় করেছেন। তবে ইমামের সাথে নামায শেষ করেননি; কিছুটা বিলম্বে শেষ করেছেন।" সমাপ্ত [মাজমু ফাতাওয়াইবনে বায (১১/৩১২)]

শাইখ ইবনে জিবরীনহাফিজুল্লাহকে এই প্রশ্নের মত একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, উত্তরে তিনি বলেন: "মুজাদির ক্ষেত্রে উত্তম হল ইমামের অনুসরণ করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তারাভী ও বিতির নামায শেষ করেন। যাতে করে তার ক্ষেত্রে এই কথা সত্য হয় যে তিনি ইমামের সাথে ইমাম শেষ করা পর্যন্ত সালাত আদায় করেছেন এবং তার জন্য সারারাত ক্রিয়াম করার সওয়াব লেখা হয়; যেমনটি ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য 'আলেমগণ হাদিস রেওয়াজেত করেছেন।"

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যদি তিনি তাঁর (ইমামের) সাথে বিতির নামায আদায় করেন তবে শেষ রাতে বিতির নামায আদায় করার প্রয়োজন নেই। যদি তিনি শেষ রাতে উঠেন তবে তিনি তার জন্য যত রাকাত সম্ভব তা জোড় সংখ্যায় (অর্থাৎ দুই দুই রাকাত) আত করে) আদায় করবেন। বিতিরের পুনরাবৃত্তি করবে না, কারণ এক রাতে দুইবার বিতির হয় না।

আর কিছু আলেম ইমামের সাথে বিতিরকেজোড় বানিয়ে (অর্থাৎ এক রাকাত যোগ করে) পড়াকে উত্তম হিসেবে গণ্য করেছেন। তা হল এভাবে যে ইমাম সালাম ফিরানো শেষে তিনি অতিরিক্ত এক রাকাত সালাত আদায় করে তারপর সালাম ফিরাবেন এবং বিতিরের নামায শেষরাতে তাহাজ্জুদের সাথে পড়ার জন্য রেখে দিবেন। এর দলীল হচ্ছে- নবীসাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

(فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاجِدَةً تُؤْتِرُ لَهُمَا قَدْ صَلَّى)

“আপনাদের মধ্যে কেউ ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে আদায় করা সালাতের সাথে এক রাকাত বিতির পড়ে নিবেন।”

তিনি আরও বলেছেন :

(اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا)

“আপনারা বিতিরের (বেজোড়ের) মাধ্যমে আপনাদের রাতের সালাত সমাপ্ত করুন।” সমাণ্ডাফাতাওয়া রমজান (পৃঃ ৮২৬)

আল-লাজনা-দায়িমা দ্বিতীয় ব্যাপারটিকে উত্তম বলে ফতোয়া দিয়েছে।

[ফাতাওয়াল্ লাজনাহ আদদায়িমা (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র) (৭/২০৭)]

আমরা আল্লাহর কাছে আপনার জন্য তাওফিক ও দ্বীনি অটলতার দোয়া করছি। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

নির্দিষ্ট কোন রাতকে লাইলাতুল কদর হিসেবে সুনিশ্চিত করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়

প্রশ্ন:

অন্য কোন রাত্ৰিতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় না করে শুধু লাইলাতুল কদরের রাত্ৰিতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার বিধান কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক:

লাইলাতুল কদর বা ভাগ্য রজনীতেইবাদত করার মহান ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মহান প্রতিপালক উল্লেখ করেছেন যে, এই রজনী হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেছেন যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে ও প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল কদরে নামায পড়বে তার অতীতের সমস্ত গুনাহমাফ করে দেয়া হবে।

আল্লাহতাআলা বলেছেন:

১. নিশ্চয়ই আমি এটি নাযিল করেছিলাইলাতুল কদরে। ২. তোমাকেকিসে জানাবে লাইলাতুল কদর কি? ৩. লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। ৪. সেরাতে ফেরেশতারাও রাহ (জিবরাইল) তাঁদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়েঅবতরণ করেন। ৫. শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।” [সূরা আল কদর, ৯৭: ১-৫]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুনবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল কদরনামায পড়বে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।” [সহীহ বুখারী (১৯০১) ও মুসলিম (৭৬০)]হাদিসে “ঈমান সহকারে” কথাটির অর্থ হচ্ছে- এই রাতের মর্যাদা ও বিশেষ আমল শরিয়তসম্মত হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। আর “প্রতিদানের আশায়” কথাটির অর্থ হচ্ছে- নিয়তকে আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠ করা।

দুই :

কোনরাতটিলাইলাতুলক্বরতানিয়ে'আলেমদেরমাবেবিভিন্ন অভিমতরয়েছে।'ফাৎহুল বারী' গ্রন্থেউল্লেখ করাহয়েছে যেএ সংক্রান্ত অভিমত৪০ টিরউপরে পৌঁছেছে। এক্ষেত্রেসবচেয়েসঠিকমতহললাইলাতুল কদররমজান মাসেরশেষদশকেরকোনএক বেজোড়রাত।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামবলেছেন: "রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতেলাইলাতুল ক্বর অনুসন্ধান কর।" [সহীহ বুখারী (২০১৭) ও সহীহমুসলিম (১১৬৯), তবে শব্দচয়ন ইমাম বুখারী]

ইমাম বুখারী এই হাদিসটির শিরোনাম লিখেছেন" রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত লাইলাতুল ক্বর অনুসন্ধান"। এই রাতটি গোপন রাখার পেছনে রহস্য হল মুসলমানদেরকে রমজানের শেষ দশকের সবগুলো রাতে 'ইবাদত-বন্দেগী, দোয়াও যিকিরের উপর সক্রিয় রাখা। একই রহস্যের কারণে জুমার দিনেরয়ে সময়টিতে দোয়াকবুল হয় তা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি এবং একই কারণে আল্লাহর ঐ ৯৯ টি নাম সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি যে নামগুলোর ব্যাপারেনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামবলেছেন:" যে ব্যক্তিনামগুলো গণনা করবে [অর্থাৎমুখস্ত করবে, এর অর্থ বুঝবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে] সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [সহীহ বুখারী (২৭৩৬) ও সহীহ মুসলিম (২৬৭৭)] হাফেজ ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

" তাঁর বক্তব্যঅর্থাৎইমামবুখারীর বক্তব্য" পরিচ্ছেদ: রমজানেরশেষদশকেরবেজোড়রাতলাইলাতুলক্বরঅনুসন্ধান" এইশিরোনাম থেকে লাইলাতুলক্বররমজান মাসে হওয়া,রমজানের শেষ দশকে হওয়া এবং শেষদশকেরবেজোড়কোন রাতে হওয়ার ব্যাপারে প্রবলইঙ্গিতপাওয়াযায়। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে সেটিকোনরাত- এমনকোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এ সংক্রান্ত হাদিসের বর্ণনাগুলো একত্রিত করলে এতটুকু প্রমাণই ফুটে উঠে।" [ফাৎহুল বারী (৪/২৬০)]

তিনি আরও বলেছেন :

'আলেমগণ বলেন, এই রাতটির নির্দিষ্ট তারিখ গোপন রাখার পিছনে হিকমত হল মানুষ যেন এ রাতের মর্যাদা লাভের জন্য চেষ্টা সাধনা করে। নির্দিষ্ট তারিখ জানা থাকলে মানুষ শুধু নির্দিষ্টভাবে সেই রাতে ইবাদত-বন্দেগীকরত। একই ধরনের ব্যাখ্যা জুমার দিনের (দোয়াকবুলের) সুনির্দিষ্ট সময় গোপন রাখার ব্যাপারে ইতিপূর্বেউল্লেখ করা হয়েছে।" [ফাৎহুল বারী (৪/২৬৬)]

তিন: পূর্বাঙ্কআলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, কারো পক্ষে নির্দিষ্ট কোনরাতের ব্যাপারে এ নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয় যে, এটিই 'লাইলাতুল ক্বর'। বিশেষতঃ যখন আমরা জানি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামএটি কোন রাত তা সুনির্দিষ্টভাবে উন্মতকে জানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা এর জ্ঞান উঠিয়ে নিয়েছেন। উবাদা ইবনেসামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম 'লাইলাতুল ক্বর' এর ব্যাপারে খবর দিতে বের হলেন। এ সময় দু'জন মুসলমানঝগড়া করছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বললেন :

" আমি আপনাদেরকে 'লাইলাতুল ক্বর' এর ব্যাপারে অবহিত করতে বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হওয়ায়তা (সেই জ্ঞান) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আশা করি উঠিয়ে নেয়াটা আপনাদের জন্য বেশি ভাল হয়েছে। আপনারা সপ্তম (২৭ তম), নবম (২৯ তম) এবং পঞ্চম (২৫ তম) তারিখে এর সন্ধান করুন।" [সহীহ বুখারী (৪৯)]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিরআলেমগণ বলেন:

" রমজান মাসে নির্দিষ্ট কোন রাতকে লাইলাতুল ক্বর হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য সুস্পষ্ট দলীলের প্রয়োজন। তবে অন্যান্য রাতের চেয়ে শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোর কোন একটিতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর এর মধ্যে ২৭তম রাতে হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন হাদিস থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি।"

[ফাতাওয়াল্ লাজনাহ আদদায়িমা (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র) (১০/৪১৩)]

তাই একজন মুসলিমের নির্দিষ্ট কোন রাতকে লাইলাতুল ক্বর হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। কারণ এতে করে এমন বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়, আসলে যে বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভবপর নয়। এবং এতে করেব্যক্তি নিজেকেপ্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করার সম্ভাবনা তৈরী হয়। হতে পারে লাইলাতুল কদর ২১তম রাতে অথবা ২৩তম রাতে অথবা ২৯তম রাতে। তাই কেউ যদি শুধু ২৭তম রাতে নামায আদায় করে এতে করেতিনি অফুরন্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবেন এবংএই মুবারকময় রাতের ফজিলত হারাবেন। সুতরাং একজন মুসলিমের উচিত গোটা রমজান জুড়ে আনুগত্য ও 'ইবাদতের কাজে সর্বোচ্চ সাধনা চালানো। আর শেষ দশকে আরো বেশি তৎপর হওয়া। এটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামএর আদর্শ। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন

:“ (রমজানের শেষ) দশ রাত্রি শুরু হলে নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোমর বেঁধে নামতেন। তিনি নিজে রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকে (ইবাদাতের জন্য) জাগিয়ে দিতেন।” [সহীহ বুখারী (২০২৪) ও সহীহ মুসলিম (১১৭৪)] আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

তারাবীর সালাতে মুজাদির কুরআন বহন করা

প্রশ্ন:

তারাবীর সালাতে ইমামের পেছনে মুজাদির কুরআন ধরে রাখা কি জায়েয?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

মুজাদির জন্য উত্তম হচ্ছে- তা না করে চুপ থাকা এবং ইমামের কুরআন তেলাওয়াত শোনা। শাইখ আব্দুল আজীজ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বাযরাহিমাছল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: তারাবীর সালাতে মুজাদির কুরআন বহনের হুকুম কি?

তিনি উত্তরে বলেন: “এর কোন ভিত্তি আমার জানা নেই। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে বেশি শক্তিশালী মনে হয় যে, সে খুশু (বিনস্রতা) অবলম্বন করবে এবং ধীরস্থিরতা বজায় রাখবে; কুরআন বহন করবে না। বরং বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে, এটি সুন্নত। অর্থাৎ সে তার ডান হাত বাম হাতের কজি ও বাহুর উপরে রাখবে এবং উভয় হাত বুকুর উপর স্থাপন করবে। এটাই অগ্রগণ্য ও উত্তম অভিমত। কুরআন বহন করতে গেলে সে এসব সুন্নত পালন করতে পারবে না। হতে পারে তার অন্তর ও চোখ পৃষ্ঠা উল্টানো ও আয়াত তালাশে ব্যস্ত থাকবে; ইমামের তিলাওয়াতে মনোযোগ দিতে পারবে না। তাই আমি মনে করি, সালাতে কুরআন বহন না-করাটাই সুন্নাহ। মুজাদি মনোযোগ দিয়ে, নীরব থেকে তিলাওয়াত শুনবে; কুরআন বহন করবে না। (ইমাম আটকে গেলে) তার জানা থাকলে সে ইমামকে স্মরণ করিয়ে দিবে। না হলে অন্য কোন মুজাদি স্মরণ করিয়ে দিবে। যদি ধরে নেয়া হয় যে, ইমাম তেলাওয়াতে ভুল করেছে এবং তাকে কেউ শুদ্ধ করিয়ে দেয়নি, তবে সেটা সূরা ফাতিহা বাদে কুরআনের অন্য স্থানে হলে কোন সমস্যা নেই। হ্যাঁ সূরা ফাতিহাতে হলে সমস্যা আছে। কারণ সূরাফাতিহা পাঠ করা ফরজ, যা অবশ্যই পাঠ করতে হবে। সূরা ফাতিহা বাদে অন্য কোন আয়াত যদি বাদ পড়ে যায় এবং মুজাদিদের কেউ ইমামকে স্মরণ করিয়ে না দেয় তবে সমস্যা নেই। আর যদি প্রয়োজনের কারণে কোন একজন মুজাদি ইমামের জন্য কুরআন বহন করে তবে আশা করি তাতেও কোন সমস্যা নেই। কিন্তু প্রত্যেক মুজাদি তার হাতে একটি করে কুরআন বহন করবে এটি সুন্নাহর (রাসূলের আদর্শের) খেলাফ।” সমাপ্ত

তাঁকে (বিন বাযকে) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

কিছু কিছু মুসল্লী কুরআন শরিফ খুলে ইমামের পড়া অনুসরণ করে- এতে কি কোন সমস্যা আছে?

তিনি উত্তরে বলেন: “আমার নিকট যা অগ্রগণ্য বলে মনে হয় তা হল, এটি না-করা উচিত। বরং উত্তম হল সালাত ও খুশুর (বিনস্রতার) দিকে মনোযোগী হওয়া এবং দুই হাত বুকুর উপর বেঁধে ইমামের ক্বিরা'আত পাঠের দিকে গভীর মনোনিবেশ করা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)

“আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমরা রহমত লাভ কর।” [সূরা আলআরাফ, ৭:২০৪]

এবং আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)

“অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে। যারা তাদের সালাতে বিনস্র।” [সূরা আল-মু'মিনুন, ২৩:১-২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأُصْنُوا)

“ নিশ্চয়ই ইমামকে নিযুক্ত করা হয়েছে যেন তাকে অনুসরণ করা হয়। তাই ইমাম যখন তাকবীর বলবেন তখন তোমরাও তাকবীর বলবে এবং ইমাম যখন তেলাওয়াত করবেন তখন তোমরা নীরবতা অবলম্বন কর।” [সহীহ মুসলিম (৪০৪)] সমাপ্ত

[মাজমু ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে বায (১১/৩৪০-৩৪২)]

দেখুন (10067) নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

যে ব্যক্তি এশার আগে তারাবীর সালাত আদায় করে ফেলেছে!

প্রশ্ন :

আমি মসজিদে বিলম্বে প্রবেশ করেছি। ততক্ষণে আমার ছয় রাকাত তারাবীর সালাত ছুটে গেছে। আমি তারাবীর পর এশার সালাত আদায় করেছি। তারাবীর যে ছয় রাকাত ছুটে গেছে এর কাযা আদায় করা কি আমার উপর ওয়াজিব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এশার নামাযের আগে তারাবীর নামায পড়া ঠিক হয়নি। আপনি এশার নামাযের নিয়ত করে তারাবীর জামাতে যোগ দিতে পারতেন। দুই রাকাত পড়ে ইমাম সালাম ফিরানোর পর আপনি দাঁড়িয়ে গিয়ে এশার বাকি দুই রাকাত সালাত পূর্ণ করে নিতে পারতেন। ক্রিয়ামূল লাইল (তারাবী, বিতির, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি) এশার সালাতের আগে হয় না; বরং পরে হয়। বরং এশার সুলত নামাযের পরে হয়। আপনি যা আদায় করেছেন তা সাধারণ নফল হিসেবে বিবেচিত হবে; ক্রিয়ামূল লাইল হিসেবে ধর্তব্য হবে না।

শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাযকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

যদি কোন মুসলিম মসজিদে এসে লোকদেরকে তারাবীর সালাত আদায়রত অবস্থায় পায় এবং সে ব্যক্তি তখনো এশার সালাত আদায় করেনি সেক্ষেত্রে তিনি কি এশার নামাযের নিয়তে তাদের সাথে তারাবীর জামাতে যোগ দিতে পারবে?

উত্তরে তিনি বলেন:

“আলেমগণের দুইটি মতের অধিকতর সঠিক মত অনুসারে তাদের সাথে এশার নিয়তে যোগ দিয়ে সালাত আদায় করতে কোন সমস্যা নেই। ইমাম সালাম ফিরালে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর অবশিষ্ট সালাত সম্পন্ন করবেন।” যেহেতু সহীহবুখারী ও সহীহ মুসলিম এ মু'আয ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার সালাত আদায় করে নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকে এশার সালাত পড়াতে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারটির বিরোধিতা করেননি। এ হাদিস প্রমাণ করে যে, নফল সালাত আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে ফরয সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সালাত আদায় করা জায়েয।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ গ্রন্থে এসেছে যে, কোন এক সালাতুল খওফ (ভয়ের সময়ের সংক্ষেপিত নামায)এর সময় এক গ্রুপকে নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। আবার দ্বিতীয় গ্রুপকে নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফিরান। এক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথমবারের আদায়কৃত নামায হচ্ছে- ফরয। কিন্তু দ্বিতীয় বারেরনামায তাঁর জন্য নফল, তাঁর পেছনে সালাত আদায়কারীদের জন্য ফরজ। আল্লাহই তাওফিক দাতা।

[মাজমু ফাতাওয়াস শাইখ ইবনে বায (১২/১৮১)]

শাইখ আরও বলেন: “ সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে- রমজানে বা অন্য সময়ে এশার সুন্নত নামাযের পরে তাহাজ্জুদ এর সালাত আদায় করা, যেমনটিনবী সালাতলাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন। এক্ষেত্রে তাহাজ্জুদ এর সালাত বাড়ীতে বা মসজিদে আদায়ে কোন পার্থক্য নেই।”

[মাজমূ' ফাতাওয়াআশ শাইখ ইবনে বায (১১/৩৬৮)]

আর আপনার তারাবীর যে সালাত ছুটে গেছে সে ব্যাপারে আপনার অবকাশ রয়েছে। আপনি চাইলে তা আদায় করতে পারেন। আবার চাইলে তা ছেড়েও দিতে পারেন। তারাবীর নামায নফল ইবাদত। এর কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়, যেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কাযা আদায় ওয়াজিব।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

নামাযে মুক্তাদির কুরআন বহন করা রাসূলের সুন্নাহর (আদর্শের) পরিপন্থী

প্রশ্ন

রমজান মাসে তারাবীর নামায পড়া অবস্থায় মুক্তাদি কর্তৃক ইমামের কিরাত অনুসরণ করার জন্য কুরআন শরিফ বহন করার হুকুম কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এই উদ্দেশ্যে কুরআন বহন করা রাসূলের সুন্নাহর (আদর্শের) পরিপন্থী। এর কারণগুলো হলো নিম্নরূপ:

এক: এর দ্বারা মুক্তাদির দাঁড়ানো অবস্থায় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার আমল ছুটে যায়।

দুই: এর ফলে মুক্তাদির অতিরিক্ত নড়াচড়ার প্রয়োজন হয়, যার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন কুরআন খোলা, বন্ধ করা, বাহুর নিচে কুরআন রাখা ইত্যাদি।

তিন: প্রকৃতপক্ষে এই নড়াচড়াতে মুসল্লী ব্যক্তি ব্যস্ত হয়ে থাকে।

চার: এর ফলে মুসল্লীর সিজদার স্থানে দৃষ্টি দেয়ার আমল ছুটে যায় এবং অধিকাংশ আলেমের মতে, সিজদা করার স্থানে দৃষ্টি দেয়া সুন্নত ও উত্তম।

পাঁচ: যে ব্যক্তি এভাবে নামাযে কুরআন বহন করে সে হয়ত ভুলেই যায় যে, সে নামাযে রয়েছে; যদি না সে তার মনকে নামাযে মনোনিবেশ করতে পারে। পক্ষান্তরে সে যদি খুশু (বিনম্রতা) এর সাথে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে সিজদার স্থানের দিকে মাথা নত করে নামায আদায় করে, তবে এ পদ্ধতি নামাযে মনোনিবেশ ধরে রাখা এবং সে ইমামের পেছনে নামায পড়ছে এই কথা মনে রাখার সহজ উপায়।

তারাবীর নামাযের রাকাত সংখ্যা

প্রশ্ন

আমি প্রশ্নটি আগেও করেছিলাম। আশা করি এর উত্তর দিয়ে আমাকে উপকৃত করবেন। কারণ এর আগে আমি সন্তোষজনক জবাব পাইনি। প্রশ্নটি তারাবীর নামায সম্পর্কে। তারাবীর নামায কি ১১ রাকাত, নাকি ২০ রাকাত? সুন্নাহ অনুযায়ী তো তারাবীর নামায ১১ রাকাত। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ “আলকিয়াম ওয়াত তারাউয়ীহ” বইতে বলেছেন তারাবী নামায ১১ রাকাত। এখন কিছু মানুষ

সেসব মসজিদে নামায পড়েন যেখানে ১১ রাকাত তারা বী পড়া হয়। আবার কিছু মানুষ সেসব মসজিদে নামায পড়েন যেখানে ২০ রাকাত তারা বী পড়া হয়। এখানে যুক্তরাষ্ট্রে এটি একটি সংবেদনশীল মাসয়ালা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি ১১ রাকাত তারা বী পড়েন তিনি ২০ রাকাত সালাত আদায়কারীকে ভৎসনা করেন। আবার যিনি ২০ রাকাত তারা বী পড়েন তিনি ১১ রাকাত সালাত আদায়কারীকে ভৎসনা করেন। এটা নিয়ে একটা ফিতনা (গোলযোগ) সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি মসজিদে হারামেও ২০ রাকাত তারা বী পড়া হয়। তাহলে মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে সুন্নাহর বিপরীত আমল হচ্ছে কেন? কেন তাঁরা মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে ২০ রাকাত তারা বী নামায আদায় করেন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।।

আলেমদের ইজতিহাদনির্ভর মাসয়ালাগুলো নিয়ে কোন মুসলিমের সংবেদনশীল আচরণ করাকে আমরা সমীচীন মনে করি না। যে আচরণের কারণে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ ও ফিতনা সৃষ্টি হয়।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রহিমাহুল্লাহকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যিনি ইমামের সাথে ১০ রাকাত তারা বী নামায পড়ে বিতিরের নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকেন, ইমামের সাথে অবশিষ্ট তারা বী নামায পড়েন না, তখন তিনি বলেন:

“ এটি খুবই দুঃখজনক যে, আমরা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এমন একটি দল দেখি যারা ভিন্ন মতের সুযোগ আছে এমন বিষয় নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করেন। এই ভিন্ন মতকে তারা অন্তরগুলোর বিচ্ছেদের কারণ বানিয়ে ফেলেন। সাহাবীদের সময়েও এই উম্মাহর মাঝে মতভেদ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের অন্তরগুলো ছিল ঐক্যবদ্ধ। তাই দ্বীনদারদের কর্তব্য, বিশেষভাবে যুব-সমাজের কর্তব্য হচ্ছে- ঐক্যবদ্ধ থাকা। কারণ শত্রুরা তাদেরকে নানারকম ফাঁদে ফেলানোর জন্য ওঁত পেতে বসে আছে।” [আশ-শারহুল মুমতি’ (৪২২৫)]

এই মাসয়ালার ব্যাপারে দুই পক্ষই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে। প্রথম পক্ষের লোকেরা যারা ১১ রাকাতের বেশি তারা বী পড়েন তাদের আমলকে একেবারে অস্বীকার করে এ আমলকে বিদআত আখ্যায়িত করেন। আর দ্বিতীয় পক্ষের লোকেরা যারা শুধু ১১ রাকাত সীমাবদ্ধ থাকেন তাদের আমলকে অস্বীকার করে বলেন: তারা ‘ইজমা’ এর খেলাফ করছে।

চলুন আমরা এ ব্যাপারে শাইখ ইবনে উছাইমীন রহিমাহুল্লাহ এর উপদেশ শুনি, বলেন:

“ এ ক্ষেত্রে আমরা বলব: বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা কোনটাই উচিত নয়। কেউ কেউ আছেন সুন্নাহ্ তে বর্ণিত সংখ্যা মানার ব্যাপারে কড়া কড়ি আরোপ করেন এবং বলেন: সুন্নাহ্ তে যে সংখ্যার বর্ণনা এসেছে তা থেকে বাড়ানো নাজায়েয। যে ব্যক্তি সে সংখ্যার বেশী তারা বী পড়ে তার কঠোর বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, সে গুনাহগার ও সীমালঙ্ঘনকারী।

এই দৃষ্টিভঙ্গি যে ভুল এতে কোন সন্দেহ নেই। কিভাবে সে ব্যক্তি গুনাহগার বা সীমালঙ্ঘনকারী হবে যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের সালাত (কিয়ামুল লাইল) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন: “ দুই রাকাত দুই রাকাত।” তিনি তো কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেননি। এ কথা সবারই জানা আছে যে, যেই সাহাবী রাতের সালাত সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি রাতের নামাযের সংখ্যা জানতেন না। কারণ যিনি সালাতের পদ্ধতিই জানেন না, রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে তার না-জানবারই কথা। আর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেবকও ছিলেন না যে আমরা এ কথা বলব- তিনি রাসূলের বাসার ভিতরের আমল কি সেটা জানতেন। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সাহাবীকে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেননি, শুধু সালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, এতে জানা গেল যে, এ বিষয়টি উন্মুক্ত। সুতরাং যে কেউ ইচ্ছা করলে ১০০ রাকাত তারা বীর নামায ও ১ রাকাত বিতির নামায আদায় করতে পারেন।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বাণী :

صلوا كما أيتموني أصلي

“তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখলে সেভাবে সালাত আদায় কর।”

এই হাদিসটির বিধান সাধারণ নয়; এমনকি এ মতাবলম্বীদের নিকটও নয়। তাই তো তারা কোন ব্যক্তির উপর একবার ৫ রাকাত, একবার ৭ রাকাত, অন্যবার ৯ রাকাত বিতির আদায় করা ওয়াজিব বলেন না। আমরা যদি এ হাদিসকে সাধারণভাবে গ্রহণ

করি তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে যে বিতিরের নামায কোনবার ৫ রাকাত, কোনবার ৭ রাকাত এবং কোনবার ৯ রাকাত আদায় করা ওয়াজিব। বরং “তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখলে সেভাবে সালাত আদায় কর”-এ হাদিস দ্বারা সালাত আদায়ের পদ্ধতি বুঝানো উদ্দেশ্য; সালাতের রাকাত সংখ্যা নয়। তবে রাকাত সংখ্যা নির্দিষ্ট করে এমন অন্য কোন দলীল পাওয়া গেলে সেটা ভিন্ন কথা।

যাই হোক, যে বিষয়ে শরিয়তে প্রশস্ততা আছে সে বিষয়ে কারো উপর চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়। ব্যাপারটি এ পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, আমরা দেখেছি কিছু ভাই এ বিষয়টি নিয়ে এত বেশি বাড়াবাড়ি করেন যে, যেসব ইমাম ১১ রাকাতের বেশি তারাবী নামায পড়েন এরা তাদের উপর বিদআতের অপবাদ দেন এবং (১১ রাকাতের পর) মসজিদ ত্যাগ করেন। এতে করে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণিত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হন। তিনি বলেছেন: “ইমাম নামায শেষ করা পর্যন্ত যে ব্যক্তি ইমামের সাথে কিয়ামুল লাইল (রাতের নামায) পড়বে তার জন্য সম্পূর্ণ রাতে নামায পড়ার সওয়াব লেখা হবে।” [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযি (৮০৬) এবং ‘সহীহুত তিরমিযি গ্রন্থে (৬৪৬) আলবানী হাদিসটিকে সহীহু আখ্যায়িত করেছেন] এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অনেকে ১০ রাকাত বিতির আদায় করে বসে থাকে; ফলে কাতার ভঙ্গ হয়। আবার কখনও তারা কথাবার্তা বলে; যার ফলে মুসল্লিদের সালাতে অসুবিধা হয়।

আমরা এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করছি না যে তাঁরা ভাল চাচ্ছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁরা মুজতাহিদ; কিন্তু সব মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেন না।

আর দ্বিতীয় পক্ষটি প্রথম পক্ষের সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা ১১ রাকাতের মধ্যে তারাবীকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান— এরা তাদের কঠোর বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, তুমি ইজমা থেকে বের হয়ে গেছ। অথচ আল্লাহ তা’আলা বলেছেন: “আর যে তার কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে আমি তাকে সেদিকে পরিচালিত করব যে দিকে সে অভিমুখী হয় এবং আমি তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর তা কতই না খারাপ প্রত্যাবর্তন।” [সূরা আন-নিসা, ৪:১১৫]

তারা বলেন যে, আপনার আগে যারা অতিবাহিত হয়েছেন তাঁরা শুধু ২৩ রাকাত তারাবীই জানতেন। এরপর তারা বিপক্ষবাদীদের তীর বিরোধিতা শুরু করেন। এটাও ভুল [আশশারহুল মুমতি (৩/৭৩-৭৫)]

যারা ৮ রাকাতের বেশি তারাবীর নামায পড়া নাজায়েয মনে করেন তারা যে দলীল দেন সেটা হলো আবু সালামাহ ইবনে আব্দুর রহমান এর হাদিস যাতে তিনি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কে প্রশ্ন করেছিলেন: “রমজানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানে বা রমজানের বাইরে ১১ রাকাতের বেশি আদায় করতেন না। তিনি ৪ রাকাত সালাত আদায় করতেন- এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন না (অর্থাৎ তা এতই সুন্দর ও দীর্ঘ হত)। এরপর তিনি আরো ৪ রাকাত সালাত আদায় করতেন-এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন না (অর্থাৎ তা এতই সুন্দর ও দীর্ঘ হত)। এরপর তিনি ৩ রাকাত সালাত আদায় করতেন। আমি বলতাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি বিতির পড়ার আগে ঘুমিয়ে যাবেন?” তিনি বলতেন: “হে আয়েশা! আমার চোখ দুটি ঘুমালেও অন্তর ঘুমায় না।” [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী (১৯০৯) ও ইমাম মুসলিম (৭৩৮)]

তারা বলেন: এই হাদিসটি নির্দেশ করছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে ও রমজানের বাইরে রাতের বেলা নিয়মিত এভাবেই সালাত আদায় করতেন। আলেমগণ এ হাদিস দিয়ে দলীলের বিপক্ষে বলেন যে, এই হাদিসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল সাব্যস্ত করছে। কিন্তু কোন আমল দ্বারা তো ওয়াজিব সাব্যস্ত করা যায় না।

আর রাতের সালাত (এর মধ্যে তারাবীর নামাযও শামিল) যে কোন সংখ্যার মধ্যে সুনির্দিষ্ট নয় এ ব্যাপারে বর্ণিত স্পষ্ট দলীলগুলোর মধ্যে একটি হলো ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদিস- “এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “রাতের সালাত দুই রাকাত, দুই রাকাত। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা করেন তবে তিনি যেন আরো এক রাকাত নামায পড়ে নেন। যাতে করে এ রাকাতটি পূর্বে আদায়কৃত সংখ্যাকে বিতির (বেজোড়) করে দেয়।” [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম বুখারী (৯৪৬) ও ইমাম মুসলিম (৭৪৯)]

বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য ফিকহী মাজহাবের আলেমগণের মতামতের দিকে দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার হয় যে, এ বিষয়ে প্রশস্ততা আছে। ১১ রাকাতের অধিক রাকাত তারাবী পড়তে দোষের কিছু নেই।

হানাফী মাজহাবের আলেম ইমাম আস্‌সারখাসী বলেন: “ আমাদের মতে বিতির ছাড়া তারাবী ২০ রাকাত ।” [আল্‌মাবসুত (২/১৪৫)]

ইবনে কুদামাহ বলেন: “ আবু-আবদুল্লাহ অর্থাৎ ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর কাছে পছন্দনীয় মত হলো তারাবী ২০ রাকাত । এই মতে আরো রয়েছেন ইমাম ছাওরী, ইমাম আবু-হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী । আর ইমাম মালেক বলেছেন: “ তারাবীহ ৩৬ রাকাত ।” [আলমুগনী (১/৪৫৭)]

ইমাম নববী বলেছেন:

“ আলেমগণের ইজমা অনুযায়ী তারাবীর সালাত পড়া সুন্নত । আর আমাদের মাজহাব হচ্ছে- তারাবীর নামায ১০ সালামে ২০ রাকাত । একাকী পড়াও জায়েয, জামাতের সাথে পড়াও জায়েয ।” [আলমাজমূ (৪/৩১)]

এই হচ্ছে তারাবী নামাযের রাকাতের সংখ্যার ব্যাপারে চার মাজহাবের অভিমত । তাঁদের সবাই ১১ রাকাতের বেশী পড়ার ব্যাপারে বলেছেন । সম্ভবত যে কারণে তাঁরা ১১ রাকাতের বেশী পড়ার কথা বলেছেন সেটা হলো:

১. তাঁরা দেখেছেন যে, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদিস নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নির্ধারণ করে না ।

২. পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবয়ীগণের অনেকের কাছ থেকে ১১ রাকাতের বেশী তারাবী পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায় । [আল-মুগনী (২/৬০৪) ও আল-মাজমূ (৪/৩২)]

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ১১ রাকাত সালাত আদায় করতেন তা এত দীর্ঘ করতেন যে এতে পুরো রাত লেগে যেত । এমনও ঘটেছে এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে তারাবীর সালাত আদায় করতে করতে ফজর হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ আগে শেষ করেছিলেন । এমনকি সাহাবীগণ সেহেরী খেতে না-পারার আশঙ্কা করেছিলেন । সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করতে পছন্দ করতেন এবং এটা তাঁদের কাছে দীর্ঘ মনে হত না । কিন্তু আলেমগণ খেয়াল করলেন ইমাম যদি এভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে সালাত আদায় করেন তবে মুসল্লিদের জন্য তা কষ্টকর হবে । যা তাদেরকে তারাবীর নামায থেকে বিমুখ করতে পারে । তাই তাঁরা তেলাওয়াত সংক্ষিপ্ত করে রাকাত সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে মত দিলেন ।

সার কথা হলো- যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত পদ্ধতিতে ১১ রাকাত সালাত পড়েন সেটা ভাল এবং এতে সুন্নাহ পালন হয় । আর যিনি তেলাওয়াত সংক্ষিপ্ত করে রাকাতের সংখ্যা বাড়িয়ে পড়েন সেটাও ভাল । যিনি এই দুইটির কোন একটি করেন তাঁকে নিন্দা করার কিছু নেই ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন:

“ যিনি ইমাম আবু হানীফা শাফেয়ী ও আহমাদের মাজহাব অনুসারে ২০ রাকাত তারাবী সালাত আদায় করল অথবা ইমাম মালেকের মাজহাব অনুসারে ৩৬ রাকাত তারাবী আদায় করল অথবা ১৩ বা ১১ রাকাত তারাবী আদায় করল প্রত্যেকেই ভাল আমল করল । এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকার কারণে ইমাম আহমাদ এ মতই পোষণ করতেন । তাই তেলাওয়াত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত করার অনুপাত অনুযায়ী রাকাত সংখ্যা বেশি বা কম হবে ।” [আল-ইখতিয়ারাত, পৃষ্ঠা- ৬৪]

আস-সুয়ুতী বলেছেন:

“ রমজানে ক্রিয়াম তথা রাতের নামায আদায় করার আদেশ দিয়ে ও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে অনেক সহীহ ও হাসান হাদিস বর্ণিত হয়েছে । এ ক্ষেত্রে কোন সংখ্যাকে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২০ রাকাত তারাবী পড়েছেন বলে সাব্যস্ত হয়নি । বরং তিনি রাতে সালাত আদায় করেছেন । কিন্তু কত রাকাত আদায় করেছেন এই সংখ্যা উল্লেখিত হয়নি । এরপর ৪র্থ রাতে দেরি করলেন এই আশঙ্কায় যে তারাবীর সালাত তাঁদের উপর ফরয করে দেয়া হতে পারে, পরে তাঁর উম্মত তা পালন করতে অসমর্থ হবেন ।”

ইবনে হাজার হাইসামী বলেছেন:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে তারাবীর সালাত ২০ রাকাত হওয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায়নি। আর এই ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে- “তিনি ২০ রাকাত সালাত আদায় করতেন; তা অত্যন্ত জরীফ (দুর্বল)।” [আল্‌মাওসূ’আহ আল-ফিকহিয়্যাহ (২৭/১৪২-১৪৫)]

অতএব প্রশ্নকারী ভাই, আপনি তারাবীর সালাত ২০ রাকাত হওয়ার ব্যাপারে অবাক হবেন না। কারণ এর আগে ইমামগণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা পালন করেছেন। আর তাঁদের সবার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

তারাবীর নামাযে ইমাম ভুল করে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, পরে বসেছেন

প্রশ্ন

যদি তারাবীর সালাতে ইমাম দ্বিতীয় রাকাতের পর তাশাহহদের জন্য বসতে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং তখনো তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ শুরু করেননি, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তাশাহহদ পাঠের জন্য দ্রুত বসে পড়েন। এমতাবস্থায় তাঁর করণীয় কী? এবং মুসল্লিদের করণীয় কী?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

তাদের সবাইকে এই অতিরিক্ত কাজের জন্য সহ সেজদা (ভুলের সেজদা) দিতে হবে। এ অতিরিক্ত কাজটি হল তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠে দাঁড়ানো।

রমজানের মাসয়ালাসমূহ

হিজাব না-পরা কি রোযা ভঙ্গকারী?

প্রশ্ন

আমি হিজাব পরিধান করি না; এতে করে কি আমার রমযানের রোযা নষ্ট হয়ে যাবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

একজন মুসলিম নারী হিজাব পরতে আদিষ্ট। ইতিপূর্বে এই ওয়েবসাইটের একাধিক প্রশ্নোত্তরে হিজাবের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। সে প্রশ্নোত্তরগুলোতে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে কোনটি ছিল হিজাবের হুকুম বর্ণনা করা তথা হিজাব করা ওয়াজিব। যেমনটি এসেছে ২১৫৩৬ নং প্রশ্নোত্তরে। কোন কোন প্রশ্নোত্তরে হিজাব ওয়াজিব হওয়ার দলিলগুলো আলোচিত হয়েছে। যেমন ১৩৯৯৮ নং ও ১১৭৭৪ নং প্রশ্নোত্তরে। কোন কোন প্রশ্নোত্তরে হিজাবের শরয়ি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। যেমন 6991 নং প্রশ্নোত্তরে। আবার কোন কোন প্রশ্নোত্তরে মুসলিম নারীর জীবনে হিজাবের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

দুই:

কোন নারী যদি হিজাব না করেন তাহলে তিনি স্বীয় প্রভুর অবাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু তার রোযা সহিহ। কেননা পাপগুলো রোযাকে নষ্ট করে না; হিজাব না-করাও একটি পাপ। তবে পাপ রোযার সওয়াবে ঘাটতি করে এবং হতে পারে গোটা সওয়াবই নষ্ট করে দেয়।

আমার আপনাকে রোযা রাখার পাশাপাশি হিজাব করার আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ রোযার উদ্দেশ্য কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকা নয়। বরং রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে- হারাম সবকিছু থেকে বিরত রাখা। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “পানাহার থেকে বিরত থাকা রোযা নয়; বরং অনর্থক ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকাই রোযা।” [মুত্তাদরাকে হাকিম, আলবানী ‘সহিছুল জামে’ গ্রন্থে (৫৩৭৬) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

অতএব আপনার রোযা রাখা যেন আপনাকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ধাবিত করে ও নিষেধ থেকে দূরে রাখে।

আমরা আল্লাহু কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনাকে তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টিজনক আমলগুলো করার তাওফিক দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

রোযাদারের বেশি বেশি গোসল করা

প্রশ্ন

রমযানের দিনের বেলায় একাধিক বার গোসল করার হুকুম কি? কিংবা সারাদিন এসি (এয়ার কন্ডিশন)-এর কাছে বসে থাকার হুকুম কি; যে এসি জলীয় বাষ্প ছড়ায়?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এটি জায়েয। এতে কোন অসুবিধা নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রেখে গরমের কারণে কিংবা পিপাসায় মাথার উপর পানি ঢালতেন। ইবনে উমর (রাঃ) রোযা রেখে তার কাপড় পানিতে ভেজাতেন— গরম বা পিপাসার কষ্ট কিছুটা লাঘব করার জন্য। জলীয় বাষ্প কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। কেননা সেটি এমন কোন পানি নয় যা পাকস্থলিতে পৌঁছে [সমাণ্ড]

ফাযিলাতুশ শাইখ মুহাম্মদ বিন উছাইমীন (রহঃ)

ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/১৩০)

রোযা রেখে এমন কোন যন্ত্রের কাছে বসা যেটা থেকে বাষ্প বা ধোঁয়া বের হয়

প্রশ্ন

রমযানের দিনের বেলায় এমন কোন যন্ত্রপাতির নিকটে বসার হুকুম কি যেটা থেকে বাষ্প বা ধোঁয়া বের হয়? যদি এটা আমার চাকুরীর কাজের অন্তর্ভুক্ত হয় সেক্ষেত্রে এর হুকুম কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এতে কোন অসুবিধা নাই। তবে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধোঁয়া বা এই ধূলি নাক দিয়ে টেনে নিবে না। যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এটি পেটে ঢুকে যায় তাহলে এতে কোন অসুবিধা নাই, এটি কোন ক্ষতি করবে না [সমাণ্ড]

মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন, ফাতাওয়াস সিয়াম (পৃষ্ঠা-২৮১)

যে নারীর বাচ্চা ন্যাচারাল ফিডিং এর উপর ২০% নির্ভর করে এমন নারীর রোযা না-রাখা

প্রশ্ন

আমার শিশুর বয়স প্রায় একমাস। সে ন্যাচারাল ফিডিং এর উপর প্রায় ২০% নির্ভর করে। কারণ দুধ কম। তার বাকী প্রয়োজনীয় কৃত্রিম দুধ দিয়ে পূরণ করা হয়। আমি এমন দেশে থাকি যেখানে রোযা ১৭ ঘন্টা। এমতাবস্থায় আমার রোযা রাখার হুকুম কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আমি এই প্রশ্নটি আমাদের শাইখ আব্দুর রহমান আল-বারুরাকের কাছে পেশ করেছি। তিনি বলেন: এই নারী রোযা না-রেখে পরবর্তীতে ছোট দিনগুলোতে কাযা পালন করবেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

যদি কোন ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন তার জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলা কি জায়েয?

প্রশ্ন

স্বাভাবিক অবস্থাগুলোতে কোন ডাক্তার যদি রোগীদের চিকিৎসা দিতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন তার জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলা কি জায়েয? কোন অপারেশন করতে গিয়ে যখন দীর্ঘ সময় লেগে যায় সে ক্ষেত্রে হুকুম কি? জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে হুকুম কি ভিন্ন হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোগীদের চিকিৎসা দেয়ার জন্য কোন ডাক্তারের রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয নয়। তবে কোন রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন হলে এবং তার চিকিৎসা করাটা চিকিৎসকের রোযা ভঙ্গ করার সাথে সম্পৃক্ত হলে সেটার হুকুম ব্যতিক্রম। এই ক্ষেত্রে ডাক্তারের রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয। কেননা সেটি একজন নিরপরাধ মানুষকে বাঁচানো।

আল্লাহই তাওফিকের মালিক। আমাদের নবী মুহাম্মদের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ সালেহ আল-ফাওয়ান, শাইখ আব্দুল আযিয আল-শাইখ, শাইখ বকর আবু যায়েদ।

ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমা; আল-মাজমুআ' আছ-ছানিয়া (৯/২০৩)

রোযাদারের উচিত সামান্য হলেও সেহেরী খাওয়ার চেষ্টা করা

প্রশ্ন

পবিত্র রমযান মাসে সেহেরী খাওয়ার ব্যাপারে অনেক কথা শুনি। মসজিদে যে হাদিসগুলো পড়া হয় সেখানে শুনি যে, সেহেরীতে বরকত রয়েছে। কিন্তু দেরীতে ডিনার করার কারণে অনেক সময় আমাদের সেহেরী খাওয়ার রুচি থাকে না। এই বরকতটি আমাদের ছুটে যায়। এ কারণে কি আমাদের কোন গুনাহ হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

নিঃসন্দেহে সেহেরী খাওয়া সুন্নত ও ইবাদত । কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেহেরী খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি বলেন: “তোমরা সেহেরী খাও । কারণ সেহেরীতে বরকত রয়েছে ।” তিনি আরও বলেন: “আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সেহেরী খাওয়া ।” তিনি নিজে সেহেরী খেতেন । সুতরাং সেহেরী খাওয়া সুন্নত; ওয়াজিব নয় । তাই যে ব্যক্তি সেহেরী খায় না; তার গুনাহ হবে না । তবে সে সুন্নতকে ছেড়ে দিল ।

সেজন্য সামান্য হলেও সেহেরী খাওয়া উচিত । বেশি পরিমাণে খাওয়া আবশ্যকীয় নয় । শেষ রাতে যা আছে সেটা দিয়েই সেহেরী খাবেন; এমনকি কয়েকটি খেজুর হলেও কিংবা যে কোন খাবার সামান্য হলেও । আর যদি কিছু না থাকে কিংবা খাবারের রুচি না হয় তাহলে সামান্যটুকু দুধ পান করবেন কিংবা কয়েক টোক পানি পান করবেন । তবুও সেহেরী খাওয়া বাদ দিবেন না । যেহেতু সেহেরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে ও প্রভূত কল্যাণ রয়েছে । সেহেরী খাওয়া রোযাদারের জন্য দিনের বেলায় তার কাজকর্ম সম্পাদনে সহায়ক । তাই একেবারে না খাওয়ার চেয়ে সামান্য হলেও সেহেরী খাওয়া উচিত । তিনি বলেন: “তোমরা সেহেরী খাও । কারণ সেহেরীতে বরকত রয়েছে ।” এভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন । এই বরকত ছুটে যাওয়া উচিত নয় । বরঞ্চ একজন মুসলিমের উচিত এই বরকত লাভে আগ্রহী হওয়া; এমনকি সামান্য কিছু খাবার দিয়ে হলেও কিংবা কয়েকটি খেজুর দিয়ে হলেও কিংবা কিছু দুধ দিয়ে হলেও । এই সেহেরী খাওয়া দিনের বেলায় তার দুনিয়াবী ও দ্বীনি কাজকর্মের জন্য সহায়ক ॥সমাপ্ত॥

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযিয বিন বিন (রহঃ)

ফাতাওয়া নুরুন্ আলাদ দারব (৩/১২২২)

যে নারী ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়েছেন কিনা এ ব্যাপারে সন্দিহান তিনি কি নামায ও রোযা আদায় করবেন?

প্রশ্ন

মাসিকের শেষ দিন ফজরের আযানের প্রায় দুই ঘণ্টা আগে আমি দেখেছি যে, হলুদ শ্রাব যাচ্ছে । এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছি । ফজরের আগে আর দেখিনি শ্রাব কি বন্ধ হয়েছে; নাকি বন্ধ হয়নি । সকালে লক্ষ্য করলাম যে, শ্রাব যাওয়া বন্ধ হয়েছে । এরপরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পর্যবেক্ষণ করলাম; এর মধ্যে জোহরের আযান হয়ে গেছে । জোহরের পর আমি গোসল করেছি । এমতাবস্থায় ছুটে যাওয়া কোন নামায কি আমাকে কাযা করতে হবে; নাকি আমি শুধু জোহরের নামায পড়ব? রমযানের পর এই দিনটির রোযা কাযা পালন করা কি আমার উপর আবশ্যিক?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

কোন নারীর হায়েয শুরু হওয়ার পর মূল অবস্থা হলো তার হায়েয চলমান থাকা যতক্ষণ পর্যন্ত না হায়েয দূরীভূত হওয়ার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত না হন । হায়েয শেষ হয়েছে কি শেষ হয়নি এ ব্যাপারে সন্দেহ নিয়ে রোযা বা নামায পালন করা জায়েয নয় ।

আমরা ইতিপূর্বে [106452](#) নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছি ।

আয়েশা (রাঃ) নারীদেরকে অপেক্ষা করা ও তাড়াহুড়া না করার নির্দেশ দিতেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পবিত্রতার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হয় । তিনি বলতেন: “তোমরা সাদাশ্রাব না দেখা অবধি তাড়াহুড়া করো না ।” তিনি এর দ্বারা হায়েয থেকে পবিত্র হওয়াকে বুঝাতেন ।

অতএব, ফজরের নামায কাযা করা আপনার উপর আবশ্যিক নয়। পক্ষান্তরে, জোহরের নামায পড়া আপনার উপর ওয়াজিব। কেননা আপনি পবিত্র অবস্থায় জোহরের ওয়াক্ত পেয়েছেন।

পক্ষান্তরে, ঐ দিনের রোযা আপনি রাখলেও সহিহ হত না। কেননা আপনি ঐ দিনের শুরুতে হায়েযগ্রস্ত ছিলেন। রমযান শেষ হওয়ার পর ঐ দিনটির রোযা আপনাকে কাযা পালন করতে হবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পবিত্র হওয়ার পর কয়েক ফোঁটা রক্তপাত হওয়া হায়েয হিসেবে গণ্য নয়

প্রশ্ন

আমি রমযান মাসের চারদিন রোযা রেখেছি। এরপর আমার হায়েয শুরু হয়েছে। হায়েযের দিনগুলো শেষ হওয়ার পর আমি পবিত্র হয়েছি এবং রোযা রাখা শুরু করেছি। কিন্তু কয়েক ফোঁটা রক্তপাত হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। যখনই আমি পবিত্র হই ও রোযা রাখি তখনই দ্বিতীয়বার গোটা রমযান রক্তপাত হয়। এ ব্যাপারে সঠিক উত্তর কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনি প্রশ্নে যেমনটি উল্লেখ করেছেন বাস্তবে যদি সেটাই হয়ে থাকে তাহলে মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর রক্তপাত হওয়া হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা তা চলমান রক্তপাত নয়। তাই সেটি হায়েযের হুকুম গ্রহণ করবে না। আপনার উপর রোযা রাখা ও নামায পড়া এবং প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্ত হলে ওয়ু করা আবশ্যিক; যেমনটি সকল মুস্তাহাযা ও বিরামহীন পেশাব-পায়াখানা-বায়ু গ্রস্ত রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই দিনগুলোতে আপনার রোযা রাখা সহিহ।

আল্লাহই তাওফিকের মালিক, আমাদের নবী মুহাম্মদের উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। [সমাপ্ত]

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, শাইখ আব্দুল আযিয আলুশ শাইখ, শাইখ সালিহ আল-ফাওয়ান, শাইখ বকর আবু যাইদ।

ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমা, আল-মাজমুআ' আস্ছানিয়া (৯/৮৩)

রোযার শুরুতে দোয়া করার বিশেষ কোন দোয়া নাই

প্রশ্ন

রোযার শুরুতে আমরা কোন দোয়া দিয়ে দোয়া করতে পারি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইমাম তিরমিযি (হাদিস নং-৩৪৫১) তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন তিনি বলতেন:

اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ

(হে আল্লাহ্! বরকত ও ঈমান দিয়ে এবং নিরাপত্তা ও ইসলাম দিয়ে আমাদের ওপর তাকে (চন্দ্রকে) উদিত করুন। আমার ও তোমার রব হচ্ছেন আল্লাহ্)[আলবানী সহিহত তিরমিযি গ্রন্থে (২৭৪৫) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

এই দোয়াটি রমযানের চাঁদের সাথে খাস নয়। বরং প্রত্যেক মাসের শুরুতে যখনই কোন মুসলিম নতুন চাঁদ দেখবে তখনই বলবেন।

পক্ষান্তরে, প্রতিদিন রোযার শুরুতে দোয়া করার বিশেষ কোন দোয়া নেই।

বরং ব্যক্তি অন্তরে আগামীকাল রোযা রাখার নিয়ত করবেন।

নিয়তের ক্ষেত্রে শর্ত হলো: রাত থেকে, ফজর হওয়ার আগেই নিয়ত করা। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজরের আগে রোযার নিয়ত পাকাপোক করেনি তার রোযা নেই" [সুনানে তিরমিযি (৭৩০)] আর সুনানে নাসাই (২৩৩৪)-এর ভাষ্য হচ্ছে- "যে ব্যক্তি রাতের বেলায় রোযার নিয়ত করেনি তার রোযা নেই"। [আলবানী সহিহত তিরমিযি গ্রন্থে (৫৮৩) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

হাদিসটির মর্ম হচ্ছে: যে ব্যক্তি রাত থেকে রোযার নিয়ত করেনি এবং রোযা পালনের পাকাপোক সিদ্ধান্ত নেয়নি তার রোযা নেই।

নিয়ত হচ্ছে অন্তরের কাজ। তাই একজন মুসলিম অন্তরে আগামীকাল রোযা রাখার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিবেন। নিয়ত উচ্চারণ করা শরিয়তসম্মত নয়। যেমন এভাবে বলা: আমি আগামীকাল রোযা রাখার নিয়ত করেছি কিংবা এ জাতীয় কোন কথা যেগুলো কিছু মানুষের উদ্ভাবিত বিদাত

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

কাযা রোযার নিয়ত যথা সময়ে আদায়কৃত রোযার মত রাত থেকে পাকাপোক হওয়া আবশ্যিক;

প্রশ্ন

আমি জানতাম না যে, যে নারী রমযান মাসে হায়েযগ্রস্ত ছিল সে নারীকে নফল রোযা পালন করার আগে দ্রুত কাযা রোযা পালন করতে হয়। এ কারণে আমি রমযানের পরে কিছু নফল রোযা রেখেছি। এখন আমি সে রোযাগুলোর নিয়ত কি পরিবর্তন করতে পারব এবং যে রোযাগুলো রেখে ফেলেছি সেগুলোকে কাযা রোযা হিসেবে ধরতে পারব? দিনের বেলায় কি নিয়ত পরিবর্তন করা যায়? অর্থাৎ আমি যদি নফল রোযা হিসেবে রোযাটি রাখা শুরু করি দিনের বেলায় আমি নিয়ত পরিবর্তন করে কাযা রোযার নিয়ত করতে পারব?

উত্তর

সংশ্লিষ্ট

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে নফল রোযা পালন করা শেষ হয়ে গেছে সে রোযার নিয়ত পরিবর্তন করে সেটাকে রমযানের ছুটে যাওয়া রোযার কাযা হিসেবে ধরা সঠিক নয়। যেহেতু কাযা রোযার নিয়ত রাত থেকে পাকাপোক হওয়া আবশ্যিক। কারণ কাযা আমলের হুকুম সময়মত আদায়কৃত আমলের হুকুমের মত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজরের আগে নিয়ত পাকা করেনি তার রোযা নেই"। [সুনানে তিরমিযি (৭৩০), আলবানী সহিহত তিরমিযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন] হাদিসটি বর্ণনা করার পর তিরমিযি বলেছেন: আলেমদের নিকট এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে- যে ব্যক্তি রমযানের রোযার নিয়ত ফজরের আগে করেনি কিংবা রমযানের কাযা রোযার নিয়ত ফজরের আগে করেনি কিংবা মানতের রোযার নিয়ত রাত থেকে করেনি। তবে, নফল রোযার নিয়ত সকালে করাও বৈধ। এটি ইমাম শাফেয়ি, আহমাদ ও ইসহাকের অভিমত [সমাণ্ড]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

রমযানের রোযা, কাযা রোযা, কাফফারার রোযা, হজ্জের ফিদিয়ার রোযা ইত্যাদি ওয়াজিব রোযাগুলোর নিয়ত দিনের বেলায় করলে শুদ্ধ হবে না- এতে কোন মতভেদ নেই [আল-মাজমু (৬/২৮৯) থেকে সমাণ্ড]

[দেখুন: ইবনে কুদামার 'আল-মুগনী' (৩/২৬)]

আরেকটি কারণ হল- ইবাদত পালন শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিয়তের পরিবর্তন ইবাদতের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না।

সু্যুতি (রহঃ) 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৩৭) বলেন:

"যদি কেউ নামায সমাপ্ত করার পর নামায কর্তন করার নিয়ত করে আলমেদের সর্বসম্মতিক্রমে এতে নামায বাতিল হবে না। অনুরূপ বিধান সকল ইবাদতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।" [সমাপ্ত]

অতএব, যে রোযাগুলো নফল হিসেবে পালন করা হয়েছে সেগুলো কাযা রোযার দায়িত্ব মুক্ত করবে না।

আরেকটি কারণ হচ্ছে- সে ব্যক্তি তো নফল রোযা হিসেবে আমলটি শুরু করেছে। এরপর দিনের বেলায় ঐ রোযাকে কাযা রোযাতে পরিবর্তন করার ভাবনা উদ্ভূত হয়েছে। এর মানে সে ব্যক্তি যে দিনটির সম্পূর্ণ অংশ ওয়াজিব রোযাতে কাটানোর কথা সেই দিনের কিছু অংশ নফল রোযাতে কাটিয়েছে। তাই এ রোযা ফরয রোযার কাযা হিসেবে দায়িত্ব মুক্ত করবে না। কারণ আমল মূল্যায়িত হয় নিয়ত দিয়ে। যেহেতু সে ব্যক্তি দিনের কিয়দংশ নফল রোযা রেখে কাটিয়েছে।

আরেকটি কারণ হচ্ছে- সাধারণ রোযা থেকে নির্দিষ্ট রোযার দিকে নিয়তের পরিবর্তন; এমনটি করা সঠিক নয়।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

তবে, আমরা এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, কারো দায়িত্বে রমযানের কাযা রোযা থাকলেও তার জন্য নফল রোযা রাখা নিষিদ্ধ নয়; যেমনটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে- কারো উপরে রমযানের কাযা রোযা কিংবা অন্য কোন ফরয রোযা থাকা সত্ত্বেও তার নফল রোযা পালন করা সঠিক হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী রমযান আসার আগে তার সামনে কাযা রোযা পালন করার মত সময় থাকে। তবে, রমযানের কাযা রোযা পালন করার আগে শাওয়ালের ছয় রোযা পালন থেকে নিষেধ করা হয়; যদিও বিষয়টি আলমেদের মাঝে মতভেদপূর্ণ।

আরও জানতে দেখুন: [39328](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

যে ব্যক্তি পশ্চিম দিকে সফর শুরু করেছে তার নামায ও ইফতারের সময় সে যে দেশ থেকে বেরিয়েছে সে দেশ থেকে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে

প্রশ্ন:

জনৈক ব্যক্তি নাইজেরিয়া থেকে কুরিয়ার উদ্দেশ্যে সফর করেছে। নাইজেরিয়াতে সে রোযা ছিল এই আশায় যে, সে কুরিয়াতে গিয়ে ইফতার করবে। পথিমধ্যে সে যোহর ও আসরের নামায বিমানের ভেতরে মুসলিম যাত্রীদের সাথে আদায় করেছে। সে আশা করেছিল মাগরিবের নামায কুরিয়াতে পড়বে এবং সেখানেই ইফতার করবে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো সে যে লোকদের সাথে সাক্ষাত করল তারা যোহরের নামাযের জন্য আযান দিচ্ছিল। সে মসজিদের দেয়াল ঘড়িতে দেখল তখন বেলা ১টা বেজে ৩০ মিনিট। সূর্য তখনও মাথার উপরে। সে পেরেশান হয়ে নাইজেরিয়াতে তার স্ত্রীকে ফোন করল। তার স্ত্রী জানাল যে নাইজেরিয়াতে তারা ইফতার খেয়ে, তারাবীর নামায পড়ে ঘুমাতে যাচ্ছে। নাইজেরিয়াতে তখন রাত নয়টা বাজে। এমতাবস্থায় সে কি কুরিয়ার স্থানীয় সময়ের সাথে মিলিয়ে রোযা চালিয়ে যাবে? অনুরূপভাবে তাদের সাথে যোহরের নামায পড়বে? নাকি মাগরিবের নামায পড়বে? নাকি নাইজেরিয়া থেকে তার স্ত্রীর সংবাদবাদের ভিত্তিতে ইফতার করবে?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

যে ব্যক্তি ওয়াজিব প্রবেশ করার পর নামায আদায় করে নিয়েছে। এরপর তার গন্তব্যে পৌঁছার পর সেখানে ঐ ওয়াজিব প্রবেশ করুক বা না করুক; যে নামাযটি সে একবার পড়েছে সে নামায পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যিক নয়। কেননা একদিনে এক নামায দুইবার পড়তে হয় না। তাই যখন সহিহভাবে নামাযটি আদায় হয়েছে তখন পুনরায় পড়া আবশ্যিক নয়। তবে রোযাদার সূর্য ডোবার আগে

রোযা ভাঙ্গবে না; পশ্চিম দিকে গমন করার কারণে সূর্য ডোবা যত বিলম্ব হোক না কেন। সে ব্যক্তি যে দেশ থেকে সফর শুরু করেছেন সেই দেশে সূর্য ডুবোটা ধর্তব্য নয়; যদি সেই দেশ থেকে বের হওয়ার আগে সেখানে সে সূর্যাস্ত না পেয়ে থাকে।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে ব্যক্তি পশ্চিম দিকে সফর করেছে এবং তার গন্তব্যে যোহরের ওয়াক্তে পৌঁছেছে, কিন্তু পশ্চিমদিকে সে যোহরের নামায পড়ে ফেলে তাহলে যোহরের নামায পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যিকীয় নয়। কেননা এক নামায দুইবার পড়া যায় না। উল্লেখ্য, পশ্চিম দিকে গমন করার মাধ্যমে নামাযের ওয়াক্ত প্রবেশের সময় বিলম্বিত হবে।

অনুরূপভাবে সে ব্যক্তি যদি আসরের নামাযও পড়ে থাকেন তাহলে পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যিকীয় নয়; চাই সে ব্যক্তি যোহরের সময় পৌঁছাক কিংবা আসরের সময় পৌঁছাক।

আরও জানতে দেখুন: [22387](#) নং প্রশ্নোত্তর।

কিন্তু কেউ যদি মসজিদে উপস্থিত থাকেন এবং নামাযের ইকামত দেয়া হয় তাহলে তিনি জামাআতের সাথে পুনরায় নামায পড়বেন। এই নামায তার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু ইমাম তিরমিযি (২১৯) ও ইমাম নাসাঈ (৮৫৮) ইয়াজিদ ইবনুল আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জ করেছি। আমি মাসজিদুল খাইফে তাঁর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম। নামায শেষে তিনি একটু কোনাকুনি হয়ে বসলেন। এর মধ্যে তিনি লোকদের পেছনে দুইজন লোককে দেখতে পেলেন যে দুইজন তাঁর সাথে নামায পড়েনি। তখন তিনি বললেন: এই দুইজনকে নিয়ে আস। তাদের দুইজনকে আনা হল। তাদের বুক ধুরুধুরু কাঁপছিল। তিনি বললেন: আমাদের সাথে নামায পড়তে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিল? তারা দুইজন বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আমাদের আস্তানাতে নামায পড়েছি। তিনি বললেন: এমন কাজ আর করো না। যদি তোমরা তোমাদের আস্তানাতে নামায পড়েও থাক এরপর কোন জামে মসজিদে আস তখন তোমরা তাদের সাথে নামায পড়বে। এই নামায তোমাদের জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে।" [আলবানী হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

দুই:

কিন্তু রোযার ক্ষেত্রে সে যে স্থানে রয়েছে সে স্থানের সূর্য ডোবা ছাড়া রোযা ভাঙ্গা বৈধ নয়। যদি কেউ তার গন্তব্যে পৌঁছে দেখে যে, তখনও সূর্য ডুবেনি তাহলে তার জন্য সূর্য ডোবার পূর্বে ইফতার করা বৈধ হবে না; এমনকি যদি সময় দীর্ঘ হয়ে যায় তবুও। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর" [সূরা বাক্বার, আয়াত: ১৮৭] এবং যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন এ দিক থেকে রাত আগমন করবে এবং এ দিক থেকে দিন প্রস্থান করবে এবং সূর্য ডুবে যাবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।" [সহিহ বুখারী (১৯৫৪) ও সহিহ মুসলিম (১১০০)]

এই আলোচনার ভিত্তিতে: এই মুসাফির যখন কুরিয়া পৌঁছেছেন তখন সেখানের মানুষ যোহরের ওয়াক্তে ছিল। এই ব্যক্তি যদি তার রোযাটি পূর্ণ করতে চান তাহলে তাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। নাইজেরিয়াতে সূর্য ডোবাটা ধর্তব্য নয়।

আর যদি তিনি মুসাফির হওয়ার কারণে ছাড় গ্রহণ করে রোযা ভেঙ্গে ফেলেন তাহলে তিনি তা করতে পারেন। বিশেষতঃ হঠাৎ করে দিনটি যদি এত বেশী দীর্ঘ হয়ে যায় এবং তার জন্য নতুন স্থানে রাত পর্যন্ত রোযাটি পূর্ণ করা কষ্টকর হয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি রমযানের পর এ দিনটির রোযা কাযা পালন করবেন।

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

“ এক ছাত্র আমেরিকার কোন এক শহরে অধ্যয়নরত। সে তার ঘটনা বলল যে, একবার সে যে শহরে থেকে পড়ে সে শহর থেকে ভ্রমণ করতে বাধ্য হল। সে ফজরের সময় রোযা ধরেছে। যে শহরের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেছে ঐ শহরে পৌঁছেছে সেখানের সময় অনুযায়ী মাগরিবের পর। কিন্তু সে দেখতে পেল এর মধ্যে ১৮ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু তার রোযা শেষ হয়নি। অথচ সাধারণত সে ১৪ ঘণ্টা রোযা রাখত। এমতাবস্থায় সে কি অতিরিক্ত ৪ ঘণ্টা রোযা চালিয়ে যাবে? নাকি সে যে শহরে থাকে সে শহরের সময় অনুযায়ী ইফতার করে ফেলবে? সেই শহর থেকে ফেরার সময় বিপরীতটা ঘটল। তখন দিনের সময় ১৪ ঘণ্টা কমে ৩ ঘণ্টা হয়ে গেল।

এর জবাবে শাইখ বলেন: সে সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত রোযা চালিয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ যখন এ দিক থেকে রাত আগমন করবে; তিনি পূর্বদিকে ইশারা করেন এবং এ দিক থেকে দিন প্রস্থান করবে; তিনি পশ্চিম দিকে ইশারা করেন এবং সূর্য ডুবে যাবে তখন রোযাদার ইফতার করবে। ”

অতএব সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত সে ছাত্রকে তার রোযার উপর থাকতে হবে; এমনকি যদি চার ঘণ্টা বেড়ে যায় তবুও।

সৌদি আরবে এর সম ধরণের উদাহরণ হচ্ছে: কেউ যদি পূর্ব প্রদেশে সেহেরী খাওয়ার পর পশ্চিম প্রদেশের উদ্দেশ্যে সফর করে তখন দূরত্ব অনুপাতে তার সময় বেড়ে যাবে। [মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৯/৩২২)]

ড. আব্দুল্লাহ আস-সাকাফির ‘নাওয়াযিলুস সিয়াম’ গ্রন্থে বলেন: “ দ্বিতীয় মাসয়ালা: কোন মুসাফির তার দেশে সূর্য ডুবার কিছুক্ষণ পূর্বে যদি পশ্চিম দিকে সফর করে তাহলে তার সূর্য ডোবা বিলম্বিত হবে। উদাহরণতঃ তার দেশে যদি সন্ধ্যা ৬টায় সূর্যাস্ত যায় আর সে ৬টা বাজার ১০ মিনিট আগে মরক্কোর উদ্দেশ্যে বিমানে চড়ে সে এই পথে যত অগ্রসর হতে থাকবে তার দিন তত বড় হতে থাকবে। কেননা মরক্কোতে সূর্য ৮টার আগে অস্ত যাবে না। এভাবে এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা সূর্যকে উদীয়মান অবস্থায় সে পাবে। এমন ব্যক্তিকে আমরা কী বলব?

আমরা বলব: সূর্য না ডুবা পর্যন্ত ইফতার করবে না। এমনকি এতে করে যদি সময় দুই ঘণ্টা, চার ঘণ্টা, পাঁচ ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশি বেড়ে যায় তবুও। তবে তার এই এখতিয়ার থাকবে যে, সে মুসাফিরের বিধিবিধান গ্রহণ করে এবং ছাড় নিয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলবে। আর রোযা পূর্ণ করতে চাইলে তাকে অতিরিক্ত সময়টুকুও (রোযা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে) বিরত থাকতে হবে। কেননা কুরআনে কারীম রোযা ভাঙ্গার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। “ অতপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ যদি রাত এ দিক থেকে আগমন করে এবং এ দিক থেকে প্রস্থান করে এবং সূর্যাস্ত যায় তখন রোযাদার ইফতার করবে। ”

আর যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যাস্ত যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই লোকের দিন শেষ হবে না। অতএব, সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত থাকা তার উপর ওয়াজিব কিংবা সে সফরের ছাড় গ্রহণ করে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে পারে এবং এই দিনের বদলে অন্য একদিন রোযাটি রাখতে পারে” [http://bit.ly/2Zq4574 থেকে সমাপ্ত]

সারকথা:

১। যে ব্যক্তি ওয়াজিব প্রবেশ করার পর নামায আদায় করে নিয়েছে। পরবর্তীতে তার গন্তব্যে পৌঁছার পর সেখানে এই ওয়াজিব প্রবেশ করুক বা না করুক; যে নামাযটি সে একবার পড়েছে সে নামায পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যিক নয়। কেননা একদিনে এক নামায দুইবার পড়তে হয় না। তাই যখন সহিহভাবে নামাযটি আদায় হয়েছে তখন পুনরায় পড়া আবশ্যিক নয়।

২। রোযাদার সূর্য ডোবার আগে রোযা ভাঙ্গবে না; পশ্চিম দিকে গমন করার কারণে সূর্য ডোবা যত বিলম্ব হোক না কেন। সে ব্যক্তি যে দেশ থেকে সফর শুরু করেছেন সেই দেশে সূর্য ডোবাটা ধর্তব্য নয়; যদি সেই দেশ থেকে বের হওয়ার আগে সেখানে সূর্যাস্ত না ঘটে।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

রোযাদারের জন্য নাকে মেডিসিন-জেল ব্যবহার করার হুকুম

প্রশ্ন

আমি নাকের এলার্জিতে ভুগছি। নাকের স্প্রে ডোজ নেয়া সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরগুলো আমি পড়েছি। আপনারা ফতোয়া দিয়েছেন যে, এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল: অন্য আরেক ধরনের ঔষধ সম্পর্কে। সেটা হচ্ছে মেডিকেল জেল; যা নাক দিয়ে গ্রহণ করা হয়। এটা ব্যবহারে কি রোযা ভেঙ্গে যাবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নাক হচ্ছে পাকস্থলির একটি প্রবেশ পথ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “প্রকৃষ্টভাবে নাকে পানি দিন; যদি না আপনি রোযাদার হন।” [সুনানে আবু দাউদ (১৪২) ও সুনানে তিরমিযি (৭৮৮); আলবানী 'সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে' হাদিসটিকে 'সহিহ' বলেছেন]

নাক দিয়ে যে জেলটি গ্রহণ করা হয় এর কোন কিছু যদি গলার ভেতরে বা পাকস্থলিতে চলে না যায়; বরং সেটি নাকের ভেতরে নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলে রোযা সহিহ।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“জেল ব্যবহার করে কিংবা পানি বা কাপড় দিয়ে ভিজিয়ে কিংবা এ জাতীয় অন্য কিছু দিয়ে ঠোঁটদ্বয় ও নাক সতেজ রাখতে কোন অসুবিধা নাই। তবে যে জিনিসটির অমসৃনতা দূর করা হলো সেটা থেকে কোন কিছু পেটের ভেতরে চলে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু ভেতরে চলে যায়; তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। যেমনিভাবে কুলি করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু পানি পেটে চলে গেলে এর মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ হবে না।” [ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৯/২২৪)]

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনার জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য আরোগ্য ও রোগমুক্তি লিখে দেন।

আল-মুনতাক্বা মিন ফাতাওয়াশ শাইখ সালেহ আল-ফাওয়ান (৩/১২১)

আল্লাহুই সর্বত্ত্ব।

ফজর হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ নিয়ে রোযাদার খেতে পারেন; কিন্তু সূর্য ডোবার ব্যাপারে সন্দেহ নিয়ে ইফতার করতে পারেন না

প্রশ্ন

১। রোযাদার সূর্য ডোবার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া কিংবা প্রবল অনুমান লাভ করা ছাড়া রোযাদারের জন্য ইফতার করা জায়েয নয়। কোন রোযাদার যদি সূর্য ডোবার ব্যাপারে সন্দেহ নিয়ে ইফতার করে ফেলে পরবর্তীতে জানা যায় যে, ইফতার করার সময় সূর্য ডুবেনি তখন তাকে সেই দিনের রোযা কাযা পালন করতে হবে।

২। কোন ব্যক্তি যদি ফজর হয়েছে; নাকি হয়নি— এ সন্দেহ নিয়ে পানাহার করে তার রোযা সঠিক। প্রশ্ন হলো প্রথম মাসয়ালায় কেন কাযা ওয়াজিব হয়? আর দ্বিতীয় মাসয়ালায় কেন কাযা ওয়াজিব হয় না।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সূর্য ডোবার ব্যাপারে সন্দেহ নিয়ে রোযাদার যদি ইফতার করে ফেলে তাহলে সে রোযাটির কাযা পালন করবে; যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭] রাত শুরু হয় সূর্য ডোবা থেকে। সুতরাং সেই ব্যক্তি নিশ্চিত ছিলেন যে, সে দিনে রয়েছেন। তাই সে সূর্য ডোবার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া কিংবা প্রবল অনুমান লাভ করা ছাড়া ইফতার করবে না। কেননা মূল অবস্থা হল দিন বলবৎ থাকা। তাই নিশ্চিত জ্ঞান বা প্রবল অনুমান ছাড়া এ মূল অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তরিত হবে না।

আর ফজর উদিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ নিয়ে যে ব্যক্তি পানাহার করেছেন সে ব্যক্তি কাযা পালন করবেন না; যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “আর তোমাদের কাছে কালো রেখা থেকে প্রভাতের সাদা রেখা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার চলে গিয়ে ভোরের আলো উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮-৭] আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “তোমাদের কাছে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত”। এ কথা প্রমাণ করে যে, ফজর হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করা জায়েয। কেননা সে ব্যক্তি যে, রাতের মধ্যে রয়েছে এ ব্যাপারে সে সুনিশ্চিত ছিল। তাই ফজর উদিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া পানাহার করা তার জন্য হারাম নয়। যেহেতু মূল অবস্থা হল রাত বলবৎ থাকা।

আরও জানতে দেখুন: [38543](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

কোন সে রোযাদার যাকে ইফতার করলে একজন রোযাদারকে ইফতার করানোর সওয়াব পাওয়া যাবে

প্রশ্ন

আমরা জানি যে, রমযান মাসে একজন রোযাদারকে ইফতার করানোর অনেক বড় পুরস্কার রয়েছে। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হল:

এই রোযাদারটা কে? সে কি এমন ব্যক্তি যার কাছে ইফতার করার মত কোন কিছু নাই? নাকি সে পথচারী? নাকি সে যে কোন ব্যক্তি; এমনকি স্বচ্ছলও হলেও? এ প্রশ্ন করার কারণ হল: আমরা আমেরিকাতে থাকি। এখানের মুসলিম কমিউনিটির লোকেরা স্বচ্ছল জীবন যাপন করছেন। তারা এখানে রমযানে দাওয়াত বিনিময় করেন—বাহ্যতঃ যা মনে হয়- গৌরব ও অহংকারের প্রতিযোগিতা থেকে... (অমুকে অমুকের চেয়ে বেশি মেহমানদারি করে, অমুকে অমুকের চেয়ে ভাল রান্না করে...)

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোযাদারকে ইফতার করানোর সওয়াব বড়; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেন: “যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবেন তিনি রোযাদারের সমান সওয়াব পাবেন; তবে রোযাদারের সওয়াব থেকে একটু ও কমানো হবে না।” [সুনানে তিরমিযি (৭০৮) আলবানী ‘সহিহত তারগীব ওয়াত তারহীব’ (১০৭৮)-এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

এ সওয়াব যে কোন রোযাদারকে ইফতার করলেই অর্জিত হবে; সে রোযাদার দরিদ্র হওয়া শর্ত নয়। কেননা এটি দান-শ্রেণীয় নয়; বরং উপহার-শ্রেণীয়। উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে উপহারগ্রহীতা দরিদ্র হওয়া শর্ত নয়। বরং ধনী গরীব সবাইকে উপহার দেয়া যেতে পারে।

তবে যে দাওয়াতগুলোর উদ্দেশ্য— গৌরব ও অহংকারের প্রতিযোগিতা করা; এমন দাওয়াত নিন্দনীয়। এমন ব্যক্তি দাওয়াত খাওয়ানোর জন্য কোন সওয়াব পাবে না। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তি নিজেকে প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে।

এ ধরনের উদ্দেশ্য থেকে কাউকে দাওয়াত দেয়া হলে তার উচিত এমন দাওয়াতে না যাওয়া এবং এতে অংশগ্রহণ না করা। বরং নিজের একটা ওজর পেশ করা। পরবর্তীতে যদি এ ব্যক্তিকে গ্রহণযোগ্য সুন্দর পদ্ধতিতে উপদেশ দিতে সক্ষম হন তাহলে সেটা করা ভাল। তবে সরাসরি না বলে ইঙ্গিতে বলবেন। কোমল ভাষা ব্যবহার করবেন। নির্দিষ্টভাবে কাউকে উদ্দেশ্য না করে আমভাবে বলবেন।

কোমল ভাষা, সুন্দর শৈলীর ব্যবহার এবং রুক্ষ ও কর্কশ শব্দগুলো পরিহার করা উপদেশ গ্রহণীয় হওয়ার কারণ। একজন মুসলিম তার মুসলিম ভাই সত্যকে গ্রহণ করুক ও এর উপর আমল করুক এ ব্যাপারে আগ্রহী থাকবেন।

যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতেন। তার সাহাবীদের মধ্যে কেউ এমন কোন কাজ করে ফেলত যা তিনি অপছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে সরাসরি সমালোচনা করতেন না। বরং তিনি বলতেন: কিছু কিছু লোকের কী হল তারা এমন এমন কাজ করে?

এ পদ্ধতির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ সাধিত হয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আই ইউ ডি ব্যবহার করার কারণে যে নারীর মাসিকের সময় বেড়ে গেছে

প্রশ্ন

রমযান মাসে আমার স্ত্রীর হায়েয শুরু হওয়ার পর সে আই ইউ ডি সেট করার জন্য গিয়েছে। যার ফলে তার হায়েযের দিন বেড়ে যায় এবং সে ১১ দিন রোযা রাখতে পারেনি। পরবর্তীতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, এর মধ্যে ৪ দিনের রক্ত হায়েযের রক্ত ছিল না; বরং তা ছিল সাধারণ রক্তপাত...। এই দিনগুলোর বিধান কী? এর জন্য কি কোন কাফ্যারা আছে? থাকলে সেটা কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।।

এক:

যদি আই ইউ ডি এর কারণে রক্তপাতের সময় বেড়ে যায় এবং রক্তপাতে কোন বিচ্ছেদ না ঘটে থাকে তাহলে সবটা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ তার স্বাভাবিক হায়েয হচ্ছে সাতদিন; কিন্তু বেড়ে গিয়ে এগার দিন হল।

আর যদি সাতদিন পর রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় এবং সে নারী পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হন; এরপর আরও চারদিন রক্তপাত হয়; এমন রক্ত যা হায়েযের পরিচিত রক্ত থেকে আলাদা এবং তা আই ইউ ডি এর কারণে ঘটে থাকে তাহলে এ চারদিন হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না। বরং ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য হবে।

অনুরূপভাবে যদি মেডিকেল পরীক্ষার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় যে, এটি সাধারণ রক্তপাত; হায়েযের রক্ত নয় সেক্ষেত্রেও এটি ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য হবে।

দুই:

যদি কোন নারী রক্ত দেখে সেটাকে হায়েয মনে করে রোযা না রাখেন এবং পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, এটি ইস্তিহাযার রক্ত ছিল; সেক্ষেত্রে তার উপর এ দিনগুলোর রোযা কাযা পালন ছাড়া অন্য কিছু আবশ্যিক হবে না।

সারকথা: যদি সাব্যস্ত হয় যে, এ দিনগুলো হায়েয ছিল না তাহলে তার উপর কাযা পালন ছাড়া অন্য কিছু আবশ্যিক নয়।

আল্লাহুই সর্বত্ত্ব।

ফজরের কয়েক মিনিট পূর্ব থেকে রোযা শুরু করা বিদাত

প্রশ্ন

কোন এক দেশের লোকেরা বলেন রোযা শুরু করার সময় হচ্ছে— ফজরের প্রায় দশ মিনিট পূর্ব থেকে। এ সময় থেকে মানুষ রোযা রাখা শুরু করে এবং পানাহার থেকে বিরত থাকে। তাদের এ কর্ম কি সঠিক?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।।

এ কর্ম সঠিক নয়।

কেননা আল্লাহুতাআলা রোযাদারের জন্য ফজর উদিত হওয়া পরিস্ফুট হওয়া অবধি পানাহার করা বৈধ করেছেন। আল্লাহুতাআলা বলেন: “আর কালো রেখা থেকে প্রভাতের সাদা রেখা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার চলে গিয়ে ভোরের আলো উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

ইমাম বুখারী (১৯১৯) ও ইমাম মুসলিম (১০৯২) ইবনে উমর (রাঃ) ও আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বিলাল (রাঃ) রাত থাকতে আযান দিতেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কেননা সে ফজর না হলে আযান দেয় না'।

ইমাম নববী বলেন:

"এ হাদিসে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত পর্যন্ত পানাহার ও অন্যান্য বিষয় জায়েয হওয়ার দলিল রয়েছে।" [সমাণ্ড]

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (৪/১৯৯) বলেন:

"এ যামানায় রমযান মাসে ইবাদতের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের দোহাই দিয়ে ফজরের প্রায় তেহাই ঘণ্টা পূর্বে দ্বিতীয় আযান দেয়া এবং বাতি নিভানোর যে প্রথা চালু করা হয়েছে; যে বাতিগুলো রোযা রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য পানাহার নিষিদ্ধ হওয়ার আলামতস্বরূপ — সেটা নিকৃষ্ট বিদাত।" [সমাণ্ড]

কোন কোন ক্যালেন্ডারে রোযা শুরু করার সময় ফজর হওয়ার ২০ মিনিট পূর্বে নির্ধারণ করা সম্পর্কে শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন:

এটি বিদাত। সুন্নাহতে এর কোন ভিত্তি নেই। বরং সুন্নাহ হচ্ছে এর বিপরীত। কেননা আল্লাহুতাআলা তাঁর কিতাবে বলেন: "আর কালো রেখা থেকে প্রভাতের সাদা রেখা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার চলে গিয়ে ভোরের আলো উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর।" [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "নিশ্চয় বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। অতএব তোমরা ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান শুনা পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কে ননা সে ফজর না হলে আযান দেয় না"। রোযা শুরু করার ক্ষেত্রে কিছু লোক আল্লাহুতটুকু ফরয করেছেন তার চেয়ে যে সময় বাড়াচ্ছেন এটি বাতিল এবং আল্লাহর ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হল। বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হল। বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হল।" [সহিহ মুসলিম (২৬৭০)]

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

রোযার নিয়ত উচ্চারণ করা বিদআত

প্রশ্ন

ইন্ডিয়াতে আমরা রোযার নিয়ত করি এভাবে: "আল্লাহুমা আসুমু জাদান লাকা ফাগফির লি মা কাদামতু ওয়ামা আখ্খারতু" আমি জানি না এর অর্থ কী? কিন্তু, এভাবে নিয়ত করা কি সহিহ? যদি সহিহ হয়, তাহলে আশা করি আপনারা আমাকে এর অর্থ জানাবেন কিংবা কুরআন বা সুন্নাহ থেকে সহিহ নিয়তটি জানাবেন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানের রোযা কিংবা অন্য কোন ইবাদত নিয়ত ছাড়া শুদ্ধ হয় না। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হচ্ছে: "আমলসমূহ নিয়ত দ্বারা হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে সেটাই তার প্রাপ্য..." [সহিহ বুখারী (১) ও সহিহ মুসলিম (১৯০৭)]

নিয়তের ক্ষেত্রে শর্ত হল: রাত থাকতে ও ফজরের আগেই নিয়ত করা। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজরের আগে রোযার নিয়ত পাকাপোক্ত করেনি তার রোযা নেই" [সুনানে তিরমিযি (৭৩০)] আর সুনানে নাসাই (২৩৩৪)-এর ভাষ্য হচ্ছে- "যে ব্যক্তি রাতের বেলায় রোযার নিয়ত করেনি তার রোযা নেই" [আলবানী সহিহুত তিরমিযি গ্রন্থে (৫৮৩) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

নিয়ত হচ্ছে অন্তরের আমল। মুসলিম ব্যক্তি অন্তরে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিবে যে, আগামীকাল সে রোযা রাখবে। তার জন্যে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করে "নাওয়াইতু সিয়াম" বা "আসুমু জাদান লাকা" ... ইত্যাদি কিছু মানুষের প্রবর্তিত বিদআতী শব্দাবলী উচ্চারণ করা শরিয়তসম্মত নয়।

সঠিক নিয়ত হচ্ছে ব্যক্তি অন্তরে আগামীকাল রোযা রাখার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া।

তাই শাইখুল ইসলাম (রহঃ) 'আল-ইখতিয়ারাত' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৯১) বলেন: "যে ব্যক্তির অন্তরে উদিত হয়েছে যে, সে আগামীকাল রোযাদার সেই নিয়ত করেছে।"[সমাণ্ড]

আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

রমযানের রোযা রাখার নিয়ত করার পদ্ধতি কিভাবে?

জবাবে তারা বলেন: রোযা রাখার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়ার মাধ্যমে নিয়ত হয়ে যাবে। প্রতি রাতে রাত থাকতেই রোযার নিয়ত করতে হবে [ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমা (১০/২৪৬)]

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

যে নারী না জেনে ফজর উদিত হওয়ার পর সেহেরী খেয়েছে

প্রশ্ন

আমি প্রায় তিন মাস ধরে তুর্কিতে আছি। গত শাবান মাসের প্রথমার্ধে আমি আমার দায়িত্বে থাকা কাযা রোযাগুলো রেখেছি। তুর্কিতে ফজরের আযানের পার্থক্যের বিষয়টি আমার জানা ছিল না। ঘটনাক্রমে শাবান মাসের শেষদিন আমি সেটা জেনেছি। এখন আমার উপর কি কাযা ও খাদ্য খাওয়ানো ওয়াজিব হবে? নাকি দুটোর একটি; নাকি উভয়টি? নাকি না-জানার কারণে এ মাসয়ালায় আমার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনি যে শহরে স্থানান্তরিত হয়েছেন যদি সে শহরের ফজরের ওয়াজ্ত শুরু সঠিক সময় না জেনে থাকেন এবং ফজর শুরু হওয়ার পর ফজর হওয়ার কথা না-জেনে আহার করে থাকেন: আলেমগণ ঐ ব্যক্তির হুকুমের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে ব্যক্তি রাত আছে ও ফজর হয়নি এ ধারণা করে পানাহার করেছে; অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সূর্য অস্ত গেছে ধারণা করে পানাহার করেছে; এরপর প্রমাণ হয়েছে যে, এটি তার ভুল ছিল।

অনেক আলেমের অভিমত হল যে, এই পানাহারের মাধ্যমে তার রোযা নষ্ট হয়ে গেছে এবং এর বদলে অন্য একদিন রোযা রাখা তার উপর আবশ্যিক।

অপর একদল আলেমের মতে, তার রোযা সহিহ; সে ব্যক্তি তার রোযাটি পূর্ণ করবে এবং তাকে কাযা পালন করতে হবে না।

এটি তাবেয়ীদের মধ্যে মুজাহিদ, হাসান (রহঃ) এর অভিমত। ইমাম আহমাদ থেকে এক বর্ণনা। শাফেয়ি মাযহাবের আলেম মুযানি ও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এই মতটি নির্বাচন করেছেন এবং শাইখ উছাইমীন এ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

আয়াতটি নাযিল হল; কিন্তু **مِنَ الْفَجْرِ** অংশটি নাযিল হয়নি। তখন এমন কিছু লোক ছিল যারা রোযা রাখতে চাইলে তাদের পায়ে একটি সাদা সূতা ও কালো সূতা বেঁধে নিত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়টির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা না যেত ততক্ষণ পর্যন্ত খেতে থাকত।

পরবর্তীতে আল্লাহনাযিল করেন: **مِنَ الْفَجْرِ** । তখন তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ্‌এখানে রাত ও দিনকে বুঝিয়েছেন ।” [সহিহ বুখারী (১৯১৭) ও সহিহ মুসলিম (১০৯১)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

“না-জানার কারণে কোন ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া: যেমন যে ব্যক্তি ধীরস্থিরতা রক্ষা না করে নামায আদায় করেছিল এবং সে জানত না যে, এটি ওয়াজিব তার ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন যে, সময় পার হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় নামায আদায় করা কি তার উপর ওয়াজিব; নাকি ওয়াজিব নয়। দুটো অভিমত: ইমাম আহমাদের মাযহাবের ও অন্য মাযহাবের।

সঠিক অভিমত হচ্ছে এমন ব্যক্তিকে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নামায আদায়ে অসঠিকভাবে নামায আদায়কারী বেদুঈনকে বলেছেন: তুমি গিয়ে নামায আদায় কর। কারণ তোমার নামায হয়নি। দুইবার বা তিনবার। লোকটি বলেন: ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন আমি এর চেয়ে ভালভাবে নামায পড়তে পারি না। আমাকে শিখিয়ে দিন যেভাবে পড়লে আমার নামায হবে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধীরস্থিরভাবে নামায পড়া শিখিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি তাকে এই ওয়াজিবের পূর্বের ওয়াজিবের নামায পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দেননি। অথচ সে লোকটি বলেছে যে, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন আমি এর চেয়ে ভাল পারি না। তিনি তাকে সেই নামাযটি পুনরায় পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা সেই নামাযটির সময় ছিল। অতএব সেই ব্যক্তি সেই নামাযটি সেই সময়ে আদায় করতে আদিষ্ট। আর যে নামাযের সময় পার হয়ে গেছে সেটি পুনরায় আদায় করার জন্য তিনি তাকে নির্দেশ দেননি; অথচ সে ব্যক্তি কিছু ওয়াজিব ছেড়ে দিয়েছিল। যেহেতু সেই ব্যক্তি জানত না যে, সেটি তার উপর ওয়াজিব।

অনুরূপভাবে যে লোকেরা সাদা সুতা থেকে কালো সুতা পার্থক্য করতে পারা অবধি আহর করেছে, ফজর উদিত হওয়ার পরও আহর করেছে তিনি তাদেরকেও রোযাগুলো পুনরায় রাখার আদেশ দেননি। যেহেতু এই ব্যক্তিগণ ওয়াজিব সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি তাদের অজ্ঞতার সময়ে তারা যে ওয়াজিব ছেড়ে দিয়েছে সেই আমলের কাযা পালনের নির্দেশ দেননি। যেমনিভাবে কাফের ব্যক্তিকে সে কাফের থাকার অবস্থায় যে আমলগুলো পালন করেনি সেগুলোর কাযা পালন করার নির্দেশ দেয়া হয় না।” [মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/৪২৯-৪৩১)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“অজ্ঞতা হচ্ছে (আল্লাহ্‌আপনাকে মুবারকময় করুন): না-জানা। কিন্তু কখনও কখনও মানুষের অজ্ঞতার ওজর গ্রহণ করা হয় পূর্বকৃত আমলের ক্ষেত্রে; বর্তমান আমলের ক্ষেত্রে নয়। এর উদাহরণ যা সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক লোক এসে এভাবে নামায পড়ল যাতে কোন ধীরস্থিরতা ছিল না। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাকে সালাম দিল। তখন তিনি বললেন: ফিরে গিয়ে নামায পড়। কারণ তোমার নামায হয়নি। এভাবে তিনবার তাকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন লোকটি বলল: ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন আমি এর চেয়ে ভাল পারি না। অতএব আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে শিখিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি তাকে পূর্বের নামায কাযা পালন করার নির্দেশ দেননি। যেহেতু সে অজ্ঞ ছিল। তিনি তাকে কেবল বর্তমান নামাযটি পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দিলেন।” [লিকাউল বাব আল-মাফতুহ; শামেলার নম্বর (১৯/৩২)]

আরও বেশি জানতে পড়ুন: **38543** নং প্রশ্নোত্তর।

এ অভিমতের সারাংশ হল: নতুন শহরের সময়ের পার্থক্য না জানার কারণে আপনার ওজর গ্রহণযোগ্য এবং আপনার রোযা সঠিক। কিছু কিছু সাহাবীদের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটার ব্যাপারে জানা গেছে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে রোযা কাযা করার নির্দেশ দিয়েছেন মর্মে উদ্ধৃত হয়নি।

তবে তা সত্ত্বেও আপনি যদি নিজের দ্বীনের ব্যাপারে সতর্কতা গ্রহণ করে এ দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করেন তাহলে সেটা ভাল, সন্দেহ থেকে অধিক দূরবর্তী এবং আলেমদের মধ্যে যারা ওয়াজিব বলে থাকেন তাদের মতভেদের উর্ধ্বে থাকার উপায়।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

তার বোন ডাউন সিনড্রোম রোগে আক্রান্ত; রোযা না থাকার কারণে তার উপরে কি কাফফারা ওয়াজিব হবে?

প্রশ্ন

আমার এক বোন 'ডাউন সিনড্রোম' রোগে আক্রান্ত। এক বছর যাবৎ সে বালোগ হয়েছে। সে রোযা রাখতে পারছে না। আমরা কি তার পক্ষ থেকে ফিদিয়া পরিশোধ করব? নাকি অন্য কিছু করা লাগবে? ফিদিয়ার পরিমাণ কত?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ডাউন সিনড্রোম এমন একটি রোগ যাতে শিশুরা আক্রান্ত হয়। এর ফলে মানুষের বুদ্ধিগত ও শারীরিক বিকাশে বিলম্ব ঘটে। এর বাহ্যিক লক্ষণগুলো হচ্ছে: চোখে টানা পড়া, ঘাড় ও হাতদ্বয় খর্বাকৃতি হওয়া, মাংসপেশি নরম হওয়া।

দুই:

রোযা ফরয হওয়ার শর্ত হচ্ছে- বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তিন শ্রেণীর লোক থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে: পাগল, যে বুদ্ধি বিকারগ্রস্ত যতক্ষণ না সে সম্বিত ফিরে পায়। ঘুমন্ত ব্যক্তি; যতক্ষণ না সে জেগে উঠে। বালক; যতক্ষণ না সে সাবালগ হয়।" [সুনানে আবু দাউদ (৪৩৯৯), আলবানী হাদিসটিকে 'সহিহ সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থে সহিহ বলেছেন]

যদি আপনার বোন বুদ্ধিগত বিলম্বের এমন পর্যায়ে থাকে যে, সে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারে, শরিয়তের নির্দেশ অনুধাবন করতে না পারে তাহলে এমতাবস্থায় তার উপরে রোযা পালন বা রোযার কাযা পালন কোনটাই ফরয নয় এবং আপনাদেরকেও তার পক্ষ থেকে ফিদিয়া পরিশোধ করতে হবে না। কেননা সে শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) 'আল-শারহুল মুমতি' গ্রন্থে (৬/৩২৪) বলেন: "প্রত্যেক যে ব্যক্তির বুদ্ধি নেই সে মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত) নয়। তার উপর দ্বীনের ওয়াজিব আমলের কোন আমল ওয়াজিব নয়। নামায নয়, রোযা নয়, রোযার পরিবর্তে খাবার দেওয়াও নয়। অর্থাৎ তার উপরে কোন কিছুই ওয়াজিব নয়; তবে আর্থিক ওয়াজিবগুলোর মত কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া।" [সমাণ্ড]

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

যে ব্যক্তি ধারণা করছেন যে, তিনি রোযা রেখেছেন কিন্তু নিয়ত নবায়ন করতে ভুলে গেছেন

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি ঘুমাতে যাওয়ার আগে গোটা রমযান মাস রোযা রাখা নিয়ত করেছেন। অতঃপর পরের দিন যখন সেহেরী খাওয়ার জন্য জাগলেন তখন তাকে বলা হল যে, রমযান মাস এখনও শুরু হয়নি। আজ শাবান মাসের ৩০ তারিখ। পরের দিন তিনি আর নতুন করে নিয়ত করেনি। এভাবেই পবিত্র মাসের রোযা রেখে গেছে। তার হুকুম কী?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ফরয রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য রাত থেকে নিয়ত করা শর্ত। দলিল হচ্ছে-- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রাঃ) এর হাদিস যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজরের আগে নিয়ত পাকা করেনি তার রোযা নেই।" [সুনানে আবু দাউদ (২৪৫৪); আলবানী 'ইরওয়াউল গালিল' গ্রন্থে (৪/২৫, নং- ৯১৪) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

"আমাদের মাযহাব (শাফেয়ি মাযহাব) হল: সেটা (অর্থাৎ রমযানের রোযা) শুদ্ধ হবে না রাত থেকে নিয়ত করা ব্যতীত। এই অভিমত পোষণ করেন ইমাম মালেক, আহমাদ, ইসহাক, দাউদ এবং পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী জমহুর আলেম।" [আল-মাজমু (৬/৩১৮) থেকে সমাপ্ত]

তবে, নিয়তের বিষয়টি অতি সহজ। আগামীকাল রমযান এটা জানার পর কেবল আপনার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাই হচ্ছে-- নিয়ত। নিয়ত উচ্চারণ করা শর্ত নয়। বরং উচ্চারণ করা শরীয়তসম্মতও নয়।

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

"প্রত্যেক যে ব্যক্তি জেনেছে যে, আগামীকাল রমযান এবং সে রোযা রাখার ইচ্ছা রাখে তাহলে তার রোযার নিয়ত হয়ে গেল; চাই সে নিয়ত উচ্চারণ করুক কিংবা না করুক। এটাই সর্বস্তরের মুসলমানগণের আমল। তাদের প্রত্যেকেই রোযা রাখার নিয়ত করছেন।" [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৫/২১৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ বিন উছাইমীন (রহঃ) "আল-শারহুল মুমতি" গ্রন্থে (৬/৩৫৩-৩৫৪) বলেন:

"কোন ইচ্ছাধীন আমল থেকে নিয়ত বাদ পড়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক যে আমল মানুষ নিজ ইচ্ছায় করে সে আমলের নিয়ত না থেকে পারে না।... এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, কিছু মানুষ যে ওয়াসওয়াসা (শয়তানের কুমন্ত্রণা)-র শিকার হয়ে বলেন: 'আমি নিয়ত করিনি' এটা বিভ্রম; যার কোন অস্তিত্ব নেই। কিভাবে নিয়ত না করা সম্ভব; অথচ সে কাজটি সম্পাদন করেছে।" [সমাপ্ত]

গোটা রমযান মাসে রোযা রাখার নিয়ত প্রথম দিন করলেই যথেষ্ট; যদি না সফর বা রোগজনিত কোন কারণে মাঝখানে রোযা পালন কর্তন না করে; কর্তন করলে নিয়ত নবায়ন করতে হবে। তবে, গোটা মাসে রোযা রাখার নিয়ত মাসের শুরুতে করা শর্ত নয়। কেউ যদি রমযান মাসের প্রতি রাতে নিয়ত করে ও রোযা রাখে তাহলে তার রোযা সহিহ।

ইবনুল কাত্তান (রহঃ) বলেন:

"আলেমগণ এই মর্মে ইজমা (প্রক্যমত্য) করেছেন যে, যে ব্যক্তি রমযান মাসের প্রতি রাতে রোযা রাখার নিয়ত করে ও রোযা রাখে তার রোযা পরিপূর্ণ।" [আল-ইকনা ফি মাসায়িলিল ইজমা (১/২২৭) থেকে সমাপ্ত]

কিন্তু, প্রবন্ধকারী ভাই যদি এ কথা বুঝতে চান যে, তিনি রমযানের প্রথমদিনে প্রবেশ করেছেন অথচ কোনভাবেই নিয়ত করেননি। তিনি সে দিনটি রমযান হওয়ার ব্যাপারে ভ্রমের মধ্যে ছিলেন অতঃপর ফজর হওয়ার পর জেনেছেন যে, এটি রমযান মাস। রাতের কোন এক মুহূর্তেও তিনি নিয়ত করেননি যে, আগামীকাল প্রথম রোযা রাখবেন, সেহেরী খাওয়ার জন্যেও উঠেননি: তাহলে তিনি এ দিনটি যে, রমযান মাস সেটা জানার পর থেকে পানাহার থেকে বিরত থাকবেন এবং পরবর্তীতে সে দিনটির রোযা কাযা পালন করবেন। কেননা রাত থেকে নিয়ত করা ওয়াজিব এমনটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।

রোযার নিয়ত করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে [22909](#) নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

রোযাদার কখন ইফতার করবেন?

প্রশ্ন

সূর্য ডোবার পরপরই ইফতার করা উত্তম; নাকি আকাশ থেকে আলো দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সুলত হচ্ছে- অবিলম্বে ইফতার করা; অর্থাৎ সূর্য ডোবার অব্যবহিত পরেই ইফতার করা। বরং তারাগুলো উদিত হওয়া পর্যন্ত দেরী করা ইহুদীদের কর্ম এবং শিয়া রাফেযি সম্প্রদায় তাদেরকে অনুসরণ করে আসছে। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে ভালভাবে সন্ধ্যা হওয়ার জন্য দেরী করা রোযাদারের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। এমনকি আযান শেষ হওয়া পর্যন্তও বিলম্ব করা ঠিক নয়। কারণ এর কোনটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ নয়।

সাহল বিন সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "মানুষ ততদিন কল্যাণে থাকবে যতদিন তারা অবিলম্বে ইফতার করবে"। [সহিহ বুখারী (১৮৫৬) ও সহিহ মুসলিম (১০৯৮)]

ইমাম নববী বলেন:

"এ হাদিসে সূর্য ডোবা নিশ্চিত হওয়ার পর অবিলম্বে ইফতার করার প্রতি উৎসাহ রয়েছে। যতদিন উম্মত এ সুলত রক্ষা করে যাবে ততদিন তারা সুশৃঙ্খল থাকবে এবং তারা কল্যাণে থাকবে। যদি তারা ইফতার করতে বিলম্ব করতে থাকে তাহলে সেটা তাদের বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হওয়ার আলামত।" [শারহে মুসলিম (৭/২০৮)]

ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি ও মাসরুক আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম: ইয়া উম্মুল মুমেনীন! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে একজন অবিলম্বে ইফতার করেন ও অবিলম্বে নামায পড়েন। অপর একজন বিলম্বে ইফতার করেন ও বিলম্বে নামায আদায় করেন। তিনি বললেন: তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অবিলম্বে ইফতার করেন ও অবিলম্বে নামায পড়েন? আমরা বললাম: আব্দুল্লাহ অর্থাৎ ইবনে মাসউদ। তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই করতেন। [সহিহ মুসলিম (১০৯৯)]

সতর্কতা:

"এ যামানায় যে গর্হিত বিদাতগুলো প্রবর্তিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে রমযান মাসে ফজর হওয়ার ২০ মিনিট আগে দ্বিতীয় আযান দেয়া এবং বাতিগুলো নিভিয়ে দেয়া; যে বাতিগুলো রোযা রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য পানাহার নিষিদ্ধ হওয়ার আলামত হিসেবে রাখা হয়। যে ব্যক্তি এটি প্রবর্তন করেছে সে এই ধারণা থেকে করেছে যে, এতে ইবাদতের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা হবে। গুটি কতক মানুষ ছাড়া আর কাউকে বিষয়টি জানায় না। একই চিন্তা থেকে তারা সূর্য ডোবার কিছু সময় পরে আযান দেয়; তাদের ধারণা অনুযায়ী যাতে করে সময় হওয়াটা জোরদার হয়। এভাবে তারা ইফতার করতে দেরী করে ও সেহেরী খাওয়া আগে আগে শেষ করে সুন্নাহর বিপরীত আমল করে যাচ্ছে। তাই তাদের মাঝে কল্যাণ হ্রাস পেয়েছে এবং অকল্যাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহই সহায়।" [ফাতহুল বারী (৪/১৯৯)]

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবার কিংবা ওষু করাকালে কুলির কিছু পানি গিলে ফেলে তার রোযা ভেঙ্গে যায়

প্রশ্ন

আমি গুচিবায়ু (OCD) তে আক্রান্ত। রমযান মাসে আমি যখন ওজু করতাম তখন বেশি বেশি থুথু ফেলতাম, এই ভয়ে না জানি গলার ভেতরে পানি চলে যায়। একবার আমি স্নায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ইচ্ছা করে পানি খেয়ে ফেলেছি। এখন আমি এ গুনার কাফফারা বা প্রতিকার কিভাবে করতে পারি?

একবার রমযানে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার মা বাদাম শুকাতেন। সে বাদামগুলো তিনি আমার পাশে রেখেছিলেন। আমি অনুভব করলাম যে, আমার মুখে কিছু একটা আছে; আমি জানি না, সেটা খাদ্যের অবশিষ্টাংশ; নাকি বাদাম। আমি উঠে গিয়ে কুলি করব এই অলসতা থেকে গিলে ফেলেছি। এখন আমার কি করণীয়?

অপর এক রমযানে আমার মুখের ভেতরে কিছু ওষুর পানি রয়ে গিয়েছিল। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সে পানি গিলে ফেলেছি।

সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে— যে ব্যক্তি উঠে গিয়ে কুলি করার অলসতা থেকে বমি গিলে ফেলেছে তার ব্যাপারে হুকুম কি?

আমি এখন স্তন্যদায়ী। আমি আল্লাহর কাছে তওবা করেছি। আমি কিভাবে আমার পাপের কাফফারা বা প্রতিকার করতে পারি?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

আপনার উপর ফরয হচ্ছে— যে দিনগুলোর রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করেছেন সেগুলোর কাযা পালন করা; সেটা মুখে থাকা পানি গিলে ফেলার মাধ্যমে হোক, যে পানি থুথুর পানি নয়; কারণ থুথুর পানি গিলে ফেলে রোযা ভাঙবে না কিংবা মুখে থাকা খাদ্যের

অবশিষ্টাংশ গিলে ফেলার মাধ্যমে হোক কিংবা মুখে চলে আসা বমি গিলে ফেলার মাধ্যমে হোক। আপনি এমন দিনগুলোর সংখ্যা নির্ধারণ করবেন এবং সে দিনগুলোর কাযা রোযা পালন করবেন। পাশাপাশি স্বেচ্ছায় আপনি যা করেছেন সেটার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করবেন। এ রোযাগুলোর কাযা পালন করা দুধ পান করানোর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ফরয হবে। কারণ স্তন্যদায়ী নারীর জন্য রোযা রাখাটা কষ্টকর হলে কিংবা এতে নিজের স্বাস্থ্যহানির আশংকা হলে কিংবা সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকা হলে দুধ পান করানোর মেয়াদের মধ্যে কাযা রোযা পালন করা তার উপর ফরয নয়। আর আপনি কঠিন শুচিবায়ু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া এবং স্নায়ুবিধি চাপে থাকা: আমরা আশা করছি এক্ষেত্রে আপনার কোন দোষ নেই। তবে, ওয়াসওয়াসা বা শুচিবায়ু রোধ করার চেষ্টা করা আবশ্যিকীয় এবং এটার প্রতি ক্রম্পেপ না করা। কারণ শুচিবায়ুর চিকিৎসার সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে- এটাকে গুরুত্ব না দেয়া ও এর প্রতি ক্রম্পেপ না করা এবং এর চাহিদামাফিক কিছু না করা। শুচিবায়ুর চিকিৎসার ব্যাপারে জানতে দেখুন: ১১১৯২৯ নং ও ৬০৩০৩ নং প্রশ্নোত্তর। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনি বলেছেন: “ একবার আমি মায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ইচ্ছা করে পানি খেয়ে ফেলেছি”।

আপনি যদি এর দ্বারা বুঝাতে চান যে, আপনার মুখে কুলির যে পানি রয়েছে সেটা বা সেটার কিছু অংশ গিলে ফেলেছেন: তাহলে আপনার রোযা ভেঙ্গে গেছে। এক্ষেত্রে আপনার উপর ফরয হল— তওবা করা এবং সে দিনের রোযার কাযা পালন করা।

আর আপনি যদি এর দ্বারা বুঝাতে চান যে, কুলি করার পর মুখের পানি বাহিরে ফেলে দিয়ে থুথু গিলে ফেলেছেন: তাহলে আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়। বুজাইরিমি (রহঃ) তার ‘হাশিয়াতে’ (২/৩৭৮) বলেন: “ গড়গড়া কুলি করার পর থুথু ফেলে দেয়া সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও গিলে ফেললে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু এর থেকে বেঁচে থাকা কঠিন।” [সমাণ্ড]

অনুরূপভাবে আপনি বলেছেন: “ আমার মুখের ভেতরে ওয়ুর কিছু পানি রয়ে গিয়েছিল”:

যদি এই পানিটি কুলির পানি হয় তাহলে আপনার রোযা ভেঙ্গে গেছে। আপনাকে এর কাযা পালন করতে হবে।

আর যদি কুলি করার পর ও মুখ থেকে পানি ফেলে দেয়ার পর মুখে যে আর্দ্রতা থাকে সেটা হয়ে থাকে: তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়।

তিন:

যদি কেউ তার দাঁতের মাঝে আটকে থাকা খাবার ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলে; যা সে বের করে ফেলতে সক্ষম, তাহলে এর দ্বারা তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলে; যেমন থুথুর সাথে গলার ভেতরে চলে গেল, এটাকে ফিরাতে পারল না; তাহলে তার রোযা সহিহ। তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়।

দেখুন: [78438](#) নং প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্নকারী বোনের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে থাকা খাবার গিলে ফেলেছেন এবং উঠে গিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে অলসতা করেছেন। যদি সেটা রাতের বেলায় ঘটে থাকে তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে না। আর যদি ফজর হওয়ার পর ঘটে থাকে তাহলে তাকে আল্লাহর কাছে তওবা করার পাশাপাশি সে দিনের রোযা কাযা পালন করতে হবে।

চার:

যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি চলে এসেছে; তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়, তার রোযা সহিহ। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করেছে তাকে রোযাটি কাযা পালন করতে হবে।

দেখুন: [95296](#) নং প্রশ্নোত্তর।

যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি আসার পর তিনি বমি গিলে ফেলেছেন; যদি তিনি সেটা অনিচ্ছাকৃতভাবে করে থাকেন তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলেন তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে গেল এবং তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক। স্থায়ী কমিটির আলোচনা বালেন: যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি বমি এসে যায় তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি গিলে ফেললেও রোযা নষ্ট হবে না। [ফাতাওয়াল লাজনা দায়িমা (১০/২৫৪)]

আরও জানতে দেখুন: [115155](#) নং প্রশ্নোত্তর।

ফজরের আযানের সময় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ায় আযানের পরেও খাওয়া-দাওয়া করা

প্রশ্ন

মিশরে ফজরের নামাযের সময় নির্ধারণ নিয়ে মতভেদ আছে। গতকাল আমার মা ফজরের আযান শুনার সময় তীব্র পিপাসা অনুভব করছিলেন। তিনি আমার ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন। আমার ভাই মিশরের একজন বড় সালাফি শাইখের তাকলিদ করে বললেন যে, পান করুন। সে শাইখ বলেন যে, নামাযের ওয়াক্ত নির্ধারণে ভুল আছে। তিনি এবং তাঁর ছাত্ররা আযানের ১০ মিনিট পরেও খাওয়া-দাওয়া করতেন। আমার ভাই অনেকবার এটা করেছেন; কিন্তু তার সংখ্যা মনে নেই। এখন আমার মা ও ভাইকে কী করতে হবে?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

রোযার ক্ষেত্রে ফরয হল ফজর উদিত হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় রোযাভঙ্গকারী যাবতীয় বিষয় থেকে বিরত থাকা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ পর্যন্ত না কালোসূতা (রাতের কালো রেখা) হতে উষার সাদা সূতা (সাদা রেখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।" [সূরা বাকারাহ ২ : ১৮৭]

সূতরাং ধর্তব্য হচ্ছে- ফজর উদিত হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি ফজর উদিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়নি সে ব্যক্তি নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত খেতে পারে।

অনুরূপভাবে কেউ যদি জানে যে, মুয়াজ্জিন ওয়াক্ত হওয়ার আগেই আযান দেয় কিংবা সন্দেহ করে যে, মুয়াজ্জিন কি ঠিক সময়ে আযান দিয়েছে নাকি সময়ের আগে; সেক্ষেত্রেও সে ব্যক্তি নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত খেতে পারে। তবে, উত্তম হচ্ছে সতর্কতাস্বরূপ আযান শুনার সাথে সাথে পানাহার থেকে বিরত থাকা শুরু করা।

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে একটি প্রশ্ন করা হয়, সে প্রশ্নটির ভাষ্য হচ্ছে- যে ব্যক্তি আযান শুনার পরও পানাহার করেই যাচ্ছে তার রোযার শরয়ি হুকুম কি?

জবাবে তিনি বলেন: ঈমানদারের উপর ফরয হচ্ছে- তার কাছে ফজর উদিত হওয়া নিশ্চিত হলে পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলো থেকে বিরত হওয়া; যদি রোযাটি রমযানের ফরয রোযা হয়, মানতের রোযা হয়, কাফফারার রোযা হয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ পর্যন্ত না কালোসূতা (রাতের কালো রেখা) হতে উষার সাদা সূতা (সাদা রেখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।" [সূরা বাকারাহ ২ : ১৮৭]

যখন কেউ আযান শুনতে পায় এবং সে জানে যে, ফজরের সময় হলেই আযান দেয়া হয় সেক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী থেকে বিরত হওয়া ফরয।

আর যদি মুয়াজ্জিন ফজর হওয়ার পূর্বেই আযান দেয় সেক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী থেকে বিরত হওয়া ফরয নয়। বরং ফজর উদিত হওয়া নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার করা তার জন্য জায়েয।

আর যদি মুয়াজ্জিনের অবস্থা না জানে যে, সে কি ফজর হওয়ার আগে আযান দেয়; নাকি ফজর হওয়ার পরে আযান দেয় তাহলে উত্তম হচ্ছে ও সতর্কতা হচ্ছে- আযান শুনার সাথে সাথে পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত হওয়া। আর যদি আযান চলাকালেও সে কোন কিছু পানাহার করে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ ফজর উদিত হওয়ার ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়নি।

এ কথা সুবিদিত যে, যে ব্যক্তি শহরের ভেতরে বসবাস করে যেখানে বৈদ্যুতিক বাতি রয়েছে সেখানে নিজ চোখে দেখে ফজর উদিত হওয়া অবহিত হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু, তার উচিত আমলের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা; আযানের মাধ্যমে ও ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে; যে সব ক্যালেন্ডারে ঘণ্টা ও মিনিটের মাধ্যমে ফজর উদিত হওয়ার সময় নির্ধারণ করা থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীর উপর আমল করে: “ যাতে তোমার সন্দেহ নেই সেটা গ্রহণ করে যাতে তোমার সন্দেহ আছে সেটা বর্জন কর।” এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “ যে ব্যক্তি সংশয়মূলক বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকে সে ব্যক্তি তার দ্বীনদারি ও সম্ভ্রম রক্ষা করে।” আল্লাহ্ই উত্তম তাওফিকদাতা। [‘ফাতাওয়া রমাদান’ থেকে সংকলিত; সংকলক: আশরাফ আব্দুল মাকছুদ, পৃষ্ঠা-২০১]

এ আলোচনার আলোকে বলব: আপনার মা ও ভাই যদি তাদের কাছে নির্ভরযোগ্য আলেমের তাকলিদ করে থাকেন, যিনি বলেন যে, সুবহে সাদেক এর আগেই আযান দেয়া হয় এবং এ অভিমতের ভিত্তিতে তারা পানাহার করেন তাহলে তাদের ইতিপূর্বে পালনকৃত রোযাতে কোন সমস্যা নেই। তার রোযা সহিহ।

তবে, ভবিষ্যতে আযানের সাথে সাথে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা ক্যালেন্ডারে ভুল আছে বললে অনেক কথা উঠবে। বিশেষত: ভুলের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে। তাই রোযার ক্ষেত্রে সতর্কতা হচ্ছে- আযানের সাথে পানাহার বর্জন করা। আর নামাযের ক্ষেত্রে সতর্কতা হচ্ছে- বিশ মিনিট বা তারও বেশি সময় পর নামায আদায় করা।

আরও জানতে দেখুন: [26763](#) নং ও [66202](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

জনৈক নারী ইফতার করার পর রক্তশ্রাব দেখেছেন, কিন্তু তিনি সন্দেহে রয়েছেন যে, ইফতারের পূর্বেই রক্তশ্রাব শুরু হয়েছে নাকি ইফতারের পর?

প্রশ্ন

আমি রমযান মাসে ইফতার করার কিছুক্ষণ পর রক্তশ্রাব দেখতে পেলাম। কিন্তু, আমি জানি না: রক্তশ্রাব কি ইফতারের আগে শুরু হয়েছে নাকি পরে? এমতাবস্থায় আমার উপরে কি সেই দিনের রোযা কাযা পালন করতে হবে? কিংবা অন্য কি করতে হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলেমগণ একটি ফিকহী নীতি উল্লেখ করে থাকেন, “ যে কোন ঘটনাকে এর নিকটতম সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করাই মূলবিধান”

এ নীতিটির অর্থ হচ্ছে: যদি কোন একটি ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সে ঘটনাটি নিকটবর্তী কিংবা দূরবর্তী যে কোন সময়ে ঘটে থাকতে পারে। এ দুটো সম্ভাবনার মধ্যে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য কোন দলিল না থাকে। সেক্ষেত্রে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার নিকটবর্তী সময়টি ধর্তব্য হবে। কেননা নিকটবর্তী সময়টির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ঘটনাটি তাতে সংঘটিত হয়েছে। আর দূরবর্তী সময়টিতে ঘটনাটি ঘটা সন্দেহপূর্ণ।

এ নীতিটির অধিভুক্ত একটি রূপ হচ্ছে, যদি কেউ তার কাপড়ে বীর্ষ দেখে জানতে পারে যে, এটি স্বপ্ন দোষের চিহ্ন। কিন্তু কখন স্বপ্নদোষ হয়েছে সেটা স্মরণ করতে না পারে সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি সর্বশেষ যে ঘুম ঘুমিয়েছে এর পরের নামাযগুলো পুনরায় আদায় করবে।

এ নীতিটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যারকাশি তাঁর ‘আল-মানছুর ফিল কাওয়ামেদ’ নামক কিতাবে, সুয়ুতি তাঁর ‘আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের’ নামক কিতাবে। তাঁরা উভয়ে এ নীতিটির আরও কিছু শাখা উল্লেখ করেছেন। আরও জানতে এ গ্রন্থদ্বয়ের যে কোনটি দেখা যেতে পারে।

এর আলোকে বলা যায় যে, যদি কোন নারী রক্তস্রাব দেখতে পান, কিন্তু তিনি রক্তপাতের সময় জানতে না পারেন: সেটা কি সূর্য ডোবার আগে নাকি পরে? সেক্ষেত্রে নিকটবর্তী সময়টিকে রক্তপাতের সময় ধরা হবে। এ মাসয়ালায় নিকটবর্তী সময় হচ্ছে, সূর্য ডোবার পর।

আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়াতে (২৬/১৯৪) এসেছে: যে নারী রক্তস্রাব দেখতে পান; কিন্তু জানেন না যে, কখন রক্তপাত শুরু হয়েছে তার বিধান ঐ ব্যক্তির মত, যে তার কাপড়ে বীর্ষ দেখেছেন, কিন্তু কখন বীর্ষপাত ঘটেছে তা জানেন না। অর্থাৎ তাকে গোসল করতে হবে এবং সর্বশেষ যখন ঘুমিয়েছে এরপর থেকে আদায়কৃত নামাযগুলো পুনরায় পড়তে হবে। এ অভিমতের, মধ্যে জটিলতা কম এবং এটি অধিক সুস্পষ্ট।” [সমাণ্ড]

শাইখ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল-মুখতার আল-শানকিতীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: এক নারী মাগরিবের পর রক্তস্রাব দেখতে পেলেন, কিন্তু তিনি জানেন না কখন রক্তপাত শুরু হয়েছিল: মাগরিবের আগে নাকি পরে? এমতাবস্থায়, তার নামায ও রোযার হুকুম কী হবে?

জবাবে তিনি বলেন: “ যদি তিনি রক্তস্রাব দেখেন এবং তার প্রবল ধারণা হয় যে, এটি সূর্যাস্তের আগেই শুরু হয়েছে তাহলে কোন সন্দেহ নেই যে, তার সে দিনের রোযা বাতিল এবং সেটি কাযা পালন করতে হবে। আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, রক্ত তাজা এবং এটি মাগরিবের পর শুরু হয়েছে: সেক্ষেত্রেও কোন সন্দেহ নেই যে, তার রোযা সহিহ এবং পবিত্র হওয়ার পর মাগরিবের নামায কাযা পালন করা তার উপর আবশ্যিক। তিনি কাযা হিসেবে নামাযটি পড়বেন।

আর যদি তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহে থাকেন সেক্ষেত্রে আলেমগণের অনুসৃত নীতি হচ্ছে, “ নিকটবর্তী সময়ের সাথে ঘটনাকে সম্পৃক্ত করা”। কারণ এক্ষেত্রে মূল অবস্থা হচ্ছে, রোযাটি সহিহ হওয়া; যতক্ষণ পর্যন্ত না রোযাটি সহিহ না হওয়ার পক্ষে কোন দলিল পাওয়া যায়। মূল অবস্থা হচ্ছে, সে মহিলা গোটা দিন রোযা রেখেছেন এবং তার দায়িত্ব নিষ্পন্ন হয়েছে; যতক্ষণ পর্যন্ত না এ অবস্থার উপর প্রতিক্রিয়া তৈরী করার মত কিছু আমরা না পাই। এ কারণে তার রোযা সহিহ মর্মে হুকুম দেয়া হবে। এ রক্তস্রাব সেদিনের রোযার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। কেননা আপনি যদি বলেন, রোযা সহিহ, তাহলে মাগরিবের নামায কাযা পালন করা আবশ্যিক হবে। আর যদি বলেন: রোযা সহিহ নয়; তাহলে তার উপর মাগরিবের নামাযের কাযা পালনও আবশ্যিক নয়। তাই রোযা ঠিক থাকলে মাগরিবের নামাযের কাযা পালন অনিবার্য হবে। কেননা, ওয়াক্ত শুরু হওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির দায়িত্বে সেটা অবধারিত হয়ে যায়।” [যাদুল মুস্তানকি এর ব্যাখ্যা হতে সমাণ্ড]

সারকথা: আপনার রোযা সহিহ। যেহেতু মাগরিবের আগে থেকে রক্তস্রাব শুরু হয়েছে কিনা সেটা আপনি নিশ্চিত নন।

আল্লাহই ভাল জানেন।

স্যালাইন, ভিটামিন ইনজেকশন ও শিরাতে পুশকৃত ইনজেকশন কি রোযা নষ্ট করবে?

প্রশ্ন

স্যালাইন, ভিটামিন ইনজেকশন, শিরাতে পুশকৃত ইনজেকশন ও সাপোজিটরি ব্যবহারে কি রোযা ভঙ্গবে? আমি অগ্রগণ্য অভিমতটি জানতে চাই।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যা কিছু পানাহার, কিংবা পানাহারের স্থলাভিষিক্ত সেটাই রোযা ভঙ্গকারী অন্তর্ভুক্ত। ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলেমগণ বলেন:

“ রোযা ভঙ্গকারী বিষয় অনেক। এর মধ্যে রয়েছে- ইচ্ছাকৃত পানাহার। পানাহারের অধীনে পড়বে প্রত্যেক খাদ্য বা পানি যা পেটে প্রবেশ করে। রাইস টউবের মাধ্যমে নাক দিয়ে যা পেটে পৌঁছানো হয় সেটাও এর অধিভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে খাদ্যের বিকল্প ইনজেকশনও এর অধিভুক্ত হবে।” [ফাতওয়াল লাজনা আদ-দায়িমা (৯/১৭৮)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“ রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলো হচ্ছে- খাওয়া ও পান করা: সে খাদ্য বা পানীয় যে শ্রেণীরই হোক না কেন। খাওয়া ও পান করার অধিভুক্ত হবে ইনজেকশনসমূহ। অর্থাৎ ঐ সকল ইনজেকশনসমূহ যেগুলো শরীরে পুষ্টি যোগায় কিংবা খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে যে শক্তি অর্জিত হয় এসব ইনজেকশনের মাধ্যমেও একই শক্তি অর্জিত হয়। তাই এগুলো রোযা ভঙ্গ করবে...।” [মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসায়িলিল উছাইমীন (১৯/২১)]

তিনি আরও বলেন:

আলেমগণ মুফাভিরাত বা রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর অধিভুক্ত করেছেন ঐ সব বিষয়কে যেগুলো পানাহারের পর্যায়ে পড়ে। যেমন- পুষ্টিদায়ক ইনজেকশন। যে সকল ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীর চাঙ্গা হয় কিংবা রোগ মুক্ত হয় এটি সেসব ইনজেকশন নয়। বরং এটি হচ্ছে পুষ্টিদায়ক ইনজেকশন; যা পানাহারের স্থলাভিষিক্ত। এ আলোচনার ভিত্তিতে যে সব ইনজেকশন পানাহারের স্থলাভিষিক্ত নয় সেগুলো রোযা ভঙ্গ করবে না। চাই সে ইনজেকশন রোগে দেয়া হোক কিংবা রানে দেয়া হোক কিংবা অন্য কোন স্থান দিয়ে দেয়া হোক। [শাইখ উছাইমীনের ‘মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলিল উছাইমীন (১৯/১৯৯)]

দুই:

কিছু কিছু রোগীকে রোগ দিয়ে যে স্যালাইন পুশ করা হয় এটি রোযা ভঙ্গ করবে। কেননা এটি খাদ্য দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। (কারণ এর মধ্যে লবণ ও তরল রয়েছে) যা পেটে প্রবেশ করবে এবং এর দ্বারা শরীর উপকৃত হবে।

তিন:

ভিটামিন ইনজেকশন ও রোগে পুশ করা ইনজেকশন:

যদি এ সকল ইনজেকশন শরীরকে চাঙ্গা করার জন্য, ব্যথ্যা দূর করার জন্য, কিংবা লাঘব করার জন্য, জ্বর কমানোর জন্য গ্রহণ করা হয় এবং এটি পুষ্টিগুণ সম্পন্ন না হয় তাহলে এসব ইনজেকশনের কারণে রোযা ভঙ্গ হবে না।

পক্ষান্তরে, যদি পুষ্টিগুণ সম্পন্ন হয় তাহলে এটি রোযা নষ্ট করবে। কারণ এটি খাবার ও পানীয়ের স্থলাভিষিক্ত; তাই এটাকে খাবার ও পানীয়ের হুকুম দেয়া হবে।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি বলেন: চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রোযাদারের জন্য রমযানের দিনের বেলায় পেশীতে ইনজেকশন দেয়া জায়েয আছে। কিন্তু, রোযাদারের জন্য খাদ্য-ইনজেকশন গ্রহণ করা নাজায়েয। কেননা ইনজেকশন গ্রহণ করা খাবার-দাবার গ্রহণ করার ন্যায়। তাই এ ধরনের ইনজেকশন গ্রহণ করা রমযান মাসে রোযা ভাঙ্গার একটা একটা কৌশল। যদি পেশীতে ও রোগের ইনজেকশন রাতের বেলায় দেয়া যায় তাহলে সেটা উত্তম। [স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র থেকে (১০/২৫২) সমাণ্ড]

চার:

সাপোজিটরি রোযা ভাঙ্গে না। কারণ এটি চিকিৎসার জন্য গ্রহণ করা হয়। এটি খাবার ও পানীয় এর মধ্যে পড়ে না।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

রোযাদার ব্যক্তি অসুস্থ হলে গুহ্যদ্বার দিয়ে প্রবেশকৃত সাপোজিটরি ব্যবহারে কোন গুনাহ নেই। কেননা এটি পানাহার নয় এবং পানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয়। শরীয়ত প্রণেতা আমাদের উপর শুধু পানাহার করা হারাম করেছেন। অতএব, যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত সেটাকে পানাহারের হুকুম দেয়া হবে। আর যা কিছু এরকম নয় সেগুলো শব্দগত কিংবা অর্থগতভাবে পানাহারের অধীনে পড়বে না। ফলে সেগুলোর জন্য পানাহারের হুকুমও সাব্যস্ত হবে না। [ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলিল উছাইমীন (১৯/২০৪)]

আরও জানতে দেখুন: [49706](#) নং, [37749](#) নং ও [38023](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

জনৈক নারী এক ফোটা রক্ত দেখছেন, তিনি কি রোযা রাখবেন?

প্রশ্ন: আমি যখন টয়লেটে প্রবেশ করেছি তখন দেখেছি সে স্থানে এক ফোটা রক্ত রয়েছে। এতে আমার সন্দেহ ও আশংকার সৃষ্টি হয়েছে যে, আমি ঋতুবতী কিনা? আমি কি নামায পড়ব, রোযা চালিয়ে যাব; নাকি নয়?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

যেটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সে রক্তের ফোটা হয়েছে নয়। সুতরাং এ রক্ত নামায ও রোযার প্রতিবন্ধক হবে না।

শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এমন একজন নারী সম্পর্কে যার কয়েক ফোটা রক্তপাত হয়েছে এবং এ অবস্থা গোটা মাস অব্যাহত ছিল এবং তিনি রোযা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তার রোযা কি সহিহ?

জবাবে তিনি বলেন: হ্যাঁ, তার রোযা সহিহ। এই যে কয়েক ফোটা রক্ত এটা কিছু না। কেননা, এ রক্ত শিরা থেকে এসেছে [ফাতওয়াল মারআল মুসলিমা (১/১৩৭) থেকে সমাপ্ত]

তিনি আরও বলেন:

সাধারণ নীতি হচ্ছে, যদি নারী পবিত্র হয়ে যায় এবং হায়েয-নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার নিশ্চিত আলামত দেখতে পায়; আমি বুঝতে চাচ্ছি যদি সাদা শ্রাব দেখতে পায়; (সাদা শ্রাব হচ্ছে- সাদা পানি, নারীরা যে পানি চিনতে পারে) এ শ্রাব দেখার পর মলিন রঙ, হলুদ রঙ কিংবা ফোঁটা ফোঁটা, কিংবা ভেজা ভেজা থাকা ইত্যাদি কিছুই হায়েয নয়। এগুলো নামায ও রোযার প্রতিবন্ধক নয়। এগুলোর কারণে স্ত্রী সহবাসেও কোন বাধা নেই। কেননা এসব হায়েয নয়।" [সমাপ্ত]

হায়েয সংক্রান্ত ৬০ নং প্রশ্নোত্তর।

রোযার নিয়ত করার পদ্ধতি কি?

প্রশ্ন

একজন মানুষ কিভাবে রোযার নিয়ত করবে? কখন থেকে রোযার নিয়ত করা ফরয?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোযা রাখার দৃঢ় সংকল্প করার মাধ্যমে রোযার নিয়ত অর্জিত হয়। রমযানের রোযার নিয়ত অবশ্যই প্রতিদিন রাত থেকে পাকাপোক্ত করতে হবে [স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র, (১০/২৪৬)]

“ কোন কোন আলেমের মতে, যে রোযাগুলো লাগাতরভাবে রাখা শর্ত সে রোযাগুলোর নিয়ত প্রথমে একবার করলেই চলবে; যদি না কোন ওজরের কারণে রোযা ভাঙ্গা হয়, যদি রোযা ভাঙ্গা হয় তাহলে আবার নতুন করে নিয়ত করবে। এ অভিমতের ভিত্তিতে কেউ যদি রমযানের প্রথম দিন রোযা রাখার নিয়ত করে যে, সে গোটা মাস রোযা রাখবে তাহলে এ নিয়তই যথেষ্ট; যদি না কোন ওজরের কারণে মাঝখানে কোন রোযা ছুটে যায়। যেমন- কেউ রমযানের মধ্যে সফরে গেল; সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি সফর থেকে ফেরত আসলে নিয়ত নবায়ন করে নিবে।

এটি অধিকতর শুদ্ধ অভিমত। কেননা আপনি যদি সকল মুসলিমকে জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি আপনাকে বলবেন, আমি মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রোযা রাখার নিয়ত করেছি। তাই, তিনি যদি আক্ষরিক অর্থে নিয়ত নাও করেন; বিধানগতভাবে নিয়ত হাছিল

হয়েছে। কেননা, মূল অবস্থা হচ্ছে, রোযা রাখার পরম্পরা বিঘ্নিত না হওয়া। এ কারণে আমরা বলেছি, যদি কোন বৈধ ওজরের কারণে রোযা রাখার পরম্পরা বিঘ্নিত হয় তাহলে আবার নতুনভাবে নিয়ত করতে হবে। এ অভিমতের ব্যাপারে অন্তর প্রশান্ত হয়।”

সেহেরী হিসেবে শুধু পানি পান করা কি যথেষ্ট?

প্রশ্ন

সেহেরীর সময় শুধু পানি পান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে সেটাকে কি সেহেরী বলা যাবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হচ্ছে- সেটাকে সেহেরী বলা যাবে যদি সে ব্যক্তি অন্য কোন খাবার না পায়। দলিল হচ্ছে- “তোমাদের কেউ ইফতার করলে সে যেন কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করে। আর যদি কাঁচা খেজুর না পায় তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে। আর যদি শুকনো খেজুরও না পায় তাহলে কয়েক টোক পানি দিয়ে ইফতার করে।” অতএব, সে ব্যক্তির কাছে যদি কোন খাবার না থাকে; অর্থাৎ খাওয়ার মত কিছু না থাকে; কিংবা তার কাছে খাবার আছে তবে সেটা খেতে তার রুচি হচ্ছে না তাহলে সে পানি পান করবে এবং আশা করি সে সওয়াব পাবে [সমাণ্ড]

অতি উষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর কষ্টকর হওয়ার পরও কি সিয়াম পালন করা ওয়াজিব?

প্রশ্ন

বিশাল সাহারা অঞ্চলে কখনও গ্রীষ্মকালে রমজান মাস আসে এবং সিয়াম পালন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জন্য তা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং কয়েক বছর ধরে এই অবস্থা বিরাজমান থাকে। তারা কিভাবে সিয়াম পালন করবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

“রমজানমাস শুরু হলে প্রত্যেক মুকান্নাফ (শরয়ি ভারপ্রাপ্ত), মুকীম(স্বগৃহে অবস্থানকারী) সুস্থ মুসলিমের উপর সিয়াম পালনকরা ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

[فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] [البقرة :]

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পেল, সে যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে, অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।” [২ আল-বাক্বারাহ: ১৮৫]

তাই গরমের মৌসুমেও সিয়াম পালন ওয়াজিব। কারণ রমজান মাসে সিয়াম পালন ইসলামের অন্যতম একটি রোকন। আর যে ব্যক্তি রোজা রেখে প্রচণ্ড পিপাসায় প্রাণ চলে যাওয়ার আশংকা করবে সে রোজা ভঙ্গ করে এতটুকু পানাহার গ্রহণ করবে যা তার জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন। এরপর পুনরায় মুফাতিরাত (রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বিরত থাকবে এবং অন্যসময় সেই দিনের রোজার কাযা পালন করবে।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহই তাওফিকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তার সাহাবীগণের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।”
সমাপ্ত

আল-লাজনাহ আদ-দায়িমা (গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি)

শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে গুদাইইয়ান, শাইখ সালাহ আল-ফাওয়ান, শাইখ আব্দুল আযিয আল-শাইখ, শাইখ বকর আবু যাইদ।

[ফাতাওয়াআল-লাজনাহ আদ-দায়িমা

যাদের দেশে দিন বড় হয় অথবা সূর্যাস্ত যায় না তারা কিভাবে নামায ও রোজা পালন করবে

প্রশ্ন

যাদের অঞ্চলে দিন ২১ ঘণ্টা দীর্ঘ হয় তারা কি করবে? তারা কি রোজার জন্য বিশেষ কোন হিসাব করে নিবে? যাদের অঞ্চলে দিন খুব ছোট তারা কি করবে? একইভাবে যাদের অঞ্চলে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত থাকে তারা কি করবে? তারা কিভাবে নামায ও রোজা আদায় করবে?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

যাদের অঞ্চলে ২৪ ঘণ্টার পরিসরে রাতদিন হয় তারা দিবাভাগে রোজা পালন করবে। দিবাভাগ ছোট হোক কিংবা বড় হোক। আলহামদুলিল্লাহ, দিবাভাগ ছোট হলেও সে ভাগে রোজা রাখা তাদের জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যাদের দিনরাত ২৪ ঘণ্টার চেয়ে দীর্ঘ হয় যেমন— ৬ মাস তারা নামায ও রোযার জন্য একটি সময়সূচী নির্ধারণ করে নিবে। যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল আবির্ভূত হওয়ার দিনের ব্যাপারে একটি সময়সূচী নির্ধারণ করে নেয়ার আদেশ করেছেন। যে দিন হবে ১ বছরের সমান অথবা ১ মাসের সমান কিংবা ১ সপ্তাহের সমান।

সৌদি উচ্চ উলামা পরিষদ এই মাসয়ালাটি গবেষণা করে একটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন; নং- ৬১ তারিখ- ১২/৪/১৩৯৮ হিজরী। উক্ত সিদ্ধান্তটি নিম্নরূপ:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের প্রতি।

এক:

কেউ যদি এমন কোন দেশে অবস্থান করে যেখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মাধ্যমে দিন ও রাত চিহ্নিত করা যায় এবং গ্রীষ্মের দিন খুব বড় ও শীতের দিন ছোট হয় তবে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সুবিদিত ৫ ওয়াক্ত সময়সূচী অনুযায়ী নামায আদায় করা তাদের জন্য ফরজ। এর দলিল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

[أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا] [الإسراء :]

“সূর্যটলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার ঘন হওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের নামায কয়েম করুন। নিশ্চয় ফজরের তেলাওয়াতে (ফেরেশতারা) উপস্থিত থাকে।” [১৭ সূরা আল ইসরা: ৭৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

[إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْثُوتًا] [النساء :]

“নিশ্চয় সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করা মুমিনদের উপর ফরজ।” [৪ সূরা আল নিসা: ১০৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوَلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ (تَطْلُعِ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ) رواه مسلم

“ জোহরের সময় হলো- যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ে তখন থেকে শুরু করে ব্যক্তির ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে আসরের ওয়াক্ত না-আসা পর্যন্ত। আসরের সময় হলো- যতক্ষণ না সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে। মাগরিবের সময় হলো- যতক্ষণ না পশ্চিমাকাশের লালিমা অদৃশ্য হয়ে যায়। এশার সময় হলো মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। ফজরের সময় প্রভাতের আলো বিচ্ছুরিত হওয়া থেকে শুরু করে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। সূর্যোদয়কালীন সময়ে নামায থেকে বিরত থাকুন। কেননা, সূর্যশয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে উদিত হয়।” [মুসলিম ৬১২] এছাড়াও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সীমা নির্ধারণমূলক আরও অনেক কওলি ও ফেলি হাদিস রয়েছে। এ হাদিসগুলোতে দিন ছোট কি বড় সে পার্থক্য করা হয়নি। রাত ছোট কি বড় সে পার্থক্য করা হয়নি। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্ট আলামতের মাধ্যমে নামাযের সময়সীমা আলাদাভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। নামাযের সময়সূচী সম্পর্কে এই আলোচনা। আর রমজানের রোজা রাখার সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফ (শরয়ি ভারপ্রাপ্ত) ব্যক্তিদের ওয়াজিব হলো- তাদের দেশে ফজরের শুরু থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে খাবার, পানীয় ও সকল প্রকার রোজা-ভঙ্গকারী মুফাতিরাতে থেকে বিরত থাকা; যে পর্যন্ত তাদের দেশে রাত থেকে দিনকে পৃথকভাবে আলাদা করা যায় এবং রাতদিনেরপরিসীমা ২৪ ঘণ্টায় হয়ে থাকে। রাত ছোট হলেও তাদের জন্য খাবার, পানীয় ও শারীরিক মিলন ইত্যাদি শুধু রাতের বেলায় হালাল হবে। কারণ ইসলামী শরিয়ত সকল দেশের মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (البقرة :)

আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না উষার কালো সূতা হতে উষার সাদা সূতা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর” [সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৭]

যে ব্যক্তি রোজা সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হবে দিন দীর্ঘ হওয়ার কারণে কিংবা বিভিন্ন আলামত, অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ত ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শের ভিত্তিতে জানতে পারবে নতুবা তার প্রবল ধারণা হবে যে, এই রোজা পালনের কারণে তার মৃত্যু হতে পারে অথবা কঠিন রোগ দেখা দিতে পারে অথবা বর্তমান রোগ বেড়ে যেতে পারে অথবা সুস্থতা বিলম্বিত হতে পারে তবে সেক্ষেত্রে তিনি রোজা না-রেখে সেই দিনগুলোর কাযা রোজা সুবিধা মত সময়ে পালন করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِمَّنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة :)

“ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পেল সে যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে সে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূরণ করবে।” [২ সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

إِلَّا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (البقرة :)

“ আল্লাহ যে কারো উপর তার সাধ্যের মধ্যে ভার আরোপ করেন।” [২ সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন:

أَوْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج :)

“ তিনি তোমাদের উপর দ্বীন পালনে কাঠিন্য আরোপ করেন নি।” [২২ সূরা আল-হজ্জ : ৭৮]

দুই:

কেউ যদি এমন কোন দেশে অবস্থান করে যেখানে গ্রীষ্মকালে সূর্য ডুবে না অথবা শীতকালে সূর্য উদিত হয় না অথবা দিবালোক ৬

মাস ও রাতের অন্ধকার ৬ মাস স্থায়ী হয় তবে তাদের জন্য প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৫ বার সালাত আদায় করা ফরজ এবং নিকটবর্তী দেশের নামাযের সময়সূচী অনুযায়ী তারা একটি সময়সূচী নির্ধারণ করে নিবে। নিকটবর্তী যে দেশে নামাযের সময়গুলো একটি থেকে আরেকটি আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। এর দলিল হচ্ছে- ইসরা ও মিরাজের হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের উপর দিবানিশি ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবের নিকট তা কমানোর প্রার্থনা করতে থাকলেন, এক পর্যায়ে আল্লাহ বললেন:

(يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَّاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) رواه مسلم ()

“ হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় (ফরজকৃত নামায) প্রতিদিন ও রাতে ৫ বার নামায।” [সহিহ মুসলিম (১৬২)]

আরও দলিল হচ্ছে- ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে নজদ থেকে এক লোক এলো। তার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার গুনগুন শব্দ শুনছিলাম; কিন্তু সে কি বলছে তা বুঝা যাচ্ছিল না। এক পর্যায়ে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এলো এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “ দিনে ও রাতে ৫ বার নামায আদায় করা।” সে বলল: “ আমার উপর কি এগুলো ছাড়া আর কোন নামাযের দায়িত্ব আছে?” তিনি বললেন: “ না, তবে আপনি যদি নফল নামায করতে চান...।” [সহিহ বুখারী (৪৬) ও সহিহ মুসলিম (১১)]

এছাড়াও সাব্যস্ত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিকট মসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন সাহাবীগণ বললেন: “ সে পৃথিবীতে কতদিন থাকবে?” তিনি বললেন: “ চল্লিশ দিন। তার একটা দিন হবে এক বছরের সমান। একটা দিন হবে এক মাসের সমান। একটা দিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর বাকি দিনগুলো আপনাদের দিনের মত হবে।” আমরা বললাম: “ ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার যে দিনটি এক বছরের সমান হবে সে দিনে কী শুধু একদিনের সালাত আদায় করলে যথেষ্ট হবে?” তিনি বললেন: “ না, আপনাদেরকে হিসাব করে নিতে হবে।” [সহিহ মুসলিম (২৯৩৭)]

সূতরাং যে দিনের দৈর্ঘ্য একবছরের সমানসেদিনে শুধু ৫ বারনামায আদায় করাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথেষ্ট ঘোষণা করেন নি। বরং সে দিনের প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৫ বার নামায আদায় করা ফরজ করেছেন এবং তাদের দেশের স্বাভাবিক দিনে এক ওয়াক্ত থেকে আরেক ওয়াক্তের মাঝে যে ব্যবধান থাকে সেটাকে ভিত্তিকরে নামাযের সময়সূচী নির্ধারণ করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সূতরাং যে দেশের নামাযের সময়সূচী নির্ধারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, সে দেশের মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হল- তারা তাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী যে দেশে রাত ও দিন আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়, যে দেশে শরিয়ত নির্ধারিত আলামতগুলোর ভিত্তিতে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৫ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচী নির্ণয় করা যায় সে দেশের সময়সূচীর উপর ভিত্তি করে তাদের নামাযের সময় নির্ধারণ করে নিবে। অনুরূপভাবে তাদের উপর রমজান মাসের সিয়াম পালন ফরজ। তারা তাদের সিয়াম পালনের জন্য রমজান মাসের শুরু ও শেষ নির্ধারণ করবে, রমজান মাসের প্রতিদিন রোজা শুরুর সময় ও ইফতারের সময় নির্ধারণ করবে তাদের সবচেয়ে কাছের যে দেশে স্বাভাবিক ২৪ ঘণ্টায় দিন-রাত পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় সে দেশের ফজরের সময় ও সূর্যাস্তের সময়ের ভিত্তিতে। এই দিনের সময়সীমা হবে ২৪ ঘণ্টা। এর দলিল হচ্ছে- ইতিপূর্বে উল্লেখিত মসীহ দাজ্জাল সম্পর্কিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস। যে হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে নামাযের সময় নির্ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে রোজা ও নামাযের মাসয়ালার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আল্লাহই তাওফিক দাতা। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। সমাপ্ত

পরীক্ষার কারণে রমজানের রোজা না-রাখা

প্রশ্ন: যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, রমজানের রোজা রেখে পড়াশুনা করতে পারতাম না। সে জন্য দুই রমজানের কিছু রোজা আমি রাখি নি। এখন আমার উপর কি শুধু কাযা ওয়াজিব; নাকি শুধু কাফফারা ওয়াজিব? নাকি কাযা কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

রমজান মাসে রোজা পালন ইসলামের অন্যতম একটি ভিত্তি। যে ভিত্তিগুলোর উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইবনেউমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

بُيِّئَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ (رَمَضَانَ)

“ইসলাম পাঁচটি রোকনের উপর প্রতিষ্ঠিত: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, নামাযকায়ম করা, যাকাত দেওয়া, হজ্জআদায় করা এবং রমজান মাসে রোজা পালন করা।”

সুতরাং যে ব্যক্তি রোজা ত্যাগ করলে ইসলামের একটি রোকন ত্যাগ করল এবং কবিরা গুনাতে লিপ্ত হল। বরখসলফে সালেহিনদের কেউ কেউ এ ধরণের ব্যক্তিকে কাফির ও মুরতাদ মনে করতেন। আমরা এ ধরনের গুনাহ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইমাম যাহাবীতার ‘আল-কাবায়ের’ গ্রন্থে (পৃঃ ৬৪) বলেছেন:

“মুমিনদের মাঝে স্বীকৃত যে, যে ব্যক্তি কোন রোগ বা কারণ ছাড়া রমজান মাসে রোজা ত্যাগ করে সে ব্যক্তি যিনাকারী ও মদ্যপ মাতালের চেয়ে নিকৃষ্ট। বরং তাঁরা তার ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন এবং তার মাঝে ইসলামদ্রোহিতা ও বিমুখতার ধারণা করেন।” সমাপ্ত

দুই:

পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখার ব্যাপারে শাইখ বিন বাযরাহিমাছল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি বলেন: “একজন মুকাব্বাফ (শরিয় দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তির জন্য রমজান মাসে পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখা জায়েয নয়। কারণ এটি শরিয়ত অনুমোদিত ওজর নয়। বরং তার উপর রোজা পালন করা ওয়াজিব। দিনের বেলায় পড়াশোনা করাতার জন্য কষ্টকর হলে সে রাতের বেলায় পড়াশোনা করতে পারে। আর পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উচিত ছাত্রদের প্রতি সহমর্মী হওয়া এবং রমজান মাসের পরিবর্তে অন্য সময়ে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা। এর ফলে দুইটি সুবিধার মধ্যে সমন্বয় করা যায়। ছাত্রদের সিয়াম পালন ও পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য অবসর সময় পাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহিহ হাদিসে এসেছে তিনি বলেন:

(اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه) أخرجه مسلم في صحيحه

“হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের যে কোন পর্যায়ের কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের সাথে কোমল হয় আপনিও তার প্রতিকোমল হন। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কর্তৃত্ব পেয়ে তাদের সাথে কঠোর হয় আপনিও তার সাথে কঠোর হন।” [সহিহ মুসলিম]

তাই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার উপদেশ হল- তাঁরা যেন ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সহমর্মী হন। রমজান মাসে পরীক্ষা না দিয়ে রমজানের আগে বা পরে পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করেন। আমরা আল্লাহর কাছে সবার জন্য তাওফিক প্রার্থনা করি। “সমাণ্ডফাতাওয়াআশ-শাইখ ইবনে বায (৪/২২৩) ‘ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি’ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

আমি রমজান মাসে একটানা সাড়ে ৬ ঘণ্টা পরীক্ষা দিব। মাঝে ৪৫ মিনিটের বিরতি আছে। একই পরীক্ষায় আমি গত বছরও অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু সিয়াম পালনের কারণে ভালোভাবে মনোযোগ দিতে পারিনি। তাই পরীক্ষার দিনে কি আমার রোজা না-রাখা জায়েয হবে?

তাঁরা উত্তরে বলেন:

“উল্লেখিত কারণে রোজা না-রাখা জায়েয নয়; বরং তা হারাম। কারণ রমজানে রোজা না-রাখার বৈধ ওজরের মধ্যে এটি পড়ে না।” সমাপ্ত

[ফাতাওয়াললাজনা দায়িম (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সমগ্র (১০/২৪০)]

তিন:

না-রাখা রোজাগুলো কাযা করার ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন:

আপনি যদি এই ভেবে রোজা না-রেখে থাকেন যে পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখা জায়েয, তবে আপনার উপর শুধু কাযা করা ওয়াজিব। আপনার যেহেতু ভুল ধারণা ছিল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আপনি হারামে লিপ্ত হননি তাই আপনার ওজুহাত গ্রহণযোগ্য। আর আপনি যদি তা হারাম জেনে রোজা না-রাখেন তবে আপনার উপর অনুতপ্ত হওয়া, তওবা করা এবং পাপ কাজে পুনরায় ফিরে না আসার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা ওয়াজিব। কাযা করার ক্ষেত্রে যদি আপনি রোজা শুরু করে দিনের বেলায় রোজা ভেঙ্গে ফেলেন তাহলে আপনাকে এর কাযা পালন করতে হবে। আর যদি আপনি শুরু থেকেই রোজা না-রেখে থাকেন তাহলে আপনার উপর কোন কাযা নেই। এর জন্য আল্লাহ চাহতে 'সত্যিকার তওবা' (তওবায়ে নাসুহ)-ই যথেষ্ট। আপনার উচিত বেশি বেশি ভাল কাজ করা, নফল রোজা রাখা; যাতে করে ছুটে যাওয়া ফরজ ইবাদতের ঘাটতিপূরণ করে নিতে পারেন।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাল্লাহুকে রমজানে দিনের বেলায় বিনা ওজরে পানাহারের হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন:

রমজানে দিনের বেলায় বিনা ওজরে পানাহার করা মারাত্মক কবিরাগুনাহ। এতে করে ব্যক্তি ফাসেক হয়ে যায়। তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে- আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং রোজা না-রাখা দিনগুলোর কাযা রোজা পালন করা। অর্থাৎ সে যদি রোজা শুরু করে বিনা ওজরে দিনের বেলায় রোজা ভেঙ্গেফেলে তাহলে তার গুনাহ হবে এবং তাকে সে দিনের রোজা কাযা করতে হবে। কারণ সে রোজাটি শুরু করেছে, সেটি তার উপর অনিবার্য হয়েছে এবং সে ফরজ জেনে সে আমলটি শুরু করেছে। তাই মান্নতের ন্যায় এর কাযা করা তার উপর আবশ্যিক। আর যদি শুরু থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা ওজরে রোজা ত্যাগ করে তবে অগ্রগণ্য মত হল তার উপর কাযা আবশ্যিক নয়। কারণ কাযা করলেও সেটি তার কোন কাজে আসবে না। যেহেতু তাকবুল হবে না।

শরয়ি কায়দা হল: নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত কোন ইবাদত যখন বিনা ওজরে সে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা হয় না সেটা আর কবুল করা হয়না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)

“ যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের দ্বীনে নেই তা প্রত্যাখ্যাত। ” [সহিহ বুখারী (২০৩৫), সহিহ মুসলিম (১৭১৮)]

তাছাড়া এটি আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন। আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমানা লঙ্ঘন করা জুলুম বা অন্যায়। জালিমের আমল কবুল হয়না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

(وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

“ যারা আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারা জালিম (অবিচারী)। ” [২ আল-বাক্বারাহ:২২৯]

এছাড়া সে ব্যক্তি যদি এই ইবাদতটি নির্দিষ্ট সময়ের আগে পালন করত তবে তা তার কাছ থেকে কবুল করা হতোনা, অনুরূপভাবে কোন ওজর ছাড়া সে যদি নির্দিষ্ট সময়ের পরে তা আদায় করে তবে সেটাও তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না। সমাপ্ত

[মাজমূফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ৪৫)]

চার:

কাযা পালনে এই কয়েক বছর দেরী করার কারণে আপনার উপর তওবা করা আবশ্যিক। যে ব্যক্তির উপর রমজানের কাযা রোজা রয়েছে পরবর্তী রমজান আসার আগে তাপালন করে নেয়া ওয়াজিব। যদি সে এর চেয়ে বেশি দেরী করে তবে সে গুনাহগার হবে। এই বিলম্ব করার কারণে তার উপর কাফফারা (প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়ানো) ওয়াজিব হবে কিনা-এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। নির্বাচিত মত হল-তার উপর কাফফারা আদায় ওয়াজিব হবে না। তবে সাবধানতাবশতঃ আপনি যদি কাফফারা আদায় করেন তবে তা ভাল। আরও জানতে দেখুন (26865) নং প্রশ্নের উত্তর।

জবাবের সারাংশ হল:

আপনি যদি পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখা জায়েয মনে করে রোজা না-রেখে থাকেন অথবা রোজা শুরু করে দিনে ভেঙ্গে ফেলেন তাহলে আপনাকে কাযা পালন করতে হবে; কাফফারা আদায় করতে হবে না। আমরা দোয়া করছি যাতে আল্লাহ আপনার তওবা কবুল করেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।

এক মেয়ে ভুল করে পানি পান করার পর তার মা তাকে বলল- 'তোমার রোজা ভেঙ্গে গেছে'; তাই সে রোজা ভেঙ্গে ফেলে পরবর্তীতে সে রোজাটির কাযা করেছে; এমতাবস্থায় তার উপর কি কিছু বর্তাবে?

প্রশ্ন: সেহেরি খাওয়ার পর আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এর মধ্যে আমি দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে জেগে উঠি। আমার মা কিছু পানি নিয়ে এলে আমি পানি পান করি। কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, 'আমি রোজাদার'। এরপর আবার ঘুমালাম। যখন জাগলাম তখন আমি রোজা পূর্ণ করতে চাইলাম। কিন্তু আমার মা বললেন: তুমি যখন পানি পান করেছ তখন তোমার রোজা ভেঙ্গে গেছে এবং তিনি আমাকে রোজা ভাঙ্গালেন। এমতাবস্থায়, এ রোজা ভাঙ্গাটি কি ইচ্ছাকৃত রোজা ভাঙ্গা হিসেবে গণ্য হবে? উল্লেখ্য পরবর্তীতে আমি এ রোজাটি কাযা করেছি। আমি কাফফারার বিষয়ে জানতে চাই। কারণ আমি মেয়ে মানুষ। আমার পিতাই আমার অভিভাবক। আমি বয়সে ছোট। এমতাবস্থায় আমি কি করব?

উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক:

যদি কোন রোজাদার ভুলে গিয়ে রমজানের দিনের বেলায় পানাহার করে ফেলে তার রোজা শুদ্ধ; তাকে কাযা আদায় করতে হবে না। এ বিষয়ে **50041** নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

তাই তুমি যে, ভুলে গিয়ে পানি পান করেছ এতে তোমার রোজার কোন ক্ষতি হয়নি। উচিত ছিল তোমার রোজাটি পূর্ণ করা। আর যেহেতু তুমি তোমার মায়ের কথা অনুযায়ী রোজা ভেঙ্গেছ এবং পরবর্তীতে ঐ রোজা কাযা করেছ- সুতরাং তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ। তোমার উপর কোন কাফফারা নেই। কারণ কাফফারা ওয়াজিব হয় কেউ রমজানের দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে। **38074** নং প্রশ্নোত্তরটি দেখতে পার।

আল্লাহই ভাল জানেন।

রমজান মাসের দিনের বেলায় মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করতে দোষ নেই

প্রশ্ন: রমজান মাসের প্রথম দিন এক বৃদ্ধা আমার সাথে দেখা করেছেন। তাঁর বয়স ১০০ বছরের মত হবে। কখনও তাঁর হুঁশ থাকে, আবার কখনও থাকে না। তিনি আমার কাছে কফি চাইলেন। আমি তাঁকে কফি বানিয়ে খাইয়েছি। এতে কি আমার গুনাহ হবে? অবশ্য আমি তাঁকে বলেছিলাম আমরা এখন রমজান মাসে আছি। আমাকে এর উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন।

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

“ যদি বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, উনি বেহুঁশ এবং বুদ্ধি-বিকলতা ও বারধক্যে আক্রান্ততবে তাঁকে কফি বানিয়ে খাওয়াতে কোন দোষ নেই। কারণ তাঁর উপর সিয়াম পালন আবশ্যিক নয়। তার কিছু হুঁশ থাকা যেমন তিনি বলতে পারেন, 'তোমরা এটি কর বা এটি দাও' তার বিবেক-বুদ্ধি বহাল থাকার প্রমাণ বহন করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যিনি ১০০ বছর বয়সে পৌঁছেছেন তার বিবেক বিপর্যয়ও পরিবর্তন ঘটে। আপনি যদি তাঁর অবস্থা দেখে বোঝেন যে, তিনি হুঁশ হারিয়ে ফেলেছেন এবং ভারসাম্যহীনতবে তাঁর পানাহার করায়

কোন দোষ নেই। আর আপনি যদি দেখেন যে, তার হুঁশ আছে এবং তিনি রোজা পালনে অবহেলা করছেন তবে কফি বা অন্য কিছু দিবেন না - যাতে করে আপনি গুনার কাজে সাহায্যকারী না হন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة :]

“পুণ্য কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর, পাপ ও সীমা লঙ্ঘনে একে অন্যকে সহযোগিতা কর না।” [৫ সূরা আল-মায়দা: ২]

তাই কোন সুস্থ মুসলিম রমজান মাসে খাবার চাইলে তাকে তা দেওয়া যাবে না। খাবার, পানীয়, ধূমপান কিছুই করতে দেওয়া যাবে না। কোন গুনাহর কাজে সাহায্য করা যাবে না। আর যাদের হুঁশ নেই যেমন- উম্মাদ, অতিবৃদ্ধ, পাগল ও অতিবৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে কোন গুনাহ হবে না। কারণ তারারোজা পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত।” সমাপ্ত

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযীয বিন বাযরাহিমাছল্লাহ

কোন ব্যক্তি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছে সেদিনের অবশিষ্ট সময় রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ হতে বিরত থাকা কি আবশ্যিক?

প্রশ্ন: কোন কাফের যদি রমজানের দিনের বেলায় ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে যেই দিন ইসলাম গ্রহণ করেছে সেই দিনের বাকি অংশ মুফাতিরাতে (রোজা-ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বিরত থাকা কি তার উপর আবশ্যিক?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

“হ্যাঁ, ঐ দিনের বাকি অংশে মুফাতিরাতে (রোজা-ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বিরত থাকাতার জন্য আবশ্যিক। কারণ তিনি এখন যাদের উপর রোজা পালন করা ওয়াজিব তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। তাই দিনের বাকী সময় মুফাতিরাতে থেকে বিরত থাকা তার জন্য আবশ্যিক হবে। এই মাসয়ালারি রোজা পালনে প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হওয়া সংক্রান্ত মাসয়ালার বিপরীত। প্রতিবন্ধকতা দূর হলেও দিনের বাকী অংশে মুফাতিরাতে (রোজা-ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক নয়। যেমন: যদি কোন নারী দিনের বেলায় হয়েয থেকে পবিত্র হয় তবে তার জন্য ঐ দিনের বাকি অংশ মুফাতিরাতে (রোজা-ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক নয়। একইভাবে যদি কোন রোজা-ভঙ্গকারী রোগী দিনের মাঝখানে তার রোগ থেকে সুস্থ হয়ে যায় তবে তার জন্য দিনের বাকি অংশে মুফাতিরাতে (রোজা-ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক নয়। কারণ সে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সেই দিনের রোজা ভঙ্গ করা তার জন্য মুবাহ (বৈধ) ছিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দিনের বেলায় ইসলাম গ্রহণ করেছে দিনের বাকি অংশে মুফাতিরাতে থেকে বিরত থাকা তার জন্য আবশ্যিক; কিন্তু এ রোজাটি কাযা করা তার উপর আবশ্যিক নয়। বিপরীত দিকে হয়েয থেকে পবিত্র নারী ও অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়া ব্যক্তির জন্য দিনের বাকি অংশে মুফাতিরাতে থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক নয়; কিন্তু রোজাটি কাযাকরাতাদের উপর আবশ্যিক।” সমাপ্ত

ফাদিলাতুশ শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাছল্লাহ

কেউ রোজা রেখে এমন কোন দেশে সফর করল যেখানে রমজান বিলম্বে শুরু হয়েছে এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে কি ৩১ দিন রোজা রাখতে হবে?

প্রশ্ন:

যদি আমি এক দেশে রোজা পালন শুরু করে রমজান মাসের মধ্যে অন্য কোন দেশে ভ্রমণ করি যেখানে রমজান একদিন পরে শুরু হয়েছে, মাসের শেষ দিকে সে দেশবাসী যখন ৩০ তম রোজা পালন করছে তখন কি আমি তাদের সাথে রোজা রাখব; এতে তো আমার ৩১টি রোজা পালন হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য । যদিকোনব্যক্তিরমজানের প্রথম রোজা যে দেশে রেখেছে সে দেশ থেকে এমন কোন দেশে সফর করে যেখানেঈদুলফিতরবিলম্বে হয় তাহলেসে ব্যক্তি রোজা পালনচালিয়েযাবেযতদিননাশে দেশবাসী ঈদ উদযাপন না করে । শাইখ বিন বায রাহিমাল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

আমি পূর্ব এশিয়ার অধিবাসী । আমাদের দেশে হিজরি মাস সৌদি আরবের একদিন পর শুরু হয় । রমজান মাসে আমি দেশে যাব । আমি যদি সৌদি আরবে সিয়াম পালন শুরু করি এবং আমার দেশে গিয়ে শেষ করি, তাহলে আমার ৩১ দিন রোজা পালন করা হবে । এভাবে আমার সিয়াম পালনের হুকুম কি? আমি কতটি রোজা রাখব?

তিনি উত্তরে বলেন-

“ আপনি যদি সৌদি আরব বা অন্য কোন দেশে সিয়াম পালন শুরু করেন এবং নিজের দেশে গিয়ে বাকিটা পালন করেন তাহলে আপনার দেশের লোকদের সাথে সিয়াম ভঙ্গ করবেন তথা ঈদ উদযাপন করবেন; যদিও বা তা ৩০ দিনের বেশি হয় । কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون)

“ রোজা হল সেদিন যেদিন তোমরা (সকলে) রোজাপালন কর, আর ঈদুলফিতর হল সেদিন যেদিন তোমরা (সকলে) ইফতার (রোজা ভঙ্গ) কর ।” কিন্তু আপনি যদি তা করতে গিয়ে ২৯ দিনের কম রোজা পালন করেন, তাহলে আপনাকে পরবর্তীতে ১টি রোজা কাযা আদায় করে নিতে হবে । কারণ রমজানমাস ২৯ দিনের কম হতে পারেনা ।” সমাপ্ত [মাজমূফাতাওয়াশ-শাইখ ইবনে বায (১৫/১৫৫)]

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল উছাইমীন রাহিমাল্লাহু এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল:

যদি কোন ব্যক্তি এক মুসলিম দেশ থেকে অন্য দেশে গমন করে যে দেশের মুসলমানেরা প্রথম দেশের একদিন পরে রমজান শুরু করেছে সে ব্যক্তি সেদেশের লোকদের সাথে রোজা রাখতে গিয়ে তার ৩০টির বেশি রোজা হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে হুকুম কী? অনুরূপভাবে এ অবস্থার বিপরীত অবস্থার হুকুম কী?

তিনি উত্তরে বলেন :

“ যদি কেউ এক মুসলিম দেশ থেকে অন্য মুসলিম দেশে ভ্রমণ করে এবং সেই দেশে রমজান পরে শুরু হয়, তবে তিনি ঐ দেশের লোকেরা সিয়াম না-ছাড়া পর্যন্ত সিয়াম পালন করে যাবেন । কারণ রোজা হল সেদিন, যেদিন লোকেরা সিয়াম পালন করে; আর ঈদুল ফিতর হল সেদিন, যেদিন লোকেরা রোজা ছেড়ে দেয় । আর ঈদুল আযহা হল সেদিন, যেদিন লোকেরা পশুযবেহ করে । তাকে এভাবে রোজা পালন করতে হবে; যদিও বা এজন্য তাকে একদিন বা এর বেশিদিন সিয়াম পালন করতে হয় । এটি সেই মাসয়ালার অনুরূপ যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন দেশে ভ্রমণ করে যেখানে সূর্যাস্ত দেবীতে হয়, তবে সে ব্যক্তি কে সূর্যাস্ত না যাওয়া পর্যন্ত রোজা পালন করতে হবে । যদিও বা এর ফলে রোজা পালন স্বাভাবিক দিনের চেয়ে দুই, তিন বা ততোধিক ঘণ্টা বিলম্বিত হয় । এছাড়া এ কারণেও তাকে বেশিদিন রোজা থাকতে হবে যেহেতু সেদ্বিতীয় যে দেশে ভ্রমণ করেছে সেখানে(শাওয়াল মাসের) নতুন চাঁদ দেখা যায়নি । অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চাঁদ দেখে রোজা রাখতে ও চাঁদ দেখে রোজা ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি বলেছেন:

(صومو الرؤيته، وأفطرو الرؤيته)

“ তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজাধর এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ছাড়। ”

আর বিপরীত অবস্থা হচ্ছে-কোন ব্যক্তি এক দেশ থেকে অন্য এক দেশে ভ্রমণ করে যেখানে রমজান মাস প্রথম দেশের তুলনায় আগে শুরু হয়েছে, তবে তিনি তাদের সাথেই রোজাপালন ছেড়ে দিবেন এবং যে কয়দিনের রোজা বাদ পড়েছে সে রোজাগুলো পরে কাযা আদায় করে নিবেন। যদি একদিন বাদ পড়ে তবে একদিনের রোজাকাযা করবেন। যদি দুই দিনের বাদ পড়ে তবে দুই দিনের কাযা করবেন। তিনি ২৮ দিন পর রোজাছাড়লে দুই দিনের রোজা কাযা আদায় করবেন। যদি উভয় দেশে মাস ৩০দিনে শেষ হয়, আর এক দিনের কাযা করবেন যদি উভয় দেশে বা যে কোন এক দেশে ২৯ দিনে মাস শেষ হয়।” [মাজমু’ ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৪)] তাঁর কাছে আরও জানতে চাওয়া হয়েছিল -

কেউ হয়ত বলবে যে, কেন আপনি বলছেন যে প্রথম ক্ষেত্রে ৩০ দিনের বেশি রোজা পালন করতে হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রোযার কাযা পালন করতে হবে?

তিনি উত্তরে বলেন-

“ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রোযার কাযা রোজা পালন করতে হবে কারণ মাস ২৯ দিনের কম হতে পারে না। আর প্রথম ক্ষেত্রে সে ৩০ দিনের বেশি রোজা পালন করবে কারণ তখনও নতুন চাঁদ দেখা যায়নি। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলব রোজাছেড়ে দাও যদিও তোমার ২৯ দিন পূর্ণ হয়নি। কারণ নতুন চাঁদ দেখা গিয়েছে। নতুন চাঁদ দেখা যাওয়ার পর রোজাছেড়ে দেয়া বাধ্যতামূলক। শাওয়াল মাসের প্রথম দিন রোজা পালন করা হারাম। আর কেউ যদি ২৯ দিনের কম রোজা পালন করে থাকে তাহলে তাকে ২৯ দিন পূরণ করতে হবে। এটি দ্বিতীয় অবস্থা হতে ভিন্ন। কারণ যে দেশে আসা হয়েছে সেখানে তখন রমজান চলছে; নতুন চাঁদ দেখা যায় নি। যেখানে এখনও রমজান চলছে সেখানে কিভাবে রোজা ভঙ্গ করা যেতে পারে? তাই আপনাকে রোজা পালন চালিয়ে যেতে হবে। আর যদি তাতে মাস বেড়ে যায়, তাহলে তা দিনের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়ার মত।” [মাজমু’ ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৫)]

আরো জানতে দেখুন (38101) নং প্রশ্নের উত্তর। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রেস্টুরেন্ট মালিকের জন্য রমজানের দিনের বেলায় বে-রোজদার লোক ও অমুসলিমদের নিকট খাবার বিক্রি করা জায়েয কি?

প্রশ্ন: আমি একটি অমুসলিম দেশে প্রবাসী। এখানে আমার ছোট একটি রেস্টুরেন্ট আছে। মুসলিমদের মধ্যে কিছু কিছু বে-রোজদার (তাদের সংখ্যা অনেক) দুপুর বেলায় আমার রেস্টুরেন্টে খেতে চায়। এ সকল বে-রোজদার ও অমুসলিমদের নিকট খাবার বিক্রি করার হুকুম কি ?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এক:

ইতিপূর্বে এই ওয়েবসাইটে প্রকাশিত অনেকগুলো প্রশ্নোত্তরে কুফরি-রাষ্ট্রে বসবাসের ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। কারণ এতে করে ব্যক্তির নিজের ও তার পরিবারের দীনদারি হুমকির সম্মুখীন হয়; ব্যক্তি তার সন্তানদেরকে আশানুরূপভাবে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে না। চাকুরীর সুলভতার কারণে কুফরি রাষ্ট্রে অবস্থান করা-গ্রহণযোগ্য অজুহাত নয়। আরও জানতে পড়ুন (38284) ও (13363) নং প্রশ্নের উত্তর।

দুই:

এবার আপনার প্রশ্নের প্রসঙ্গে আসা যাক। জেনে রাখুন, রমজান মাসের দিনের বেলায় কাউকে খাবার খেতে দেয়া আপনার জন্য জায়েয নয়। তবে সে ব্যক্তির রোজা-ভঙ্গ করার শরিয়তসম্মত কোন ওজর থাকলে; যেমন অসুস্থ হলে বা মুসাফির হলে ভিন্ন কথা। এই

হুকুমের ক্ষেত্রে মুসলিম ও কাফেরের মাঝে কোন তফাৎ নেই। বে-রোজদার মুসলিম রোযা রাখার জন্য আদিষ্ট। রোজাভঙ্গ করার কারণে সে গুনাহগার হবে। রমজান মাসের দিনের বেলায় তাকে পানাহার করতে দেয়ার মানে গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে তাকে সহযোগিতা করা। অনুরূপভাবে কাফের ব্যক্তিও সিয়াম পালন ও সমস্ত ইসলামী অনুশাসন পালন করার ব্যাপারে আদিষ্ট। তবে আমলের আগে তাকে দুই সাক্ষ্যবাণী (শাহাদা) উচ্চারণ করে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। কেয়ামতের দিন কাফেরকে তার কুফুরির কারণে যেমনশাস্তি দেয়া হবে তেমনিভাবে ইসলামী শরিয়তের অন্যান্য অনুশাসনগুলো পালন না করার কারণেও শাস্তি দেয়া হবে। এতে করে জাহান্নামে তার শাস্তি অনেক বেড়ে যাবে।

ইমাম নববী রাহিমাল্লাহ বলেন, সঠিক মত হলো-যেমতের পক্ষে মুহাক্কিক (স্বক্ষ বিপ্লেষক)ও অধিকাংশ আলেম রয়েছেন-“ কাফেরেরা শরিয়তের শাখা-বিষয়সমূহের ব্যাপারেও আদিষ্ট। মুসলমানদের উপর যেমন রেশম হারাম তেমনিভাবে কাফেরদের উপরেও তা হারাম।” সমাপ্ত [শরহে মুসলিম (১৪/৩৯)] শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-উছাইমীন রাহিমাল্লাহ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: কাফের তো শরিয়ি বিধিবিধান পালনের জন্য আদিষ্ট নয়; তাহলে কিভাবে কেয়ামতের দিন কাফেরের বিচার করা হবে?

তিনি উত্তরে বলেন:

এ প্রশ্নটি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তিতে করা হয়েছে যে দৃষ্টিভঙ্গিটি সঠিক নয়। কারণ একজন মুমিন যা যা করার জন্য আদিষ্ট একজন কাফেরও তা তা করার জন্য আদিষ্ট। তবে দুনিয়াতে কাফেরকে বাধ্য করা হচ্ছে না। কাফের যে, শরিয়ি বিধিবিধান পালনের জন্য আদিষ্ট এর দলীল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

(إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين)

(৩৯)কিন্তু ডানদিকস্থরা, (৪০) তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (৪১) অপরাধীদের সম্পর্কে (৪২) বলবেঃ তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? (৪৩) তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তাম না, (৪৪) অভাবগ্রস্তকে আহার দিতাম না, (৪৫) আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম। (৪৬) এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। [৭৪ আল-মুদ্দাসসির: ৩৯-৪৬] যদি নামায ত্যাগ ও মিসকীনদেরকে খাওয়ানো ত্যাগ করার কারণে তারা শাস্তিপ্রাপ্ত না হতো তাহলে তারা প্রশ্নের জবাবে সে বিষয়গুলো উল্লেখ করতনা। কারণ সে অবস্থায় এগুলো উল্লেখ করা নিরর্থক। অতএব, এটাই দলীল যে, ইসলামের শাখা-বিষয়সমূহ ত্যাগ করার কারণে তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এ বিষয়টি নকলি দলীল দ্বারা যেমন প্রমাণিত, তেমনি যুক্তির মাধ্যমেও প্রমাণিত। আল্লাহ যদি তাঁর মুমিন বান্দাকে তাঁর দ্বীনের কোন একটি ওয়াজিব দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হওয়ার কারণে শাস্তি দেন, তবে কাফেরকে কেন শাস্তি দিবেন না? বরং আমি আরেকটু যোগ করে বলতে পারি যে, আল্লাহ কাফেরকে খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি যত নেয়ামত দিচ্ছেন সেসবের জন্যেও তাকে শাস্তি দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

(ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و أحسنوا والله يحب المحسنين)

“যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যাভক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোন গুনাহ নেই যখন ভবিষ্যতের জন্যে সংযত হয়েছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর সংযত থাকে এবং ঈমান রাখে। এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ সৎকর্মীদেরকে ভালবাসেন।” [৫ আল-মায়দা : ৯৩] এই আয়াতের মানতুক (প্রত্যক্ষ ভাব) হচ্ছে- মুমিনগণ যা আহার করেছে সে ব্যাপারে তাদের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর আয়াতের মাফহুম (পরোক্ষ ভাব) হচ্ছে-কাফেরেরা যা আহার করেছে সে ব্যাপারে তাদের গুনাহ হবে।” সমাপ্ত [মাজমূফাৎওয়াশ-শাইখইবনে উছাইমীন (শাইখ উছাইমীনের ফতোয়াসমগ্র (২/ প্রশ্ননং ১৬৪)]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়- রমজানমাসের দিনের বেলায় কোন অমুসলিমকে খাবার পরিবেশন করা কোন মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। কারণ কাফেরেরা শরিয়তের শাখাগত বিষয়সমূহ পালনের ব্যাপারে আদিষ্ট। “নিহায়াতুলমুহতাজ” (৫/২৭৪) গ্রন্থে আলেমগণ হতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁরা রমজান মাসের দিনের বেলায় কাফেরদের কাছে খাবার বিক্রি করা হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আরো জানতে পড়ুন (49694) নং প্রশ্নের উত্তর। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রোজার সওয়াব কি কষ্টের পরিমাণের উপর নির্ভর করে?

প্রশ্ন

আল্লাহর নিকট রোজার সওয়াব কি সমান? নাকি রোজাদারের কষ্টের সাথে রোজার সওয়াব সম্পৃক্ত? কেউ আছে শীতের দেশে রোজা পালন করে; তারা পিপাসার কষ্ট তেমন অনুভব করে না। পক্ষান্তরে কেউ আছে গরমের দেশে রোজা পালন করে। রোজার সাথে আরো যে সব ভাল আমল থাকতে পারে সেগুলো বাদ দিয়ে আমি শুধু রোজার সওয়াবটার ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

কষ্ট যে কোন ইবাদতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কষ্ট সহ্য করা ছাড়া কোন ইবাদত পালন করা সম্ভব নয়। কষ্টের তীব্রতায় তবিশিহবে পুরস্কারও সওয়াব ততবেশি পাওয়া যাবে। তাই তোনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছেন :

إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك (رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترمذي والترهيب (وأصل الحديث) في الصحيحين

“ নিশ্চয় তোমার শ্রম ও ব্যয়ের পরিমাণ অনুযায়ী তুমি সওয়াব পাবে। ” [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আল-হাকেম, আলবানী ‘সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব’ (১১১৬) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন। এহাদিসের ভিত্তি দুই সহীহ গ্রন্থে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) রয়েছে]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ ‘সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা’ গ্রন্থে বলেন: “ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

(عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ أَوْ قَالَ : نَفَقَتِكَ)

তাঁর কথা: “ তোমার শ্রম অনুযায়ী অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বলেছেন: তোমার ব্যয় অনুযায়ী ” এর থেকে স্পষ্ট বুঝায় যে, শ্রম ও ব্যয়ের বৃদ্ধির সাথে ইবাদতের সওয়াব ও মর্যাদা বেড়ে যায়। শ্রম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-এমন শ্রম শরিয়তে যে শ্রম নিন্দনীয় নয়। অনুরূপভাবে ব্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যয় শরিয়তে যে ব্যয় নিন্দনীয় নয়। ” সমাপ্ত

“ কষ্টের পরিমাণ অনুযায়ী সওয়াব পাওয়া যায় ” এই নিয়মটি স্বত সিদ্ধ নয়। বরং এমন কিছু আমল রয়েছে যা তুলনামূলকভাবে সহজ, কিন্তু এতে সওয়াব বেশি।

যারকাশী ‘আল-মানছুর ফিলকাওয়ায়েরদ’ (২/৪১৫-৪১৯)-গ্রন্থে বলেন:

“ আমল যত বেশি ও কঠিন হবে তা অন্য আমলের চেয়ে তত বেশি উত্তম। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হাদীসে এসেছে:

وفي حديث عائشة رضي الله عنها : (أجرك على قدر نصبك)

তোমার সওয়াব তোমার শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী।

তবে অল্প আমল কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি আমলের চেয়ে উত্তম। যেমন:

মুসাফিরের জন্য নামায কসর (৪ রাকাতের স্থলে ২ রাকাত) করে পড়া পরিপূর্ণ পড়ার চেয়ে উত্তম।

জামায়াতের সাথে ১ বার নামায আদায় করা একাকী ২৫ বার নামায আদায় করা থেকে উত্তম।

ফজরের দুই রাকাত সুন্নত সংক্ষিপ্ত করে আদায় করা তা দীর্ঘ করে পড়ার চেয়ে উত্তম।

কুরবানীকৃত পশুরকিছু গোশত খেয়ে বাকীটা সদকা করে দেয়া সম্পূর্ণ গোশত সদকা করে দেয়ার চেয়ে উত্তম।

নামাযে কোন একটি ছোট সূরার পুরা টুকু পড়া অন্য সূরার অংশ বিশেষ পড়ার চেয়ে উত্তম; এমনকি সে অংশ বিশেষ দীর্ঘ হলেও । কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত এটাই করতেন ।” [উদ্ধৃতিটি পরিমার্জিত ও সংক্ষেপিত]

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন ।

মুয়াজ্জিন কি আগে ইফতার করবেন নাকি আগে আযান দিবেন?

প্রশ্ন

মুয়াজ্জিন কখন ইফতার করবেন? আযানের আগে; না পরে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

রোযাদারের ইফতার করার ক্ষেত্রে বিধান হল- সূর্য অস্ত যেতে হবে এবং রাত শুরু হতে হবে ।এর দলীল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)
[البقرة : 2]

“আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায় । অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত ।” [2 আল-বাক্বারাহ : ১৮৭]

ইমাম তাবারী বলেছেন:আল্লাহর বাণী:

قوله : (ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)

“অতঃপর তোমরা রোযাপূর্ণ কর রাত পর্যন্ত” এখানে আল্লাহ তাআলা রোযার সময়-সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন ।রোযার শেষ সময় নির্ধারণ করেছেন- রাতের আগমন ।অন্যদিকে ইফতার, খাদ্য-পানীয়, স্ত্রী-মিলনবৈধ হওয়ার শেষ সময় ও রোযা শুরু করার সময় নির্ধারণ করেছেন- দিনের আগমন ও রাতের শেষভাগেরপ্রস্থান । এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাতের বেলায় কোন রোযা নেই ।অপরদিকে রোযার দিনগুলোতে দিনের বেলায় পানাহার বা স্ত্রী-মিলন নেই ।” সমাণ্ডাতাফসীরেতাবারী (৩/৫৩২)

রোযাদারের জন্য সুন্নত হলো অবিলম্বে ইফতার করা । সাহুল ইবনেসাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

(لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) رواه البخاري () ومسلم ()

“মানুষ ততদিন পর্যন্ত কল্যাণে থাকবে যতদিন তারা অবিলম্বে ইফতার করবে ।”[হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী (১৮৫৬) ওইমাম মুসলিম (১০৯৮)]

ইবনে আব্দুল বারর রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“ সুন্নত হলো-অবিলম্বে ইফতার করা এবং বিলম্বে সেহরি খাওয়া । অবিলম্বে মানে- সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে অবিলম্বে ইফতার করা । সূর্য অস্ত গিয়েছে কি; যায়নি- এ ব্যাপারে সন্দিহান থেকে ইফতার করা জায়েয নয় । কারণ “ নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে যে ফরজ আমল অনিবার্য হয়েছে, সে ফরজ আমল শেষও করতে হবে নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে ।” সমাণ্ডাত-তামহীদ (২১/৯৭, ৯৮)]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

“সূর্য অস্ত যাওয়া নিশ্চিত হয়েঅবিলম্বে ইফতারকরার ব্যাপারে এই হাদিসে উদ্ধৃদ্ধ করা হয়েছে। হাদিসের মর্মার্থ হলো- এই উম্মতেরঅবস্থা ততদিন পর্যন্ত সুশৃঙ্খল থাকবে এবং তারা কল্যাণেথাকবে যতদিন তারা এই সুন্নতপালন করে যাবে।” সমাপ্ত [শরহ মুসলিম (৭/২০৮)]

মুয়াজ্জিনের প্রসঙ্গ: যদি লোকেরা ইফতার করার জন্য মুয়াজ্জিনের আযানের অপেক্ষায় থাকে তাহলে মুয়াজ্জিনের উচিত অবিলম্বে আযান দেয়া। কারণ মুয়াজ্জিন বিলম্বে আযান দিলে লোকেরাও বিলম্বে ইফতার করবে এবং এতে করে সুন্নত লঙ্ঘিত হবে। আর যদি মুয়াজ্জিন সামান্য কিছু মুখে দিয়ে (যেমন এক ঢোক পানি) আযান দেন যাতে আযানে বিলম্বে না হয় তাতে কোন দোষ নেই।

আর যদি মানুষ ইফতার করার জন্য মুয়াজ্জিনের আযানের অপেক্ষায় না থাকে যেমন কোন এক ব্যক্তি নিজের নামাযের জন্য আযান দিল (উদাহরণতঃ মরুভূমিতে একা হতে পারে) অথবা এমন একদল মানুষের জন্য আযান দিল যারা সবাই কাছাকাছি উপস্থিত আছে (উদাহরণতঃ মুসাফির কাফেলা) সে ক্ষেত্রে আযানের আগে ইফতার করে নিতে কোন আপত্তি নেই। কেননা আযান না দিলেও তার সঙ্গিরা সবাই তার সাথে ইফতার করে নিবে; কেউ তার আযানের অপেক্ষায় থাকবে না। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রোজার রুকনগুলো কি কি?

প্রশ্ন

রোজার রুকনগুলো কি কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সকল ফিকাহবিশারদ এ ব্যাপারে একমত যে, সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজাভঙ্গকারী বিষয়সমূহ(মুফাতিরাত) থেকে বিরত থাকা রোজার অন্যতম একটি রুকন। তবে নিয়তের ব্যাপারে তারা মতানৈক্য করেছেন। হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবের আলেমগণেরমতে, নিয়ত হচ্ছে-রোজা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। অপরদিকে মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবেরআলেমগণের মতে, নিয়ত রোজার রুকন। মুফাতিরাত থেকে বিরত থাকা এর সাথে “নিয়তের সাথে” কথাটি যোগ করতে হবে। নিয়তকে রুকন ধরা হোক অথবা শর্ত ধরা হোক অন্য ইবাদতের মত রোজাও নিয়ত ছাড়া শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ নিয়তের সাথে মুফাতিরাত থেকে বিরত থাকতে হবে। [আল-বাহরুর-রায়েক (২/২৭৬), মাওয়াহিবুল-জালীল (২/৩৭৮), নিহাইয়াতুল-মুহতাজ (৩/১৪৯), নাইলুল-মা'আরিব শারহ দলীলু-ত্বালীব (১/২৭৪)] আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইফতারের মধ্যে অপচয় কি রোযার সওয়াব কমিয়ে দেয়?

প্রশ্ন

ইফতারের জন্য অতিরিক্ত খাবার বানানো কি রোযার সওয়াব কমিয়ে দিবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এতে সিয়ামের সওয়াব কমবে না। রোযা পূর্ণ করার পরে কেউ যদি কোন হারাম কাজে লিপ্ত হয় তাতে রোযার সওয়াবের কমতি হবে না। তবে এ ধরনের অপচয় আল্লাহ তাআলার সেই বাণীর নিষেধাজ্ঞার অধীনে পড়ে যায়:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

الأعراف :

“তোমরা পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করোনা। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।” [সূরা আ'রাফ, আয়াত ৭:৩১]

অপচয় করাটা এমনিতেই হারাম। আর মিতব্যয়িতা হল জীবিকার অর্ধেক। তাদের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু থাকলে তারা তা সদকাহ করে দিতে পারে। সেটাই তো উত্তম।”

ফজিলাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে 'উছাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)।

শিশুদের রোযা পালনে অভ্যস্ত করার পদ্ধতি কি?

প্রশ্ন

আমার ৯ বছরের একটি ছেলে আছে। তাকে কিভাবে রমজানের রোযা পালনে অভ্যস্ত করা যায়- আশা করি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবেন, ইনশা'আল্লাহ। বিগত রমজানে সে মাত্র ১৫ দিন রোযা পালন করেছে।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

এ প্রশ্নটি পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। সন্তানদের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া ও তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে গড়ে তোলার আন্তরিক চেষ্টার ইঙ্গিত বহন করে এ ধরনের প্রশ্ন। এটি অধীনস্থদের কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার উপর যাদের দায়দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

দুই:

শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ৯ বছরের ছেলে সিয়াম পালনে মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) নয়। কারণ সে এখনও সাবালক হয়নি। তবে আল্লাহ তা'আলা ইবাদতের উপর সন্তানদেরকে লালন-পালনের দায়িত্ব পিতা-মাতার ওপর অর্পণ করেছেন। ৭ বছর বয়সী সন্তানকে নামায শিক্ষা দেয়ার জন্য পিতামাতার প্রতি আদেশ জারী করেছেন। নামাযে অবহেলা করলে ১০ বছর বয়স হতে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান সাহাবীগণ তাঁদের সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকে রোযা রাখাতেন, যেন তারা এ মহান ইবাদত পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। এ আলোচনা হতে সন্তানসন্ততিকে উত্তম গুণাবলী ও ভাল কাজের উপর গড়ে তোলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সালাতের ব্যাপারে এসেছে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

“আপনারা আপনাদের সন্তানদের ৭ বছর বয়সে সালাত আদায়ের আদেশ করুন। এ ব্যাপারে অবহেলা করলে ১০ বছর বয়সে তাদেরকে প্রহার করুন এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দিন।” [হাদিসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন (নং ৪৯৫) এবং শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদ গ্রন্থে এ হাদিসকে সহীহ হাদিস বলে চিহ্নিত করেছেন]

রোযার ব্যাপারে এসেছে:

রুবাইবিনতে মুআওয়েয ইবনে আফরা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার সকালে মদিনার আশেপাশে আনসারদের এলাকায় (এই ঘোষণা) পাঠালেন : ‘যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় সকাল শুরু করেছে, সে যেন তার রোযা পালন সম্পন্ন করে। আর যে ব্যক্তি বে-রোযাদার হিসেবে সকাল করেছে সে যেন বাকি দিনটুকু রোযা পালন করে।’ এরপর থেকে আমরা আশুরারদিনরোযা পালন করতাম এবং আমাদের ছোট শিশুদেরকেও (ইনশা'আল্লাহ) রোযা রাখাতাম। আমরা (তাদের নিয়ে) মসজিদে যেতাম এবং তাদের জন্য উল দিয়ে খেলনা তৈরী করে রাখতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে সেই খেলনা দিয়ে ইফতারের সময় পর্যন্ত সাবুনা দিয়ে রাখতাম। [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী (নং ১৯৬০) ও মুসলিম (নং ১১৩৬)]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রমজান মাসে এক মদ্যপকে বলেছিলেন :

“ তোমার জন্য আফসোস! আমাদের ছোট শিশুরা পর্যন্ত রোযাদার!” এরপর তাকে প্রহার করা শুরু করলেন। [হাদিসটি ইমাম বুখারীসনদবিহীন বাণী (মুআল্লাক) হিসেবে ‘শিশুদের রোযা’ পরিচ্ছেদে সংকলন করেছেন]

যে বয়সে শিশু রোযা পালনে সক্ষমতা লাভ করে সে বয়স থেকে পিতামাতা তাকে প্রশিক্ষণমূলক রোযা রাখাবেন। এটি শিশুর শারীরিক গঠনের উপর নির্ভর করে। আলেমগণের কেউ কেউ এ সময়কে ১০ বছর বয়স থেকে নির্ধারণ করেছেন। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জবাব দেখুন (65558)নং প্রশ্নের উত্তরে। সেখানে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা পাবেন। তিন : শিশুদেরকে রোযা পালনে অভ্যস্ত করে তোলার বেশকিছু পন্থা রয়েছে:

১। শিশুদের নিকট রোযার ফজিলত সম্পর্কিত হাদিসগুলো তুলে ধরতে হবে। তাদেরকে জানাতে হবে সিয়াম পালন জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। জান্নাতের একটি দরজার নাম হচ্ছে ‘আর-রাইয়্যান’। এ দরজা দিয়ে শুধু রোযাদারগণ প্রবেশ করবে।

২। রমজান আসার পূর্বেই কিছু রোযা রাখানোর মাধ্যমে সিয়াম পালনে তাদেরকে অভ্যস্ত করে তোলা। যেমন- শা’বান মাসে কয়েকটি রোযা রাখানো। যাতে তারা আকস্মিকভাবে রমজানের রোযার সম্মুখীন না হয়।

৩। প্রথমদিকে দিনের কিছু অংশে রোযা পালন করানো। ক্রমান্বয়ে সেই সময়কে বাড়িয়ে দেয়া।

৪। একেবারে শেষ সময়ে সেহেরি গ্রহণ করা। এতে করে তাদের জন্য দিনের বেলায় রোযা পালন সহজ হবে।

৫। প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে রোযা পালনে উৎসাহিত করা।

৬। ইফতার ও সেহেরীর সময় পরিবারের সকল সদস্যের সামনে তাদের প্রশংসা করা। যাতে তাদের মানসিক উন্নয়ন ঘটে।

৭। যার একাধিক শিশু রয়েছে তাদের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা। তবে খুবই সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিশুটির প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা না হয়।

৮। তাদের মধ্যে যাদের ক্ষুধা লাগবে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়েঅথবা বৈধ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা। এমন খেলনা যাতে পরিশ্রম করতে হয় না। যেভাবে মহান সাহাবীগণ তাঁদের সন্তানদের ক্ষেত্রে করতেন। নির্ভরযোগ্য ইসলামী চ্যানেলগুলোতে শিশুদের উপযোগী কিছু অনুষ্ঠান রয়েছেএবংরক্ষণশীল কিছু কার্টুন সিরিজ রয়েছে। এগুলো দিয়ে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা যেতে পারে।

৯। ভাল হয় যদি বাবা তার ছেলেকে মসজিদে নিয়ে যান। বিশেষতঃ আসরের সময়। যাতে সে নামাযের জামাতে হাযির থাকতে পারে। বিভিন্ন দ্বীনি ক্লাসে অংশ নিতে পারে এবং মসজিদে অবস্থান করে কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহ তা’আলার যিকিরে রত থাকতে পারে।

১০। যেসব পরিবারের শিশুরা রোযা রাখে তাদের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার জন্য দিনে বা রাতের কিছু সময় নির্দিষ্ট করে নেয়া। যাতে তারা সিয়াম পালন অব্যাহত রাখার প্রেরণা পায়।

১১। ইফতারের পর শরিয়ত অনুমোদিত ঘুরাফিরার সুযোগ দেয়া। অথবা তারা পছন্দ করে এমন খাবার, চকলেট, মিষ্টি, ফল-ফলাদি ও শরবত প্রস্তুত করা।

আমরা এ ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখতে বলছি যে, শিশুর যদি খুব বেশি কষ্ট হয় তবে রোযাটি পূর্ণ করতে তার ওপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া উচিত নয়। যাতে তার মাঝে ইবাদতের প্রতি অনীহা না আসে অথবা তার মাঝে মিথ্যা বলার প্রবণতা তৈরী না করে অথবা তার অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণ না ঘটায়। কেননা ইসলামী শরিয়তে সে মুকাব্লাফ (ভারাপিত) নয়। তাই এ ব্যাপারে খেয়াল রাখা উচিত এবং সিয়াম পালনে আদেশ করার ব্যাপারে কড়াকড়ি না করা উচিত।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রোজা অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী

যে ব্যক্তি ফজরের ওয়াক্ত হয়নি মনে করে স্ত্রী সহবাস করেছে

প্রশ্ন

আমি যখন স্ত্রী-সহবাস করেছি তখন আমি জানতাম না যে, ফজরের আযান হয়ে গেছে। আমি এটি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল আরও কয়েক মিনিট পর পাঁচটা বাজে আযান দিবে। কিন্তু পরবর্তীতে পরিস্কার হয়েছে যে, পাঁচটা বাজার ১৫মিনিট আগেই আযান দেয়। এক্ষেত্রে সমাধান কি? আমি ও আমার স্ত্রীর উপর কি কাফফারা ওয়াজিব। উল্লেখ্য, সহবাস আমাদের উভয়ের সম্মতিক্রমে হয়েছে। আমরা সবেমাত্র ২৪ ঘন্টা পূর্বে সফর থেকে ফিরেছি। তখনও নামাযের সময়সূচী আমাদের জানা হয়নি। আমরা পৌঁছার দ্বিতীয় দিনে হঠাৎ করে রমযানের ঘোষণা পেয়েছি।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি আপনি যেভাবে উল্লেখ করেছেন সেভাবে হয়ে থাকে; তাহলে আপনাদের উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়। কেননা যে ব্যক্তি ফজর হয়নি মনে করে কোন রোযা ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, তখন ফজর হয়ে গিয়েছিল; সেক্ষেত্রে আলেমদের দুটো অভিমতের মধ্যে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী রোযাটির কাযা নেই। চাই সেই রোযা ভঙ্গকারী বিষয়টি পানাহার হোক কিংবা সহবাস হোক।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন: আমি পছন্দ করছি যে, সহবাস, খাওয়া ও পান করা এবং রোযা ভঙ্গকারী অন্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো তিনটি শর্ত পূর্ণ হওয়া ছাড়া কোন ব্যক্তির রোযাকে ভঙ্গ করবে না:

১। রোযাদারের জানা থাকতে হবে যে, এটি রোযা ভঙ্গকারী; অন্যথায় রোযা ভঙ্গ হবে না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর এ ব্যাপারে তোমরা কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বেচ্ছায় করেছে (তা অপরাধ)। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আহযাব, আয়াত: ৫]

এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: “হে আমাদের প্রভু! আমরা যদি বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬] তখন আল্লাহ তাআলা বললেন: আমি সেটাই করলাম।

এবং যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমার উম্মত থেকে ভুল ও বিস্মৃতি এবং যে ক্ষেত্রে তাদেরকে জবরদস্তি করা হয় সেটার গুনাহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।”

অজ্ঞব্যক্তি ভুলকারী। যেহেতু সে যদি জানত তাহলে সেটি করত না। সুতরাং অজ্ঞব্যক্তি যদি অজ্ঞতাবশতঃ কোন রোযা ভঙ্গকারী বিষয় করে ফেলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। তার রোযা পরিপূর্ণ ও সঠিক; চাই তার সে অজ্ঞতা হুকুম সম্পর্কে হোক কিংবা সময় সম্পর্কে হোক।

সময় সম্পর্কে অজ্ঞতার উদাহরণ হলো: সে ধারণা করেছে যে, এখনও ফজরের ওয়াক্ত হয়নি; তাই সে খাবার গ্রহণ করেছে। তার রোযা সহিহ।

২। রোযাদারের জ্ঞাতসারে বিষয়টি ঘটা; যদি বিস্মৃতিবশতঃ হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

৩। রোযাদার স্বেচ্ছায় সেটি করা। যদি তার অনিচ্ছায় সেটি ঘটে তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বিন উছাইমীন (১৯/২৮০) থেকে সমাপ্ত]

শাইখকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: জনৈক ব্যক্তি নব-বিবাহিত। সেই ব্যক্তি শেষ রাতে এই ভেবে স্ত্রী সহবাস করেছে যে, এখনও রাত বাকী আছে। এরমধ্যে নামাযের ইকামত দেয়া হয়। এ ব্যাপারে আপনারা কি বলবেন? তার উপর কি বর্তাবে?

তিনি জবাব দেন: “ তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না; পাপও না, কাফফারাও না, কাযাও না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: *এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস কর। তাদের সাথে অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে।*

এবং তিনি বলেছেন: *আর তোমাদের কাছে কালো রেখা থেকে প্রভাতের সাদা রেখা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার চলে গিয়ে ভোরের আলো উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর।* [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

তাই খাওয়া, পান করা ও সহবাস করা এ তিনটি সমান। এ তিনটির মধ্যে পার্থক্য করার পক্ষে কোন দলিল নেই। এ প্রত্যেকটি রোযার নিষিদ্ধ বিষয়। এর কোনটি যদি অজ্ঞতা বা বিস্মৃতির অবস্থায় ঘটে থাকে তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। [সমাণ্ড]

এর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আপনাদের উভয়ের উপর কোন কিছু বর্তাবে না; না রোযাটি কাযা করা, আর না কাফফারা। এই হুকুম সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি আপনারা সেই দিনের রোযা রেখে থাকেন। যদি আপনারা সেই দিনের রোযা না-রাখেন এই ভেবে যে, সহবাসের কারণে আপনাদের রোযা ভেঙ্গে গেছে; সেক্ষেত্রে আপনাদের উপর রোযাটির কাযা করা ছাড়া অন্য কিছু আবশ্যিক হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ

মুয়াজ্জিন ফজরের আযান দিচ্ছিলেন সে সময় যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত ছিলেন

প্রশ্ন

রমজান মাসে ফজরের আযানের আগ থেকে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করছিলাম। আযান চলাকালীন সময়েও আমি সহবাসরত ছিলাম। তবে আযান শেষ হওয়ার আগেই আমরা বিরত হয়েছি। আমার ধারণা ছিল যে, মুয়াজ্জিনের আযান শেষ করার পূর্ব পর্যন্ত সহবাস করা জায়েয। এখন আমার করণীয় কি?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

যদি ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে মুয়াজ্জিন আযান দেন, তাহলে ওয়াজিব হল ফজরের ওয়াক্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ (মুফাতিরাতে) থেকে বিরত থাকা। তাই মুয়াজ্জিন ‘আল্লাহ আক্ববার’ (আল্লাহ মহান) বলার সাথে সাথে খাদ্য, পানীয়, সহবাস ও সকল রোযা ভঙ্গকারী বিষয় (মুফাতিরাতে) থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক হয়ে যায়।

ইমাম নববী (রাহিমাল্লাহু) বলেন :

“ যদি ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সময় কারও মুখে খাবার থাকে, তবে সে যেন তা ফেলে দেয়। (খাবার) ফেলে দিলে - তার রোযা শুদ্ধ হবে, আর গিলে ফেলে - তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সময় সে সহবাসরত অবস্থায় থাকে, তবে সে অবস্থা থেকে তাৎক্ষণিক সরে গেলে - তার রোযা শুদ্ধ হবে। আর যদি ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সময় সে সহবাসরত অবস্থায় থাকে এবং ফজরের ওয়াক্ত হয়েছে জেনেও সহবাসে লিপ্ত থাকে, তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে- এ ব্যাপারে ‘আলেমগণের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। আর সে অনুসারে তার উপর কাফফারা আবশ্যিক হবে।” সমাণ্ড [আল-মাজ্জুম (৬/৩২৯)]

তিনি আরও বলেন: “আমরা উল্লেখ করেছি যে, ফজর উদিত হওয়ার সময় যদি কারো মুখে খাবার থাকে, তবে সে তা ফেলে দিবে ও তার রোযা সম্পন্ন করবে। আর যদি ফজর হয়েছে জেনেও সে তা গিলে ফেলে, তবে তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই” [আল-মাজ্জুম (৬/৩৩৩) এর দলীল হচ্ছে ইবনে উমর ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম এর হাদিস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(إن بلالا يؤذن بليل , فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) رواه البخاري و مسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه

“ বিলাল (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) রাত থাকতে আযান দেন। তাই আপনারা খেতে থাকুন ও পান করতে থাকুন যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) আযান দেন।” [হাদিসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমসংকলনকরেছেন এবং সহীহ গ্রন্থে এই অর্থের আরও হাদিস রয়েছে] সমাণ্ড

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, যদি আপনার এলাকার মুয়াজ্জিন ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দেয়, তাহলে আযানের প্রথম তাকবীর শোনার সাথে সাথে আপনাকে সহবাস থেকে বিরত হয়ে যেতে হবে। আর যদি আপনি জেনে থাকেন যে, মুয়াজ্জিন ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগেই আযান দেয় অথবা এব্যাপারে আপনি সন্দিহান থাকেন যে, তিনি কি সুবহে সাদিক হওয়ার আগে আযান দেন, নাকি পরে আযান দেন- সেক্ষেত্রে আপনার উপর করণীয় কিছু নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা ফজর পরিস্ফুট হওয়া পর্যন্ত খাওয়া, পান করা ও সহবাস করা বৈধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(فَالْآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَنْبِئُوهُمْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

“অতএব এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) লিখে রেখেছেন তা কামনা করতে পার। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ কালোসূতা (রাতের কালো রেখা) হতে উষার সাদা সূতা (সাদা রেখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।” [সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৭]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির 'আলেমগণকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:“ কোন ব্যক্তি আগেই সেহেরী খেয়েছে। কিন্তু ফজরের আযান চলাকালীন সময়ে অথবা আযান দেওয়ার ১৫ মিনিট পর পানি পান করেছে-এর হুকুম কী?

তাঁরা উত্তরে বলেন: “প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি যদি জেনে থাকেন যে, সেই আযান সুবহে সাদিকপরিষ্কার হওয়ার আগে দেওয়া হয়েছিল তবে তার উপর কোন কাযা নেই। আর যদি তিনি জেনে থাকেন যে, সে আযান সুবহে সাদিকপরিষ্কার হওয়ার পরে দেওয়া হয়েছে তবে তার উপর উক্ত রোযা কাযা করা আবশ্যিক। আর তিনি যদি না জানেন যে, তার পানাহার ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে ঘটেছে, না পরে ঘটেছে সেক্ষেত্রে তাকে কোন রোযা কাযা করতে হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে মূল অবস্থা হচ্ছে- রাত বাকি থাকা। তবে একজন মু'মিনের উচিত তার সিয়ামের ব্যাপারে সাবধান থাকা এবং আযান শোনার সাথে সাথে রোযা ভঙ্গকারী সমস্ত বিষয় থেকে বিরত থাকা। তবে তিনি যদি জেনে থাকেন যে, এই আযান ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে দেওয়া হয়েছে তাহলে ভিন্ন কথা।” সমাপ্ত

[ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ : (২/২৪০)]

দুই:

যদি আপনি এই হুকুমের ব্যাপারে না জেনে থাকেন এবং মনে করে থাকেন যে, আযানের শেষ পর্যায়েরোযা ভঙ্গকারী বিষয়াদি (মুফাতিরাত) থেকে বিরত হওয়া অনিবার্য হয়, তবে আপনার উপর কোন কাফফারা বর্তাবে না। তবে সাবধানতাবশতঃ আপনাকে সে রোযাটির কাযা আদায় করতে হবে। সেই সাথে দ্বীনের যেসব বিষয় জানা আপনার জন্য ওয়াজিব ছিল, সে ব্যাপারে অবহেলার জন্য তওবা ও ইস্তিগফার করতে হবে।

আরও দেখুন (93866) ও (37879) নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

স্ত্রী রমজানের কাযা রোযা পালনকালীন সময়ে স্বামী তার সাথে সহবাস করেছে; এখন তাদের উভয়ের করণীয় কি?

প্রশ্ন

রমজানের আগে আমার স্ত্রী বিগত রমজান মাসের কিছু কাযা রোযা পালন করছিলেন। এমতাবস্থায় আমি তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়েছি। সে সবগুলো রোযা কাযা করতে পারিনি।

বিঃ দ্রঃ সে পূর্বেই আমার কাছে রোযা পালনের অনুমতি চেয়েছিল এবং আমি তাকে অনুমতি দিয়েছিলাম।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক:

যিনি কোন ওয়াজিব রোযা শুরু করেন (যেমন: রমজানের কাযা রোযা বা কসম ভঙ্গের কাফফারাস্বরূপ রোযা) তার জন্য কোন ওজর (শরিয়ত অনুমোদিত অজুহাত) ছাড়া রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নয়। ওজরের উদাহরণ হচ্ছে- রোগ বা সফর।

যদি তিনি কোনো ওজরবশত অথবা ওজর ছাড়া রোযা ভঙ্গ করে থাকেন তবে সে রোযাটি পালন করা তার দায়িত্বে বাকি থেকে যাবে এবং যে দিনের রোযা বিনষ্ট করেছিলেন সেই দিনের পরিবর্তে অন্য একদিন তাকে রোযা পালন করে নিতে হবে।

যদি তিনি কোন ওজর ছাড়া রোযাটি ভঙ্গ করে থাকেন তবে এ রোযাটি পুনরায় পালন করার সাথে তাকে এই হারাম কাজ থেকে তওবা করতে হবে।

আপনার স্ত্রীর উপর কোন কাফফারা নেই। কারণ কাফফারা শুধু রমজান মাসে দিনের বেলা সহবাসের কারণে ওয়াজিব হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে (49985) নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই:

আপনি আপনার স্ত্রীরোযা বিনষ্ট করে খুবই খারাপ কাজ করেছেন। কারণ কোন স্ত্রী যখন তার স্বামীর অনুমতি নিয়ে রমজানের কাযা রোযা পালন করে তখন স্বামীর তার রোযা বিনষ্ট করার কোন অধিকার নেই। তাই আপনাদের দু'জনের উচিত আল্লাহর কাছে তওবা করা। এ কাজের জন্য অনুতাপ হওয়া। এ কাজ পুনরায় না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া। আর যদি আপনি আপনার স্ত্রীকে জোরপূর্বক বাধ্য করে থাকেন তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

যে ব্যক্তি রমজান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে কিন্তু বীর্ষপাত হয়নি

প্রশ্ন

এক লোক রমজান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, কিন্তু বীর্ষপাত হয়নি। এর হুকুম কী? আর সে স্ত্রীরই বা করণীয় কী- যিনি এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমজান মাসে দিনের বেলায় যে ব্যক্তি যৌনমিলন করে তিনি মুকীম (নিজ অঞ্চলে অবস্থানকারী) রোযাদার হলে তার উপর বড়-কাফফারা (আল কাফফারাতুল মুগাল্লাযাহ) ওয়াজিব হয়। আর তাহল একজন দাসমুক্ত করা। যদি তা নাপায় তাহলে একাধারে দুইমাস সিয়াম পালন করা। আর যদি তাও নাপারে তবে ৬০ জন মিসকীন কে খাওয়ানো।

যদি নারী সন্তুষ্টচিত্তে যৌনমিলনে সাড়া দেয় তাহলে একই বিধান নারীরক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর যদি জোরপূর্বক নারীর সাথে সহবাস করা হয় তাহলে তার উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবেনা। আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মুসাফির হয় তবে সহবাসের কারণে তাদের কোন গুনাহ হবেনা, তাদের উপর কোন কাফফারাও ওয়াজিব হবেনা এবং দিনের বাকিঅংশ পানাহার ও যৌনমিলন থেকে বিরত থাকাও ওয়াজিব হবেনা। শুধু তাদের উভয়কে ঐদিনের রোযা কাযা করতে হবে। যেহেতু মুসাফির অবস্থায় রোযাপালন করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

একইভাবে যে ব্যক্তিকোনো অনিবার্য প্রয়োজনে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে (যেমন কোন নিরপরাধ মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর নিমিত্তে) ঐ ব্যক্তি সেই দিন যদি যৌনমিলন করে, সেইদিন অনিবার্য প্রয়োজনে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবেনা। কারণ এক্ষেত্রে সে ব্যক্তিকোন ওয়াজিব রোযা ভঙ্গ করেনি।

নিজ অঞ্চলে অবস্থানকারী (মুকীম) রোযাদার যদি যৌনমিলন করে রোযা ভেঙ্গে ফেলে যার উপর রোযা রাখা বাধ্যতামূলক তার উপর পাঁচটি জিনিস বর্তাবে-

১। সে গুনাহগার হবে।

২। তার সেই দিনের রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

৩। সেই দিনের বাকি অংশ পানাহার ও যৌন মিলন থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪। সেই দিনের রোযার কাযা করা ওয়াজিব হবে।

৫। (বড়) কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে।

কাফফারা আদায় করার দলীল হল সেই হাদিসটি, যা আবু হুরাইরাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হ'উন) থেকে বর্ণিত হয়েছে- এক ব্যক্তি রমজানের দিনের বেলায় তাঁর স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করেছিলেন। এই ব্যক্তি একাধারে দুইমাস রোযা পালন করা অথবা ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াতে অক্ষম ছিলেন। তাই এই ব্যক্তি কাফফারা পরিশোধের বাধ্যবাধকতা হতে রেহাই পান। কারণ আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না [সূরা বাক্বারাহ, ২:১৮৬] অপারগের ওপর কোন ওয়াজিব আরোপ করা যায় না।

যৌনমিলন যেহেতু সংঘটিত হয়েছে সুতরাং উপরোল্লিখিত মাসয়ালাতে বীর্য়পাত হওয়া বা না-হওয়ার কারণে হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু ব্যাপারটি যদি এমন হয় যৌনমিলন ছাড়া বীর্য়পাত হয়েছে সেক্ষেত্রে তাকে কাফফারা আদায় করতে হবে না। বরং সে গুনাহগার হবে, দিনের বাকি অংশ তাকে যৌনমিলন ও পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং রোযাটির কাযা করতে হবে।

রোজা ফরজ হওয়া ও এর ফজিলত

রমজান মাসের ফজিলত সম্পর্কে সালমান (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিসটি যয়ীফ (দুর্বল)

প্রশ্ন

এই অঞ্চলের এক মসজিদের জটনৈক খতিব তাঁর খোতবার মধ্যে সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। সে হাদিসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসের শেষদিন তাঁদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিয়েছিলেন...। জটনৈক ভাই প্রকাশ্যে মানুষের সামনে ইমাম সাহেবের পেশকৃত হাদিসের বিরোধিতা করে বলেন যে, সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এ হাদিসটি মাওজু বা বানোয়াট। অনুরূপভাবে “যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে পেট ভরে খাওয়ায় আল্লাহ তাকে আমার হাউজে কাউছার থেকে এক ঢোক পানি পান করাবেন। যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত আর পিপাসার্ত হবে না।” অনুরূপভাবে “যে ব্যক্তি তার কৃতদাসের কাজকে সহজ করে দিবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে মুক্তি দিবেন।” সেই ভাই বলেন: “এই কথাগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর মিথ্যা আরোপকৃত। আর যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর মিথ্যা আরোপ করে সে যেন স্বীয় স্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়...।” এই হাদিসটি কি সহীহ; নাকি সহীহ নয়?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত এ হাদিসটি ইবনে খুযাইমা তাঁর “সহীহ” নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: “রমজান মাসের ফজিলত শীর্ষক পরিচ্ছেদ; যদি এ হাদিসটি সহীহ সাব্যস্ত হয়”। এরপর তিনি বলেন: আমাদের নিকট আলী ইবনে হুজর আল-সাদী হাদিস বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: আমাদের নিকট ইউসুফ ইবনে যিয়াদ হাদিস বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: আমাদের নিকট হুমাম ইবনে ইয়াহইয়া হাদিস বর্ণনা করেছেন আলী বিন যায়িদ বিন জাদআন হতে; তিনি সাঈদ ইবনে আল-মুসাইয়িব হতে, তিনি সালমান (রাঃ) হতে; তিনি বলেন:

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: (أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعاً، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقيقه من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم، فقال: يعطي الله هذا الثواب

من فطر صائماً على تمرّة أو شربة ماء أو مذقة لبن ، وهو شهر أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ، خفف عن مملوكه غفر الله له ، وأعتقه من النار ، فاستكثروا فيه من أربع خصال : خصلتين ترضون بهما ربكم ، وخصلتين لا غنى بكم عنهما: فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشهادة أن لا إله إلا الله ، وتستغفرونه ، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما : فتسألون الله الجنة ، وتعوذون به من النار ، ومن أشبع فيه صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظماً حتى يدخل الجنة

একবার শাবান মাসের শেষ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খোতবা (ভাষণ) দিলেন। খোতবা দিতে গিয়ে তিনি বলেন: “ হে লোকেরা! আপনাদের নিকট এক মহান মাস হাজির হয়েছে। এক বরকতময় মাস এসেছে। এ মাসে এমন এক রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ মাসে সিয়াম পালন করা আল্লাহ ফরজ (আবশ্যিকীয়) করেছেন এবং এ মাসের রাতে কিয়াম (নামায আদায়) করা নফল (ফজিলতপূর্ণ) করেছেন। এ মাসে যে কোন একটি (নফল) ভালো কাজ করা অন্য মাসে একটি ফরজ কাজ করার সমান। আর এ মাসে কোন একটি ফরজ আমল করা অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আমল করার সমান। এটি হল- ধৈর্যের মাস; ধৈর্যের প্রতিদান হচ্ছে- জান্নাত। এটি হল- সহানুভূতির মাস। এটি এমন এক মাস যাতে একজন মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি পায়। এ মাসে যে ব্যক্তি কোন একজন রোজাদারকে ইফতার করাবে তার সমূহ গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে এবং তাকে সেই রোজাদারের সমান সওয়াব দেয়া হবে; কিন্তু রোজাদারের সওয়াবে কোন কমতি করা হবে না। তাঁরা বললেন- আমাদের মধ্যে সবার তো একজন রোজাদারকে ইফতার করানোর মত সামর্থ্য নেই। তিনি বললেন: কোন ব্যক্তি যদি একজন রোজাদারকে একটি খেজুর অথবা এক টোক পানি অথবা এক চুমুক দুধ দিয়েও ইফতার করায় আল্লাহ তাকেও এই সওয়াব দিবেন। এটি এমন মাস এর প্রথম ভাগে রহমত, দ্বিতীয় ভাগে মাগফিরাত এবং শেষ ভাগে রয়েছে জাহান্নাম হতে নাজাত। আর যে ব্যক্তি তার কৃতদাসের দায়িত্ব সহজ করে দিবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জাহান্নাম থেকে তাকে মুক্তি দিবেন। সুতরাং এ মাসে আপনারা চারটি কাজ বেশি করে করুন। দুটি হল যা দিয়ে আপনারা আপনাদের রবকে সন্তুষ্ট করবেন। আর দুটি কাজ এমন যা আপনাদের না করলেই নয়। যে দুটি কাজ দ্বারা আপনারা আপনাদের রবকে সন্তুষ্ট করবেন: (১) এ বলে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং (২) তাঁর কাছে ইসতিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আর যে দুটো কাজ আপনাদের না করলেই নয় (৩) আপনারা আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করবেন এবং (৪) জাহান্নামের আগুন থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। আর এই মাসে যে ব্যক্তি একজন রোজাদারকে পেট ভরে খাওয়াবে আল্লাহ তাঁকে আমার হাউজ থেকে এক টোক পানি পান করাবেন যার ফলে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত আর পিপাসার্ত হবে না।”

উল্লেখিত হাদিসের সনদে একজন রাবী হচ্ছেন- আলী বিন যায়েদ বিন জাদআন। তিনি একজন যয়ীফ বা দুর্বল রাবী। যেহেতু তার মুখস্থশক্তি দুর্বল ছিল।

হাদিসটির সনদে আরও একজন রাবী হচ্ছেন- ইউসুফ বিন যিয়াদ আল-বসরী। তিনি “মুনকারুল হাদিস”।

হাদিসটির সনদে আরও একজন রাবী হচ্ছেন- হুমাম বিন ইয়াহইয়া বিন দীনার আল-আউদী। তার সম্পর্কে ইবনে হাজার ‘আত-তাকরীব’ গ্রন্থে বলেছেন: ثقة ربما وهم: (তিনি ছিকাহ, তবে কখনো কখনো ভুল করেন)। [“ ছিকাহ” পরিভাষাটির মাধ্যমে মুখস্থশক্তি ও দ্বীনদারি দুটো বিষয়ের স্বীকৃতি দেয়া হয়]

এই পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, এ সনদে হাদীসটি মিথ্যা বা বানোয়াট নয়; তবে যয়ীফ বা দুর্বল। এটি দুর্বল হলেও রমজানের ফযিলত বিষয়ক সহীহ হাদিস তো যথেষ্ট রয়েছে।

আল্লাহই তাওফিক দাতা। আমাদের নবীর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।” সমাপ্ত।

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ ইবনে বায। শাইখ আব্দুর রাযযাক আফীফি, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন গুদাইইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন কুউদ।

ফাতাওয়াল লাজনাহ আদদায়িমাহ (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র) (১০/৮৪-৮৬)]

আমরা রমযানকে কিভাবে স্বাগত জানাতে পারি?

প্রশ্ন

শরিয়ত অনুমোদিত এমন কিছু বিশেষ বিষয় কি আছে যা দিয়ে একজন মুসলিম রমযানকে স্বাগত জানাতে পারে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

মাহে রমযান বছরের সবচেয়ে উত্তম মাস । কেননা আল্লাহ তাআলা এ মাসে সিয়ামকে ফরয করে, ইসলামের চতুর্থ রুকন বানিয়ে এ মাসকে বিশেষত্ব দিয়েছেন । এ মাসের রাতে কিয়াম পালন করার বিধান জারী করেছেন । যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর নির্মিত: এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল (বার্তাবাহক), নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ আদায় করা ।"[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশায় রমযান মাসে কিয়াম পালন করবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে ।"[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

রমযান মাসকে স্বাগত জানানোর জন্য বিশেষ কিছু আছে মর্মে আমি জানি না । তবে একজন মুসলিম রমযানকে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সাথে, আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে গ্রহণ করবে; যেহেতু তিনি তাকে রমযান পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন, তাওফিকপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং জীবিতদের মধ্যে রেখেছেন যারা নেক আমলের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে । যেহেতু রমযানে উপনীত হতে পারা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মহান নেয়ামত । এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে রমযান আগমনের সুসংবাদ দিতেন রমযানের মর্যাদা তুলে ধরার মাধ্যমে এবং আল্লাহ তাআলা রোযাদার ও নামাযগুজারদের জন্য যে মহান সওয়াব প্রস্তুত রেখেছেন তা বর্ণনা করার মাধ্যমে । শরিয়ত একজন মুসলিমের জন্য অনুমোদন করে যে, তিনি এই মহান মাসটিকে স্বাগত জানাবেন খালিস তাওবার মাধ্যমে, সিয়াম ও কিয়ামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার মাধ্যমে, নেক নিয়ত ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে ।"[সমাণ্ড]

ফাদিলাতুশ শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায এর "মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাওয়িয়া" (১৫/৯)]

যে ব্যক্তি নামায পড়ে; কিন্তু রোযা রাখে না সে কি কাফের হয়ে হবে?

প্রশ্ন

রোযা বর্জনকারী কি কাফের হয়ে হবে; যতক্ষণ সে নামায আদায় করে, কিন্তু কোন অসুস্থতা বা ওজর ছাড়া রোযা রাখে না ।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।.

যে ব্যক্তি রোযার ফরযিয়তকে অস্বীকার করে রোযা রাখে না আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে সে ব্যক্তি কাফের । আর যে ব্যক্তি অসলতা ও অবহেলা করে রোযা রাখে না তার ব্যাপারে কিছু আলেমের অভিমত হচ্ছে সে কাফের । কিন্তু সঠিক অভিমত হচ্ছে— এমন ব্যক্তি কাফের নয় । তবে ইসলামের এই মহান রুকন ও আলেমদের সর্বসম্মত (ইজমাকৃত) ফরয বিধান বর্জন করার মাধ্যমে সে মহা বিপদের দ্বারপ্রান্তে আছে । রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে সে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত; যে শাস্তি তাকে নিরস্ত করবে । এমন ব্যক্তির উপর ফরয হল সে যে রোযাগুলো বর্জন করেছে সেগুলোর কাযা পালন করা এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করা ।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ ।

[দেখুন: ফাতাওয়াল লাজনাহ (১০/১৪৩)]

রমযানে সিয়াম পালনের ফযিলত অর্জিত হবে রমযানের সব দিন রোযা রাখার মাধ্যমে

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া রমযানের একটি দিন খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমে কিংবা হস্তমৈথুন করার মাধ্যমে রোযা ভেঙ্গেছে সে কি "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে রমযানের রোযা রাখবে তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে" এ হাদিসে উল্লেখিত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে? এ হাদিসের অর্থ কি গোটা রমযান মাসের রোযা রাখা? যে ব্যক্তি একদিনের রোযা ভেঙ্গেছে সে কি এ সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

এক:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে রমযানের রোযা রাখবে তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"[সহিহ বুখারী (৩৮) ও সহিহ মুসলিম (৭৫৯)]

রমযান মাসের রোযা রাখা বাস্তবায়িত হবে সবগুলো দিন রোযা রাখার মাধ্যমে। যে ব্যক্তি সব রোযা রাখেনি তার ক্ষেত্রে এ কথা সত্য নয় যে, সে গোটা রমযান রোযা রেখেছে। বরঞ্চ তার ব্যাপারে সত্য হল: সে রমযানের কিছু অংশ কিংবা কিছুদিন রোযা রেখেছে।

কারমানী বলেন:

"হাদিসের উক্তি: **صام رمضان** অর্থাৎ রমযানের রোযা রেখেছে। আপনি যদি বলেন: নিদেন পক্ষে যতটুকু রোযা বলা যায় ততটুকু রোযা রাখলে কি যথেষ্ট হবে; এমনকি কেউ যদি মাত্র একদিন রোযা রাখে সেকি হাদিসের অধিভুক্ত হবে?

আমি বলব: মানুষের প্রচলনে 'রমযানের রোযা রেখেছে' ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয় যে সবগুলো রোযা রেখেছে। প্রসঙ্গ থেকে এটি সুস্পষ্ট।

আপনি যদি বলেন: ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি; যেমন রোগী যদি রোযা রাখতে না পারে। যদি সে রোগী না হত তাহলে রোযা রাখত। যদি তার ওজর না থাকত তাহলে তার নিয়ত ছিল রোযা রাখার: সে কি এই ছকুমের অধিভুক্ত হবে? আমি বলব: হ্যাঁ। যেমনিভাবে রোগী যদি তার ওজরের কারণে বসে বসে নামায পড়ে সে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ব্যক্তির সমান সওয়াব পাবে। ইমামগণ এ কথা বলেছেন।"[আল-কাওয়াকিবুদ দারারি (১/১৫৯)]

শাইখ মাহমুদ খাতাব আস-সুবকী (রহঃ) বলেন, হাদিসের উক্তি: **من صام رمضان الخ** যে ব্যক্তি রমযানে রোযা রাখল..." অর্থাৎ রমযানের সকল দিন রোযা রাখল। আর যে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া কিছু দিনের রোযা ভেঙ্গেছে সে ব্যক্তি এই প্রতিদান পাবে না। আর যে ব্যক্তি ওজরের কারণে ভেঙ্গেছে সে ব্যক্তি প্রতিদান পাবে; যদি সে তার উপর কাযা পালন বা খাদ্য খাওয়ানো যেটা আবশ্যিক হয় সেটা পালন করে থাকে। ঐ ব্যক্তির মত যে ব্যক্তি ওজরের কারণে বসে বসে নামায পড়েছে সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর সওয়াব পাবে।"[আল-মানহাল আল-আযব আল-মাওরুদ শারহ সুনানে আবি দাউদ (৭/৩০৮) থেকে সমাণ্ড]

দুই:

এই ব্যক্তির এই চৈতন্য রাখা বাঞ্ছনীয় যে, যদি এই মহান সওয়াব তার ছুটেও যায় তার অন্য অনেক পথ খোলা রয়েছে। তার কর্তব্য দেবী না করে সে সুযোগগুলো গ্রহণ করা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে— খালিস (ঐকান্তিক) তাওবা করা।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় **13693** প্রশ্নোত্তরটিও পড়ুন।

রোযা রাখা ছাড়াও রমযান মাসের গুনাহ মোচনকারী আরও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন শেষ দশকে ঈমান ও সওয়াব পাওয়ার আশা নিয়ে কিয়ামুল লাইল পালন করা। আশা করা যায়, শেষ দশকে কিয়াম পালনকারী লাইলাতুল ক্বাদর পাওয়ার তাওফিকপ্রাপ্ত হবেন। এই রাতগুলোতে কিয়াম পালন করার মধ্যে গুনাহ মাফও রয়েছে; যা রমযানের সিয়াম পালনের মধ্যেও রয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি লাইলাতুল রুদরে ঈমান ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে কিয়াম পালন করবে তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" [সহিহ বুখারী (৩৫) ও সহিহ মুসলিম (৭৬০)]

আপনি রমযান মাসে নেক আমলের ক্ষেত্রগুলো জানার জন্য ওয়েবসাইটের ২৫ নং প্রবন্ধটি পড়তে পারেন।

আমরা আপনাকে নিম্নোক্ত কিতাব পড়ার উপদেশ দিচ্ছি:

হাফেয ইবনে হাজার-এর রচিত "الخصال المكفرة للذنوب" (আল-খিসালুল মুকাফিরা লিয় য়নুব) এবং শামসুদ্দিন আশ-শারবিনির রচিত "الخصال المكفرة للذنوب" (আল-খিসালুল মুকাফিরা লিয় য়নুব)।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

ইসলাম গ্রহণ করার আগে রমযানের যে অংশ পার হয়ে গেছে তাকে কি সে অংশের রোযা কাযা পালন করতে হবে?

প্রশ্ন

ইসলাম গ্রহণ করার আগে রমযানের যে দিনগুলো পার হয়ে গেছে তাকে কি সে দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করতে হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলাম গ্রহণ করার আগের দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর আবশ্যিক নয়। কেননা সে সময় রোযা পালন করার নির্দেশ দ্বারা তিনি সম্বোধিত ছিলেন না। তাই যাদের উপর রোযা ফরয তিনি তখন সে দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। অতএব, সে সময়ের রোযার কাযা পালন করা তার উপর অবধারিত নয়। [সমাণ্ড]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ)

[আল-ইজাবাত আলা আসইলাতিল জালিয়াত (১/৮)]

যে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া রমযানের রোযা রাখেনি কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে তার উপর কি কাযা পালন করা ফরয?

প্রশ্ন

যদি কেউ কোন ওজর ছাড়া রমযানের রোযা না-রেখে থাকে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙ্গে থাকে যে দিনগুলোর রোযা সে ভঙ্গ করেছে সে দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর কি ফরয?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানের রোযা পালন ইসলামের অন্যতম একটি রুকন (মূল স্তম্ভ)। কোন মুসলিমের জন্য ওজর ছাড়া রমযানের রোযা ত্যাগ করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি শরিয়ত অনুমোদিত কোন ওজরের কারণে (যেমন- অসুস্থ থাকা, সফরে থাকা, ঋতুগ্রস্ত হওয়া) রমযানের রোযা বাদ দিয়েছে কিংবা ভঙ্গ করেছে; যে রোযাগুলো সে ভেঙ্গেছে সে রোযাগুলোর কাযা পালন করা আলেমগণের ইজমার ভিত্তিতে তার উপর ফরয। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।" [সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে রমযানের রোযা বর্জন করেছে, সেটা একটিমাত্র রোযার ক্ষেত্রে হলেও (যেমন সে রোযার নিয়তই করেনি কিংবা কোন ওজর ছাড়া রোযা শুরু করে ভেঙ্গে ফেলেছে) সে কবিরা গুনাতে (মহাপাপে) লিপ্ত হয়েছে। তার উপর তওবা করা ফরয।

অধিকাংশ আলেমের মতে, সে যে দিনগুলোর রোযা ভেঙ্গেছে সে দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর ফরয। বরং কেউ কেউ এই মর্মে ইজমা উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আব্দুল বার বলেন: “গোটা উম্মত ইজমা করেছেন এবং সকলে উদ্ধৃত করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা পালন করেনি, কিন্তু সে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার প্রতি বিশ্বাসী, সে অবহেলা করে, অহংকারবশতঃ রোযা রাখেনি, ইচ্ছা করেই তা করেছে, অতঃপর তওবা করেছে: তার উপর রোযার কাযা পালন করা ফরয।” [আল-ইযতিযকার (১/৭৭) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি বলেন:

“আমরা এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ জানি না। কেননা রোযা তার দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং রোযা পালন করা ছাড়া তার দায়িত্ব মুক্ত হবে না। বরং যেভাবে ছিল সেভাবে তার দায়িত্ব থেকে যাবে।” [আল-মুগনি (৪/৩৬৫)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৪৩) এসেছে:

যে ব্যক্তি রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে রোযা ত্যাগ করে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমার ভিত্তিতে) কাফের। আর যে ব্যক্তি অলসতা করে, কিংবা অবহেলা করে রোযা ছেড়ে দেয় সে কাফের হবে না। কিন্তু, সে ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত (ইজমা সংঘটিত) একটি রুকন ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে মহা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। নেতৃবর্গের কাছ থেকে সে শাস্তি ও সাজা পাওয়ার উপযুক্ত; যাতে সে এবং তার মত অন্যেরা এর থেকে নিবৃত্ত হয়। বরং কিছু কিছু আলেমের মতে, সেও কাফের। সে যে রোযাগুলো ভঙ্গ করেছে সেগুলোর কাযা পালন করা ও আল্লাহর কাছে তওবা করা তার উপর ফরয। [সমাপ্ত]

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: শরিয়ত অনুমোদিত কোন ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখে না তার হুকুম কী? তার বয়স প্রায় সতের বছর। তার কোন ওজর নেই। তার কি করা উচিত? তার উপর কি কাযা পালন করা ফরয?

জবাবে তিনি বলেন: হ্যাঁ, তার উপর কাযা পালন করা এবং তার অবহেলা ও বাড়াবাড়ির জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করা ফরয।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সংক্রান্ত যে হাদিসটি বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি কোন (শরয়ি) ছাড় ব্যতীত কিংবা রোগ ব্যতীত রমযান মাসের কোন একদিনের রোযা ভাঙে সে সারা বছর রোযা রাখলেও কাযা পালন হবে না।” সে হাদিসটি দুর্বল, মুযতারিব, আলেমদের নিকট এটি সহিহ হাদিস নয়। [নুরুন আলাদ দারব ফতোয়াসমগ্র (১৬/২০১) থেকে সমাপ্ত]

কিছু কিছু আলেমের মতে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোযা রাখেনি তার উপর কাযা পালন নেই। বরং সে বেশি বেশি নফল রোযা রাখবে। এটি জাহেরি মতাবলম্বীদের মাযহাব। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও শাইখ উছাইমীন এ অভিমতটি পছন্দ করেছেন।

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি বলেন:

জাহেরি মতাবলম্বীদের অভিমত কিংবা তাদের অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে- ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারীর উপর কাযা নেই। শাফেয়ির ছাত্র আব্দুর রহমান থেকে, শাফেয়ির মেয়ের ছেলে থেকেও এমন অভিমত বর্ণিত আছে। ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা-নামায ত্যাগকারীর ক্ষেত্রে এটি আবু বকর আল-ছুমাঈদিরও উক্তি: ‘কাযা পালন করলে দায়িত্ব মুক্ত হবে না’। আমাদের মাযহাবের অনুসারী পূর্ববর্তী একদল আলেমের অভিমতও এটাই; যেমন- আল-জুযজানি, আবু মুহাম্মদ আল-বারবাহারি, ইবনে বাত্তাহ্।” [ফাতহুল বারী (৩/৩৫৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

বিনা ওজরে নামায কিংবা রোযা ত্যাগকারী কাযা পালন করবে না। [আল-ইখতিয়ারাত আল-ফিকহিয়া (পৃষ্ঠা-৪৬০) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলেন:

আর যদি মূলতই সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওজর ছাড়া রোযা ত্যাগ করে; তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক নয়। কেননা কাযা পালন করে তার কোন লাভ হবে না। যেহেতু তার থেকে সেটা কবুল করা হবে না। কারণ ফিকহী নীতি হচ্ছে, 'যদি নির্দিষ্ট কোন সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত কোন ওজর ছাড়া উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে পালন করা না হয় তাহলে তার থেকে সেটা কবুল করা হয় না।' [মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/৮৯) থেকে সমাণ্ড]

সারকথা:

যে ব্যক্তি রমযানের রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করবে অধিকাংশ আলেমের মতে, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক। আর কিছু কিছু আলেমের মতে, কাযা পালন করা শরিয়তসিদ্ধ নয়। কেননা এটি এমন ইবাদত যে ইবাদতের সময় পার হয়ে গেছে। তবে, অধিকাংশ আলেম যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটা অগ্রগণ্য। কেননা, রোযা এমন ইবাদত যা ব্যক্তির দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে; সুতরাং এটি পালন করা ছাড়া দায়িত্ব মুক্ত হবে না।

রমযান মাসে একজন মুসলিম

প্রশ্ন

রমযান মাসের আগমন উপলক্ষে আপনারা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কি কোন উপদেশ পেশ করবেন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে (স্বগৃহে) উপস্থিত থাকবে, সে যেন এ মাসটি রোযা থাকে। আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান; কাঠিন্য চান না। তিনি চান—তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি যে তোমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন সে জন্য তাকবির উচ্চারণ কর (আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর)। আর যাতে তোমরা শোকর কর।” [সূরা বাকারা ২: ১৮৫] এ মহান মাসটি কল্যাণ ও বরকতের মৌসুম, ইবাদত ও আনুগত্যের মৌসুম।

এটি একটি মহান মাস ও সম্মানিত মৌসুম। এমন এক মাস যাতে সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়, পাপকেও জঘন্য ধরা হয়, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়। যে মাসে আল্লাহ পাপী-তাপীদের তওবা কবুল করেন।

আল্লাহ আপনারদেরকে কল্যাণ ও বরকতের যে মৌসুমগুলো দিয়েছেন এবং অনুগ্রহ ও অবিরত নেয়ামতের যে উপকরণগুলো আপনারদেরকে বিশেষভাবে দিয়েছেন এর জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করুন। মহান সময়গুলো ও সম্মানিত মৌসুমগুলোকে আনুগত্যের মাধ্যমে এবং গুনাহর কাজ ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে কাজে লাগান; ফলে আপনারা দুনিয়ায় উত্তম জীবন ও আখিরাতে সুখ লাভ করবেন।

প্রকৃত মুমিনের কাছে সারা বছরই ইবাদতের মৌসুম। সারা জীবনই নেকীর মৌসুম। কিন্তু, রমযান মাসে তার নেক আমল করার হিম্মত বহুগুণ বেড়ে যায়। তার অন্তর ইবাদতের প্রতি বেশি তৎপর হয় ও আল্লাহ্ অভিমুখী হয়। আমাদের মহান প্রতিপালক তাঁর রহম ও করম রোযাদার মুমিন বান্দাদের উপর ঢেলে দেন। এ মহান ক্ষণে তিনি তাদের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করার এবং নেককাজের বদলায় উপঢৌকন ও পুরস্কার অবিরত করার ঘোষণা দিয়েছেন।

গতকালের সাথে আজকের কতই না মিল!!

দিনগুলো খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে; যেন কিছু মুহূর্তমাত্র। আমরা এক রমযানকে স্বাগত জানালাম, এরপর বিদায় দিলাম। এই তো সামান্য কিছুদিনের ব্যবধানে পুনরায় রমযানকে স্বাগত জানাতে যাচ্ছি। আমাদের কর্তব্য এই মহান মাসে নেক কাজে অগ্রণী হওয়া। আল্লাহ্ যা কিছুতে সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের দিন যা কিছু আমাদেরকে আনন্দিত করবে সেসব আমল দিয়ে এই মাসকে ভরপুর করা।

আমরা রমযানের জন্য কিভাবে প্রস্তুতি নিব?

রমযানের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, দুই সাক্ষ্যবাণীর বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে, ফরয আমলগুলো পালন করার ক্ষেত্রে, কু-প্রবৃত্তি বা সংশয়মূলক হারাম আমলগুলো পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে নিজেদের ঘাটতিকে সমালোচনা করার মাধ্যমে।

ব্যক্তি নিজেই নিজের আচরণকে মূল্যায়ন করবে যাতে করে মাহে রমযান ঈমানের উচ্চ স্তরে অবস্থান করতে পারে। কারণ ঈমান বাড়ে ও কমে। নেককাজের মাধ্যমে বাড়ে। বদ কাজের মাধ্যমে কমে। তাই বান্দার সর্বপ্রথম যে নেককাজটি বাস্তবায়ন করা কর্তব্য সেটা হচ্ছে— 'ইবাদত বা উপাসনা শুধু আল্লাহর জন্য' এটি বাস্তবায়ন করা এবং মনে মনে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। সব ধরণের ইবাদত বা উপাসনা কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদন করবে; এতে অন্য কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার বানাবে না। এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, সে যেটা পেয়েছে (যেটার শিকার হয়েছে) সেটা কিছুতেই ছুটে যেত না। এবং সে যেটা পায়নি (যেটার শিকার হয়নি) সেটা সে কিছুতেই পেত না (শিকার হত না)। সবকিছু তাকদীর অনুযায়ী ঘটে।

এ দুই সাক্ষ্যবাণীর বাস্তবায়ন করার সাথে যা কিছু সাংঘর্ষিক আমরা সেগুলো থেকে বিরত থাকব। আর তা অর্জিত হবে বিদআত ও দ্বীনি ক্ষেত্রে অভিনব প্রচলন করা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে এবং 'মিত্রতা ও বৈরিতা' বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে। অর্থাৎ আমরা ঈমানদারদের সাথে মিত্রতা রাখব এবং কাফের ও মুনাফিকদের থেকে বৈরিতা রক্ষা করব। শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ে আমরা খুশি হব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীবর্গের অনুসরণ করব। তাঁর সুন্নত ও তাঁর পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীন-এর সুন্নতের অনুকরণ করব। সুন্নতকে ভালবাসব এবং যারা সুন্নতকে আঁকড়ে ধরে, সুন্নতের পক্ষে কথা বলে তাদের দেশ, বর্ণ বা নাগরিকত্ব যেখানের হোক না কেন আমরা তাদেরকে ভালবাসব।

এরপর নেককাজ পালন করার ক্ষেত্রে আমাদের যে কসুর বা ঘাটতি রয়েছে সে ব্যাপারে নিজেদের আত্মসমালোচনা করব। যেমন- জামাতে নামায আদায় করা, আল্লাহর যিকির পালন করা, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও অন্য মুসলিমের হক আদায় করা, সালামের প্রচলন করা, সংকাজের আদেশ দান, অসৎ কাজের নিষেধ করা, পরস্পর পরস্পরকে হকের উপর থাকা, এর উপর ধৈর্য ধারণ করা, গুনার কাজ না করা, ভাল কাজ করার ব্যাপারে ও তাকদীরের উপর ধৈর্য ধারণ করার ব্যাপারে উপদেশ দেয়া।

এরপর পাপ কাজ ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত থাকার ব্যাপারে নিজেদের আত্মসমালোচনা করতে হবে; এগুলোর উপর চলতে থাকা থেকে নিজেদেরকে প্রতিহত করার মাধ্যমে। সেটা ছোট পাপ হোক কিংবা বড় পাপ হোক। সেটা আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ কিছুর দিকে নজর দেয়ার মাধ্যমে দৃষ্টির পাপ হোক, মিউজিক শুনার মাধ্যমে শ্রুতির পাপ হোক, আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট নন এমন কোন ক্ষেত্রে পদচারণের পাপ হোক, আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট নন এমন কিছু ধরার পাপ হোক, আল্লাহ্ যা ভক্ষণ করা হারাম করেছেন যেমন- সুদ, ঘুষ কিংবা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ইত্যাদি ভক্ষণ করার পাপ হোক।

আমাদের সামনে যেন থাকে, আল্লাহ্ তাআলা দিনের বেলায় তাঁর হস্ত প্রসারিত করে রাখেন যাতে করে রাতে পাপকারী তওবা করতে পারে এবং তিনি রাতে হস্ত প্রসারিত করে রাখেন যাতে করে দিনে পাপকারী তওবা করতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "আর তোমরা ছুটে আস তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে ও জান্নাতের দিকে; যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যম্বীনের মত, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সুদিনে ও দুর্দিনে ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ্ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন। আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া পাপ ক্ষমা করার কে আছে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে-বুঝে তারা তা উপর্যুপরি করতে থাকে না। তাদের পুরস্কার হলো তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতসমূহ; যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে। সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতইনা উত্তম!" [সূরা আলে ইমরান ৩: ১৩৩-১৩৬] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: "বলুন, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ— আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা যুমার ৩৯: ৫৩] আল্লাহ্ আরও বলেন: "আর যে কেউ কোন মন্দ কাজ করে কিংবা নিজের প্রতি যুলুম করে; এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে।" [সূরা নিসা ৪: ১১০]

আমাদের কর্তব্য এ ধরণের আত্মসমালোচনা, তওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে রমযান মাসকে স্বাগত জানানো। কারণ "বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের সমালোচনা করে এবং মৃত্যুর পরের জন্য আমল করে। আর অক্ষম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে নিজের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কাছে অনেক অনেক আশা করে"।

রমযান মাস হচ্ছে অর্জন করা ও লাভ করার মাস। বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী বেশি লাভ করার জন্য মৌসুমগুলোকে কাজে লাগায়। সুতরাং আপনারা এ মাসে ইবাদত পালন, বেশি বেশি নামায আদায়, কুরআন তেলাওয়াত করা, মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া, অন্যের প্রতি ইহসান করা, দরিদ্রদেরকে দান করা ইত্যাদি সুযোগকে কাজে লাগান।

রমযান মাসে জান্নাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়, শয়তানগুলোকে বন্দি করা হয় এবং প্রতি রাতে একজন আহ্বানকারী ডেকে বলে: ওহে পুণ্যকামী, অগ্রসর হও; ওহে পাপকামী, তফাত যাও।

সুতরাং আপনাদের পূর্বসূরীদের অনুকরণ করে, আপনাদের নবীর সুন্নাহর অনুসরণ করে আল্লাহর পুণ্যকামী বান্দা হোন; যাতে করে আমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে, মকবুল আমল নিয়ে রমযানকে বিদায় জানাতে পারি।

জেনে রাখুন, রমযান মাস নেকীর মাস:

ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) বলেন: “এর মধ্যে রয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে মর্যাদার তারতম্যের মধ্যে রয়েছে) রমযান মাসকে অন্য মাসগুলোর উপর মর্যাদা দেয়া এবং রমযান মাসের শেষ দশরাত্তিকে অন্য রাত্তিগুলোর মর্যাদা দেয়া।” [যাদুল মাআদ (১/৫৬)]

এ মাসকে অন্য মাসের উপর চারটি কারণে মর্যাদা দেয়া হয়েছে:

এক.

এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যে রাত বছরের অন্য রাতগুলোর চেয়ে উত্তম। সেটি হচ্ছে- লাইলাতুল কুদর বা কুদরের রাত। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় আমরা এটি (কুরআন) নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে; আর আপনাকে কিসে জানাবে ‘লাইলাতুল-কুদর’ কী? লাইলাতুল-কুদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। সে রাতে ফিরিশতাগণ ও রুহ (জিব্রাইল আঃ) নাযিল হয় তাদের রবের নির্দেশক্রমে সকল বিষয় নিয়ে। শান্তিময় সে রাত, ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত।” [সূরা কুদর ৯৭: ১-৫]

তাই এ রাতে ইবাদত করা সহস্র রাত ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।

দুই.

এ রাতে সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উপর সর্বোত্তম কিতাব নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “রমজান মাস এমন মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে; মানবজাতির জন্য হিদায়েতের উৎস, হিদায়াত ও সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে।” [সূরা আল-বাক্বারা ২: ১৮৫] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “নিশ্চয় আমি এটাকে (কুরআনকে) এক মুবারকময় রাতে নাযিল করেছি; আর নিশ্চয় আমরা সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যেক চূড়ান্ত নির্দেশ স্থিরকৃত হয়। আমাদের পক্ষ থেকে নির্দেশ; আর নিশ্চয় আমরা (রাসূলগণকে) প্রেরণকারী।” [সূরা আদ-দুখান ৪৪: ৩-৫]

ওসেলা বিন আসকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সহিফাগুলো (গ্রন্থগুলো) রমযানের মাসের প্রথম রাতে নাযিল হয়েছে। রমযানের মাসের ষষ্ঠ দিনে তওরাত নাযিল হয়েছে। রমযান মাসের ১৩ তম দিনে ইঞ্জিল নাযিল হয়েছে। রমযান মাসের ১৮ তম দিনে যাবুর নাযিল হয়েছে। রমযান মাসের ২৪ তম দিনে কুরআন নাযিল হয়েছে।” [তাবারানির ‘আল-মুজামুল কাবির’, মুসনাদে আহমাদ, আলবানি ‘সিলসিলা সহিহা’ (১৫৭৫) গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন]

তিন.

এ মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে বন্দি করা হয়: আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যখন রমযান মাস আগমন করে তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে বন্দি করা হয়।” [সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “ যখন রমযান মাস আগমন করে তখন রহমতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শিকল বন্দি করা হয়।” [সুনানে নাসাঈ, আলবানি ‘সহিহুল জামি’ (৪৭১) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

সুনানে তিরমিযি, সুনানে ইবনে মাজাহ ও সহিহ ইবনে খুযাইমা-র এক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, “ রমযানের প্রথম রাত্রিতে শয়তানগুলো ও উদ্যত জিনগুলোকে বন্দি করা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়; একটি দরজাও খোলা রাখা হয় না। জাহান্নামের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। এবং একজন আহ্বানকারী ডেকে বলেন: ওহে পুণ্যকামী, অগ্রসর হও। ওহে পাপকামী, তফাৎ যাও। রমযানের প্রতি রাতে আল্লাহ অনেককে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন।” [আলবানি ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৭৫৯) হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন]

যদি কেউ বলেন যে, আমরা রমযান মাসেও অনেক খারাপ কাজ ও গুনাহর কর্ম ঘটতে দেখি। যদি শয়তানগুলোকে বন্দি করা হত তাহলে তো এসব ঘটত না?

জবাব হচ্ছে: যে ব্যক্তি সিয়ামের শর্তাবলি ও আদবগুলো রক্ষা করে তার ক্ষেত্রে গুনাহ কমে হয়।

কিংবা হাদিসে উদ্দেশ্য হচ্ছে- কিছু শয়তানকে বন্দি করা হয়। তারা হচ্ছে উদ্যত শয়তানগুলো।

কিংবা হাদিসে উদ্দেশ্য হচ্ছে- খারাপ কাজ কম হওয়া। এটি প্রত্যক্ষ বিষয়। রমযান মাসে খারাপ কাজ অন্য সময়ের চেয়ে কম হয়। আর সকল শয়তানকে বন্দি করা হলেও খারাপ কাজ বা পাপ কাজ একেবারে না ঘটা অনিবার্য নয়। কেননা শয়তান ছাড়াও অন্যান্য কারণেও পাপ কাজ ঘটে। যেমন- কলুষিত অন্তরগুলোর কারণে, খারাপ অভ্যাসের কারণে এবং মানুষরূপী শয়তানগুলোর কারণে। [ফাতহুল বারী (৪/১৪৫)]

চার.

এ মাসে অনেক ইবাদত রয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু ইবাদত এমন রয়েছে যেগুলো অন্য সময়ে নেই। যেমন: রোযা রাখা, কিয়ামুল লাইল আদায় করা, খাবার খাওয়ানো, ইতিকাফ করা, সদকা করা ও কুরআন তেলাওয়াত করা।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের সকলকে তাওফিক দেন, আমাদেরকে সিয়াম পালন, কিয়াম আদায়, নেক আমল করা ও বদ আমল বর্জনে সাহায্য করেন।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

রোজাদারগণকে ‘রাইয়ান’ নামক দরজা দিয়ে ডাকা হবে

প্রশ্ন

আমার স্বামী আমাকে ‘রেদোয়ান’ নামক দরজার সংবাদ দিয়েছেন; যে দরজাটি শুধু রমজান মাসে খোলা হয়। আমাকে আরও জানানো হয়েছে যে, যখন এ দরজাটি খোলা হয় তখন আল্লাহ এ দরজা দিয়ে সম্পদ ঢেলে দেন। আপনি যদি এ উক্তিটি নিশ্চিত করতেন/স্পষ্ট করতেন এবং আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দিতেন; যাতে করে আমরা এ মাসালাটি আরও ভালভাবে জানতে পারি।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ করে দিয়েছেন এবং রোজাদারদের জন্য বিপুল সওয়াবের ওয়াদা করেছেন। রোজার প্রতিদান যেহেতু সুমহান তাই আল্লাহ তাআলা এর প্রতিদানকে সুনির্দিষ্ট করেননি। হাদিসে কুদসিতে এসেছে-
“রোজা আমার জন্য; আমিই রোজার প্রতিদান দিব।”

রমজান মাসের অসংখ্য ফজিলত রয়েছে। এ ফজিলতের মধ্যে রয়েছে-

আল্লাহ তাআলা রোজাদারদের জন্য ‘রাইয়্যান’ নামক জান্নাতের দরজা প্রস্তুত রেখেছেন। বুখারি ও মুসলিমে সাহল (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসে নামটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“জান্নাতের একটি দরজা আছে; যার নাম হচ্ছে- ‘রাইয়্যান’ কেয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে শুধু রোজাদারগণ প্রবেশ করবে; অন্য কেউ নয়। এই বলে ডাকা হবে- রোজাদারগণ কোথায়? তখন রোজাদারগণ উঠে প্রবেশ করবে; অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। তারা প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। ফলে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।” [সহিহ বুখারি (১৭৬৩) ও সহিহ মুসলিম (১৯৪৭)]

যে হাদিসগুলো রোজার ফজিলত বর্ণনা করে এর মধ্যে রয়েছে-

আবু সালামা (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনি আদমের প্রত্যেকটি আমল তারই; শুধু রোজা ছাড়া। রোজা আমার জন্য; আমিই এর প্রতিদান দিব। রোজা হচ্ছে- চালস্বরূপ। যেদিন তোমাদের কেউ রোজা রাখে সে যেন অল্লীল কথা না বলে, চোঁচামেচি না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় সে যেন বলে, আমি রোজাদার। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে রয়েছে মুহাম্মদের প্রাণ, রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুবাসের চেয়ে উত্তম। রোজাদারের জন্য রয়েছে দুইটি খুশি। যখন রোজা ইফতার করে তথা রোজা ভাঙ্গে তখন একবার খুশি হয়। আবার যখন তার রবের সাক্ষাত পাবে তখন একবার খুশি হবে। [সহিহ বুখারি (১৭৭১)]

দুই:

একথা সুবিদিত যে, জান্নাতের অনেক দরজা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “বসবাসের বহু জান্নাত (বাগান)। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সংকমশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।” [সূরা আল-রাদ, আয়াত: ২৩] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।” [সূরা আল-যুমার, আয়াত: ৭৩]

সহিহ হাদিসে জান্নাতের আটটি দরজার কথা এসেছে। সাহল বিন সাদ (রাঃ) বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। একটি দরজার নাম হচ্ছে- রাইয়্যান। এ দরজা দিয়ে রোজাদারগণ ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না।” [সহিহ বুখারি (৩০১৭)]

উবাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই; তাঁর কোন অংশীদার নেই। আরও সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর বাণী যা মরিয়মের প্রতি ঢেলে দিয়েছেন এবং তাঁর প্রেরিত রুহ। আরও সাক্ষ্য দিবে যে, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য- আল্লাহ তাকে তার আমলের ভিত্তিতে জান্নাতের আটটি দরজার যে কোন একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবেন। [সহিহ বুখারি (৩১৮০) ও সহিহ মুসলিম (৪১)]

এ উম্মতের উপর আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি রমজান মাসে একটি নয়; জান্নাতের সবগুলো দরজাখুলে দেন। যে ব্যক্তি বলেন যে, জান্নাতের একটি দরজার নাম হচ্ছে- ‘রেদোয়ান’ তাকে এই মর্মে দলিল পেশ করতে হবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, “যখন রমজান মাস প্রবেশ করে তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়; জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শিকলাবদ্ধ করা হয়।” [সহিহ বুখারি (৩০৩৫) ও সহিহ মুসলিম (১৭৯৩)]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আমাদের নবী মুহাম্মদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

রোজাদারের জন্য যে সুন্নতগুলো পালন করা মুস্তাহাব

প্রশ্ন

রোজার সুন্নতগুলো কি কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

রোজা একটি মহান ইবাদত । সওয়াবের আশাবাদী রোজাদারের সওয়াব আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ বনি আদমের প্রত্যেকটি কাজের সওয়াব তার নিজের জন্য; রোজা ছাড়া । রোজা আমার জন্য; আমিই রোজার প্রতিদান দিব ।” [সহিহ বুখারী (১৯০৪) ও সহিহ মুসলিম (১১৫১)]

রমজানের রোজা ইসলামের একটি রোকন । রোজা ফরজ হোক অথবা নফল হোক একজন মুসলমানের রোজা পালনে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত; যাতে সে আল্লাহর কাছ থেকে উপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারে ।

রোজার অনেক সুন্নত রয়েছে । যেমন-

এক:

রোজাদারকে কেউ গালি দিলে অথবা তার সাথে ঝগড়া করলে এর বিনিময়ে তার সাথে ভাল ব্যবহার করে বলবে: “ আমি রোজাদার” ।

দুই:

রোজাদারের জন্য সেহেরী খাওয়া সুন্নত । সেহেরীর মধ্যে বরকত রয়েছে ।

তিন:

অনতিবিলম্বে ইফতার করা সুন্নত; আর দেরিতে সেহেরী খাওয়া সুন্নত ।

চার:

কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করা; কাঁচা খেজুর না পেলে শুকনো খেজুর দিয়ে; শুকনো খেজুরও না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করা সুন্নত ।

পাঁচ:

ইফতারের সময় এই দোয়াটি পড়া

"ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ"

“ তৃষ্ণা দূর হয়েছে; শিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং প্রতিদান সাব্যস্ত হয়েছে; ইনশাআল্লাহ” ।

এ সংক্রান্ত দলিলগুলো জানতে [39462](#) নং প্রশ্নের জবাব দেখুন ।

ছয়:

রোজাদারের বেশি বেশি দু'আ করা মুস্তাহাব । দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “ তিন ব্যক্তির দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না । ন্যায়পরায়ণ শাসক । রোজাদার; ইফতার করার পূর্ব পর্যন্ত । মজলুমের দু'আ ।

মুসনাদে আহমাদ (৮০৪৩), মুসনাদ কিতাবের পাঠোদ্ধারকারী সম্পাদকগণ হাদিসটিকে অন্যান্য সহায়ক সনদ ও হাদিসের ভিত্তিতে 'সহিহ' বলেছেন।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন:

রোজাদারের জন্য রোজাপালনকালে নিজের জন্য, প্রিয় মানুষের জন্য এবং সকল মুসলমানের দুনিয়া ও আখেরাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দু'আ করা মুস্তাহাব। [আল-মাজমু (৬/৩৭৫)]

সাত:

রোজার দিন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পালন করা মুস্তাহাব:

- মসজিদে বসে বসে কুরআন তেলাওয়াত করা ও আল্লাহর যিকির করা।

- শেষ দশদিন ইতিকাফ করা।

- তারাবীর নামায আদায় করা।

- বেশি বেশি দান সদকা করা।

- পরস্পর কুরআন অধ্যয়ন করা। সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ বদান্য মানুষ। তিনি সবচেয়ে বেশি বদান্য হতেন রমজান মাসে; যখন জিব্রাইল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। জিব্রাইল (আঃ) প্রতি রাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং একে অপরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্ত বাতাস চেয়ে অধিক বদান্য ছিলেন।"

-অনর্থক ও বেহুদা কাজে সময় নষ্ট না করা; যা তার রোজার উপর প্রভাব ফেলতে পারে যেমন অতিরিক্ত ঘুম, অতিরিক্ত ঠাট্টা মশকরা ইত্যাদি। নানা রকম খাবারদাবার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত না হওয়া। কারণ রোজা পালনকালে এগুলো তাকে অনেক নেকীর কাজ করা থেকে বিরত রাখবে।

আর জানতে দেখুন [12468](#) ও [26869](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জানেন।

অতি উষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর কষ্টকর হওয়ার পরও কি সিয়াম পালন করা ওয়াজিব?

প্রশ্ন

বিশাল সাহারা অঞ্চলে কখনও গ্রীষ্মকালে রমজান মাস আসে এবং সিয়াম পালন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জন্য তা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং কয়েক বছর ধরে এই অবস্থা বিরাজমান থাকে। তারা কিভাবে সিয়াম পালন করবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসাআল্লাহরজন্য।

"রমজানমাসশুরুহলেপ্রত্যেকমুকান্নাফ (শরয়ি ভারপ্রাপ্ত), মুকীম(স্বগৃহে অবস্থানকারী) সুস্থমুসলিমেরউপরসিয়াম পালনকরাফরজ।আল্লাহ তাআলাবলেছেন:

[فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] (البقرة :)

“ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পেল, সে যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে, অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।” [২ আল-বাক্বারাহ: ১৮৫]

তাই গরমের মৌসুমেও সিয়াম পালন ওয়াজিব। কারণ রমজান মাসে সিয়াম পালন ইসলামের অন্যতম একটি রোকন। আর যে ব্যক্তি রোজা রেখে প্রচণ্ড পিপাসায় প্রাণ চলে যাওয়ার আশংকা করবে সে রোজা ভঙ্গ করে এতটুকু পানাহার গ্রহণ করবে যা তার জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন। এরপর পুনরায় মুফাতিরাতে (রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বিরত থাকবে এবং অন্যসময় সেই দিনের রোজার কাযা পালন করবে।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহই তাওফিকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার বর্গ ও তার সাহাবীগণের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।” সমাপ্ত

আল-লাজনাহ আদ-দায়িমা (গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি)

শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযু, শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে গুদাইইয়ান, শাইখ সালাহ আল-ফাওয়ান, শাইখ আব্দুল আযিয আল-শাইখ, শাইখ বকর আবু যাইদ।

[ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমা

রমজান মাসে যেসব মুসলমান রোজা রাখে না তাদেরকে কিভাবে দাওয়াত দেয়া যায়?

প্রশ্ন

রমজান মাসে যেসব মুসলিম সিয়াম পালন করে না তাদের সাথে আচার-আচরণ কেমন হওয়া উচিত? এবং তাদেরকে রোজা রাখার প্রতি দাওয়াত দেওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি কোনটি?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে ঐ সমস্ত মুসলমানকে রোযা রাখার প্রতি দাওয়াত দেয়া, রোজা রাখার প্রতি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং এ মহান ইবাদত পালনে অবহেলা করা থেকে তাদেরকে সাবধান করা ওয়াজিব। ১। তাদেরকে অবহিত করা যে, রোজা একটি ফরজ ইবাদত, ইসলামের রোজার মর্যাদা অতি মহান, ইসলাম যে ভিত্তিগুলোর উপর নির্মিত রোজা সেগুলোর অন্যতম।

২। রোজা পালনের মহান প্রতিদান তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

(مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (رواه البخاري () ومسلم ())

“ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজান মাসে রোজা পালন করবে তাঁর পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।” [আল-বুখারী (৩৮) ও মুসলিম (৭৬০)]

তিনি আরো বলেছেন:

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا تُبَيِّنُ النَّاسَ ؟ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، مَا

بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفُزْدُونَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ) رواه البخاري ()

“ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, রমজানের রোজা পালন করে আল্লাহর উপর তার এই অধিকার এসে যায় যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা তার জন্মস্থান থেকে বের না হোক। সাহাবায়ে কেবল বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি মানুষকে এ সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ১০০টি স্তর আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। দুই স্তরের মধ্যে ব্যবধান হল আসমান ও যমীনের ব্যবধানের ন্যায়। আপনারা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন তখন জান্নাতুল ফেরদাউস চাইবেন। ফেরদাউস হচ্ছে- সর্বোত্তম জান্নাত ও সুউচ্চ জান্নাত। এর উপরে হচ্ছে- আর-রহমানের (পরম দয়ালুর) আরশ। সেখান থেকে জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হয়।” [সহিহ বুখারী (৭৪২৩)]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন:

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشَرِبَهُ مِنْ أَجْلِي . وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ، فَرِحَةٌ جِئِن يُفْطِرُ ، وَفَرِحَةٌ (جِئِن يَلْقَى رَبَّهُ، وَلِخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ) رواه البخاري () ومسلم ()

“আল্লাহ তাআলা বলেন:রোজা আমার-ই জন্য, আমিই এরপ্রতিদান দিব। রোজাদার আমার জন্য যৌন চাহিদা ও পানাহার ত্যাগ করে। রোজা হচ্ছে- চালস্বরূপ। রোজাদারের জন্য দু’টি খুশি রয়েছে। একটি ইফতারের সময়। অন্যটি যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে। নিশ্চয় রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুবাসের চেয়েও সুগন্ধিময়।” [সহিহ বুখারী (৭৪৯২) ও সহিহ মুসলিম (১১৫১)]

৩। রোজানা-রাখার ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। পরিষ্কার ধারণা দেয়া যে, রোজা না-রাখা কবিরার গুনাহ। ইবনে খুয়াইমাহ (১৯৮৬) ও ইবনে হিব্বান (৭৪৯১) আবুউমামা আল-বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي (الضبع هو العضد) فأتيا بي جبلا وعرا ، فقالا : اصعد . فقلت : إني لا أطيقه . فقالا : إنا سنسهله لك . فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديد ، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار . ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيهم ، مشققه أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما ، قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم . صححه الألباني في صحيح موارد الظمان .

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এ সময় দুইজন মানুষ এসে আমার দুইবাছ ধরে আমাকে দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে গেলো। সেখানে নিয়ে তারা আমাকে বলল: পাহাড়ে উঠুন। আমি বললাম:আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা বলল: আমরা আপনার জন্য সহজ করে দিচ্ছি। তাদের আশ্বাস পেয়ে আমি উঠতে লাগলাম এবং পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠে গেলাম। সেখানে প্রচণ্ড চিৎকারের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: এটা কিসের শব্দ? তারা বলল: এটা জাহান্নামী লোকদের চিৎকার।

এরপর তারা আমাকে এমন কিছু লোকদের কাছে নিয়ে এল যাদেরকে পায়ের টাখনুতে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের গাল ছিন্নবিন্ন, তা হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: এরা কারা? তিনি বললেন: এরা হচ্ছে এমন রোজাদার যারা রোজা পূর্ণের আগে ইফতার করত।”

শাইখ আল-আলবানী ‘সহীহ মাওয়ারিদ আজ-যামআন’(১৫০৯)গ্রন্থেহাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেন এবংহাদিসটির শেষে টীকা লিখে বলেন:“ আমি বলি —এই শাস্তি হল তাঁর জন্য যে রোজারেখেছে; কিন্তু ইফতারের সময় হওয়ার পূর্বে ইচ্ছাকৃতভাবে ইফতার করে ফেলেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মূলতই রোজারাখেনি তার অবস্থা কি হতে পারে?! আমরা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করছি।”

৪। রোজা পালন করা যে সহজ, এতে যে কি আনন্দ, খুশি, তৃষ্টি, মনের প্রশান্তি ও অন্তরের স্বস্তি রয়েছে তা বর্ণনা করা। কুরআন তেলাওয়াত ও কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে দিবানিশি ইবাদতেমশগুল থাকার যে মজা তা তুলে ধরা।

৫। রোজা, রোজার গুরুত্ব ও রোজার মাসে একজন মুসলিমের করণীয় বিষয়ক কিছু আলোচনা শুন্যর উপদেশ দেয়া এবং এ বিষয়ক কিছু লিফলেট পড়তে দেয়া।

৬। কোমল ভাষা ও উত্তম কথা দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে যাওয়া ও নসীহত করা। সাথে সাথে তাদের হেদায়াত ও মাগ্ফিরাতের জন্য দোয়াকরতে থাকা।

আমরাআল্লাহরকাছেআমাদেরজন্য ওআপনার জন্য শক্তি ওসামর্থ্য প্রার্থনাকরছি।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

নামায নষ্ট করলে সিয়াম কবুল হয় না

প্রশ্ন

প্রশ্ন: নামায না পড়ে সিয়াম পালন করা কি জায়েয?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

বে-নামাযীরযাকাত, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি কোনো আমলই কবুল হয়না।

ইমাম বুখারী (৫২০) বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)

“ যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যায়। ”

“ তারআমল নিষ্ফল হয়ে যায় ” এর অর্থ হল: তা বাতিল হয়ে যায় এবং তা তার কোনো কাজে আসবে না। এ হাদিস প্রমাণ করে যে, বেনামাযীর কোনোআমল আল্লাহ কবুল করেন না এবং বেনামাযী তারআমল দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হবেনা। তার কোনোআমল আল্লাহর কাছে উত্তোলন করা হবে না।

ইবনুল কায়েম তাঁর ‘আস-স্বালাত’ (পৃ-৬৫) নামক গ্রন্থে এ হাদিসের মর্মার্থ আলোচনা করতে গিয়েবলেন —“ এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, নামায ত্যাগ করা দুই প্রকার:

(১) পুরোপুরিভাবে ত্যাগ করা।কোন নামাযই না-পড়া। এ ব্যক্তির সমস্তআমলবিফলে যাবে।

(২) বিশেষ কোন দিন বিশেষ কোন নামায ত্যাগ করা। এক্ষেত্রে তার বিশেষ দিনেরআমল বিফলে যাবে। অর্থাৎ সার্বিকভাবেসালাত ত্যাগ করলে তার সার্বিক আমল বিফলে যাবে।আর বিশেষ নামায ত্যাগ করলে বিশেষ আমল বিফলে যাবে।” সমাপ্ত।

“ ফাতাওয়াস সিয়াম ” (পৃ-৮৭) গ্রন্থে এসেছে শাইখ ইবনেউছাইমীনকে বেনামাযীর রোজা রাখার হুকুম সম্পর্কেজিজ্ঞেস করা হয়েছিলো তিনি উত্তরে বলেন: বেনামাযীররোজা শুদ্ধ নয় এবং তা কবুলযোগ্য নয়। কারণ নামায ত্যাগকারী কাফের, মুরতাদ।এর সপক্ষে দলিল হচ্ছে-

আল্লাহ তাআলার বাণী:

(فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) [التوبة :]

“ আর যদি তারা তওবা করে,সালাত কয়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। ” [৯ সূরা আৎ তওবা:১১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণী:

(بَيِّنَ الرَّجُلَ وَبَيَّنَ الشِّرْكَ وَالْكُفْرَ تَزَكُّ الصَّلَاةِ) رواه مسلم ()

“ কোন ব্যক্তির মাঝে এবং শিরক ও কুফরের মাঝে সংযোগ হচ্ছে সালাত বর্জন ।” [সহিহ মুসলিম(৮২)]

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী –

(الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) رواه الترمذي () . صححه الألباني في صحيح الترمذي

“ আমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি হলো নামাযের । সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল, সে কুফরি করল ।” [জামে তিরমিযী (২৬২১), আলবানী ‘সহীহ আত-তিরমিযী’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলে চিহ্নিত করেছেন]

এই মতের পক্ষে সাহাবায়ে কেরামের ‘ইজমা’ সংঘটিত না হলেও সর্বস্তরের সাহাবীগণ এই অভিমত পোষণ করতেন ।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে শাক্কির রাহিমাহুমুল্লাহ বলেছেন: “ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাহাবীগণ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরি মনে করতেন না ।”

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি রোজা রাখে; কিন্তু নামায না পড়ে তবে তার রোজা প্রত্যাখ্যাত, গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কোন উপকারে আসবে না । আমরা এমন ব্যক্তিকে বলবো: আগে নামায ধরুন, তারপর রোজা রাখুন । আপনি যদি নামায না পড়েন, কিন্তু রোজা রাখেন তবে আপনার রোজা প্রত্যাখ্যাত হবে; কারণ কাফেরের কোন ইবাদত কবুল হয় না ।” সমাপ্ত ।

আল-লাজনাহ আদদায়িমাহ (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল(১০/১৪০): যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র রমজান মাসে রোজা পালনে ও নামায আদায়ে সচেষ্ট হয় আর রমজান শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইনামায ত্যাগ করে, তবে তার সিয়াম কি কবুল হবে? এর উত্তরে বলা হয়- “ নামায ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম । সাক্ষ্যদ্বয়ের পর ইসলামের স্তম্ভগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ফরজে আইন । যে ব্যক্তি এর ফরজিয়তকে অস্বীকার করে কিংবা অবহেলা বা অলসতা করে তা ত্যাগ করল সে কাফের হয়ে গেল । আর যারা শুধু রমজানে নামায আদায় করে ও রোজা পালন করে তবে তা হলো আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি । কতইনা নিকৃষ্ট সেসব লোক যারা রমজান মাস ছাড়া আল্লাহকে চেনেন! রমজান ব্যতীত অন্য মাসগুলোতে নামায ত্যাগ করায় তাদের সিয়াম শুদ্ধ হবে না । বরং আলেমদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী নামাযের ফরজিয়তকে অস্বীকার না-করলেও তারা বড় কুফরে লিপ্ত কাফের ।” সমাপ্ত

রমজানের রোজা পালন করা কার উপর ওয়াজিব?

প্রশ্ন

রমজানের রোজা পালন করা কার উপর ওয়াজিব?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ ।

যে ব্যক্তির মধ্যে ফৈতি শর্ত পাওয়া যায় তার উপর রোজা পালন করা ওয়াজিব -

এক: মুসলিম হওয়া

দুই: মুকাল্লাফ হওয়া অর্থাৎ শরয়ি বিধিবিধানের ভারপ্রাপ্ত হওয়া

তিন: রোজা পালনে সক্ষম হওয়া

চার: নিজগৃহে অবস্থানকারী বা মুকীম হওয়া

পাঁচ: রোজা পালনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ হতে মুক্ত হওয়া

এই পাঁচটি শর্ত যে ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায় তার উপর সিয়াম পালন করা ওয়াজিব।

প্রথম শর্তের মাধ্যমে কাফের ব্যক্তি রোজা পালনের দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে গেল। কাফেরের উপর রোজা পালন অনিবার্য নয়। আর কাফের তা পালন করলেও শুদ্ধ হবে না। কাফের যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে তাকে পূর্বের দিনগুলোর রোজা কাযা করার আদেশ দেয়া হবে না। এর দলীল হল আল্লাহ তাআলার বাণী:

[وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون]
التوبة :

“ তাদের অর্থব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে, ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে।” [৯ সূরা তাওবা : ৫৪]

দান-সদকার উপকার বহুমুখী হওয়া সত্ত্বেও সেটা যদি কবুল না হয় তাহলে ব্যক্তিগত ইবাদত কবুল না হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। ইসলাম গ্রহণ করার পর নও মুসলিমকে যে কাফের অবস্থায় না-রাখা রোজা কাযা করার নির্দেশ দেয়া হবে না এর দলিল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

[قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف] (الأنفال)

“ আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে পূর্বে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা করে দেয়া হবে।” [৮ আল-আনফাল: ৩৮] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তাকে ইতিপূর্বে ছুটে যাওয়া ওয়াজিবগুলো (আবশ্যকীয় ইবাদত) কাযা করার নির্দেশ দিতেন না।

তবে মুসলমান না-হয়ে রোজা না-রাখার কারণে কাফেরকে কি আখেরাতে শাস্তি দেয়া হবে?

উত্তর হচ্ছে- হ্যাঁ, কাফের ব্যক্তি রোজা না-রাখার কারণে এবং অন্য সব ওয়াজিব পালন না-করার কারণে শাস্তি পাবে। কারণ আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল, শরীয় বিধান পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একজন মুসলিম যদি শাস্তি পায় তবে (আল্লাহ ও তাঁর বিধানের প্রতি) উদ্যত কাফের শাস্তি পাওয়া আরও বেশি যুক্তিযুক্ত। খাবার, পানীয়, পোশাক এ জাতীয় আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করার কারণে যদি কাফেরকে শাস্তি দেয়া হয় তাহলে নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হওয়া ও নির্দেশ লঙ্ঘনের কারণে তাকে শাস্তি দেয়া আরও অধিক যুক্তিযুক্ত। এটি ক্বিয়াস শ্রেণীর দলিল।

নকলী দলিল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলা ডানপন্থীদের সম্পর্কে বলেন তারা পাপীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে:

[ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب ببيوم الدين]
المدثر :-

“ বলবেঃ তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তাম না, মিসকীনকে আহার্য্য দিতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম।” [৭৪ আল-মুদাসসির : ৪২- ৪৬]

অতএব আয়াতে উল্লেখিত চারটি বিষয় তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে।

(১) “ আমরা নামায পড়তাম না” - নামায

(২) “ মিসকীনকে আহার্য্য দিতাম না” - যাকাত

(৩) “ আর আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম” যেমন- আল্লাহর আয়াতগুলো নিয়ে বিদ্রূপ করা।

(৪) “আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম” ।

দ্বিতীয় শর্ত:

মুকান্নাফ বা শরয়ি ভারপ্রাপ্ত হওয়া। মুকান্নাফ হচ্ছেন- বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন সাবালক ব্যক্তি। কারণ নাবালক কিংবা পাগলের উপর কোন শরয়ি ভার নেই। কোন নাবালকের বাল্যে হওয়া তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। (70475) নং প্রশ্নের উত্তর থেকে এ বিষয়টি জেনে নিতে পারেন।

বুদ্ধিসম্পন্ন এর বিপরীত হল পাগল তথা বিবেক-বুদ্ধিহীন। সে পাগল উচ্ছ্বল হোক অথবা শান্ত হোক এবং তার পাগলামি যে ধরনের হোক না কেন সে শরয়ি ভারপ্রাপ্ত বা মুকান্নাফ নয়। তার উপর দ্বীনের কোন আবশ্যিকীয় (ওয়াজিব) দায়িত্ব নেই। যেমন- নামায, রোজা, মিসকীনকে খাওয়ানো ইত্যাদি। অর্থাৎ তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব নয়।

তৃতীয় শর্ত: সক্ষম হওয়া। অর্থাৎ সিয়াম পালনে সক্ষম হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি অক্ষম তার উপর সিয়াম পালন করা ওয়াজিব নয়। এর দলিল আল্লাহ তাআলার বাণী:

[ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر] (البقرة:)

“আর যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা যে ব্যক্তি সফরে আছে তারা সেই সংখ্যা অন্য দিনগুলোতে পূরণ করবে।” [২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

অক্ষমতা দুই প্রকার: সাময়িক অক্ষমতা ও স্থায়ী অক্ষমতা।

(১.) সাময়িক অক্ষমতার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখিত আয়াতে এসেছে। যেমন- এমন রোগী যার সুস্থতা আশা করা যায় এবং মুসাফির। এ ব্যক্তিদের জন্য রোজা না-রাখা জায়েয আছে। তারা ছুটে যাওয়া দিনগুলোর রোজা পরে কাযা করবেন।

(২.) স্থায়ী অক্ষমতা। যেমন- এমন রোগী যার সুস্থতা আশা করা যায় না এবং এমন বৃদ্ধ লোক যিনি সিয়াম পালনে অক্ষম। এ অক্ষমতার বিষয় নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

[البقرة:] وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ

“আর যারা রোজা পালনে অক্ষম তারা ফিদিয়া দিবে (অর্থাৎ মিসকীন খাওয়াবে)।” [২ সূরা বাক্বারাহ: ১৮৪]

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- “বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যারা রোজা পালনে সক্ষম নয় তারা প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে।”

চতুর্থ শর্ত: নিজ গৃহে অবস্থানকারী বা মুকীম হওয়া। সুতরাং মুসাফিরের উপর রোজা পালন করা ওয়াজিব নয়। এর দলিল আল্লাহ তাআলা বাণী:

[ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر] (البقرة:)

“আর যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা যে ব্যক্তি সফরে আছে তারা সেই সংখ্যা অন্য দিনগুলোতে পূরণ করবে।” [২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

আলেমগণ ইজমা (ঐকমত্য) করেছেন যে, মুসাফিরের জন্য রোজা না-রাখা জায়েয। তবে উত্তম হলো- তার জন্য যেটা বেশি সহজ সেটা করা। পক্ষান্তরে যদি রোজা পালন করায় তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় তবে তার জন্য রোজা পালন করা হারাম। এর দলিল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

[ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً] (النساء:)

“তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি দয়াময়।” [৪ আন-নিসা : ২৯]

এই আয়াত থেকে এই নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর তা তার জন্য নিষিদ্ধ। দেখুন প্রশ্ন নং (20165)।

আপনি যদি বলেন সেই ক্ষতি কিভাবে পরিমাপ করা হবে, যা রোজা রাখা হারাম করে দেয়? জবাব হল: সে ক্ষতিটা ইন্দিয় দিয়ে অনুভব করা সম্ভব অথবা তথ্যের ভিত্তিতে জানা সম্ভব।

(১.) ইন্দিয় দিয়ে অনুভব করা অর্থাৎ রোগী নিজেই অনুভব করা যে রোজা পালন করার কারণে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে, রোগ বেড়ে যাচ্ছে এবং সুস্থতা বিলম্বিত হচ্ছে ইত্যাদি।

(২.) আর তথ্যের মাধ্যমে ক্ষতি সম্পর্কে জানার অর্থ হল- একজন বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ডাক্তার রোগীকে এ তথ্য দিবে যে রোজা পালন করা তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পঞ্চম শর্ত: রোজা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকা। এ শর্তটি নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নারীর জন্য সিয়াম পালন অনিবার্য নয় এবং এর দলীল হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

" أليس إذا حاضت لم تصل و لم تصم "

" একজন নারীর হায়েয (মাসিক) হলে সে কি নামায ও রোজা ত্যাগ করে না?" [আল- বুখারী: ২৯৮]

আলেমগণের ইজমা (সর্বসম্মতি) এর ভিত্তিতে হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নারীর উপর রোজা পালন করা ওয়াজিব নয়। এমতাবস্থায় রোজা পালন করলে শুদ্ধ হবে না। বরং পরবর্তীতে এই দিনগুলোর রোজা কাযা আদায় করা বাধ্যতামূলক [আশ-শারহুল-মুমতি (৬/৩৩০)]

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

কখন থেকে রোজা ফরয হয়েছে?

প্রশ্ন

কত সালে মুসলিম উম্মাহর উপর সিয়াম পালন ফরয করা হয়েছে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দ্বিতীয় হিজরি সনে রমজান মাসে রোজা পালন ফরয করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয়টি রমজান সিয়াম পালন করেছেন। ইমাম নববী রাহিমাল্লাহু "আল- মাজমু" (৬/২৫০) -গ্রন্থে বলেন:

" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয় বছর রমজানের রোজা পালন করেছেন। কারণ রমজানের রোজা ২য় হিজরির শাবান মাসে ফরয করা হয়েছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১১ হিজরি সালের রবিউল আউয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন।" সমাপ্ত

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রমজান মাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রশ্ন

রমজান বলতে কী বুঝায়?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য । রমজান: আরবি বার মাসের একটি মাস । এ মাসটি ইসলাম ধর্মে সম্মানিত । অন্য মাসগুলোর তুলনায় এ মাসের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রয়েছে । যেমন : ১. আল্লাহ তাআলা এ মাসে রোজা পালন করাকে ইসলামের চতুর্থ রুকন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة:]

“রমজান মাস এমন মাস যে মাসেকুরআন নাযিল করা হয়েছে; মানবজাতির জন্য হিদায়েতের উৎস, হিদায়াত ও সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে । সুতরাং তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি এই মাস পাবেসে যেন রোজা পালন করে ।” [২ সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

وثبت في الصحيحين البخاري () ، ومسلم () من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبد الله ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت . "

সহীহ বুখারী (৮) ও সহীহ মুসলিম (১৬)-এ ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ইসলাম পাঁচটি খুঁটির উপর নির্মিত । (১) এই সাক্ষ্যদেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল (২) সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) রমজানমাসে রোজা পালনকরা এবং (৫) বায়তুল্লাহ শরিফের হজ্জ আদায় করা” ।

২. আল্লাহ তাআলা এইমাসে কুরআন নাযিল করেছেন । যেমনটি তিনি ইতিপূর্বে উল্লেখিত আয়াতে বলেছেন:

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ) [البقرة:]

“রমজান মাস এমন মাস যে মাসেকুরআন নাযিল করা হয়েছে; মানবজাতির জন্য হিদায়েতের উৎস, হিদায়াত ও সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে । [২ সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৮৫]তিনি আরও বলেছেন :

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) [القدر:]

“নিশ্চয়ই আমি একে (কুরআনকে) লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি ।” [৯৭ সূরা আল-ক্বাদর:১]

৩. আল্লাহ তাআলা এ মাসে লাইলাতুল কদর বা ভাগ্য রজনী রেখেছেন ।যে রাত্রি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম ।আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ) [القدر: ১ - ৫]

১. নিশ্চয়ই আমি এটা (কুরআন) লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি ।২. আপনি কি জানেন- লাইলাতুল কদরকি? ৩. লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম ।৪. এই রাতে ফেরেশতাগণ ও রুহ (জিবরীলআলাইহিস সালাম) তাঁদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করেন ।৫. ফজরের সূচনা পর্যন্ত শান্তিময় ।” [৯৭ আল-ক্বাদর :১-৫]

তিনি আরও বলেছেন :

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ) [الدخان:]

“ নিশ্চয়ই আমি এটা (কুরআন) এক মুবারকময় (বরকতময়) রাতে নাযিল করেছি। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। ” [৪৪ আদ-দুখান : ৩]

আল্লাহ তা'আলা রমজান মাসকে লাইলাতুল কদর দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আর এই বরকতময় রাতের মর্যাদা বর্ণনায় সূরাতুল কদর নাযিল করেছেন। এ ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলেছেন:

“ তোমাদের কাছে রমজান উপস্থিত হয়েছে। এক বরকতময় মাস। আল্লাহ তোমাদের উপর এমাসে সিয়ামপালন করা ফরজ করেছেন। এ মাসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। এ মাসে অবাধ্য শয়তানদের শেকল বদ্ধ করা হয়। এ মাসে আল্লাহ এমন একটি রাত রেখেছেন যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত হলে সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষেই বঞ্চিত। ” [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নাসা'ঈ (২১০৬) ও ইমাম আহমাদ (৮৭৬৯) এবং শাইখ আলবানী' সহীছত তরগীব' (৯৯৯) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন]

আর আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদর বা ভাগ্য রজনীতে নামাজ আদায় করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ” [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (১৯১০) ও মুসলিম (৭৬০)]

৪. আল্লাহ তাআলা এই মাসে ঈমান সহকারে ও প্রতিদানের আশায় সিয়াম ও ক্রিয়ামপালন (রোজা ও নামাজ আদায়) করাকে গুনাহ মাহফের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমনটি সহীহ বুখারী (২০১৪) ও সহীহ মুসলিম (৭৬০) -এ আবু হুরায়রারাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ যেব্যক্তি রমজান মাসে ঈমান সহকারে ও সওয়াবের আশায় রোজা পালন করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ” এবং সহীহবুখারী (২০০৮) ও সহীহ মুসলিম (১৭৪)-এআবু হুরায়রা (রাঃ) হতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ যে ব্যক্তি রমজান মাসে ঈমান সহকারে ও সওয়াবের আশায় নামাজ আদায় করবে তার অতীতের সব গুনাহমাফ করে দেয়া হবে। ”

মুসলিমগণ এ ব্যাপারে ইজমা (ঐকমত্য) করেছেন যে, রমজান মাসে রাতের বেলা ক্রিয়াম পালন (নামাজ আদায় করা) সুন্নত। ইমাম নববী উল্লেখ করেছেন: “ রমজান মাসে ক্রিয়াম করার অর্থ হল তারাবীর নামাজ আদায় করা। অর্থাৎ তারাবীর নামাজ আদায়ের মাধ্যমে ক্রিয়াম করার উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ”

৫. আল্লাহ তাআলা এই মাসে জান্নাতগুলোর দরজা খোলার রাখেন, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ রাখেন এবং শয়তানদেরকে শেকলবদ্ধ করেন। যেমনটি দুই সহীহ গ্রন্থ সহীহ বুখারী (১৮৯৮) ও সহীহ মুসলিম (১০৭৯)-এ আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ যখন রমজান আগমন করে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শেকলবদ্ধ করা হয়। ”

৬. এ মাসের প্রতিরাতে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে তাঁর বান্দাদের মুক্ত করেন। ইমাম আহমাদ (৫/২৫৬) আবু উমামাহ -এর হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ প্রতিদিন ইফতারের সময় আল্লাহ কিছু বান্দাকে (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করেন। ” আল-মুনযিরী বলেছেন হাদিসটির সনদে কোন সমস্যা নেই। আলবানী' সহীছত তারগীব' (৯৮৭) – গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন। বাযযার (কাশফ ৯৬২) আবু সা'ঈদের হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: “ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রমজান মাসে প্রতি দিনে ও রাতে কিছু বান্দাকে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি দেন। আর নিশ্চয় একজন মুসলিমের প্রতি দিনে ও রাতে কবুল যোগ্য দু'আ' রয়েছে। ”

৭. রমজান মাসে সিয়াম পালন পূর্ববর্তী রমজান থেকে কৃত গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়; যদি কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়। যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে 'সহীহ মুসলিম' (২৩৩)-এ। নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ পাঁচ ওয়াক্তনামাজ, এক জুমা থেকে অপর জুমা, এক রমজান থেকে অপর রমজান এদেরমধ্যবর্তী গুনাহসমূহের জন্য কাফফারা হয়ে যায়; যদি কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা হয়। ”

৮. এই মাসে সিয়াম পালন বছরের দশমাস সিয়াম পালন তুল্য। সহীহ মুসলিম (১১৬৪)-এ আবু আইয়ুব আনসারীর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি রমজান মাসে সিয়াম পালন করল, এরপর শাওয়াল মাসেও ছয়দিন রোজারাখল সে যেন সারা বছররোজা পালন করল”।

ইমাম আহমাদ (২১৯০৬) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি রমজান মাসে সিয়াম পালন করল- রমজানের একমাস রোজা দশমাস রোজা রাখার সমতুল্য। আরঈদুল ফিত্বরের পর (শাওয়াল মাসের) ছয় দিন রোজা রাখলে যেন গোটা বছরের রোজা হয়ে গেল।”

৯. এই মাসে যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ইমাম যতক্ষণ নামায পড়েন ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামুল লাইল (তারাভী নামায) আদায় করবে সে ব্যক্তি সারা রাত নামায পড়ার সওয়াব পাবে। দলিল হচ্ছে- আবু দাউদ (১৩৭০) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিস বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি ইমাম নামায শেষ করা পর্যন্ত ইমামের সাথে কিয়াম করবে তার জন্য সারারাত কিয়াম করার সওয়াব লেখা হবে।” আলবানী ‘সালাতুত তারাভী’ গ্রন্থ (পৃঃ ১৫) —এ হাদিসকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন।

১০. এই মাসে উমরা আদায় করা হজ্জ করার সমতুল্য। ইমাম বুখারী (১৭৮২) ও মুসলিম (১২৫৬) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারী মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন: “কিসে আপনাকে আমাদের সাথে হজ্জ করতে বাধা দিল?” মহিলা বললেন: “আমাদের পানি বহনকারী শুধু দুটো উট ছিল।” তাঁর স্বামী ও পুত্র একটি পানি বহনকারী উটে চড়ে হজ্জ গিয়েছিলেন। তিনি বললেন: “আর আমাদের পানি বহনের জন্য একটি পানি বহনকারী উট রেখে গিয়েছেন।” তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “তাহলে রমজান এলে আপনি উমরা আদায় করুন। কারণ এ মাসে উমরা করা হজ্জ করার সমতুল্য।”

সহীহ মুসলিমের রেওয়াজেতে আছে: “.....আমার সাথে হজ্জ করার সমতুল্য।”

১১. এ মাসে ইতিকাফ করা সুন্নত। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমজানে ইতিকাফ করেছেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমজান মাসের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করেছেন। [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী (১৯২২) ও মুসলিম (১১৭২)]

১২. রমজান মাসে পারস্পারিক কুরআন তেলাওয়াত ও ব্যক্তিগতভাবে বেশি বেশি তেলাওয়াত করা তাগিদপূর্ণ মুস্তাহাব। মুদারাসা বা পারস্পারিক তেলাওয়াত বলতে বুঝায় একজন তেলাওয়াত করা অন্যজন সেটা শুনানো। আবার দ্বিতীয়জন তেলাওয়াত করা এবং প্রথমজন সেটা শুনানো। এই পারস্পারিক তেলাওয়াত মুস্তাহাব হওয়ার দলীল হলো:

أَنَّ جُبْرَيْلَ كَانَ يُلْقِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُذَارِسُهُ الْقُرْآنَ () وَمُسْلِمٌ)

)

“জিবরাইল (আঃ) রমজান মাসে প্রতিরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরসাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং পরস্পর কুরআন তেলাওয়াত করতেন।” [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী (৬) ও মুসলিম (২৩০৮)]

যে কোন সময় কুরআন তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব। আর রমজানে এটি আরো বেশি তাগিদপূর্ণ মুস্তাহাব। ১৩. রমজান মাসে রোজাদারকে ইফতার খাওয়ানো মুস্তাহাব। এর দলীল হচ্ছে-যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ , غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا " رواه الترمذي () وابن ماجه () وصححه الألباني في صحيح الترمذي ()

“ যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে সে ব্যক্তি রোজাদারের সমতুল্যসওয়াবপাবে। কিন্তু সেই রোজাদারের সওয়াবেরকোন কমতি করা হবে না”। [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী (৮০৭) ওইবনে মাজাহ (১৭৪৬)। শাইখ আলবানী ‘সহীহত তিরমিযী’ (৬৪৭) গ্রন্থেহাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন। দেখুন প্রশ্ন নং (12598)

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রমজান মাসের আগমন উপলক্ষে আমরা কিভাবে প্রস্তুতি নিব

প্রশ্ন

আমরা কিভাবে রমজানের জন্য প্রস্তুতি নিব? এই মহান মাসে কোন আমলগুলো অধিক উত্তম?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক :

প্রিয় ভাই, আপনি একটি ভাল প্রশ্ন করেছেন। আপনি রমজান মাসের প্রস্তুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। এমন একটি সময়ে আপনি প্রশ্নটি করেছেন যখন সিয়াম সম্পর্কে বহু মানুষের ধ্যান ধারণা পাল্টে গেছে। তারা এই মাসকে খাবার-দাবার, পান-পানীয়, মিষ্টি-মিষ্টান্ন, রাত জাগা ও স্যাটেলাইট চ্যানেল উপভোগ করার মৌসুম বানিয়ে ফেলেছে। এর জন্য তারা রমজান মাসের আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে; এই আশংকায় যে- কিছু খাদ্যদ্রব্য কেনা বাদ পড়ে যেতে পারে অথবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে। এভাবে তারা খাদ্যদ্রব্য কেনা, হরেক রকম পানীয় প্রস্তুত করা এবং কী অনুষ্ঠান দেখবে, আর কী দেখবে না সেটা জানার জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর প্রোগ্রামসূচী অনুসন্ধান করার মাধ্যমে এর জন্য প্রস্তুতি নেয়। অথচ রমজান মাসের তাৎপর্য সম্পর্কে সত্যিকার অর্থেই তারা অজ্ঞ। তারা এ মাসকে ইবাদত ও তাকওয়ার পরিবর্তে উদরপূর্তি ও চক্ষুবিলাসের মৌসুমে পরিণত করে।

দুই :

অপরদিকে কিছু মানুষ রমজান মাসের তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন। তারা শাবান মাস থেকেই রমজানের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এমনকি তাদের কেউ কেউ শাবান মাসের আগ থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

রমজানের জন্য প্রস্তুতির কিছু প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হল:

১. একনিষ্ঠভাবে তওবা করা :

তওবা করা সবসময় ওয়াজিব। তবে ব্যক্তি যেহেতু এক মহান মাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাই অনতিবিলম্বে নিজের মাঝে ও স্বীয় রবের মাঝে যে গুনাহগুলো রয়েছে এবং নিজের মাঝে ও অন্য মানুষের মাঝে অধিকার ক্ষুণ্ণের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো থেকে দ্রুত তওবা করে নেয়া উচিত। যাতে করে সে পূত-পবিত্র মন ও প্রশান্ত হৃদয় নিয়ে এ মুবারক মাসে প্রবেশ করতে পারে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: **“আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর; যাতে করে সফলকাম হতে পার।”** [২৪ আন-নূর : ৩১]

আল-আগারর ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ رواه مسلم ()

“ হে লোকেরা, আপনারা আল্লাহর কাছে তওবা করুন। আমি প্রতিদিন তাঁর কাছে ১০০ বার তওবা করি।” [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম (২৭০২)]

২. দোআ করা:

কিছু কিছু সলফে সালেহীন হতে বর্ণিত আছে যে, তারা ৬ মাস আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন যেন আল্লাহ তাদেরকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছান। রমজানের পর পাঁচ মাস দোয়া করতেন যেন আল্লাহ তাঁদের আমলগুলো কবুল করে নেন।

তাই একজন মুসলিম তার রবের কাছে বিনয়ানভাবে দোয়া করবে যেন আল্লাহ তাআলা তাকে শারীরিকভাবে সুস্থ রেখে, উত্তম দ্বীনদারির সাথে রমজান পর্যন্ত হায়াত দেন। সে আরো দোয়া করবে আল্লাহ যেন তাকে নেক আমলের ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। আরো দোয়া করবে আল্লাহ যেন তার আমলগুলো কবুল করে নেন।

৩. এই মহান মাসের আসন্ন আগমনে খুশি হওয়া :

রমজান মাস পাওয়াটা একজন মুসলিমের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ নেয়ামত। যেহেতু রমজান কল্যাণের মৌসুম। যে সময় জান্নাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত রাখা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ রাখা হয়। রমজান হচ্ছে- কুরআনের মাস, সত্যমিথ্যার মধ্যে পার্থক্য রচনাকারী জিহাদি অভিযানগুলোর মাস। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ [يونس :]

“বলুন, এটি আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায়। সুতরাং এতে তারা আনন্দিত হোক। এটি তারা যা সম্বল করে রাখে তা থেকে উত্তম।” [১০ ইউনুস : ৫৮]

৪. কোন ওয়াজিব রোজা নিজ দায়িত্বে থেকে থাকলে তা হতে মুক্ত হওয়া :

আবু সালামাহ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন:

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ رواه البخاري () ومسلم ()

“আমার উপর বিগত রমজানের রোজা বাকি থাকলে শা'বান মাসে ছাড়া আমি তা আদায় করতে পারতাম না।” হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী (১৮৪৯) ও ইমাম মুসলিম (১১৪৬)

হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “আয়েশা (রাঃ) এর শাবান মাসে কাযা রোজা আদায় পালনে সচেষ্ট হওয়া থেকে বিধান গ্রহণ করা যায় যে, রমজানের কাযা রোজা পরবর্তী রমজান আসার আগেই আদায় করে নিতে হবে।” [ফাতহুল বারী (৪/১৯১)]

৫. রোজার মাসয়ালা-মাসায়েল জেনে নেয়া এবং রমজানের ফজিলত অবগত হওয়া।

৬. যে কাজগুলো রমজান মাসে একজন মুসলমানের ইবাদত বন্দেগীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে সেগুলো দ্রুত সমাপ্ত করার চেষ্টা করা।

৭. স্ত্রী-পুত্রসহ পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে বসে রমজানের মাসয়ালা-মাসায়েল আলোচনা করা এবং ছোটদেরকেও রোজা পালনে উদ্বুদ্ধ করা।

৮. যে বইগুলো ঘরে পড়া যায় এমন কিছু বই সংগ্রহ করা অথবা মসজিদের ইমামকে হাদিয়া দেয়া যেন তিনি মানুষকে পড়ে শনাতে পারেন।

৯. রমজানের রোজার প্রস্তুতিস্বরূপ শাবান মাসে কিছু রোজা রাখা:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ . رواه البخاري () ومسلم ()

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে সিয়াম পালন করতেন যে, আমরা বলতাম—

তিনি আর সিয়াম ভঙ্গ করবেন না এবং এমনভাবে সিয়াম ভঙ্গ করতেন যে আমরা বলতাম—

তিনি আর সিয়াম পালন করবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

কে রমজান ছাড়া অন্য কোন মাসের গোটা অংশ রোজা

পালন করতে দেখিনি এবং শাবান ছাড়া অন্য কোন মাসে অধিক সিয়াম পালন করতে দেখিনি।” [এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (১৮৬৮) ও মুসলিম (১১৫৬)]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ، قَالَ : ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ وَأَنَا صَائِمٌ رواه النسائي () وحسنه الألباني في " صحيح النسائي "

উসামাহ ইবনে যয়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: “আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আপনাকে শাবান মাসের মত অন্য কোন মাসে এত রোজা পালন করতে দেখিনি। তখন তিনি বললেন: “এটি রজব ও রমজানের মধ্যবর্তী মাস। এ মাসের ব্যাপারে মানুষ গাফেল। অথচ এ মাসে বান্দাদের আমল রাক্বুল আলামীনের কাছে উত্তোলন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, রোজা পালনরত অবস্থায় আমার আমল উত্তোলন করা হোক।” [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসা’ঈ (২৩৫৭) এবং আলবানী একে ‘সহীছন নাসা’ঈ’ গ্রন্থে হাসান বলেছেন।]

এ হাদিসে শাবান মাসে রোজা পালনের হেকমত (গুঢ় রহস্য) বর্ণনা করা হয়েছে। সে হেকমত হচ্ছে- এ মাসে বান্দার আমলগুলো উত্তোলন করা হয়। জনৈক আলেম আরো একটি হেকমত উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে- শাবান মাসের রোজা যেন ফরজ নামাজের আগে সুলত নামাজের তুল্য। এই সুলতের মাধ্যমে ফরজ পালনের জন্য আত্মাকে প্রস্তুত করা হয় এবং ফরজ পালনের জন্য প্রেরণা তৈরী করা হয়। একই হেকমত রমজানের পূর্বে শাবানের রোজার ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে।

১০. কুরআন তেলাওয়াত করা

সালামাহ ইবনে কুহাইল বলেছেন: “শাবান মাসকে তেলাওয়াতকারীদের মাস বলা হত।” শাবান মাস শুরু হলে আমার ইবনে কায়েস তাঁর দোকান বন্ধ রাখতেন এবং কুরআন তিলাওয়াতের জন্য অবসর নিতেন।

আবু বকর আল-বালখী বলেছেন: “রজব মাস হল- বীজ বপনের মাস। শাবান মাস হল- ক্ষেতে সেচ প্রদানের মাস এবং রমজান মাস হল- ফসল তোলার মাস।” তিনি আরও বলেছেন: “রজব মাসের উদাহরণ হল- বাতাসের ন্যায়, শাবান মাসের উদাহরণ হল- মেঘের ন্যায়, রমজান মাসের উদাহরণ হল- বৃষ্টির ন্যায়। তাই যে ব্যক্তি রজব মাসে বীজ বপন করল না, শাবান মাসে সেচ প্রদান করল না, সে কিভাবে রমজান মাসে ফসল তুলতে চাইতে পারে?”

এখন তো রজব মাস গত হয়ে গেছে। আপনি যদি রমজান মাস পেতে চান তাহলে শাবান মাসের জন্য আপনার কি পরিকল্পনা? এই হল এই মুবারক মাসে আপনার নবী ও উম্মতের পূর্ববর্তী প্রজন্মের অবস্থা। এই সমস্ত আমল ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে আপনার অবস্থান কী হবে!!

তৃতীয়ত:

রমজান মাসে একজন মুসলিমের কী কী আমল করা উচিত সে সম্পর্কে জানতে (26869) ও (12468) নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

আল্লাহই তাওফিক দাতা।

“রোজাদারের ঘুম হল ইবাদত” শীর্ষক হাদিসটি যয়ীফ বা দুর্বল

প্রশ্ন

আমি একজন আলোচককে “রোজাদারের ঘুম ইবাদত” এই শীর্ষক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হাদিস বলতে শুনেছি। এই হাদিসটি কি সহীহ?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এই হাদিসটি সহীহ নয়। এটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সাব্যস্ত হয়নি। ইমাম বাইহাকী তাঁর ‘শুআবুল ঈমান’ (৩/১৪৩৭) গ্রন্থে ‘আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফারাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف)

“রোজাদারের ঘুম হল ইবাদত। তার নিরবতা অবলম্বন হল- তাসবীহ। আর তার দোয়া হল কবুলযোগ্য এবং তার আমলের সওয়াব বহুগুণ বেশি।”

ইমাম বাইহাকী এই হাদিসটির সনদকে “যয়ীফ” (দুর্বল) আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন: মারুফ ইবনে হাসসান (সনদের রাবীদের একজন): যয়ীফ (দুর্বল) এবং সুলাইমান ইবনে আমর আন-নাখাঈ তার চেয়েও যয়ীফ (দুর্বল)।

ইরাকী তাঁর ‘তাখরীজ ইহইয়া উলুমুদদ্বীন’ (১/৩১০) নামক গ্রন্থে বলেন: সুলাইমান আন-নাখাঈ মিথ্যাবাদীদের একজন।

মুনাউয়ী তাঁর ‘ফাইজুল কাদির’ (৯২৯৩) নামক গ্রন্থে তাকে যয়ীফ (দুর্বল) আখ্যায়িত করেছেন। আলবানী ‘সিলসিলাতুল আহাদিস আদ যায়িফা’ (৪৬৯৬) গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: “সে যয়ীফ (দুর্বল)।”

তাই সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্ব হলো খতিব ও ওয়াজের-বক্তাদের বক্তব্য তাদের নিকট থেকে নিশ্চিত হওয়া। এতে করে তারা কোন উজ্জিকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সম্পৃক্ত করার আগে নিশ্চিতভাবে জেনে নিবেন। কারণ যে কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি তা তাঁর উপর আরোপ করা জায়েয নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

قال صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدٍ ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) رواه البخاري () ورواه مسلم في مقدمة صحيحه ()

“নিশ্চয় আমার নামে মিথ্যা বলা অন্য কারো নামে মিথ্যা বলার মত নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়।” [সহীহ বুখারী (১৩৯১) ও সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় (৪)]

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রোজার হুকমে তাকলিফি বা শরয়ি দায়িত্বের প্রকারভেদ

প্রশ্ন

রোজার হুকমে তাকলিফি বা শরয়ি দায়িত্বের প্রকারগুলো কি কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যে কোন ব্যক্তির উপর ইসলামের শরয়ি দায়িত্ব ৫ ভাগে বিভক্ত। (১) ওয়াজিব (অবশ্য পালনীয়) (২) হারাম (অবশ্য পরিহার্য) (৩) মুস্তাহাব (যা পালন-করা শ্রেয়) (৪) মাকরুহ (যা পরিহার করা শ্রেয়) (৫) মুবাহ (যা পালন করা বা পরিহার করা উভয়টা সমান)। এই ৫ টি হুকুমের প্রত্যেকটি রোজার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পাঁচটি হুকুমের প্রত্যেকটির খুঁটিনাটি আমরা এখানে আলোচনা করতে যাব না। বরং সংক্ষেপে যতটুকু উল্লেখ করা যায় সে চেষ্টা করব। এক: ওয়াজিব (ফরজ) রোজা

(১) রমজানের রোজা

(২) রমজানের কাযা রোজা

(৩) কাফফারার রোজা (ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা, জিহারের কাফফারা, রমজানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করার কাফফারা, শপথ ভঙ্গের কাফফারা)

(৪) মুতামাতে হজ্জ আদায়কারীর রোজা; যদি তিনি কোরবানী করার সামর্থ্য না রাখেন। এর দলীল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)
[البقرة : 2]

“তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে উমরার সুবিধাও ভোগ করবে, সে (আল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করবে) যে কুরবানী সহজলভ্য হয়।”[২ আল-বাক্বারাহ : ১৯৬]

(৫) মান্নতের রোজা

দুই: মুস্তাহাব রোজা

(১) আশুরার রোজা

(২) আরাফার দিনের রোজা

(৩) প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবারের রোজা

(৪) প্রতি মাসে তিনদিন রোজা রাখা

(৫) শাওয়াল মাসে ছয় রোজা

(৬) শাবান মাসের অধিকাংশ দিন রোজা রাখা

(৭) মুহাররম মাসে রোজা রাখা

(৮) একদিন রোজা রাখলে, পরের দিন না-রাখা। এটি (নফল) রোজা রাখার সর্বোত্তম পদ্ধতি।

উপরে উল্লেখিত রোজাগুলোর বিধান হাসান ও সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং এই ওয়েবসাইটে এগুলোর ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে।

তিন: মাকরুহ রোজা

(১) শুধু শুক্রবারে রোজা রাখা। দলীল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

(لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده) (متفق عليه)

“আপনারা শুক্রবারে রোজা রাখবেন না। শুক্রবারে রোজা রাখতে চাইলে সাথে আগের দিন অথবা পরের দিনও রোজা রাখবেন।”
[সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

(২) শুধু শনিবারে রোজা রাখা। দলীল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

(لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِخَاءِ عَنَبَةٍ أَوْ عُودِ شَجَرَةٍ)
(رواه الترمذي () وحسنه وأبو داود () وابن ماجه () وصححه الألباني في "إرواء الغليل" ())

“আপনারা ফরজ রোজা ছাড়া শনিবারে কোন রোজা রাখবেন না। এমনকি আপনাদের কেউ যদি (খাওয়ার জন্য) আঙ্গুর গাছের বাকল বা গাছের কাণ্ড ছাড়া অন্য কিছু না পায় তা সত্ত্বেও।” [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী (৭৪৪) এবং হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়িত করেছেন; আবু দাউদ (২৪২১), ইবনে মাজাহ (১৭২৬) এবং আলবানী তাঁর ‘ইরওয়াউল গালীল’ (৯৬০) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন।]

ইমাম তিরমিযী বলেন:

“মাকরুহ হওয়ার অর্থ হলো- কোন ব্যক্তির সুনির্দিষ্টভাবে শনিবারে রোজা রাখা। কারণ ইহুদীরা শনিবারকে বিশেষ মর্যাদা দেয়।”
(সমাণ্ড)

চার: হারাম রোজা

(১) ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও তাশরীকের দিনগুলোতে রোজা রাখা। তাশরীক এর দিন হলো- ঈদুল আযহার পরের তিনদিন।
(১১, ১২ ও ১৩ জিলহজ্জ)

(২) সন্দেহের দিন রোজা রাখা

সন্দেহের দিন: ৩০ শে শাবান; আকাশে মেঘ থাকায় যদি সেদিন নতুন চাঁদ দেখা না যায় তবে সেদিনকে সন্দেহের দিন বলা হয়। আর যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে এতে সন্দেহের কিছু থাকে না।

(৩) হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় রোজা রাখা।

পাঁচ: মুবাহ রোজা

যে রোজা উপরে উল্লেখিত চার প্রকারের কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে মুবাহ (বৈধ) হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- যে দিনের রোজা রাখার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন আদেশ বা নিষেধ বর্ণিত হয়নি। যেমন মঙ্গল ও বুধবারে রোজা পালন। যদিও সাধারণভাবে যে কোন সময় নফল রোযা রাখা মুস্তাহাব ইবাদত।

দেখুন: আল-মাওসুআহআল-ফিক্কাহিয়াহ (ফিক্কাহী বিশ্বকোষ) (২৮/১০-১৯), আশ-শারহুল- মুমতি'আহ (৬/৪৫৭-৪৮৩)

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রমজান মাসে একজন মুসলিমের জন্য প্রস্তাবিত রুটিন

প্রশ্ন

প্রথমে আমি মাহে রমজান মাস উপলক্ষে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করছি- আল্লাহ যেন আমাদের ও আপনাদের সিয়াম ও ক্বিয়াম কবুল করে নেন। আশা করছি- আমি রমজানের এই সুযোগকে সাধ্যানুযায়ী ইবাদতের মধ্যে ও সওয়াব হাছিলে কাজে লাগাব। তাই আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা আমার ও আমার পরিবারের জন্য উপযোগী একটি প্রোগ্রাম উপস্থাপন করুন, যাতে আমরা এই মাসটি ভালো আমল ও আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারি।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ ।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

আল্লাহ তাআলা সকলের সৎ কথা ও কাজ কবুল করুন এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে আমাদেরকে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) দান করুন ।

এটি এই মুবারক মাসে একজন মুসলিমের জন্য প্রস্তাবিত রুটিন :

রমজান মাসে একজন মুসলিমের সারাদিন :

একজন মুসলিম তাঁর দিন শুরু করবে ফজরের সালাতের আগে সেহেরী গ্রহণের মাধ্যমে । উত্তম হচ্ছে যদি রাতের শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে সেহেরী গ্রহণ করা যায় । আযানের আগে তিনি ফজরের সালাতের জন্য প্রস্তুতি নিবেন । বাসা হতে ওজু করে আযানের আগেই মসজিদে যাবেন । মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে 'তাহিয়্যা তুল মসজিদ' দুই রাকাত সালাত আদায় করবেন । এরপর মুয়াজ্জিন আযান দেয়ার আগ পর্যন্ত বসে বসে দোয়াদরুদ, কুরআন তিলাওয়াত বা যিকির আযকারে মশগুল থাকবেন । আযান দিলে মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে আযানের বাক্যগুলোর পুনরাবৃত্তি করবেন । আযান সমাপ্ত হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত দুআপাঠ করবেন । এরপর ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামায আদায় করবেন । তারপর ফরজ সালাত দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত যিকির, দুআ ও কুরআন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করবেন । " সালাতের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি সালাতেই রয়েছেন" । [বুখারী (৬৪৭) ও মুসলিম (৬৪৯)]

জামাতের সাথে সালাত আদায় শেষে, সালাম ফিরানোর পর তিনি শরিয়ত নির্দেশিত দুআসমূহ পাঠ করবেন । এরপর চাইলে সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে থেকে যিকির, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকবেন । এটি করতে পারলে ভাল । ফজরের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে আমল করতেন । এরপর সূর্যোদয়ের পর সূর্য কিছুটা উপরে উঠলে এবং উদয়নের পর ১৫ মিনিটের মত অতিক্রান্ত হলে তিনি চাইলে সালাতুদ দোহা তথা চাশতের নামায (সর্বনিম্ন দুই রাকাত) আদায় করবেন । এটি ভাল । আর চাইলে কিছুটা দেরী করে এই নামায পড়ার উত্তম সময়ে নামাযটি পড়তে পারেন । উত্তম সময় হলো- সূর্য আরো উপরে উঠলে এবং রোদের প্রখরতা বাড়লে । এই সময়ে নামাযটি পড়তে পারলে আরো ভাল । [মুসলিম (৭৪৮), তিরমিযী (৫৮৬)] এরপর কর্মস্থলে যাওয়ার প্রস্তুতিস্বরূপ কিছু সময় ঘুমাতে চাইলে এই ঘুমের দ্বারা 'ইবাদত ও রিযিক অন্বেষণের নিমিত্তে শক্তি অর্জনের নিয়ত করবেন । যাতে আল্লাহ চাহতে এ ঘুমেরমাধ্যমে সওয়াব পেতে পারেন । ইসলামী শরিয়ত যেসব কথা ও কাজকে ঘুমের আদব হিসেবে নির্ধারণ করেছে সেগুলো পালনে যত্নবান হওয়া উচিত । এরপর তিনি তার কর্মস্থলে যাবেন । যোহরের নামাযের ওয়াক্ত নিকটে এলে যথাসম্ভব শীঘ্রই আযানের আগে অথবা আযানের পরপরই মসজিদে হাযির হবেন । নামাযের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকবেন । এরপর তিনি ২ সালামে যোহরের ৪ রাকাত সুন্নত নামায আদায় করবেন । এরপর কুরআন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না জামাত শুরু হয় । এরপর জামাতের সাথে সালাত আদায় করবেন । জামাতের পর যোহরের ২ রাকাত সুন্নত নামায আদায় করবেন । সালাত আদায় শেষে তার ডিউটির বাকী অংশ সম্পন্ন করবেন । ডিউটি শেষে তিনি বাসায় ফিরে আসবেন । যদি আসরের সালাতের পূর্বে লম্বা সময় বাকি থাকে তাহলে কিছু সময় বিশ্রাম নিবেন । আর যদি ঘুমানোর মত বেশি সময় বাকি না থাকে এবং ঘুমিয়ে পড়লে আসরের সালাত ছুটে যাওয়ার আশংকা করেন তাহলে নামাযের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত কোন কাজে ব্যস্ত থাকবেন । যেমন- বাসার লোকজনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কিনতেবাজারে যাওয়া । নতুবা কর্মস্থল থেকে ফিরে সোজা মসজিদে চলে যাবেন এবং আসরের সালাত পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করবেন । আসরের পর একজন মানুষ তার নিজের অবস্থা বিবেচনা করবে । তিনি যদি মসজিদে বসে কুরআন তিলাওয়াতে নিয়োজিত থাকার মত শক্তি পান তাহলে এটা এক মহান সুযোগ । আর যদি তিনি ক্লান্তি বোধ করেন তবে এ সময়ে বিশ্রাম নিবেন; যাতে রাতে তারাবীর নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন । মাগরিবের আযানের আগে তিনি ইফতারের জন্য প্রস্তুতি নিবেন । এই মুহূর্তগুলোকে তিনি যেকোন ভালো কাজে ব্যয় করবেন । যেমন- কুরআন তিলাওয়াত করা, দুআ করা, অথবা পরিবার ও সন্তানদের নিয়ে ভাল কোন কথা আলোচনা করা । এ সময়ের সবচেয়ে ভাল কাজ হল – রোযাদারদের ইফতার করানোতে অংশ নেওয়া । হয়তো তাদের জন্য খাবার কিনে দেয়ার মাধ্যমে অথবা তা বিতরণ করার মাধ্যমে অথবা এর ব্যবস্থাপনা করার মাধ্যমে । এই আমলের মধ্যে অপরিসীম আনন্দ রয়েছে । এটা তিনিই জানেন যিনি নিজে এ আমল করেছেন ।

ইফতারের পর তিনি জামাতের সাথে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাবেন । এরপর দুই রাকাত মাগরিবের সুন্নত সালাত আদায় করবেন । বাসায় ফিরে তিনি প্রয়োজনমত খাদ্যগ্রহণ করবেন । অতিরিক্ত খাবেন না । এরপর এই সময়কে তার নিজের জন্য ও তার পরিবারের জন্য কল্যাণকর কোন পন্থায় ব্যয় করবেন । যেমন – কোন কাহিনীর বই পড়া, দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় হুকুম

আহকামের কোন বই পড়া, প্রতিযোগিতার বই পড়া, বৈধ কোন আলাপ আলোচনায় রত থাকা অথবা অন্য যে কোন আকর্ষণীয় কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা এবং এগুলোর মাধ্যমে মিডিয়ায় সম্প্রচারিত হারাম অনুষ্ঠান থেকে পরিবারের সদস্যদেরকে বিরত রাখা। কারণ চ্যানেলগুলোর জন্য এটি পিক আওয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই আপনি দেখবেন এ সময় তারা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। যে অনুষ্ঠানগুলো আক্কাঁদা বিনষ্টকারী ও আখলাক বিনষ্টকারী বিষয়াদিতে ভরপুর থাকে।

প্রিয় ভাই, এসব অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করুন এবং আপনার অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। যাদের ব্যাপারে কিয়ামাতের দিন আপনি প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। সেদিনের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। এরপর এশার সালাতের জন্য প্রস্তুতি নিন এবং মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন। মসজিদে গিয়ে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হোন। অথবা মসজিদে কোন ইলমী আলোচনা অনুষ্ঠান থাকলে তা শুনুন। এরপর এশার সালাত আদায় করুন। অতঃপর ২ রাকাত এশার সুন্নত নামায আদায় করুন। এরপর ইমামের পিছনে তারাবির নামায খুশু (আল্লাহর ভয়), তাদাক্বুর (অনুধাবন), তাফাক্কুর (চিন্তাভাবনা)এর সাথে আদায় করুন। ইমাম নামায শেষ করার আগে আপনি নামায ছেড়ে চলে যাবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة". رواه أبو داود () وغيره ، وصححه الألباني في "صلاة التراويح" (ص)

"ইমাম নামায শেষ করা পর্যন্ত যে ব্যক্তি তাঁর সাথে নামায আদায় করবে তার জন্য পুরো রাত নামায পড়ার সওয়াব লিখে দেয়া হবে।" [হাদিসটি আবু দাউদ (নং ১৩৭০) এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সংকলন করেছেন। আলবানী সালাতুং তারাবীহ অধ্যায়ে হাদিসটিকে সহীহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন]

সালাতুং তারাবীর পর আপনি আপনার নিজস্ব ব্যতিব্যস্ততার সাথে সামঞ্জস্যশীল প্রোগ্রাম তৈরি করে নিন। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন:

- সমস্ত হারাম থেকে এবং হারামের আক্সয়ক বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকুন।
- আপনার বাসার সদস্যদেরকে হারাম থেকে ও হারামের যাবতীয় উপকরণ থেকে কৌশলে বিরত রাখুন। যেমন—তাদের জন্য বিশেষ কোন প্রোগ্রাম তৈরি করুন। অথবা তাদের নিয়ে শরিয়ত অনুমোদিত স্থানে ঘুরতে বের হোন। তাদেরকে অসৎসঙ্গ থেকে দূরে রাখুন। তাদের জন্য সৎ সাহচর্যের অনুসন্ধান করুন।
- কম ফজিলতপূর্ণ বিষয়ের পরিবর্তে বেশি ফজিলতপূর্ণ আমলে মশগুল হওয়া।

আগে আগে বিছানায় যেতে চেষ্টা করুন। ইসলামী শরিয়ত যেসব কথা ও কাজকে ঘুমের আদব হিসেবে নির্ধারণ করেছে সেগুলো পালনে যত্নবান হবেন। ঘুমের আগে যদি কিছু কুরআন তেলাওয়াত বা ভাল কোন বইয়ের কিছু অংশ পড়তে পারেন তবে তা ভাল। বিশেষ করে আপনি যদি কুরআন থেকে আপনার দৈনন্দিন পাঠ্য (ওয়াজীফাহ) শেষ না-করে থাকেন তবে তা সম্পন্ন না করে ঘুমাবেন না। এরপর সেহেরীর আগে যথেষ্ট সময় নিয়ে ঘুম থেকে উঠুন। যাতে দুআতে ব্যস্ত হতে পারেন। কারণ এই সময় — রাতের শেষ তৃতীয়াংশ — আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা এ সময়ে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের প্রশংসা করেছেন। এ সময়ে দুআকারীদের দুআ কবুলের এবং তওবাকারীদের তওবা কবুলের ওয়াদা করেছেন। তাই এই মহা সুযোগটি আপনার হাতছাড়া করা উচিত হবে না।

জুমাবার:

জুমাবার সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম। তাই এই দিনের 'ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য বিশেষপ্রোগ্রাম থাকা উচিত। এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো খেয়াল রাখা দরকার :

জুমার সালাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আগে আগে বের হওয়া।

আসরের সালাতের পর মসজিদে অবস্থান করা এবং এ দিনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিলাওয়াত ও দুআতে ব্যস্ত থাকা। কারণ এ সময়ে দুআ কবুল হওয়ার আশা করা হয়।

সপ্তাহের মাঝে যে কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারেননি তা সম্পন্ন করতে এই দিনকে একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করুন। যেমন কুরআনের সাপ্তাহিক পাঠ্য (ওয়াজীফাহ) বা কোন বই পাঠ অথবা ক্যাসেট শোনা অথবা এ জাতীয় কোন ভাল কাজের কিছু অসম্পন্ন থাকলে এদিনে তা সম্পন্ন করুন।

শেষ দশক:

রমজানের শেষ দশকে আছে লাইলাতুল কদর (ভাগ্য রজনী)। যে রাত হাজার মাস থেকে উত্তম। তাই এই দশকে মসজিদে ই'তিকাহ করার বিধান এসেছে। লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে ইতিকাহ করেছেন। সুতরাং যার ইতিকাহ করার সুযোগ রয়েছে তার জন্য উচিত এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য এক মহান করুণা। আর যার পুরো দশদিন ইতিকাহ করার সুযোগ নেই তিনি যে কয়দিন পারেন ইতিকাহ করতে পারেন। আর যার একেবারেই ইতিকাহ করার সুযোগ নেই তিনি যেন এ রাত্রিগুলোতে ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে কাটাতে সচেষ্ট হন। যেমন কুরআন তিলাওয়াত করা, যিকির করা, দু'আ করা। রাতজেগে এসব আমল করার জন্য তিনি যেন দিনেরবেলা বিশ্রাম নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

লক্ষণীয় কিছু বিষয় :

এই রুটিন একটি প্রস্তাবিত রুটিন। এটি একটি পরিবর্তনযোগ্য রুটিন। যে কেউ তার ব্যতিব্যস্ততার আলোকে এটি পরিবর্তন করে নিতে পারেন।

এই রুটিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে প্রমাণিত সুন্যতসমূহ যথাযথভাবে পালনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, এতে উল্লেখিত সবকিছুই ওয়াজিব বা ফরজ। বরং এতে অনেক সুন্যাহ ও মুস্তাহাব কাজ রয়েছে।

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হল সে কাজ যা নিয়মিত করা হয় – তা অল্প হলেও। রমজান মাসের শুরুতে মানুষ আনুগত্য ও ইবাদতের খুব যোশ নিয়ে সক্রিয় থাকে। কিছুদিন পর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তাই এ ব্যাপারে সাবধান থাকুন এবং এই মহান মাসে পালনকৃত সমস্ত কাজ নিয়মিতভাবে ধরে রাখতে সচেষ্ট হউন।

একজন মুসলিমের উচিত এই মূবারক মাসে তার সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনায় সচেষ্ট হওয়া। যাতে করে কল্যাণ ও ভাল কাজে এগিয়ে যাওয়ার বড় বড় সুযোগ তার হাতছাড়া হয়ে না যায়। যেমন— রমজান মাস শুরু হওয়ার আগেই পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনে দিতে সচেষ্ট হওয়া। একইভাবে দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এমন সময়ে কিনতে সচেষ্ট হওয়া যখন বাজারে ভিড় থাকে না। আরেকটি উদাহরণ হল: ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দেখা সাক্ষাতের জন্য এমন রুটিন করে নেয়া যাতে ইবাদতে বিঘ্ন না ঘটে।

এই মূবারক মাসে বেশি বেশি ইবাদত করা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভকে আপনার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণকরুন।

সালাতের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মসজিদে হাযির হওয়ার ব্যাপারে মাসের শুরুতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আল্লাহ তাআলার কিতাব তিলাওয়াত খতম (সমাণ্ড) করার সিদ্ধান্ত নিন। এই মহান মাসে নিয়মিত ক্বিয়ামুল লাইল পালন করার সংকল্প করুন। স্বীয় সম্পদ থেকে সাধ্যানুপাতে দান করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন।

এই রমজান মাসে আল্লাহ তাআলার কিতাবের সাথে সম্পর্ক মজবুত করার সুযোগ গ্রহণ করুন। নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে হতে পারে:

-সঠিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করা। ভাল একজন কুরআনের শিক্ষকের (ফারীর) নিকট কুরআন পড়া সংশোধন করে নেয়া। আর তা সম্ভব না হলে দক্ষ কারীগণের তিলাওয়াতের ক্যাসেট অনুসরণ করা।

-আল্লাহ আপনাকে যতটুকু কুরআন হিফজ করার তাওফিক দিয়েছেন তা রিভিশন দেওয়া এবং হিফজ করার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া।

-কুরআনের আয়াতের তাফসীর পাঠ করা। এটা হতে পারে যে আয়াত বুঝতে আপনার সমস্যা হয় সে আয়াতের তাফসীর নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থগুলো (যেমন— তাফসীরে বাগাবী, তাফসীরে ইবনে কাছীর ও তাফসীরে সা'দী) থেকে সেটা জেনে নেওয়া। অথবা নির্দিষ্ট কোন তাফসীর গ্রন্থ থেকে নিয়মিত পড়ার জন্য রুটিন তৈরি করে নেয়া। প্রথমে আমপারা (পারা-৩০), তারপর তাবারাকা পারা (পারা-২৯) এভাবে পড়তে থাকবেন।

-আল্লাহ তাআলার কিতাবে যে আদেশাবলী পাওয়া যায় তা বাস্তবায়নে যত্নশীল হওয়া।

আমরা দু'আ করছি যাতে আল্লাহ তাআলা সিয়াম, ক্বিয়াম সম্পন্ন করার তাওফিক দানের মাধ্যমে আমাদের উপর রমজান মাস পাওয়ার নেয়ামত পূর্ণ করে দেন। আমাদের পক্ষ থেকে তা কবুল করে নেন এবং আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো মাফ করে দেন।

রমজানে নারী

অপারেশনের কারণে রক্তপাত কি রোযা রাখার ক্ষেত্রে বাধা হবে?

প্রশ্ন

আমি প্রায় দুই মাস আগে সন্তান প্রসব করেছি। এখনও নিফাসের রক্ত বন্ধ হয়নি। রেডিওগ্রাফার ডাক্তার পরীক্ষা করে আবিষ্কার করলেন যে, জরায়ুর ভিতরে বাচ্চার প্লাসেন্টারের একটি টুকরো রয়ে গেছে। এটি দূর করার জন্য আমি অপারেশন করিয়েছি। অপারেশন করিয়েছি রমযানের এক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর। অপারেশনের পর থেকে আমি রোযা রাখছি। যদিও রক্তপাত এখনও বন্ধ হয়নি। এখন আমি কি করব? আমার রোযা রাখা কি সঠিক? এখন কি সহবাস করা যাবে; অপারেশনের পরে রক্তপাত এখন একেবারে কম।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নিফাসের সর্বোচ্চ সীমা চল্লিশ দিন। চল্লিশ দিন পর নারী পবিত্র হয়ে যাবেন। তিনি রোযা রাখবেন, স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে; এমনকি যদি রক্তপাত হয় তবুও। চল্লিশ দিন পরের রক্তপাত রক্তক্ষরণ হিসেবে গণ্য হবে; নিফাস হিসেবে নয়।

ইতিপূর্বে এ বিষয়টি দলিলসহ বিস্তারিত [106464](#) নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব, অপারেশনের পর আপনার রোযা রাখা সঠিক; এমনকি রক্তপাত চলমান থাকলেও।

রমযান মাসের যে এক সপ্তাহ আপনি রোযা রাখেননি সেগুলো কাযা করা আপনার উপর আবশ্যিক।

আর চল্লিশ দিন পর থেকে যে নামাযগুলো আপনি পড়েননি সেগুলো ইনশাআল্লাহ্ কাযা করা আপনার উপর আবশ্যিক নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

যে নারীর বাচ্চা ন্যাচারাল ফিডিং এর উপর ২০% নির্ভর করে এমন নারীর রোযা না-রাখা

প্রশ্ন

আমার শিশুর বয়স প্রায় একমাস। সে ন্যাচারাল ফিডিং এর উপর প্রায় ২০% নির্ভর করে। কারণ দুধ কম। তার বাকী প্রয়োজনীয় কৃত্রিম দুধ দিয়ে পূরণ করা হয়। আমি এমন দেশে থাকি যেখানে রোযা ১৭ ঘন্টা। এমতাবস্থায় আমার রোযা রাখার হুকুম কি?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আমি এই প্রশ্নটি আমাদের শাইখ আব্দুর রহমান আল-বাব্বারকের কাছে পেশ করেছি। তিনি বলেন: এই নারী রোযা না-রেখে পরবর্তীতে ছোট দিনগুলোতে কাযা পালন করবেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

যে রোযাদার নারীর নিফাসের রক্তপাত বন্ধ হয়ে পুনরায় ফিরে এসেছে

প্রশ্ন

জৈনিক নিফাসগ্রস্ত নারী এক সপ্তাহের মধ্যে নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে গেছেন। তিনি রযমানের কিছুদিন সাধারণ মুসলিমদের সাথে রোযাও রেখেছেন। এরপর পুনরায় তার রক্তপাত শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় সেই নারী কি রোযা রাখবেন না? তিনি যে দিনগুলোর রোযা রেখেছেন এবং যে দিনগুলোর রোযা ভঙ্গ করেছেন সবগুলোর কাযা পালন কি তার উপর আবশ্যিক হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি কোন নারী চল্লিশ দিনের ভেতরে নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে যান; এরপর কিছুদিন রোযা রাখেন, এরপর চল্লিশ দিনের ভেতরেই আবার রক্তপাত শুরু হয়; তাহলে তার রোযা রাখা সহিহ। যে দিনগুলোতে রক্তপাত আবার ফিরে এসেছে সে দিনগুলোতে তিনি নামায ও রোযা বর্জন করবেন। কেননা এটি নিফাসের রক্ত। যতদিন পর্যন্ত না তিনি পবিত্র হন কিংবা চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়। যখনই তিনি চল্লিশ দিন পূর্ণ করবেন তখন গোসল করা তার উপর ওয়াজিব; এমনকি যদি তিনি পবিত্রতার কোন আলামত না দেখেন তবুও। কেননা আলেমদের দুটো অভিমতের মধ্যে সর্বাধিক শুদ্ধ অভিমত হলো: চল্লিশ দিন হচ্ছে নিফাসের সর্বশেষ সীমা। এরপর রক্তপাত অব্যাহত থাকলে প্রতি ওয়াক্তের জন্য ওয়ু করা তার উপর আবশ্যিক; যতদিন না রক্তপাত বন্ধ হয়। ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম এভাবে করার নির্দেশ দিয়েছেন। চল্লিশ দিনের পর তার স্বামী তাকে উপভোগ করতে পারবে; এমনকি পবিত্রতার আলামত না দেখা সত্ত্বেও। কেননা উল্লেখিত অবস্থার রক্তপাতটি দূষিত রক্ত। যা নামায পড়া ও রোযা রাখার জন্য প্রতিবন্ধক নয় এবং স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীকে উপভোগ করার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক নয়।

কিন্তু যদি চল্লিশ দিনের পরের রক্তপাতটি তার অভ্যাসগত হয়েযের সময়ে পড়ে তাহলে তিনি নামায ও রোযা বর্জন করবেন এবং এটাকে হয়েয হিসেবে বিবেচনা করবেন। আল্লাহ্ই তাওফিকদাতা [সমাণ্ড]

ফাযিলাতুশ শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহঃ)

ফাতাওয়াত ইসলামিয়া (২/১৪৬)

এক নারী গর্ভবতী, তার কিছু শ্রাব নির্গত হয়; তিনি কি নামায ত্যাগ করবেন?

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী থেকে কফি-কালারের একটি পদার্থ নির্গত হচ্ছে। মাঝেমাঝে তার মাসিক হয় না। সেকি রোযা রাখবে ও নামায পড়বে; নাকি পড়বে না? উল্লেখ্য আমার স্ত্রী তার প্রেগনেন্সির প্রথম দিকে, ১ মাস ১৫ দিন।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অনেক আলেমের মতে, গর্ভবতী নারীর হয়েয হয় না। এটি আবু হানিফা ও আহমাদ এই দুইজন ইমামের অভিমত। [দেখুন: আল-মুগনী (১/৪৪৩)]

এই অভিমতটি স্থায়ী কমিটির আলেমগণ নির্বাচন করেছেন।

অপর একদল আলেমের মতে, গর্ভবতী নারীর হয়েয হতে পারে। এটি মালেক ও শাফেয়ি এই দুই ইমামের অভিমত। [দেখুন: আল-মাজমু (২/৪১১-৪১২)]

এই অভিমতটি শাইখ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম ও শাইখ ইবনে উছাইমীন তাঁরা নির্বাচন করেছেন।

তবে শর্ত হলো নির্গত রক্তের বৈশিষ্ট্য হয়েযের রক্তের বৈশিষ্ট্য হতে হবে এবং হয়েযের সময়মত হতে হবে।

ইতিপূর্বে **226060** নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

তবে উপরোক্ত অভিমতদ্বয়ের কোনটি মতেও আপনার স্ত্রী থেকে নির্গত শ্রাব হয়েয নয়। কেননা সেটি হয়েযের রক্তের বৈশিষ্ট্য নয় এবং হয়েযের সময়মত নয়।

অতএব, আপনার স্ত্রী পবিত্র অবস্থায় আছেন। তিনি নামায পড়বেন, রোযা রাখবেন এবং পবিত্র নারীগণ যা যা করতে পারেন তিনিও তা করতে পারবেন।

রমযান মাসে মাসিক বন্ধ করে রাখা

প্রশ্ন

কোন কোন নারী রমযান মাসে ইচ্ছাকৃতভাবে ট্যাবলেট খেয়ে মাসিক (হায়েয) বন্ধ করে রাখেন। এ কাজ করার প্ররোচনা হচ্ছে যাতে করে রমযানের রোযা পরে কাযা পালন করতে না হয়। এটা করা কি জায়েয? এক্ষেত্রে কি বিশেষ কোন শর্ত রয়েছে যাতে করে এ নারীগণ এ কাজটি না করেন?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এ মাসয়ালায় আমার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে— কোন নারী যেন এ কাজটি না করেন। আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং নারী জাতির জন্য যা লিখে রেখেছেন সেটা সেভাবেই থাকুক। কারণ এ মাসিক দেয়ার মধ্যে আল্লাহ্র বিশেষ গূঢ় রহস্য রয়েছে। এই গূঢ় রহস্যটি নারীর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি এই মাসিককে বাধাগ্রস্ত করা হয় নিঃসন্দেহে এর প্রতিক্রিয়ায় নারীর শরীরের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ক্ষতি করা নয় এবং পাল্টাপাল্টি ক্ষতি করাও নয়”। তাছাড়া এই ট্যাবলেটগুলোর গর্ভাশয়ের উপর ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে যা ডাক্তারগণ উল্লেখ করে থাকেন। তাই এই মাসয়ালায় আমার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে নারীরা যেন এই ট্যাবলেটগুলো ব্যবহার না করেন। আল্লাহ্র তাকদীর ও হেকমতের জন্য তার প্রশংসা। যখন কোন নারীর হায়েয শুরু হবে তখন তিনি রোযা ও নামায থেকে বিরত থাকবেন। যখন পবিত্র হবেন তখন রোযা ও নামায পুনরায় শুরু করবেন। যখন রমযান শেষ হবে তিনি রমযানের ছুটে যাওয়া রোযাগুলোর কাযা পালন করবেন।

কোন নারী রমযান মাসে রান্নাবান্নায় থেকে সময়কে কিভাবে কাজে লাগাতে পারেন?

প্রশ্ন

আমি জানতে আগ্রহী মর্যাদাপূর্ণ রমযান মাসে বেশি নেকি হাছিল করার জন্য কোন আমল করা মুস্তাহাব... যিকির-আযকার, ইবাদত-বন্দেগী, মুস্তাহাব বিষয়াবলি। আমি যেগুলো জানি: তারাবীর নামায পড়া, বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা, বেশি বেশি ইস্তিগফার করা, কিয়ামুল লাইল পড়া...। কিন্তু আমি এমন কিছু কথা জানতে চাই যেগুলো আমি প্রতিদিন আওড়াতে পারব; যখন আমি রান্নাবান্নায় কিংবা পারিবারিক অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকব তখন। আমি নেকি লাভের সুযোগ নষ্ট করতে চাই না।

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এই মহান মাসে নেক আমল ও ভাল কাজের প্রতি এই আগ্রহের জন্য আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আপনি যে নেক আমলগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোর সাথে আরও যে সব আমল যোগ করা যেতে পারে: দান করা, খাবার খাওয়ানো, উমরা করতে যাওয়া, যার সুযোগ আছে ইতিকার করা।

আর কাজ করার সময় যে কথাগুলো আওড়ানো যেতে পারে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: সুবহানাল্লাহ্, লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহ্ আকবার বলা। ইস্তিগফার করা, দোয়া করা, মুয়াজ্জিনের আযানের জবাব দেয়া। আপনার জিহ্বা যেন আল্লাহর যিকির দিয়ে সতেজ থাকে। সামান্য কিছু কথা উচ্চারণ করে মহা সওয়াব প্রাপ্তির সুযোগ গ্রহণ করুন। প্রতিবার সুবহানাল্লাহ্ বলা একটি দান, প্রতিবার আলহামদু লিল্লাহ্ বলা একটি দান, প্রতিবার আল্লাহ্ আকবার বলা একটি দান, প্রতিবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা একটি দান।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক হাড় (নিরাপদে) ভোর করায় সদকা করা আবশ্যিক। প্রতিবার সুবহানাল্লাহ্ বলা একটি দান। প্রতিবার আলহামদু লিল্লাহ্ বলা একটি দান। প্রতিবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা একটি দান। প্রতিবার আল্লাহ্ আকবার বলা একটি দান। সৎ কাজের আদেশ দেয়া একটি দান। অসৎ কাজের নিষেধ করা একটি দান। দুই রাকাত সালাতুদ দোহা (চাশতের নামায) পড়লে এ সবকিছুর বদলে যথেষ্ট হয়ে যাবে।" [সহিহ মুসলিম (৭২০)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "দুটো বাণী উচ্চারণে হালকা, মিয়ানে ভারী এবং আর-রহমানের কাছে প্রিয়:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

(সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম)।" [সহিহ বুখারী (৬৬৮২) ও সহিহ মুসলিম (২৬৮৪)]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি বলবে:

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

(সুবহানাল্লাহি আযীম ওয়াবি হামদিহি) তার জন্য জান্নাতে একটি খর্জুর বৃক্ষ রোপন করা হবে।" [সুনানে তিরমিযি (৩৪৬৫); আলবানী হাদিসটিকে 'সহিহ' বলেছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি বলবে:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

আস্তাগফিরুল্লাহাল আযীম আল্লাযি লা ইলাহা ইল্লাহ্ ওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আ-তুবু ইলাইহি) তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে; এমনকি সে যদি জিহাদ থেকে পলায়ন করে থাকে তবুও [সুনানে আবু দাউদ (১৫১৭), সুনানে তিরমিযি (৩৫৭৭); আলবানী সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "পৃথিবীতে কোন মুসলিম যদি কোন দোয়া করে আল্লাহ্ তাকে তার প্রার্থিত বিষয় দান করেন কিংবা অনুরূপ কোন মন্দ তার থেকে দূর করে দেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন পাপের দোয়া করে কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দোয়া করে। তখন এক লোক বলল: তাহলে আমরা অধিক দোয়া করব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহ্ও অধিক দিবেন।" [সুনানে তিরমিযি (৩৫৭৩); আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমরা মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুনবে তখন মুয়াজ্জিন যা যা বলে তোমরাও তা তা বলবে। এরপর আমার উপর দরুদ পড়বে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পড়ে আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। এরপর আমার জন্য ওসিলা প্রার্থনা করবে। ওসিলা জান্নাতের এমন একটি মর্যাদা যা কেবল আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল একজন বান্দার জন্য সমীচীন। আমি আশা করছি, আমিই হব সেই ব্যক্তি। যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসিলা প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার শাফায়াতপ্রাপ্তি অবধারিত হয়ে যায়।" [সহিহ মুসলিম (৩৮৪)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "কোন ব্যক্তি আযান শুনে যদি বলে:

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ ، آتٍ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ

আল্লাহুমা রাক্বা হাযিহিদ্ দাওয়াতিং তাম্মাহ, ওয়াস সালাতিল কাযিমা। আতি মুহাম্মাদানিল ওসিলাতা ওয়াল ফাযিলাত; ওয়াব আছহ্ মাকামাম মাহমুদানিল্লাযি ওয়াদতাহ) তার জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত হয়ে যায়।"[সহিহ বুখারী (৬১৪)]

আরও জানতে দেখুন: 4156 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ আমাদেরকে ও আপনাকে উপকারী ইল্ম ও নেক আমলের রিযিক দান করুন।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞ।

এদের উপর কি রোজা পালন ওয়াজিব এবং রোজার কাযা করা অপরিহার্য?

প্রশ্ন

যে শিশু বালেগ হওয়ার আগে থেকে রমজানের রোজা পালন করত। রমজান মাসের দিনের বেলায় সে বালেগ হল। তাকে কি সেই দিনের রোজা কাযা করতে হবে? একইভাবে রমজান মাসে দিনের বেলা যে কাফের ইসলাম গ্রহণ করল, যে নারী হয়েয থেকে পবিত্র হল, যে পাগল জ্ঞান ফিরে পেল, যে মুসাফির রোজা না-রাখা অবস্থায় স্বগৃহে ফিরে আসল, যে অসুস্থ ব্যক্তি রোজা ছিল না, কিন্তু সে সুস্থ হয়ে উঠল - এ সমস্ত ব্যক্তির জন্য সেই দিনের বাকি অংশ রোজাভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ও সেদিনের রোজার কাযা আদায় করা কি ওয়াজিব?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের সবার ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাপারে আমরা আলেমগণের মতভেদ ও তাদের বক্তব্য (৪৯০০৮) নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করেছি।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের দুটি গ্রুপে ভাগ করা যেতে পারে :

১) কোন শিশু যদি বালেগ হয়, কোন কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে, কোন পাগল যদি জ্ঞান ফিরে পায়- তবে তাদের সবার হুকুম এক। সেট হল- ওজর বা অজুহাত চলে যাওয়ার সাথে সাথে দিনের বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী সমস্ত মুফাতিরাতে হতে বিরত থাকা ওয়াজিব। কিন্তু তাদের জন্য সেই দিনের রোজা কাযা করা ওয়াজিব নয়।

২) অপরদিকে হয়েযগ্রস্ত নারী যদি পবিত্র হয়, মুসাফির ব্যক্তি যদি স্বগৃহে ফিরে আসে, অসুস্থ ব্যক্তি যদি আরোগ্য লাভ করে- এদের সবার হুকুম এক। এদের জন্য রোজা ভঙ্গকারী মুফাতিরাতে হতে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়। কারণ বিরত থাকতে তাদের কোন লাভ নেই। যেহেতু সেই দিনের রোজা কাযা করা তাদের উপর ওয়াজিব।

প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য:

প্রথম গ্রুপের মধ্যে তাকলিফের তথা শরয়ি ভার আরোপের সকল শর্ত পাওয়া গেছে। শর্তগুলো হচ্ছে- বালেগ হওয়া, মুসলিম হওয়া ও আকল (বুদ্ধি) সম্পন্ন হওয়া। যখন থেকে তাদের উপর শরয়ি ভার আরোপ সাব্যস্ত হয়েছে তখন থেকে মুফাতিরাতে তথা রোজা ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থাকা তাদের উপর ওয়াজিব; কিন্তু সেই দিনের রোজা কাযা আদায় করা তাদের উপর ওয়াজিব নয়। কারণ যখন থেকে তাদের উপর মুফাতিরাতে (রোজা ভঙ্গকারী বিষয়) হতে বিরত থাকা ওয়াজিব হয়েছে তখন থেকে তারা তা থেকে বিরত থেকেছে। এর আগে তো তারা রোজা পালনের ব্যাপারে মুকাব্বাফ (ভারপ্রাপ্ত) ছিল না।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় গ্রুপটি সিয়াম পালনের ব্যাপারে আইনতঃ মুকাব্বাফ ছিল। তাই তা পালন করা তাদের উপর ওয়াজিব ছিল। তবে তাদের শরয়িত অনুমোদিত ওজর থাকায় তাদেরকে রোজা না-রাখার বৈধতা দেয়া হয়েছে। এ ধরনের ওজর হচ্ছে- হয়েয, সফর ও রোগ। এসব ওজরের কারণে আল্লাহ্ রোজার বিধান তাদের জন্য কিছুটা সহজ করেছেন এবং রোজা না-থাকা তাদের জন্য বৈধ করেছেন। উল্লেখিত ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি রমজানের দিনের বেলায় বে-রোজদার থাকতে এ মাসের পবিত্রতা বিনষ্টকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। যদি রমজানের দিনের বেলায় তাদের ওজর দূর হয়ে যায় তবুও দিনের বাকী সময়টা রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে তাদের কোন লাভ নেই। কারণ রমজান মাসের পরে তাদেরকে সেই দিনের রোযা কাযা করতে হবে।

শাইখ মুহাম্মদ বিন সালাহ উছাইমীন রাহিমাল্লাহু বলেছেন:

“ যদি কোন মুসাফির রোজা না-রাখা অবস্থায় স্বগৃহে ফিরে আসে তবে তার জন্য রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়; দিনের বাকী সময়ে পানাহার করা তার জন্য বৈধ। যেহেতু তাকে এই দিনের রোজা কাযা করতে হবে। তাই এই দিনের অবশিষ্টাংশে পানাহার থেকে বিরত থেকে কোন লাভ নেই। এটাই সঠিক মত। এটি ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ীর অভিমত এবং ইমাম আহমাদ থেকে দুইটি বর্ণনার একটি। তবে সে ব্যক্তির প্রকাশ্যে পানাহার করা উচিত নয়।” সমাপ্ত [মাজমূ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৫৮ নং প্রশ্ন)]

তিনি আরও বলেন:

“কোন হায়েযগ্রস্ত নারী অথবা নিফাসগ্রস্ত নারী দিনের বেলায় পবিত্র হলে তাদের জন্য রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়। তিনি পানাহার করতে পারেন। কারণ তার বিরত থাকায় কোন লাভ নেই। যেহেতু সেই দিনের রোজা তাকে কাযা করতে হবে। এটি ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ীর অভিমত ও ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত দুইটি অভিমতের একটি। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন:

من أكل أول النهار فليأكل آخره

“ দিনের প্রথম অংশে যে ব্যক্তি খেয়েছে দিনের শেষভাগেও সে খেতে পারে।” অর্থাৎ যার জন্য দিনের প্রথম অংশে রোজা ভঙ্গ করা জায়েয তাঁর জন্য দিনের শেষ অংশেও রোজা ভঙ্গ করা বৈধ।” সমাপ্ত [মাজমূ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৫৯ নং প্রশ্ন)]

শাইখ উছাইমীনকে আরও প্রশ্ন করা হয়েছিল:

যে ব্যক্তি রমজান মাসের দিনের বেলায় শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে রোজা ভেঙ্গেছে ওজর দূর হয়ে যাওয়ার পর সে দিনের বাকী সময়ে পানাহার করা কি তার জন্য জায়েয হবে?

তিনি উত্তরে বলেন:

“ তার জন্য পানাহার করা জায়েয। কারণ সে শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে রোজা ভঙ্গ করেছে। শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে রোজা ভঙ্গ করায় তার ক্ষেত্রে রমজানের দিবসের পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব থাকে না। তাই সে পানাহার করতে পারে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি রমজান মাসের দিনের বেলায় কোন শরিয়ত ওজর ছাড়া রোজা ভঙ্গ করেছে তার অবস্থা ভিন্ন। তার ক্ষেত্রে আমরা বলব: দিনের বাকী অংশে রোজা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত থাকা তার জন্য ওয়াজিব। যদিও এ রোজার কাযা পালন করাও তার উপর ওয়াজিব। এই মাসয়ালা দুইটির পার্থক্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।” সমাপ্ত। [মাজমূ ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৬০) নং প্রশ্ন]

তিনি আরও বলেন:

“ সিয়াম বিষয়ক গবেষণাপত্রে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোন নারীর যদি হায়েয হয় এবং (রমজান মাসে) দিনের বেলায় তিনি পবিত্র হন তবে সেই দিনের বাকী অংশে তাকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে কি- এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন।

আমরা বলব: এ মাসয়ালায় ইমাম আহমাদ রাহিমাল্লাহু থেকে দুটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ থেকে সর্বজনবিদিত মত হল- দিনের বাকী অংশে রোজা ভঙ্গকারী সমস্ত মুফাতিরাত থেকে বিরত থাকা সে নারীর উপর ওয়াজিব। সুতরাং সে পানাহার করবে না।

দ্বিতীয় মত হচ্ছে- তার জন্য মুফাতিরাত থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়। তাই পানাহার করা তার জন্য জায়েয। আমরা বলব: এই দ্বিতীয় মতটি ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ি (রাঃ) এরও অভিমত। এটি ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণিত। তিনি বলেন:

من أكل أول النهار فليأكل آخره

"যে ব্যক্তির জন্য দিনের প্রথম অংশে খাওয়া বৈধ তার জন্য দিনের শেষ অংশেও খাওয়া বৈধ।"

আমরা আরও বলব ভিন্ন মত আছে এমন মাসয়ালার ক্ষেত্রে তালিবে ইলমের কর্তব্য হল দলিলগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং তার কাছে যে মতটি অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হয় সে মতটি গ্রহণ করা। আর দলিল যেহেতু তার পক্ষে রয়েছে সেহেতু ভিন্ন মতাবলম্বীর ভিন্নমতের প্রতি ক্রক্ষেপ না করা। কারণ আমরা রাসূলকে অনুসরণ করার ব্যাপারে আদিষ্ট। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

"যে দিন তাদেরকে ডেকে বলবেন: তোমরা রাসূলগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে?" [২৮ সূরা আল-ক্বাস্বাস্ব : ৬৫]

ভিন্ন মতাবলম্বীগণ একটা সহিহ হাদিস দিয়ে দলিল দেয়। সেটা হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনের মধ্যভাগে 'আশুরা'-র রোজা পালনের আদেশ দিয়েছিলেন। তখন সাহাবীরা দিনের বাকি অংশ রোজা-ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত থেকেছেন। আমরা বলব, এই হাদিসে তাদের পক্ষে কোন দলিল নেই। কারণ 'আশুরা'-র রোজা পালনের ক্ষেত্রে 'প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া' (হায়েয, নিফাস, কুফর ইত্যাদি)-র কোন ব্যাপার ছিল না। বরং সেক্ষেত্রে 'নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর' ব্যাপার ছিল।

'প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া' ও 'নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর' মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর' অর্থ হল- যে কারণে কোন বিধান আবশ্যকীয় হয় সে কারণ উপস্থিত হওয়ার আগে সেই হুকুমটি সাব্যস্ত হয় না। পক্ষান্তরে 'প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার' অর্থ হল- বিধান সাব্যস্ত আছে; কিন্তু প্রতিবন্ধকতা থাকায় সেটা বাস্তবায়ন করা যায় না। বিধান ওয়াজিব হওয়ার কারণ পাওয়া গেলেও এই প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতিতে বিধানটি পালন করা শুদ্ধ হবে না।

এই মাসয়ালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য একটি মাসয়াল হলে- যে ব্যক্তি রমজান মাসে দিনের বেলায় ইসলাম গ্রহণ করল তাঁর ক্ষেত্রে রোজার দায়িত্ব তার উপর নতুনভাবে বর্তাল।

এ রকম আরো একটি উদাহরণ হল- কোন নাবালেগ যদি রমজান মাসে দিনের বেলায় সাবালক হয় এবং সে বে-রোজদার থাকে তবে তার ক্ষেত্রেও রোজার দায়িত্বটি নতুনভাবে বর্তায়।

তাই যে ব্যক্তি দিনের বেলায় ইসলাম গ্রহণ করেছে আমরা তাঁকে বলব: দিনের বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকা আপনার উপর ওয়াজিব। তবে এ রোজাটি আর কাযা করা আপনার উপর ওয়াজিব নয়।

অনুরূপভাবে রমজান মাসের দিনের বেলায় যে নাবালেগ বালেগ হয়েছে আমরা তাকে বলব: দিনের বাকী অংশে রোজা ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকা তোমরা উপর ওয়াজিব। তবে এ রোজাটি কাযা করা তোমার উপর ওয়াজিব নয়।

কিন্তু রমজানের দিনের বেলায় যে ঋতুবতী নারী পবিত্র হয়েছে তার ক্ষেত্রে বিধানটি ভিন্ন। আলেমগণের ইজমা তথা সর্বসম্মত মত হচ্ছে- তার উপর রোজাটি কাযা করা ওয়াজিব। ঋতুবতী নারী যদি রমজানের দিনের বেলায় পবিত্র হয় তাহলে দিনের বাকী অংশ রোজা ভঙ্গকারী বিষয়াদি থেকে বিরত থাকায় তার কোনো উপকারে হবে না, এই বিরত থাকাটা রোজা হিসেবে গণ্য হবে না। বরং তাকে রোজাটি কাযা করতে হবে। এ ব্যাপারে আলেমগণ ইজমা করেছেন।

এই আলোচনার মাধ্যমে 'নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানো' ও 'প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া' এর মধ্যে পার্থক্য জানা গেল। সুতরাং হায়েযগ্রস্ত নারী রমজানের দিনের বেলায় পবিত্র হওয়ার মাসয়ালটি 'প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হওয়া' শ্রেণীর মাসয়াল। পক্ষান্তরে কোন শিশুর বালেগ হওয়া অথবা প্রশ্নকারীর উল্লেখিত রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে 'আশুরা' দিনের রোজা ফরজ হওয়া- এর মাসয়ালটি 'নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানো' শীর্ষক মাসয়াল। আল্লাহই তাওফিক দাতা। " সমাপ্ত।

[মাজমু ফাৎওয়া আশ-শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৬০ নং প্রশ্ন)]